মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৯শ ভাগ]   শ্রাবণ, ১৩২০। আগষ্ট, ১৯১৩।   [১ম সংখ্যা।

সূচী।

কলিকাতা।

৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে"

কে, পি নাথকর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ডাকমাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৯শ ভাগ] শ্রাবণ, ১৩২০। আগষ্ট, ১৯১৩। [১ম সংখ্যা।

প্রার্থনা।

হে মঙ্গলময়ী জননী এই নববর্ষারম্ভে তুমি তোমার সেবিকা মহিলাকে আশীর্ব্বাদ কর। তুমি তোমার বঙ্গবাসিনী কন্যাগণের শিক্ষা ও উন্নতির জন্য আজ বহুবৎসর যে এই ক্ষুদ্র পত্রিকাকে রক্ষা করিয়াছ, এজন্য আমরা তোমার চরণে ধন্যবাদ দান করি। মহিলা দ্বারা যাহা কিছু সদ্ভাব, উন্নত আদর্শ ও আশার কথা প্রচারিত হইয়াছে সে সমস্ত গৌরব তোমারই, সেজন্য তোমার চরণে কৃতজ্ঞ হই। ইহার সকল ত্রুটি, অভাব, অপূর্ণতার জন্য একমাত্র আমরাই দায়ী, সেজন্য তোমার নিকট ও তোমার পুত্র কন্যাগণের নিকট করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আর প্রার্থনা করি যে, যদি অযোগ্য জানিয়াও তোমার কন্যাগণের সেবায় নিযুক্ত রাখিলে, তবে আমাদিগকে এই কার্য্যের উপযুক্ত শক্তিবিধান কর। তোমার চরণে বৎসরারম্ভে এই ভিক্ষা করি, যেন এ বৎসরে বা ভবিষ্যতে মহিলা পত্রিকাতে অপ্রেম, অশুদ্ধতা, অসত্য বা নিরাশার কোন কথা বা ইঙ্গিত প্রকাশিত না হয়—যেন আশা ও আনন্দের দিকে চিরদিন ইহা চলে। তোমার বিস্তৃত লীলাক্ষেত্রে তুমি ক্ষুদ্র বস্তুর দ্বারাও আপনার কার্য সাধিত করিয়া লইতেছ, মহৎ বস্তু দ্বারাও মহৎ কার্য্য করাইতেছ। যদি মহিলাকে ছোট করিয়াছ ও ছোটই রাখিবে, আশীর্ব্বাদ কর, যেন ইহার ক্ষুদ্র আকারে ক্ষুদ্র কার্য্যক্ষেত্রে সর্ব্বদা তোমার মঙ্গলইচ্ছা পূর্ণ হয়—যেন তোমার কন্যাগণের প্রকৃত হিতসাধনে চিরদিন ব্যাপৃত হয়। তব পাদপদ্মে এই প্রার্থনা করিয়া বার বার প্রণাম করি।

আত্মনিবেদন।

আমাদের দেশের সাময়িক পত্রিকাগুলির উন্নতি ও বৃদ্ধি দেখিয়া সত্যই

আনন্দ হয়। এক এক খানি মাসিক বা ত্রৈমাসিক পত্রিকাতে কত সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ থাকে, কত উত্তম ছবি থাকে, কত প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা ও পৃথিবীর নানা দেশের নূতন উন্নতি বা পরিবর্ত্তনের প্রসঙ্গ থাকে। ইহার একখানি পত্রিকা নিয়মমত পাঠ করিলে যথার্থ শিক্ষালাভ হয় এবং জগতের উন্নতি-স্রোতের সহিত সংযুক্ত থাকা যায়। অনেকগুলি পত্রিকার মুদ্রাঙ্কন ও চিত্রগুলি এতই সুন্দর যে আমাদের এই দুস্থ দেশে এমন সুন্দর কার্য্য হইতে পারে, যেন ইহা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। ফলে ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে লণ্ডনের প্রসিদ্ধ চিত্রপত্রিকা যেরূপ ছবি প্রকাশ করিত, এখন আমাদের দেশেই সেইরূপ হইতেছে। বিবিধ বিষয়ে চিন্তাশীল লেখকগণের প্রবন্ধগুলিও সর্ব্বদাই মাসিক পত্রিকাতে প্রকাশিত হইতেছে। যে সকল মাসিক পত্রিকা স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বিষয় প্রচারের জন্য প্রকাশিত হইতেছে, সেগুলিও আপন আপন কার্য্য উত্তমরূপে করিতেছে এবং আমাদের পাঠকগণও অবশ্য এই সকল বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন; কারণ দশ জনের সাহায্য ও সহানুভূতি না হইলে এসকল কার্য্য কখনও চলিতে পারে না। এই সকল উচ্চশ্রেণীর সাময়িক পত্রিকার কার্য্যোদ্যমের সহিত তুলনা করিলে মহিলা পত্রিকার স্থান অতি নিম্নে। যাহা কিছু সাধারণের চিত্তাকর্ষক, তাহা পাঠক পাঠিকাগণকে উপহার দেওয়া মহিলার ভাগ্যে প্রায় ঘটে না। যদি আয়তন ও চিত্রের সংখ্যাদ্বারা পত্রিকার গুণাগুণ নির্দ্দেশ করা হয়, তাহা হইলে মহিলার স্থান নাই। কিন্তু আমরা জ্ঞাত আছি, এবং ইহা বিশ্বাস করি, যে মহিলা আমাদের অনেক পাঠিকা ও পাঠকগণের আদরের বস্তু।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের শিক্ষিত সমাজে যে সকল উচ্চ বিষয় আলোচনা হইতেছে, সাহিত্য, দর্শন বিজ্ঞান, প্রাচীন ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে উপযুক্ত লেখকগণ মহিলাতে প্রবন্ধাদি লিখিতেছেন। নিত্যগতিশীল সংসারে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে তাহাও সংক্ষেপে ইহাতে প্রকাশ করা যাইতেছে, অন্যান্য বিষয়েও মহিলাকে মহিলাগণের উপযুক্ত সেবিকারূপে উপস্থিত করিতে যত্ন হইতেছে, কিন্তু সে সকল মহিলার বিশেষ উদ্দেশ্যের কথা নহে। সাময়িক প্রয়োজন অনুসারে আলোচনা মাত্র।

মহিলার জীবনধারণের মূল উদ্দেশ্য বর্ত্তমান সময়ে নারীজীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বিষয়ে আলোচনা করা। আমাদের দেশের সামাজিক রীতিনীতি আচার ব্যবহার যে পরিবর্ত্তিত হইতেছে ইহা আমরা সকলেই দেখিতে পাইতেছি। কতকগুলি লোক অতি দৃঢ়তার সহিত প্রাচীন রীতিনীতি স্থির রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা কালের স্রোতকে অবরুদ্ধ রাখিতে চাহিতেছেন; কিন্তু বিফল-মনোরথ হইয়া সময়ের নিন্দা করিতেছেন। অপর কতকগুলি লোক এদেশীয় প্রাচীন সামাজিক নিয়ম

যাহারাই এদেশের বর্ত্তমান দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া তাহা সর্ব্বদা ত্যাগ করিতে মনস্থ করিয়া তদনুরূপ ব্যবহার করিতেছেন। অপর দিকে সমাজের প্রতি প্রাচীন ধর্ম্মের শাসন শিথিল হওয়ায় সমাজ যেন আদর্শহীন হইয়া পড়িয়াছে। এজন্য নূতন ভাবাপন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ-মণ্ডলীতে নানারূপ দোষ প্রবেশ করিতেছে। জনসমাজের প্রধান অংশ মহিলা সমাজ। যেদেশে নারীকুল আদর্শহীন হইয়া চাপলভাব স্বেচ্ছ রুচি অনুসারে চলিতে থাকে, সেদেশে অচিরে মহা পাপ মহা দুঃখ উপস্থিত হয়। আমরা বিশ্বাস করি, সকল চিন্তাশীল লোকই সামাজিক পরিবর্ত্তনের সময়ে নারীজাতিকে শ্রেষ্ঠপথে রক্ষা করিতে সর্ব্বাগ্রে যত্নবান হইবেন। মহিলার ক্ষুদ্র শক্তি নারীজাতির মঙ্গলের শ্রেষ্ঠপথ অনুসন্ধানই একমাত্র লক্ষ্য।

মঙ্গলবিধাতা নরনারীকে এক উচ্চ-ভূমিতে লইয়া যাইবেন বলিয়াই তাহাদিগের অবস্থার পরিবর্ত্তন সংঘটন করিতেছেন, কিন্তু কোন পথটি ঠিক মঙ্গল পথ তাহা তিনি কাহাকেও বলিয়া দিতেছেন না। নবযুগে যে নূতন নূতন পরিবর্ত্তন আসিতেছে তাহা যথাযথরূপে গ্রহণ করা এ যুগের অতি গুরুতর কর্ত্তব্য। মহিলার ক্ষুদ্র শক্তি, প্রাণের আকুল প্রার্থনা, জীবনের দর্শন সকলই এই প্রিয়কার্য্যে ব্যয়িত করা অভিপ্রায়। নবযুগে মহিলাগণের স্থান কি হইবে, তাঁহারা সমাজের কোন্ কোন্ কার্য্যের ভার লইবেন, কি কি অধিকার প্রাপ্ত হইবেন, এই সকল বিষয় জ্ঞান বিশ্বাস ও দেবালোকে আলোচনা করা মহিলার বিশেষ কার্য্য। যদি এবিষয়ে শেষ তত্ত্ব কাহারও জ্ঞাত হইত, তাহা হইলে এজন্য এত লাগিয়া থাকা প্রয়োজন হইত না, একখানি গ্রন্থ লিখিলেই শেষ হইত; কিন্তু বিধাতার অভিপ্রায় তাহা নয়। তিনি যেমন নিমেষ নিমেষ করিয়া যুগ যুগ দিতেছেন, তেমনই ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প করিয়া মহা মহা সত্য সকল প্রকাশ করিতেছেন। তিনি অতি অল্প অল্প করিয়া সামাজিক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠতা প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার আলোক অনুসারে নরনারী বিচরণ করিবেন। পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য আসিবে ইহা বিশ্বাস করিয়া স্বর্গের দেবতার ইঙ্গিত অনুসারে মহিলাগণের উন্নতির পথ আলোচনা করা অবশ্যই একটি গৌরবের কার্য্য। মহিলা এই মহৎ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া আপনার ক্ষুদ্র কার্য্য সম্পন্ন করিতে যত্নবান হইতেছে. এ বিষয়ে সাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতিও কিছু কিছু পাইতেছে। আজ কাল যেমন দিন পড়িয়াছে তাহাতে স্বর্গের আলোকও অনেক পথ দিয়া অতি প্রবল বেগে আসিতেছে। যাঁহারা এইসকল নবালোক প্রাপ্ত হইতেছেন, তাঁহারা যদি সমাজের হিতকর সংবাদ ও প্রবন্ধ দ্বারা মহিলাকে সাহায্য করেন তাহা হইলে বিশেষ উপকার হইবে। মহিলা পত্রিকাখানি যদি নবালোক-প্রাপ্ত কোন মহিলা সম্পাদন করেন, তাহা হইলে উত্তম হয়। যত দিন সেরূপ মহিলা অগ্রসর না হইতেছেন, ততদিন এই ভাবেই চলিবে। যে সকল

মহিলা অনুগ্রহ করিয়া ইহাতে প্রবন্ধ লিখিতেছেন, তাঁহাদিগের নিকট আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ; তাঁহাদের প্রবন্ধ চিরদিন আদরে গৃহীত হইবে. এবং আশাকরি ভবিষ্যতে অন্য সকল শিক্ষিতা মহিলাগণও মহিলার হিতার্থে সামাজিক, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ও অন্যান্য উপযুক্ত বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়া আমাদিগকে সাহায্য করিবেন। পৃথিবীতে স্বর্গ অবতীর্ণ হইতেছে. এই সংবাদ আসিয়াছে। এখন যিনি সমাজকে সামান্য বিষয়েও স্বর্গের গুণে ভূষিত করিবেন, তিনি স্বর্গে ও মর্ত্তে পুরস্কৃত হইবেন।

নারীপ্রকৃতি এবং নারীশ্বর।

মানবের প্রকৃতির মধ্যে নরনারী প্রকৃতি উভয়ই বিরাজিত। এক হইয়াও পাত্রভেদে এই দুই প্রকৃতির বিভিন্নতা রহিয়াছে। ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয় ইহা কে অস্বীকার করে? কিন্তু ঈশ্বরও এক হইয়া বহুরূপ ধারণ করেন। তাঁহারও পাত্রভেদে বিভিন্নরূপ প্রকাশ পায়। এজন্য ঈশ্বরের একরূপের দ্বারা নরনারী সকলের প্রকৃতির পূর্ণতা ও চরিতার্থতা হয় না। নরেশ্বর দ্বারা নারী জীবনের সম্পূর্ণরূপ সাফল্য লাভ ঘটে না। নারীশ্বর দ্বারাও নর পূর্ণরূপে আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতে পারে না।

এই কারণে নারীর আপন প্রকৃতি এবং সেই প্রকৃতির চরিতার্থতাকারী ঈশ্বরের সন্ধান করা এবং শরণ লওয়া আবশ্যক। আমরা বঙ্গীয় রমণী সমাজকে এ বিষয়ে একটু প্রণিধান করাইবার জন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি।

বঙ্গদেশে বিশেষ ভাবে অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল হইতে অভূতপূর্ব্ব যুগ-প্রলয় আরম্ভ হইয়াছে। বঙ্গদেশে নরনারীগণ ধর্ম্ম নীতি ও সমাজ সম্বন্ধে ঘোরতর বিবর্ত্তনের চক্রে বিঘূর্ণিত হইতেছেন। অবশ্যই যাঁহাদের একটু জ্ঞানোদয় হইয়াছে তাঁহারাই বর্ত্তমান বিবর্ত্তনের শক্তি প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম। শ্রীঈশা বলিয়াছিলেন, পুরাতন পাত্রে নূতন সুরা রাখা যায় না। তাহা আমরা বর্ত্তমান কালে সুস্পষ্ট লক্ষ্য করিতেছি। যে সকল নরনারীর সংস্কার, ভাব ও মতি গতি পুরাতন রকমের, তাহাদের জীবনে নবপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম স্থান পাইতে পারে না। এজন্য সর্ব্বপরিবর্ত্তয়িতা পরমেশ্বর বঙ্গদেশে নবধর্ম্মের বিকাশ হওয়ার পূর্ব্বাবধি বঙ্গীয় যুবক যুবতীগণ যাহাতে নূতন শিক্ষা, নূতন ভাব ও নূতন সংস্কারে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, তাহার বিপুল আয়োজন করিয়াছেন। বিধাতার সেই চক্রে নিপতিত হইয়া বঙ্গীয় নর ও নারীজাতির ভাব, গতি ও সংস্কার দিনের দিন নবীভূত হইতেছে। যেরূপে নারী নর গঠিত হইলে নবধর্ম্ম সুরা তাহাদের দ্বারা আদৃত ও গৃহীত হইতে পারে, যেরূপ সমাজে নারী নরের বাস হইলে নবীভূত জীবন পরিচালনে তাহারা সমর্থ হয়, সেরূপে কাল চক্র তাহাদিগকে গঠন পূর্ব্বক উপযোগী সমাজ মধ্যে আশ্রয় প্রদান করিতেছে। মহিলাগণ কি তাহা পরিষ্কার সন্দর্শন করিতেছেন না?

এ অবস্থায় অবস্থিত হইয়াও আমরা বঙ্গীয় নারীজাতিতে নব বিশ্বাস ও নব ভক্তির সঞ্চারের প্রবল চিহ্ন দেখিতে পাই না। নবধর্ম্ম প্রভাবে বঙ্গীয় নারী সমাজে অত্যল্প পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, নারীগণ কি তাহা সন্দর্শন করেন না? ব্রাহ্মসমাজে প্রধানরূপে নরের ঈশ্বর স্বীকৃত ও পরিগৃহীত হইয়াছেন, সুতরাং নর প্রকৃতি নবভাবে এদেশে প্রস্ফুটিত হইতেছে। কিন্তু নারীপ্রকৃতিকে বিকশিত করিবার জন্য নারী বা নরকুল উপযুক্তরূপে যত্নবান হয়েন নাই। নারীশ্বরও নারীজাতিতে সুস্পষ্ট প্রকাশমান হইতে পারেন নাই। এজন্য নারীজাতির তেমন নবস্ফুরণ পরিলক্ষিত হইতেছে না। আমাদের এই মন্তব্যটি যদি বঙ্গদেশের শিক্ষিতা রমণীগণ চিন্তা করিয়া দেখেন, তবে আমাদের বর্ত্তমান প্রচেষ্টা কিঞ্চিৎ সফল বোধ করিব।

নারী প্রকৃতির প্রধান প্রধান ভাব কি? ঈশ্বরের কোনরূপ দ্বারা সেইভাব চরিতার্থ হইতে পারে, তাহা কি মহিলাগণ ভাবিয়া দেখিয়াছেন? জ্ঞানী বলিয়াছেন—আপনাকে জান, তবেই ঈশ্বরকে জানিবে। ভক্ত বলেন—ঈশ্বরকে জান, তবে আপনার স্বরূপও ঠিক জানিবে। বাস্তবিক জ্ঞানীর প্রবচনানুসারে আপনাকে জানা ঈশ্বর জ্ঞানের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা। তাই জিজ্ঞাসা করি, শ্রদ্ধেয়া ভগিনি, নবীন শিক্ষালোকে আলোকিতা ভগিনি, তুমি তোমার আপনাকে জানিতে পারিয়াছ কি না এবং জানিতে যত্নবতী হইয়াছ কি না? পুরুষের অনুরূপ শিক্ষা তোমরা প্রাপ্ত হইতেছ বলিয়া, এবং পুরুষের ছন্দে গঠিত হইতেছ বলিয়া তোমরা কি কখন পুরুষ হইবে? কখনই না। নারী যদি যথার্থ আপনার প্রকৃতিতে স্ফূর্ত্তি লাভ না করে, তবে প্রকৃতি-ভ্রষ্ট হইবে। অতএব তোমাদের স্বকীয় প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করা ও আপনার প্রকৃতিকে চিনিয়া লওয়া সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। আমরা নারীপ্রকৃতির যে পরিচয় প্রাপ্ত হইতেছি, তাহা অবলম্বনপূর্ব্বক আমাদের অভিমত অদ্য প্রকাশ করিতেছি; আশা যে, আমাদের শিক্ষিতা ভগিনীগণ ইহা আপন মনে ও আপন প্রকৃতিতে স্থির হইয়া চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

বিশ্বাস ও নির্ভর নারীপ্রকৃতির প্রধান ভাগ। প্রীতি ইহার প্রধান ভাব।

বিশ্বাস বলিতেই আমরা অন্যের প্রতি বিশ্বাসকে নির্দ্দেশ করিতেছি। নির্ভর শব্দেও অন্য কাহারও উপরে নির্ভরকে নির্দ্দেশ করিতেছি।

পুরুষপ্রকৃতিতেও বিশ্বাস এবং নির্ভর নিহিত আছে। কিন্তু পুরুষ যত অধিকবয়স্ক হয়, তত আপন শক্তি ও ইচ্ছার উপর বিশ্বাস ও নির্ভর করিতে অভ্যস্ত হইয়া থাকে।

নারীও যদি শিক্ষালাভপূর্ব্বক আপন শক্তি ও ইচ্ছার উপর বিশ্বাস ও নির্ভর করিতে শিক্ষা পায় এবং অভ্যস্ত হয়, তবে সে তাহার আপনার প্রকৃতি হারাইয়া ফেলে।

আমরা অন্যের প্রতি প্রীতিকেই প্রীতির স্বরূপ বলি! কিন্তু নর অনেক সময়ে আপনার প্রতি প্রীতিকেই প্রীতির

প্রকৃতি বুঝিয়া লয়। আপনার প্রতি প্রীতি হইতে অনেক পুরুষ জীবনের কার্য্য আরম্ভ করে। নারীর পক্ষে ইহা অসম্ভব। নারীহৃদয়ের প্রীতি ও সহানুভূতি যদি অন্যের প্রতি সঞ্চারিত না হয়, তবে তাহার হৃদয় বিনষ্ট এবং নারীত্ব বিলুপ্ত হইল।

অনেক শিক্ষিত পুরুষের মনে এই ভাব যে, আমাদের দেশের নারীকুল অপরের প্রতি অযথা বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া বিনষ্ট হইয়া থাকে। এ সিদ্ধান্ত কোন কোন স্থলে সত্য হইলেও ইহা পূর্ণ সত্য নহে। নারী যেন বিশ্বাস-এবং নির্ভরশূন্য-জীবন না হয়েন ইহাই সর্ব্বথা প্রার্থনীয় বটে।

নারীর পূর্ণবিশ্বাসের পাত্র পূর্ণ পরমেশ্বর হইবেন, তাঁহার জীবনের নির্ভরও পূর্ণ পরমেশ্বরের প্রতি স্থিতি করিবে। নবীন শিক্ষালোকের সহিত পূর্ণ ব্রহ্মসনাতনের প্রকাশের আলোক মিলিত হইয়া বঙ্গীয় নারীকে যত দিন ঐরূপ বিশ্বাস গ্রহণ করিতে শিক্ষা না দিতেছে এবং পূর্ণ ব্রহ্মের প্রতি জীবনের সকল বিষয়ে নির্ভরশীল না করিতেছে, তত দিন আমাদের নবভাবাপন্ন রমণীসমাজ নবজীবনের স্রোতে আপনাদিগকে নিক্ষেপ করিতে পারিবেন না। নবীন পাত্রে ভিন্ন নূতন ধর্ম্মসুরা পুরাতন পাত্রে রাখা হয় না।

ধন, জন, শক্তি, পদ কোন কিছুই নারীর জীবনের বিশ্বাস আকর্ষণ করিলে বা নারীজীবনের নির্ভর গ্রহণ করিলে নূতন নারীসমাজ বঙ্গে প্রকাশ পাইবে না। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে এবং হিন্দু সমাজে স্বামীকে নারীর যেরূপ বিশ্বাস ও নির্ভরস্থল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে, নূতন বিধানের আলোকে তাহাও ঠিক বলিয়া বিবেচিত হইবে না। বঙ্গীয় নারীগণ বা নরসমাজ আমাদের এ মন্তব্য বিচার করিয়া দেখিবেন।

নারীর জীবনের গতি প্রীতি দ্বারা নিয়মিত হইতেছে। পুরাতন হিন্দুসমাজে এই প্রীতি একরূপে নারীকে গঠন করিয়াছে। সে জন্য হিন্দুর সংসার নারীর সেবার মহাক্ষেত্ররূপে প্রকাশ পাইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে নব্য শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়া নারীকে কি কিছুটা (Self-Centered) আত্মকেন্দ্রাভিমুখী করিতেছে? আমরা ইহার প্রতিবাদই প্রত্যাশা করি। শিক্ষা দ্বারা বঙ্গদেশে যেন নারীকুলে উক্ত প্রকার পরিবর্ত্তন না ঘটে, ঈশ্বরের নিকট আমাদের ইহা হৃদ্গত প্রার্থনা।

বর্ত্তমান প্রণালীর শিক্ষাপ্রভাবে আত্মপ্রীতির ভাবটি প্রবল হওয়া বিশেষ আশ্চর্য্যজনক নহে। আমরা তাই একথা এ ভাবে এখানে উল্লেখ করিতেছি।

প্রবক্তা বলিয়াছেন, "হৃদয়কে সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা কর, কেন না ইহা হইতে জীবন প্রবাহিত হইয়া থাকে।" বাস্তবিক হৃদয় বা প্রীতি হইতেই জীবনের প্রবাহ। ইহা সংকীর্ণ হইলে জীবনও সংকীর্ণ হইয়া থাকে। ইহা বিস্তীর্ণ হইলে জীবনও বিশেষ প্রসার লাভ করে। সুতরাং প্রীতির গতির দিকে সকলেরই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা কর্ত্তব্য। প্রীতি [illegible] ভিন্ন কিছুতেই পরিতৃপ্ত [illegible] স্ফুরিত হয় না। প্রীতি আপনার অর্দ্ধেক

কাহাকে দান করিয়া অর্দ্ধেক হাতে রাখিয়া সুখী হয় না। প্রীতির প্রধান প্রয়াস সম্পূর্ণ ভাবে অন্যের করে সমর্পণ করা। এজন্য ইহা এমন একটি ব্যক্তি সন্ধান করে যাহাকে সমগ্রটি সমর্পণপূর্ব্বক আপনাকে মুক্ত করে। আর্য্য ঋষিগণ নারীর পক্ষে আপনার পতিকেই সেই ব্যক্তি নিরূপিত করিয়াছেন। কিন্তু নবধর্ম্মের জ্যোতি পৃথিবীর কোন মনুষ্যকে বা স্বর্গলোকে কোন ব্যক্তিকে নরনারীর প্রীতির পরিপূর্ণ অধিকারী নির্দ্দেশ করেন না। যিনি প্রেমময়, প্রেম যাঁহা হইতে প্রবাহিত, তিনিই নারীহৃদয়ের ও প্রীতির পরিপূর্ণ অধিকারী।

আমাদের নারীগণ কি এ বিষয়টি চিন্তা করিয়াছেন? সমগ্র হৃদয়টি সেই অখণ্ড প্রেমময়ের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন এমন একটি মহিলাও কি জন্মপরিগ্রহ দ্বারা বঙ্গীয় মহিলাকুলকে ধন্য করিয়াছেন?

আমাদের দেশে পূর্ব্ব কালে নারীর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব প্রায় স্বীকৃত হয় নাই। বর্ত্তমান কালে পাশ্চাত্য সভ্য জাতির অনুকরণে নারীকে যে স্বাধীনতা পুরুষকর্ত্তৃক প্রদত্ত হইতেছে ইহা আসলের নকল মাত্র। ইহা দ্বারা নারীর ব্যক্তিত্ব সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

পরিপূর্ণ ব্যক্তি পরমেশ্বরের আনুগত্য ও প্রেম দ্বারা যদি নারী আপন ব্যক্তিত্বটি সমাজে দণ্ডায়মান করিতে সমর্থা হন, তবে আমরা এদেশে নারীসমাজে যে নব সৌন্দর্য্য ও নব শক্তি দেখিব, তাহা অদ্যাপি প্রকাশ পায় নাই।

পাশ্চাত্যজাতি সমূহ মধ্যে বহুকাল নারীরও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব স্বীকৃত হইতেছে। খ্রীষ্টের প্রতি ভক্তি হইতে পাশ্চাত্য সভ্য নারীজাতি জীবনের যেরূপ শক্তি ও সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন, এদেশে নারীগণ মধ্যে তাহা পরিলক্ষিত হয় নাই। এদেশে নারীগণ গৃহিণী ও জননী রূপে আশ্চর্য্য শক্তি ও শুদ্ধি প্রদর্শন করিয়াছেন; কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস, নির্ভর ও ভক্তি অর্পিত হইলে যে বিশুদ্ধ মনুষ্যপ্রীতি এবং মনুষ্য সমাজের স্বাধীন সেবা দ্বারা নারীগণ আপনাদের ব্যক্তিত্বের গৌরব প্রদর্শন করিবেন, তাহা অদ্যাবধি দেখা যায় নাই। নারীগণকে নারী প্রকৃতির জ্ঞানলাভ করিয়া এজন্য নারীশ্বরের শরণাপন্ন হইতে হইবে। নারীকে স্বাধীন ভাবে ব্যক্তিরূপে এইরূপে আপন প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে আত্ম-সমর্পণ এবং সমগ্র প্রীতি সমর্পণ করিতে হইবে। তাঁহার মঙ্গলপদে জীবনের সমগ্র বিশ্বাস, নির্ভর না দিলে উহা ঘটিবে না। আমরা শিক্ষিতা মহিলাগণকে এ বিষয়ে আত্মানুসন্ধান করিবার জন্য অনুরোধ করি। বঙ্গীয়া নারীদিগের অনেকে অধুনা নানারূপ জনসেবা-ব্রতেও জীবনপাত করিয়া থাকেন। কিন্তু কোন ভাবে কি উদ্দেশে তাঁহারা জনসেবাব্রত গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহা কি চিন্তা করিয়া দেখেন? নিজকে এবং সমস্ত বঙ্গীয়া মহিলাদিগকে নবজীবনে পরিবর্ত্তিত দেখিতে হইলে উক্তরূপে আত্মানুসন্ধান অতীব প্রয়োজন।

দাম্পত্যধর্ম্ম এবং এদেশের নারী জাতির ভালবাসার প্রভাব।

একবার যাহার সঙ্গে যাহার বিবাহ হইয়া যায়, তাহার সঙ্গে চিরকালের জন্য বিবাহ হয়। বিবাহের পর যদি একজন চিররুগ্ন হইয়া পড়ে, কিম্বা কোন প্রকার অচল হয়, মৃত্যু হয়, কিম্বা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে বা চরিত্র স্খলিত হয়, তথাপি বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইতে পারে না। "কেন না ঈশ্বর যাহাদিগকে বাঁধিয়াছেন, কিছুতেই যেন সে বন্ধন ছেদন না হয়।" এই হইল স্বর্গের উৎকৃষ্ট বিধি। অস্মদ্দেশে এ নিয়ম স্ত্রীলোকের মধ্যেই দৃষ্ট হয়। একবার বিবাহিত হইলে নারী চিরকালের জন্য বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু পুরুষেরা সচরাচর এরূপ বন্ধন মানেন না। তাঁহারা দারান্তর গ্রহণ করেন। এমন কি এক স্ত্রী বর্ত্তমানে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করেন। এরূপ ভাব প্রচলন অতীব হীনমতির কার্য্য। মানব অধ্যাত্মভাবাপন্ন। বহু বিবাহ পাশব ব্যবহার। ইউরোপে স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকার। বিধবা এবং বিপত্নীক উভয়ে ইচ্ছা করিলে পুনরায় বিবাহ করিতে পারেন এবং করিয়া থাকেন। এমতাবস্থায় যখন কোন নারী চিরবৈধব্যব্রত গ্রহণ করেন, অথবা কোন বিপত্নীক চির বৈপত্নীক ধর্ম্ম পালন করেন, তাহাতে উচ্চ আধ্যাত্মিকতা বা প্রকৃত প্রণয় প্রকাশ পায়।

দেখা যায়, ইউরোপে কখনও বহুপত্নী গৃহীত হয় নাই। তথায় বহু বিবাহ কোন কালে চল ছিল না। কিন্তু নারীকে স্বামীর অধীনতা অবলম্বন করা একটা ধর্ম্ম এবং উচ্চধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত। সে সব দেশে এখনও বিবাহ সময়ে কন্যাসম্প্রদান হয়। খ্রীষ্টিয়ান বিবাহপদ্ধতিতে সম্প্রদানক্রিয়া সন্নিবিষ্ট আছে। আমাদের দেশে চিরকাল নারী একবার মাত্র বিবাহের অধিকারিণী। যাহার সঙ্গে বিবাহ হয়, তাহাকে নারী দেবতাস্বরূপ মান্য করেন। প্রাণ মন রূপ যৌবন সর্ব্বস্ব অর্পণ করেন। আপন পিতা মাতার নিকট যাইতে হইলেও স্বামীর বিনা অনুমতিতে যাইতে পারেন না। এইরূপে ক্রমে নারীর মধ্যে সতীধর্ম্ম সঞ্চারিত হইয়াছে। ভারতনারী নীরবে কত নির্য্যাতন, অপমান, লাঞ্ছনা সহ্য করেন, তথাপি পতিরই হইয়া থাকেন। এমন কি অনেক নারী এমন সতী আছেন যে, স্বামীর দুর্ব্যবহারের কথা অন্যের মুখে শুনিতে কষ্ট বোধ করেন—কখনও শুনেন না। পতি ভিন্ন নারীর আর গত্যন্তর নাই। এইরূপে পতিভক্তিতে এত উন্নত হইয়াছেন যে, পতির অমানুষিক অপমান-জনক—এমন কি সতীধর্ম্ম বিনষ্ট হয় এরূপ অবস্থাতে স্বামী কর্ত্তৃক নিপতিত হইয়াও পতির প্রতি আপন প্রেম ভক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া থাকেন। ব্রাহ্মসমাজের একটি উচ্চ কুলের কায়স্থ কন্যার এক জন নব-শাখাস্থ যুবকের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল। যুবক অল্প কয়েক দিন পরে হিন্দুসমাজভুক্ত হইয়া পুনরায় হিন্দুমতে দারপরিগ্রহ করেন। ১৮৭২ সনের ৩ আইন অনুযায়ী বিবাহ রেজিষ্টরী হইয়াছিল, ইচ্ছা করিলে

পত্নী পতির নামে নালিশ করিতে পারিতেন—এরূপ অভিযোগের ফলে উক্ত হিন্দু-বিবাহ অসিদ্ধ হইত এবং এক পত্নী বর্ত্তমানে অন্য পত্নী গ্রহণ অপরাধে ৫ বৎসর কঠিন শ্রমসহ কারাদণ্ড এবং ৫০০৲ অর্থ দণ্ড হইতে পারিত। কিন্তু নারী পতির বিরুদ্ধে অভিযোগ উচ্চ-প্রেমবিরুদ্ধ মনে করিয়া চিরকাল ক্ষমা করিয়া নিজ প্রেম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। একসময়ে পতি তাঁহাকে গ্রহণ করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু এরূপ সপত্নীত্ব স্বীকার করা উচ্চ-ধর্ম্মবিরোধী বিধায় তিনি স্বামিসঙ্গে যাইতে সম্মত হইতে পারেন নাই, অথচ তাঁহার সঙ্গে সদ্ব্যবহার—ভালবাসাপ্রদর্শনে ত্রুটী করেন নাই।

কিছু দিন হইল কোন নগরে এক চিকিৎসাব্যবসায়ীর পত্নীর প্রতি ব্যবহার বিষয়ে যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহাতে নারীচরিত্রের উৎকৃষ্টতর পরিচয় পাইয়াছি এবং প্রেমের জয় হয়ই হয়, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। উক্ত চিকিৎসাব্যবসায়ী উচ্চ-কুলোদ্ভব একটী অল্পবয়স্কা বালিকাকে বিবাহ করিয়া বিদেশে চাকুরী করিতেছিলেন। লোকের নিকট প্রকাশ করিতেন তিনি বিবাহ করেন নাই। তাঁহার পত্নী পূর্ণবয়স্কা হইলে পত্নীর পিতা জামাতাকে অনেক রকমে তাঁহার কন্যাকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। কিছুতেই উক্ত বাবু গ্রহণ করেন নাই। অবশেষে কন্যার পিতা কন্যাকে লইয়া কর্ম্মস্থলে উপস্থিত হইয়া তথায় প্রথম স্বয়ং জামাতার নিকট উপস্থিত হইয়া কন্যাগ্রহণের প্রস্তাব করেন, কিন্তু জামাতা সম্মত হয়েন না। সেই স্থানের কতিপয় ভদ্রলোক অনেক অনুরোধ করেন, কিছুতেই তাঁহার স্ত্রীকে গ্রহণ করিলেন না। অবশেষে মেয়েটী মনে করিলেন, আমারই তো স্বামী—আমি আপনা হইতে তাঁহার গৃহে যাইয়া থাকিব, দেখি পতি আমাকে গ্রহণ না করিয়া পারেন কি প্রকারে? এই মনে করিয়া পিতার অমতে এক দিন স্বামিগৃহে যাইয়া উপস্থিত। স্বামী গৃহে ছিলেন না—কিছুকাল পর গৃহে আসিয়া দেখিলেন, পত্নী আসিয়া গৃহে বসিয়া আছেন। দেখিবামাত্র অমনি বাহিরে গেলেন—এবং দুই জন মেথর ডাকিয়া তাহাদিগকে দুইটী টাকা দিয়া বলিলেন যে, একটী যুবতী নারী আমার বাড়ীতে আমার অনুপস্থিতির সময়ে এসে ঘরে প্রবেশ করিয়া রহিয়াছে। তোমরা তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাও এবং যাহা ইচ্ছা তাহা কর। তাহারা টাকা পাইয়া অমনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ঐ নারীকে ধরিল, নারী কিছুতেই যাবেন না। দুর্ব্বৃত্তদের হাত হইতে রক্ষা পাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিয়া উঠিলেন না। দুর্ব্বৃত্তেরা তাহাকে চুলে ধরিয়া বাহিরে টানিয়া লইয়া গেল—বস্ত্র পড়িয়া গেল। স্ত্রীলোকটী প্রাণপণে চিৎকার করিতে লাগিলেন। চিৎকার শুনিয়া পার্শ্ববর্ত্তী একটী মুসলমান ভদ্রলোক বাহির হইয়া আসিয়া সেই মেথরদ্বয়ের হস্ত হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করেন। কাপড় পরাইয়া নিজ গৃহে লইয়া যান। তৎপর তাঁহার পিতাকে সংবাদ দিয়া স্ত্রীলোকটীকে তাঁহার

পিতার নিকট দেন। পিতা এবং অন্যান্য ভদ্রলোকেরা এই অপমান এবং সতীত্ব বিনাশের পথে ফেলিয়া দেওয়ার জন্য স্বামীর বিরুদ্ধে বিচারালয়ে অভিযোগ করিতে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করা সত্ত্বেও সেই ভদ্রমহিলা কিছুতেই স্বামীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করিলেন না। তাঁহার এরূপ ক্ষমা এবং অপ্রতিহত প্রেমে স্বামীর অন্ধতা লোপ পাইল এবং সেই স্বামী এখন তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছেন এবং উভয়ে সুখে ঘরসংসার করিতেছেন। স্বামীর প্রতি অপ্রতিহত ভালবাসা অবশেষে জয় লাভ করিল। এদেশের নারীর মধ্যে এখনও কত উচ্চদরের প্রীতি ভালবাসা আছে। ভালবাসার ক্ষমাতে কি না হয়?

বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন যে, ঘৃণা দ্বারা ঘৃণা দমন করা যায় না—প্রেমের দ্বারা ঘৃণা জয় হয়। এই জন্য প্রেমের জয়—সতীত্বের জয় চিরকালই হইয়া থাকে। আধুনিক শিক্ষিত মহিলাদের মধ্যে এরূপ ঘটনাসম্বন্ধে কি ভাব-তাহা জানিতে পারা যায় নাই। তাঁহারা এরূপ স্থলে কিরূপ ব্যবহার করা বিধেয় মনে করেন জানি না। মহিলারা যেরূপ পতিপরায়ণ এই ক্ষণ পতিরা যদি সেরূপ পত্নীপরায়ণ হইতে পারেন তবে দেশের কত মঙ্গল। পত্নীকে দেবীর ন্যায় দেখা এবং পূজা করা যখন পতির পক্ষে দাম্পত্যব্রতপালনের আদর্শ হবে, তখন এ সংসার স্বর্গ হবে এবং প্রকৃত দাম্পত্যধর্ম্ম স্থাপিত হবে। অধুনা নারীদের মধ্যে এরূপ ভাব দাঁড়াইতেছে যে, যখন পুরুষেরা দুশ্চরিত্র হইলে তাহাদের প্রতি শাসন নাই—তখন নারীদের চরিত্রহীনতার জন্য শাসন করা অবিচার। এরূপ ভাবে বিষয়টী দেখিলে চরিত্রহীনতার প্রতি যে স্ত্রীসুলভ ঘৃণা তাহার শিথিলতা উপস্থিত হওয়ার বিশেষ আশঙ্কা। নারীর সতীত্বের তীব্র পুণ্যপ্রভাব পুরুষে যাহাতে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করে, তাহার যত্ন সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। মাতা, পত্নী ভগ্নী, প্রভৃতি স্নেহময়ী নারীরা যদি পুত্র প্রভৃতি গৃহের পুরুষদের চরিত্রহীনতায় নিজদিগকে নিতান্ত দুঃখিত, শোকগ্রস্ত এবং ক্ষুণ্ণ ও বিমর্ষভাবাপন্ন বোধ করেন, তবে নিশ্চয় গৃহের পুরুষগণ শুদ্ধ থাকিতে যত্ন করিবেন এবং ক্রমে বাধ্য হইবেন।

কলিকাতা মহানগরীতে কোন ছাত্রী একদা কুপথে যাওয়ার উদ্যমের সময় মাতার কথা মনে পড়িল যে, মাতার মনে বড়ই কষ্ট হবে। অমনি অসৎপথে পদার্পণ করিতে বিরত হইলেন। মানবসমাজের মূলই নারী। এদেশের নারী চিরশুদ্ধতাকে বড় আদর করেন। সতীধর্ম্ম তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা লভনীয় এবং সেই জন্য জীবন। নারী এইরূপই শুদ্ধতার পক্ষপাতী চিরদিন থাকুন। পুরুষের দোষ, নীচসুখাসক্তি, তামাক, আফিঙ, গাঁজা, মদ, চরিত্রহীনতা যেন তাঁহাদের জীবনের ত্রিসীমাতে না যায়। এক অঙ্গ সুস্থ সুক্ষম থাকিলে অপর অঙ্গের শুদ্ধ সুস্থ হওয়ার আশা থাকে। আর দক্ষিণ অঙ্গের রোগ যদি বাম অঙ্গে ব্যাপৃত হয় তবে সমস্ত দেহই নষ্ট হইল। অতএব

নারীগণ যেন পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার স্থাপন করার উদ্যমে এবং চেষ্টাতে আপন আপন ধর্ম্ম—পুণ্য প্রেম দ্বারা পাপ অপ্রেম জয় করার অধিকার, তাহা হইতে বিচলিত না হয়েন। যদি ঈশার ঘোষিত স্বর্গরাজ্য এবং নববিধানের মহাসমন্বয় স্থাপিত হয়, তবে নারীর প্রেম পুণ্যের জয়েতেই হইবে। অতএব নারীগণের যে ধর্ম্ম প্রেম দ্বারা অপ্রেম জয়, প্রেম দ্বারা পাপরাজ্য ধ্বংস করা তাহার যেন এক চুলও এদিক ওদিক না হয়।

শ্রী—

অতীতের বাণী।

রাজা সলোমন জেরুজালেম হইতে তাঁহার সভাসদ্ ও যোদ্ধৃবর্গসহ মহাসমারোহে বাহির হইতেছিলেন। শীবার (আবিশীনিয়া) রাজ্ঞীও তাঁহাদের সহযাত্রী ছিলেন। সিরিয়া দেশের উত্তপ্ত সূর্য্যরশ্মি তাঁহাদের নিকট একটুও কষ্টকর বোধ হয় নাই, বরং দিবাবসানে সুবর্ণদীপ্তির সৌন্দর্য্যে তাঁহারা গৌরব অনুভব করিতেছিলেন। রাজা সলোমন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলিয়া বিদিত ছিলেন; তিনি পৃথিবীতে ভূচর, খেচর বা জলচর, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সকল প্রাণীরই ভাষা বুঝিতে পারিতেন। পথিমধ্যে তাঁহারা একটী পিপীলিকার বাসস্থানের সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। রাজ্ঞী সলোমনকে পিপীলিকাগণের বাক্যালাপের মর্ম্ম বুঝিয়া তাহা শুনাইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। সলোমন বলিলেন ইহারা বলাবলি করিতেছে, "ঐ দেখ যে রাজাকে লোকে বিজ্ঞ, ন্যায়বান ও সাধু বলিয়া সম্মান করে, তিনি আমাদিগকে পদতলে দলন করিয়া ধূলায় মিশাইয়া চলিয়া যাইবার জন্য আসিতেছেন।" এই বলিয়া রাজা রাজ্ঞীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং দেখিলেন তাঁহার এইরূপ অর্থারোপে রাজ্ঞী অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়াছেন। ক্ষণকাল পরে রাণী বলিলেন, "হে রাজন্ আপনার অনুগ্রহে আপনার চরণে দলিত হইয়া যদি কাহারও জীবন যায়, সে তো নিজেকে ধন্য মনে করিবে; আপনার রাজমুকুট স্বয়ং ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিয়াছে, শত শত রাজন্যবর্গ আপনার পদমূলে নত হয়, আর এই ক্ষুদ্র জীবেরা আপনার বিরুদ্ধে এরূপ বলিতে সাহস করিবে?" সলোমন উত্তর করিলেন, "না ভদ্রে, বিজ্ঞ এবং সবলকেই দুর্ব্বল ও দরিদ্রের মঙ্গলসাধনে যত্নবান্ হইতে হইবে।" এই বলিয়া তিনি ঘোড়ার লাগাম ফিরাইলেন; সঙ্গে সঙ্গে ত্রস্তগতিতে অনুগামিগণও পিপীলিকার পাহাড় পার্শ্বে রাখিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গেল। রত্নভূষিত শির নত করিয়া রাণী বলিলেন, "মহারাজ এখন আপনার মহত্ত্ব ও জ্ঞানের যথার্থ পরিচয় প্রাপ্ত হইলাম; যে রাজ্যের অধীশ্বর ধনীর চাটুবাক্যে না ভুলিয়া দরিদ্রের সভয় মৃদু আবেদন শ্রবণ করেন, সে রাজ্য নিশ্চয়ই ধন্য।"

দূর অতীতের স্তব্ধতা হইতে এ কোন্ শব্দ আজও শ্রবণে আসিয়া পৌঁছিতেছে? পূর্ব্বাপর শত শত শতাব্দীর জন্য এ কোন্

শিক্ষা ও অনুযোগ মানবের জন্য সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে? সহস্র সহস্র বৎসরের চেষ্টায়ও এই সাধন আজ সম্পূর্ণ হইল না; কয়জন লোক, কয়টী জাতি আজও ধনীর কথায় 'হাঁ' না দিয়া, সবলের পক্ষে না হইয়া দুর্ব্বল ও দরিদ্রের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়ায়? রুষ জাপান যুদ্ধের ভীমনাদে ঊনবিংশ শতাব্দী কম্পমান হইয়াছিল; তুরস্ক বল্কান যুদ্ধের রক্তস্রোতে বিংশ শতাব্দীর আরম্ভকালই রঞ্জিত হইয়া গেল। বিধাতার আদেশ উপদেশ শক্তিশালী, কিন্তু মানবের তাহা নিষ্ফল করিবার আগ্রহ যেন তদপেক্ষাও অধিক বলী। শত শত বৎসরের উপদিষ্ট সাম্যনীতি এই সভ্যতার দিনেও মানব-সমাজে শক্তি-বিস্তার করিতে পারিল না! কেন আজও বড়লোকের আচার ব্যবহার, ন্যায় হোক বা অযথা হোক, সমাজের আদর্শ হইয়া দাঁড়ায়, কেন আজও দরিদ্র অস্পৃশ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, কেন দুর্ব্বল ভ্রাতৃগণ পতিত বলিয়া ঘৃণিত হয় কেন এখনো ধনীর নারী দরিদ্রের গৃহিণীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে দাম্ভিকভাব ও গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করেন? সাধন ও আদর্শ দৈনিক জীবন-রূপে পরিণত না হইলে তাহা নিতান্তই অর্থহীন। রাজপুত্র ভিখারী শাক্যসিংহের জন্ম ও সাধনভূমি আমাদের এই পুরাতন ভারতবর্ষে, শ্রীচৈতন্যের এই লীলাক্ষেত্রে, কবীর ও নানকের দেশে কবে প্রতিজনে পিপীলিকার বাসস্থানটি মনোযোগের সহিত পার্শ্বে রাখিয়া পথ অতিক্রম করিতে শিখিবে?

শ্রীনির্ঝরপ্রিয়া ঘোষ।

স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়।

(অনুবাদ।)

স্বাস্থ্যরক্ষার আবশ্যকতা অপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয় খুব অল্পই আছে, তবুও এ সম্বন্ধে অজ্ঞতাই বহুদূর প্রসারিত। অস্বাস্থ্য পালন ও উৎপাদনের পরিবর্ত্তে স্বাস্থ্য-রক্ষার প্রণালী কত সহজ, জ্ঞাত থাকিলে লোকে তাহা পাইবার জন্যই প্রাণপণ চেষ্টা করিত।

অধিকাংশ পীড়া বাস করিবার দোষেই জন্মে, উপযুক্ত উপায় গ্রহণ করিয়া উক্ত দোষ পরিহার করাই প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত। পীড়া জন্মিবার পূর্ব্বে উহার আক্রমণ হইতে রক্ষা এবং শরীরকে সুস্থ রাখিবার জন্য পীড়া সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা অপেক্ষা স্বাস্থ্যসম্বন্ধে জ্ঞানলাভই প্রকৃষ্ট।

এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য শারীরিক স্বাস্থ্য লাভের উত্তম উপায় ও সাধারণ স্বাস্থ্য-নীতির ভ্রমপ্রদর্শন।

এক্ষণে প্রথমতঃ আহার ও পান সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা এবিষয়ে ঐকমত যে সাধারণতঃ লোকে প্রয়োজনের অধিক ভোজন করে; খাদ্যের পরিমাণ শারীরিক স্বাস্থ্য, বয়স, অভ্যাস ও পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে, সুতরাং উহার পরিমাণ নিরাকরণ করা এক প্রকার অসম্ভব। অবকাশভোগী অপেক্ষা শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম-কারীর এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশবাসী অপেক্ষা শীতপ্রধান দেশবাসীর অধিক খাদ্যের আবশ্যক। শারীরিক প্রয়োজনীয়তা

অপেক্ষা অধিক ভোজন করিয়া পরিপাক যন্ত্রকে ভারগ্রস্ত করিলে প্রচুর শক্তির অপচয় করা হয়, অধিকন্তু অতিরিক্ত আহারে চর্বি জমিয়া সমস্ত শরীরকে ভারাক্রান্ত করে। যখন চিন্তা করা যায় যে, অধিকাংশ স্থলে মাংসবহুল শরীর ও তদানুষঙ্গিক অস্বাস্থ্য ও বিপদ কেবল অতিরিক্ত ভোজন এবং অল্প পরিশ্রমের ফল, তখনই ইহার প্রতীকার সম্বন্ধে পরামর্শ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়ত অনুভূত হয়।

আমাদের খাদ্যের প্রকার ও পরিমাণ কোনটিই উপেক্ষার বিষয় নহে, দুর্ভাগ্যবশতঃ আস্বাদন দ্বারা বস্তুর পরিপাকের গুণ বিচার করা যায় না। সাধারণতঃ ইহাই দেখা যায় যে, দুষ্পাচ্য সামগ্রীই অধিকতর স্বাদু; সকলের পক্ষেই প্রযুজ্য, আহার সম্বন্ধে এমন কোন নিয়মই নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া যায় না। কেননা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের খাদ্যবস্তু পরিপাক সম্বন্ধে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য আছে, যেমন একজনের খাদ্যবিশেষ অপরের পক্ষে বিষতুল্য, অতএব এবিষয়ে অভিজ্ঞতা দ্বারা পরিচালিত হওয়াই যুক্তিযুক্ত। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা আহারের ঠিক নিয়ম না জানিব, ততক্ষণ আমাদিগের উপযুক্ত আহার বিশেষতঃ খাদ্যের প্রকার ও পরিমাণ সম্বন্ধে কোন বিচারই সম্পূর্ণ হইবে না। অনিয়মিত সময়ে আহার ও খাদ্যবস্তু চর্ব্বণের অসম্পূর্ণতায় পরিপাক শক্তির হ্রাস ও তদানুষঙ্গিক বহু প্রকারের পীড়া জন্মিয়া থাকে। দন্তের দ্বারা কত প্রকারের পীড়া জন্মিতে পারে, বিগত কয়েক বৎসরে সে বিষয়ে বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে। খারাপ দন্ত যে কেবল অব্যবহার্য্য তাহা নহে, দন্তের ভিতর ছিদ্র থাকিলে উহাতে চর্ব্বিত খাদ্য প্রবিষ্ট হইয়া বিষ উৎপন্ন করে যাহা বড়ই বিপজ্জনক। দেখা গিয়াছে, কৃত্রিম দন্ত ব্যবহার করিয়া অনেকে পাকস্থলীর পীড়া ও শারীরিক দুর্ব্বলতার হস্ত এড়াইয়া পুনরায় স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছেন।

পাকস্থলীর ক্রিয়া অতি দ্রুতগামী, অন্যান্য শক্তির সহায়তা পাইলে তাহার কার্য্য অতিশয় শীঘ্র নির্ব্বাহিত হয়। সেইজন্য ভোজনের অব্যবহিত পরেই কোন কার্য্য না করিয়া অল্পক্ষণ বিশ্রামের ব্যবস্থা অতি উত্তম।

খাদ্য অপেক্ষা পানীয়ের সমস্যা কঠিন নহে এবং কয়েকটী সাধারণ নিয়ম দ্বারা ইহার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। চা ও কাফির অপরিমিত পান অত্যন্ত ক্ষতিকারক, ইহাতে স্নায়ুদৌর্ব্বল্য ও পরিপাক শক্তির হ্রাস হয়। সাধারণ নিয়ম অনুসারে চা বহুক্ষণ জলে রাখিয়া পান করায় বিশেষ ক্ষতি আছে, আহার কালে অতিরিক্ত জলপান পরিপাক শক্তিকে হীন করে। শরীরে শক্তিবর্দ্ধন ও পুষ্টিকারিতায় উৎকৃষ্ট দুগ্ধের সমকক্ষ অন্য পানীয় নাই।

আহার ও পানের পরেই স্বাস্থ্যের দ্বিতীয় কার্য্যাধ্যক্ষ শ্বাস ও প্রশ্বাস। মুখবিবর যেমন আহার করিবার, নাসিকা তেমনি শ্বাস ও প্রশ্বাস গ্রহণ ক্রিয়ার উপযুক্ত যন্ত্র, ইহাদের একের দ্বারা অন্যের কার্য্য করাইলে প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতি-

ক্রেম করা হয়। নাসিকার গঠন প্রণালীতে শ্বাস গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে বায়ুকে উষ্ণ ও বিশুদ্ধ করিয়া লইবার উপায় আছে। যাহারা মুখ দিয়া শ্বাস ও প্রশ্বাসের কার্য্য করে তাহাদিগের শ্বাস ও প্রশ্বাসের যন্ত্রে কিছু না কিছু অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, তাহাদিগের এই সকল যন্ত্রে পীড়া হয় এবং সহজেই সর্দ্দি ও কাশী ধরিয়া ফেলে; উপযুক্ত শিরঃপীড়া, স্মৃতিশক্তির বিলোপ এবং মানসিক অবসাদ সচরাচর ঘটিয়া থাকে। •

পরবর্ত্তী আলোচ্য বিষয়, আমরা কিরূপ বাতাসে শ্বাস গ্রহণ করি এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যকীয় বস্তু। বিশুদ্ধ বাতাস, আহারের ন্যায় শরীরের মূল মঙ্গলকারী। দুষ্পাচ্য ও অস্বাস্থ্যকর খাদ্য জীর্ণ করা অপেক্ষা দূষিত ও বিষাক্ত বায়ুর শ্বাস গ্রহণ অধিক অনিষ্টকর খাদ্যবস্তুতে স্বাদ ও গন্ধে ব্যতিক্রম ঘটিলেই লোকে ফেলিয়া দেয়, কিন্তু দূষিত বায়ু দ্বারা বাহ্যিক কোন অনিষ্ট অনুভূত হয় না বলিয়া উহার প্রতীকারের প্রতি দৃষ্টিও নাই। কিছুদিন হইল ইটালীতে 'টিউবর কিউলোসিস' পীড়ার মৃত্যু সংখ্যা দরিদ্র হইতে ধনীদিগের মধ্যেই অধিক হয়, তদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে অবস্থার হীনতা সত্ত্বেও কেবল বিশুদ্ধ বাতাসই দরিদ্রদিগকে উক্ত উৎকট পীড়া হইতে রক্ষা করিয়াছে।

দিবসের অন্যান্য সময় অপেক্ষা রাত্রি কালেই বিশুদ্ধ বাতাসের অধিকতর প্রয়োজন। সে সময় আমরা নিদ্রিত থাকি, শরীর সেই অবসরে অপর দিনের জন্য ব্যয়িত শক্তির ক্ষতিপূরণ করিয়া লয়, এই নিতান্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য কেবল বিশুদ্ধ বাতাসেই সুসিদ্ধ হইতে পারে। যাহারা নিজেদের উচ্ছিষ্ট বায়ুতেই শ্বাস প্রশ্বাস লইয়া পরিতৃপ্ত, তাহারা প্রাতে উঠিয়া শারীরিক অবসাদ ও ক্লান্তি বহন করিবেই। অনেকের ধারণা যে, উন্মুক্ত বায়ু ও উষ্ণতার অভাবে সর্দ্দি ও কাশী জন্মে, বস্তুত তাহা নহে, ইহা পরীক্ষিত সত্য যে, সর্দ্দি ও কাশী গৃহস্থিত রুদ্ধ বায়ুর এবং দূষিত বায়ুর দোষেই হইয়া থাকে।

এ পর্য্যন্ত কেবল শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে মূল কয়েকটী বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে, কিন্তু ইহা অপেক্ষা আরও কয়েকটী প্রবল শক্তি আছে, যাহাদিগের কার্য্য ও প্রভাব শরীরের উপর কোন অংশে হীন নহে। মানসিক শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া স্বাস্থ্যরক্ষার কোন প্রণালীই সম্পূর্ণ হইতে পারে না। সুস্থ দেহে যেমন সুস্থ মন থাকে, তেমনই মন সুস্থ থাকিলে দেহও সুস্থ হয়। সেই জন্য উচ্চ মহৎ চিন্তাই শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা ও স্বাস্থ্যের মূল। ক্রোধ, ঈর্ষা, হিংসা, ঘৃণা, লোভ ও ভয় প্রভৃতি মানসিক উত্তেজনা ও অশাসিত ভাবসমূহ শরীর ও মন উভয়ের পক্ষে সমভাবে অনিষ্টকারী; অতএব স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে শরীর ও মনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে এবং ন্যায় ও নীতির পথগুলিকে অবহেলা করিলে চলে না। ইহা বলা বাহুল্য যে, শারীরিক স্বাস্থ্যের উপর মানসিক প্রভা-

বের অজ্ঞতাই অধিকাংশ পীড়ার কারণ।

অতএব স্বাস্থ্যবান হইতে হইলে সমস্ত শক্তির অর্থাৎ দেহ, মন ও আত্মার কার্য্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করা এবং মনের উত্তেজক প্রবৃত্তিসমূহকে উচ্চ ভাব দ্বারা সংযত করাই উত্তম স্বাস্থ্যের প্রথম লক্ষণ। ইহার সংসাধন অল্প-আয়াসসাধ্য নহে, কিন্তু সকলেরই নিজের ও অপরের প্রতি একটী কর্ত্তব্য আছে, যাহা পালন করিলে কেবল শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি পাইবে তাহা নহে, অধিকন্তু অনেক মানসিক বল জাগিয়া উঠিবে, যাহার প্রভাবে আমরা জীবনের বহু উচ্চতর কর্ত্তব্য সাধনে সক্ষম হইব।

শ্রীআমোদিনী ঘোষ।

——

বিসূচিকার সংক্রামকতা।

(ডাক্তার শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এল্, এম্, এস্ লিখিত।)

বিসূচিকা বা কলেরা রোগ যে অত্যন্ত সংক্রামক, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। কিন্তু কলেরার কারণ কি ও কিরূপে এক ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তিতে সংক্রামিত হইয়া যায়, তাহার একটা জ্ঞান সাধারণের মধ্যে থাকা আবশ্যক।

কলেরা রোগের কারণ।

কলেরা রোগগ্রস্ত ব্যক্তির মল অনুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা করিলে তাহাতে এক প্রকার অতি সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম উদ্ভিজ্জাণু দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের আকৃতি অনেকটা অর্দ্ধাংশ 'কোমার' [,] ন্যায়। সেজন্য ইহাদিগকে 'কোমা ভিব্রিয়ো' বলে। ইহারা নররক্তের স্বাভাবিক উত্তাপে (৩৭° সেন্টিগ্রেড) অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 'কোমা ভিব্রিয়ো'র গতি অতি ক্ষিপ্র ও চঞ্চল এবং সুবিধা মত বাসস্থান পাইলে অল্প সময়ের মধ্যে সংখ্যায় এত বর্দ্ধিত হয় যে ইয়ত্তা করা দুরূহ। যাহা হউক এই উদ্ভিজ্জাণু যদি কোন প্রকারে অন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া বৃদ্ধি পাইবার সুবিধা পায় তাহা হইলে অতি অল্পকালে সংখ্যায় লক্ষ লক্ষ বর্দ্ধিত হইয়া বিষ উৎপাদন করে এবং তাহাতেই কলেরা রোগের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। এতদ্ব্যতিরেকে ব্যক্তিগত অবস্থায় যথা উপবাস, অনিয়মিত বা অতিরিক্ত ভোজন ও ক্লান্তি প্রভৃতিতে 'কোমা ভিব্রিয়ো' শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ লাভের সুবিধা পায়।

সংক্রামকতা সম্বন্ধে সাধারণ মত।

কোমা ভিব্রিয়ো কিরূপে বাহির হইতে অন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ লাভ করে সে বিষয়ে চিকিৎসকগণ নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক মতে অনুসন্ধান করিয়াছেন। সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্টের অধীন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার মেজর গ্রেগ (Major E, D, W, Greig M, D, D, S C, I, M, S,) এই অনুসন্ধানে নিযুক্ত আছেন। অনেকের মত যে কলেরা রোগীর মলের দ্বারায় কোন প্রকারে পানীয় জল বা দুগ্ধ দূষিত হইয়া যায় এবং তাহা হইতেই ব্যক্তিতে সংক্রামিত হয়। কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব স্থানে অনেক স্থলেই পানীয়

জলে 'কোমা ভিব্রিয়ো' দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। আহার্য্য দ্রব্যও যে এইরূপে দূষিত হইতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। এখানে বলিয়া রাখা উচিত যে উদ্ভিজ্জাণু এতই ক্ষুদ্র যে এক সূচ্যগ্রভাগে সহস্রাধিক অবস্থিতি করিতে পারে। সুতরাং আমাদের অলক্ষ্যে খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যে কিরূপে কোথা হইতে সংস্পর্শিত হয় তাহা চিন্তার বিষয় হইয়া উঠে;

আধুনিক মত।

আধুনিক অনুসন্ধানে ইহা প্রকাশিত হইতেছে যে, কেবল দূষিত খাদ্যদ্রব্যই কলেরা রোগ বিস্তারের কারণ নয়। এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি বিশেষ কারণ আছে। কলেরা রোগাক্রান্ত কোন কোন রোগীর মলে অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে দেখা যায় যে, আরোগ্য হওয়ার বহুদিন পরেও তাহাদের মলে 'কোমা ভিব্রিয়ো' বর্ত্তমান থাকে। মেজর গ্রেগ আরও বিশেষ অনুসন্ধানে প্রকাশ করিয়াছেন যে, রোগীর পিত্তকোষে "কোমা ভিব্রিয়ো" প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত থাকে এবং আরোগ্য হওয়ার পরও মলের সহিত বাহির হইতে থাকে। কলেরা রোগে মৃত ব্যক্তির দেহচ্ছেদে অধিকাংশেরই পিত্তকোষে কলেরা ভিব্রিয়ো পাওয়া গিয়াছে। রোগমুক্ত অবস্থায় তাহাদের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয় না, তাহারা ইচ্ছামত সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকে। তাহার উপর অপরিচ্ছন্ন হইলে সহজেই খাদ্য দ্রব্যাদি 'কোমা ভিব্রিয়ো' সংস্পর্শিত হইবার সম্ভাবনা থাকে। মল-দূষিত ধূলিকণা বাত্যাতাড়িত হইয়া মুখের মধ্যে আসিতে পারে।

আর এক কথা, মক্ষিকার দ্বারা অতি সহজেই কলেরা বিস্তৃতি লাভ করে। মক্ষিকারা স্বভাবতঃই কলেরা রোগীর মলে বসায় তাহাদের শরীরে কোমা ভিব্রিয়ো লাগিয়া যায় এবং তৎপরেই কোনও অনাচ্ছাদিত খাদ্য বা পানীয় দ্রব্যে বসিলে তাহা দূষিত হইয়া থাকে। গত রথযাত্রার সময় পুরীতে ৺ জগন্নাথদেবের নতন কলেবর উপলক্ষে প্রায় দেড় লক্ষ তীর্থযাত্রীর সমাবেশ হইয়াছিল। কয়েক দিনের ভিতর অতি ভীষণ প্রকোপে যাত্রীদিগের মধ্যে কলেরা আরম্ভ হইল। বহু যাত্রী মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এদিকে সে স্থানের মক্ষিকাবংশ এরূপভাবে বিস্তৃতি পাইতে লাগিল যে, দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। কলেরা হাসপাতাল সংশ্লিষ্ট ও বিভিন্ন স্থানের মক্ষিকা-পরীক্ষায় তাহাদের গাত্রে 'কোমা ভিব্রিয়ো' দেখিতে পাওয়া যায়। বাজারে অনাবৃত বা মক্ষিকাসমাবৃত খাদ্য দ্রব্যের অভাব নাই! যাঁহারা ৺ পুরীধামে মেলার সময় গিয়াছেন তাঁহারাই দেখিয়াছেন অপকৃষ্ট বিকৃত দূষিত খাদ্য দ্রব্যাদি কিরূপ অপরিষ্কার ও অসাবধানতার সহিত বাজারে বিক্রীত হইতেছে। দরিদ্র, অশিক্ষিত, অনশন ও পথভ্রমণে ক্লান্ত সাধারণ যাত্রিবৃন্দ উপায়ান্তর না দেখিয়া সেই বিকৃত খাদ্য খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেছে। পিপাসায় কাতর হইয়া যেখানে যে জল দেখিতেছে তাহাই পান করিতেছে। এইরূপে কলেরা রোগ

উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়। মড়কের সময় সংক্রামকতা এক প্রকার বোঝা যায়। কিন্তু অন্যান্য সময়ে মাসে মাসে একটী দুইটী করিয়া এখানে সেখানে যখন কলেরা হয়, তখন "কোমা ভিব্রিয়ো" কি করিয়া কোথা হইতে আসিল তাহা বলা বড় কঠিন হইয়া উঠে।

আমাদের জানা উচিত যে, টাইফয়েড জ্বরাক্রান্ত রোগীর অনেক দিন পর্য্যন্ত 'টাইফয়েড ব্যাসিলাই' দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল ব্যক্তিকে 'টাইফয়েড বাহক' (Typhoid carrier) বলা যায়। বর্ত্তমান অনুসন্ধানের ফলে কলেরা রোগের সহিত টাইফয়েড রোগের এই স্থানেই সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। যাহারা কলেরায় আক্রান্ত হইবার পর বহুদিন পর্য্যন্ত 'কোমা ভিব্রিয়ো' মলের সহিত বাহির করিতে থাকে তাহাদিগকে 'কলেরা বাহক' (Cholera carrier) বলা যায়। কত দিন পর্য্যন্ত 'কোমা ভিব্রিয়ো' শরীরাভ্যন্তরে থাকিতে পারে, তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। এখন ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে যে, কলেরা-বাহকেরাই কলেরা রোগ বিস্তারের অন্যতম কারণ। মনে করুন ৺ জগন্নাথক্ষেত্রে যে সকল যাত্রী কলেরা রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ফিরিয়া যাইল তাহাদের দ্বারা সেই সেই স্থান সংক্রামিত হওয়া কি সম্ভবপর নয়? এখন দেখা যাইতেছে যে, তিনটী কারণের উপর চিকিৎসকগণের বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে।

১। পানীয় ও আহার্য্য দ্রব্যাদি।

২। মক্ষিকা।

৩। "কলেরা-বাহক"। (Cholera carriers.)

কি উপায়ে সংক্রামকতা নিবারিত হইতে পারে।

সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, কলেরা ভিব্রিয়ো শরীরের বাহিরে বড় অধিকক্ষণ জীবিত থাকে না। সামান্য উত্তাপেই ও শুষ্ক হইলেই তাহারা বিনষ্ট হইয়া যায়। সামান্য অম্লরসেও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। পাকস্থলীর রস স্বাভাবিক অম্ল এ কারণ ঘটনাচক্রে কলেরা বীজ পাকস্থলীতে পড়িলে তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। উপযুক্ত আহার, উত্তাপ (৩৭° সেন্টিগ্রেড) ও বায়ু না পাইলে তাহাদের বৃদ্ধি হয় না। এ সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া জীবাণুতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা কলেরার সংক্রামকতা নিবারণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

১। কলেরার প্রাদুর্ভাব সময়ে অনিয়মিত ভোজন, উপবাস, অতি ভোজন, অতিরিক্ত পরিশ্রম ও রাত্রি জাগরণ অন্যায়। পানীয় ও আহার্য্য দ্রব্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও আচ্ছাদিত করিয়া রাখা আর জল বা দুগ্ধ সন্দেহজনক হইলে ফুটাইয়া লওয়া উচিত। কলেরা রোগীর মল ও মূত্রসিক্ত বস্ত্র কদাচ পুষ্করিণীতে বা কুয়ায় ধৌত করিতে দিবে না। খাদ্য দ্রব্য বিক্রয়ের স্থানে রোগীকে রাখা বা রোগীর গৃহে বসিয়া আহার করা উচিত নয়।

২। মক্ষিকা যাহাতে আহার্য্য বা পানীয় দ্রব্যে বসিতে না পারে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা। অপরিষ্কার স্থানে মক্ষিকা স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হয়, সে জন্য বাড়ীতে কিছুমাত্র ময়লা বা আবর্জ্জনা রাখিতে দিবে না।.

৩। রোগীর মলসংশ্লিষ্ট বস্ত্রাদি দগ্ধ করা। মূল্যবান বস্ত্রাদি থাকিলে তাহা গন্ধকের ধূম বা ক্লোরিন গ্যাসে শোধন (disinfect) করা যায়।

৪। কলেরা-রোগ-মুক্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে যত না থাকা যায় ততই ভাল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে তাহারা প্রায়ই 'কলেরার বীজ বাহক' হইয়া থাকে। কলেরার প্রাদুর্ভাব কালে সামান্য পেটের অসুখেরও বিশেষ প্রতিকার করা কর্ত্তব্য। দেখা গিয়াছে রোগীর সামান্য 'ডায়েরিয়া' হইয়াছে মনে করিয়া উপেক্ষা করায় পরিশেষে বিশেষ পরিতাপ করিতে হইয়াছে।

৫। ডিসিনফেক্ট্যান্ট (disinfectant) বা শোধনকারি বস্তুর ব্যবহার। ইহার ব্যবহারে সংক্রামক রোগের বীজ নষ্ট হয়। কার্ব্বলিক এসিড, লাইজাল (lysol) করোসিব সবলিমেট (corrosive sublimat), পটাস পার্ম্যাঙ্গানাস (potass permanganas) ফিনাইল প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রোগীর মল ও বমি কার্ব্বলিক লোশনে (5 per cent.) মিশ্রিত করিবে। আরোগ্য ও মৃত্যুর পর গৃহ সম্পূর্ণরূপে শোধন (disinfect) করিতে হইবে। কলেরা সময় চূণের ব্যবহার অতি উৎকৃষ্ট ও সুবিধাজনক। দূষিত স্থানে চূণ ছিটাইয়া দিলেই সংক্রামক রোগের বীজ নষ্ট হয় এবং দুর্গন্ধও বিদূরিত হয়। মক্ষিকা নিকটে আসিতে পারে না, আর চূণের দামও অপেক্ষাকৃত সস্তা। রথযাত্রায় মড়কের সময় পুরীতে কলেরা হাসপাতাল ও অন্যান্য দূষিত স্থানে চূণের ব্যবহারে বিশেষ ফললাভ হইয়াছিল।

(স্বাস্থ্যসমাচার)

কর্ত্তব্য ও প্রেম।

কর্ত্তব্য ও প্রেম এই উভয় অনেকে একই সূত্রে অনুস্যূত মনে করেন। কেহ কেহ আপন জ্ঞানবুদ্ধির বহু তর্ক বিচারে এই নিষ্পত্তিতে উপনীত হইয়াছেন যে, যেখানে কর্ত্তব্য সেখানে প্রেম, যেখানে প্রেম সেখানে কর্ত্তব্য। কিন্তু বস্তুবিক ইহা ভুল ধারণা; যেখানে প্রেম সেখানে কর্ত্তব্য আছেই, কিন্তু যেখানে কর্ত্তব্য সেখানে প্রেম নাও থাকিতে পারে। কর্ত্তব্য ও প্রেম এই দু'য়ের পার্থক্য স্বর্গ মর্ত্তের পার্থক্য সদৃশ। একটি পৃথিবীর জিনিষ, আর একটি স্বর্গের জিনিষ। কর্ত্তব্য মানবীয় বুদ্ধিজাত, প্রেম ভগবৎ প্রেরণাজাত। কর্ত্তব্যের মধ্যে স্বপ্রতিষ্ঠা, আত্মরক্ষা আছে, কিন্তু প্রেমে সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ। একটি আত্মরক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত, আর একটি আত্মত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত। কর্ত্তব্যের নীতি এই যে, 'আমি' প্রথম, তৎপর কর্ত্তব্য; 'আমি'

না থাকিলে কর্ত্তব্য পরিপালন করে কে? প্রেমের নিয়ম কেবলই ভালবাসা; এখানে 'আমি' অপ্রবল, নিজের জন্য কোন ভাবনা নাই, পরের ভাবনা ভাবিয়াই সে পাগল-পারা। যেখানে 'আমি' সেখানে সুখ-দুঃখ-বোধ আছে, এজন্য কর্ত্তব্যের মধ্যে সুখ-দুঃখের স্মৃতি আছে, আত্মগৌরবের প্রলোভন আছে, আত্মপ্রতিষ্ঠা আছে। কিন্তু প্রেমের ভিতর 'আমি' নাই, এজন্য প্রেমে সুখ-দুঃখবোধ নাই, আত্মগৌরব বা আত্মপ্রতিষ্ঠা নাই, আত্মজ্ঞান নাই, কেন প্রেম করিতেছি, তাহার বোধ নাই।

আজকাল বিজ্ঞান-প্রধান যুগে বৈজ্ঞানিক সামঞ্জস্যের প্রাধান্যই বেশী। কোন কাজ করিতে হইলেই দেহ, মন, প্রাণ, স্বাস্থ্য, সুখ ইত্যাদি সমস্তই বিজ্ঞানানুমত করিয়া চালিতে হয়। পাঞ্চভৌতিক এই শরীর কেবল জড়ীয় নহে, ইহা ভগবানের শ্রীমন্দির। ইহার প্রতি অযত্ন অবশ্য মহাপাপ। যতদিন তিনি পৃথিবীতে রাখিবেন, ততদিন ইহার প্রতি অপব্যবহার করিলে মহা অকল্যাণ। সুতরাং তাঁহার ইঙ্গিত অনুসারে পরিমিত সংযত ভোজনাদি ও স্বাস্থ্যানুকূল নিয়মাদি পালন দ্বারা ইহা রক্ষা করিতেই হইবে। তবে মনে রাখিতে হইবে, এই শরীর তিনি দিয়াছেন, আমার ইচ্ছা পালনের জন্য নয়—কেবল তাঁহারই ইচ্ছা পালনের জন্য। এই শরীরের উপর আমার কোনই কর্তৃত্ব নাই; তাঁহার জিনিষের উপর তাঁহারই কর্তৃত্ব। এই শরীরের উপর আমার আসক্ত হওয়া বৃথা, কেন না আমি যত চেষ্টা করি না কেন এই শরীরত আমার আয়ত্ত থাকে না। আমি নানাবিধ সুখাদ্য ভোজন করিয়া চাই শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখিতে, কিন্তু দেখি তাহাতে শরীর চিররোগের আকর হয়। আমি আমার বুদ্ধিবিচারগত কতকগুলি নিয়ম করিয়া তাহার উপর শরীর দাঁড় করাইতে চাই, কিন্তু শরীর যে ঠিক থাকে না, পুনঃ পুনঃ যে ভেঙ্গে পড়ে। আমার যখন শরীর নয়, তখন আমার নিয়মে ইহা কখনই ঠিক থাকিবে না।

আমরা অনেক সময়েই কর্ত্তব্যের খাতিরে শরীরের প্রতি আসক্ত হই। শরীর সুস্থ না থাকিলে আমার কর্ত্তব্য কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না, এজন্য সর্ব্বতোভাবে শরীরের জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়ি। এবং যে শরীরকে কর্ত্তব্যসাধনের প্রধানতম উপায় বলিয়া মনে করি, শরীর-সর্ব্বস্ব হইয়া সেই কর্ত্তব্যের অবহেলা করিতেও ত্রুটী করি না। কিন্তু প্রেমের স্বভাব ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত।

প্রেম সদা সক্রিয়, নিষ্ক্রিয় অবস্থায় তাহাত কখনও থাকিতে পারে না। তবে তাহার সরবতা বা নীরবতা থাকিতে পারে, সজনতা বা নির্জ্জনতা থাকিতে পারে, কিন্তু সদাই ক্রিয়াশীল। ঈশ্বর নিত্য ক্রিয়াশীল বায়ু পুরুষ; নিত্য তাঁহার অনন্তমুখী ক্রিয়া চলিতেছে এবং শতদিক দিয়া তাঁহার অনন্ত বাণী-প্রবাহ পৃথিবীর জড়তা ভেদ করিয়া নিত্য উত্থিত হইতেছে। প্রেম লীলাময়, প্রেম-স্বভাবে তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়া কত

ভাবে কতরূপে লীলাখেলা করিতেছেন। তিনি যে প্রেমশক্তিতে জগৎ সৃষ্টি করিলেন, তাহা জগতের সঙ্গে অনুস্যূত করিয়া রাখিলেন। তাহাতেই দেখিতেছি, প্রেম স্বভাবজাত—একই প্রেমবন্ধনে জগৎ বদ্ধ। যদিও এই স্বাভাবিকী শক্তির ব্যতিক্রম বা ন্যূনাধিক্য দৃষ্টিগোচর হয়, তথাপি বলিতে বাধা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতভাবে সর্ব্বত্র ইহার সঞ্চার আছে। প্রেমে বিশ্বের সৃষ্টি, প্রেমে পরিপুষ্টি, প্রেমেই সুন্দর। কোথায় কোন নিবিড় অন্তরালে কমলকলি লুকাইয়া ছিল, কোন মহা আকর্ষণে সূর্য্যকিরণ তাহাকে ফুটাইয়া তুলিয়া জগতের মাঝে পরম সুন্দররূপে তুলিয়া ধরিল। কোন দিক দিয়া একটু মৃদুমন্দ বাতাস বহিতে লাগিল, বৃক্ষপত্র সর্ সর্ শব্দে আহ্বান করিয়া তাহাকে বাড়াইয়া তুলিল, শ্রান্ত পথিকের পথশ্রান্তি দূর করিয়া দিল। সর্ব্বত্রই এইরূপ মহা-প্রেমের নিদর্শন সকল স্পষ্ট জাজ্জ্বল্যমান। এখানে যে প্রেমের কথা বলা হইল, তাহা স্বার্থসংযুক্ত সাংসারিক প্রেম নহে; সাংসারিক প্রেম ভোগবিলাসের পরিপূর্ণতার আসক্তি মাত্র। ঘরে ঘরে এই স্বর্গীয় প্রেমমূর্ত্তির প্রকাশ আমরা দেখিতে পাই।

নরনারী নিয়া এই সংসার। নর-প্রকৃতি ও নারীপ্রকৃতি এই দু'য়ের সমষ্টীভূত মিলনেই পরিবারের মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য। জ্ঞানবিজৃম্ভিত নরহৃদয় কর্ত্তব্যের অধিষ্ঠান ভূমি, এবং কুসুমকোমল স্নিগ্ধ-প্রকৃতি নারীহৃদয় প্রেমের উৎস। স্বভাবতঃ পুরুষ-হৃদয় কর্ত্তব্যপ্রধান, এবং নারী-হৃদয় প্রেম-প্রধান। পুরুষ কর্ত্তব্যের অনুসারী হইয়া সব করে, নারী-প্রেমের আকর্ষণে আপনাকে ঢেলে দেয়। পুরুষ-জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত জ্ঞানসূর্য্যের তীব্র আলোকে আলোচিত, কিন্তু নারী-হৃদয়ের প্রতিমুহূর্ত্ত প্রেম-চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণে উদ্ভাসিত। যে জীবন চায়, সে একটী মাত্র জীবন পায়; কিন্তু যে জীবন দেয়, সে অনেক জীবন পায়। পুরুষ আপন জীবনের জন্য কত পরিশ্রম করে, হয়ত ভগবানের কৃপায় আপন যত্ন চেষ্টায় সফলতালাভ করে—জ্ঞানী হয়, পণ্ডিত হয়, আপন মহিমালোকে জগৎকে স্তম্ভিত করে, কিন্তু সে কয়জনকে পায় বা কয়জনের হয়? সহজ স্নেহশীলা নারী সংসারের যে জ্ঞানকে আমরা সাধারণতঃ জ্ঞান বলি সেই জ্ঞানের অসদ্ভাবসত্ত্বেও সে আপনাকে দিয়ে পরিবারের সকলকে, প্রতিবেশী সকলকে, এমন কি যাহার সঙ্গে পরিচিত হয় তাকেই পায় এবং তাহাদের হয়। প্রেম যে অমূল্য রত্ন তাহা পুরুষ স্বভাবতঃ জানে না, কিন্তু নারী তাহার মহিমা স্বভাবতঃই জানে, এজন্য আপনাকে সর্ব্বতোভাবে ঢেলে দিয়ে পরের হয়, এবং পরকে আপন করিয়া প্রেমের মাহাত্ম্য স্বীয় জীবনে প্রকটিত করে ও ধন্য হয়।

বুদ্ধি বিচার করিয়া প্রেম করা যায় না। স্বাভাবিক প্রাণের টানে প্রেম করিতে হয়। ঘরে ঘরে স্নেহময়ী মাতা, পতিপ্রাণা সরলা নারী তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সংসারে বুদ্ধিবিচারগত প্রেমেরও

অসম্ভব নাই। কিন্তু বুদ্ধিবিচারগত প্রেম এবং স্বাভাবিক প্রেম এই দু'য়ের পার্থক্যগত পরিচয় সহজে অনুভূত হয়। আজকাল প্রাণের টানে সরল আন্তরিক ভালবাসা বা প্রেমের পরিবর্ত্তে বুদ্ধিবিচার-গত প্রেমই অধিকতর দৃষ্ট হয়। কিন্তু এ বিষয়ে পুরুষদের নিকট অধিক দাবী করিতে পারি না। নারীজাতির নিকট অবশ্য আমাদের দাবী আছে। কেন না যুগে যুগে তাঁহাদের নিকট পৃথিবী এই অহৈতুক প্রেমের সন্ধান পেয়েছে; তাই আজও পৃথিবী তাঁহাদের নিকট সেই প্রেম ভিক্ষা করিতেছে। যদি পৃথিবী তাঁহাদের নিকট সেই প্রেম না পায়, তবে পৃথিবী সহজেই অনুমান করিবে, হয়ত তাঁহারা স্বভাবকৃপণা, না হয় বিকৃতস্বভাবা হয়েছেন।

আজকাল একটা কথা উঠেছে, শিক্ষিতা নারীগণের মধ্যে আর তেমন স্বভাবসৌন্দর্য্য দৃষ্টিগোচর হয় না। পুরুষদের মধ্যে যেমন গড়া সৌন্দর্য্য, তেমনি নারীজাতির মধ্যেও তাহার প্রাবল্য পরিদৃশ্যমান। স্বভাবসৌন্দর্য্য ও গড়া সৌন্দর্য্য এই দুয়ের পার্থক্য অনেক। অণুমাত্র স্বভাবসৌন্দর্য্যে প্রাণ মন যেমন মুগ্ধ হয়, রাশীকৃত গড়া সৌন্দর্য্যে তাহা হয় না। গড়া সৌন্দর্য্যের অর্থ দেখান সৌন্দর্য্য; যাহা আমার বাস্তবিক নাই, তাহা বাহিরে প্রদর্শন। ইহা অপ্রকৃত এবং কাল্পনিক। পুরুষদের কর্ম্মক্ষেত্রে নানা অবস্থায় পড়িয়া নানা লোকের সঙ্গে আপন আপন স্বার্থ, জ্ঞান, বুদ্ধির সংগ্রহে অপরের তৎসকলের ঘাত প্রতিঘাতে একরূপ বিকৃতস্বভাব জন্মিয়া যায়; স্বীয় সরলতার পরিবর্ত্তে এক প্রকার কাপট্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্বীয় জ্ঞানগরিমার মাহাত্ম্য প্রকটিত করিতে চেষ্টা হয়। এজন্য যাহা নিজের নাই, তাহা প্রচুর প্রদর্শন করিতে হয়। কেননা, তাহা না হইলে পুরুষের পুরুষত্ব ও মনুষ্যত্ব দাঁড়ায় না। সুখের বিষয় আজকাল পুরুষদের মধ্যে এবিষয়ে সচেতন জ্ঞানের সঞ্চার দেখা যাইতেছে। এই অপ্রকৃত অবস্থা হইতে সরল স্বাভাবিক অবস্থার দিকে তাহাদের দৃষ্টি এবং গতির সূচনা আরম্ভ হইয়াছে।

ভারতের প্রাচীনতার দিকে দেখিলে বুঝা যায়, নারীজাতির স্বভাব ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। সে সময়ে তাঁহাদিগকে স্বভাবের রাণী বলিয়া অনেকে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা যে অতিরঞ্জিত তাহা নহে। তখন তাঁহাদিগকে পরিবারের মধ্যে স্বীয় স্বভাবসৌন্দর্য্য ঢালিয়া সকলকে সুখী করিতে হইত। সকলে তাঁহাদিগকে গৃহের লক্ষ্মী বলিয়া মনে করিতেন। "গৃহিণী গৃহমুচ্যতে" গৃহিণীকেই গৃহ বলিয়া উক্ত হইত। 'গৃহিণীই গৃহ' ইহার তাৎপর্য্য এই যে গৃহের সরলতা, মধুরতা, সৌন্দর্য্য, পারিপাট্য আদি যাহা কিছু, নারীজীবনের ফল। নারীজাতিকে অধিকাংশ সময় গৃহের সুখ সুবিধা ইত্যাদির জন্য যত্ন করিতে হয়, বাহিরে তাঁহাদের তাদৃশ গতিবিধির দরকার হয় না; কাজেই তাঁহাদের জীবনের সারল্য অক্ষুণ্ণ থাকে। আর তাঁদের ভিতর আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাব

নাই; আত্মোৎসর্গের পরাকাষ্ঠাস্বরূপ যথা-সর্ব্বস্ব এমন কি স্বীয় জীবন বিসর্জ্জন করিয়া সকলকে সুখী করিতে চায়। পুরুষদিগের মধ্যে সুখী হওয়ার প্রত্যাশা বেশী, কিন্তু নারীজাতির মধ্যে সুখী করার ইচ্ছা সর্ব্বদা প্রবল। শিক্ষার প্রভাবে এই সারল্য টুকু অধিকতররূপে ফুটিয়া উঠাই সকলে আশা করেন।

শিক্ষার অর্থ এবং উদ্দেশ্যই এই যে, স্বাভাবিক গুণ গুলিকে ফুটাইয়া বাড়াইয়া তোলা। প্রকৃত শিক্ষাতে কিছুই বিকৃত বা বিনষ্ট হয় না। যদি শিক্ষার প্রভাবে নারীজাতির মধ্যে তাদৃশ সরল সুন্দর প্রেমের অসদ্ভাব দৃষ্ট হয়, তবে যে নারীজাতির মহা অকল্যাণ। যে স্বাভাবিক প্রেমগুণে ভারতীয় নারীজাতি এতদিন প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, সেই প্রেমের অভাবে তাঁহাদের আর কি বাকী রহিল? প্রেমরত্নই যে তাঁহাদের সর্ব্বস্ব, প্রেমই যে তাঁহাদের অন্নপান, প্রেমই যে তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গের ভূষণ। তাঁহাদের প্রেমব্যবহারে জগৎ মুগ্ধ, চিরদিন তাঁহাদের অনুগত। যতদিন নারীজাতি এই প্রেমের মাহাত্ম্যে আপন জীবনকে বিভূষিত রাখিবেন, ততদিন পুরুষজাতি তাঁহাদের গৌরব করিবে এবং তাঁহাদের সংশ্রবে থাকিয়া জীবনে অতীব সুখী ও শান্তিলাভ করিবে। কেহ কেহ বলেন, আজকাল শিক্ষার প্রভাবে নারীজাতির মধ্যে সরল সুন্দর প্রেমের পরিবর্ত্তে পুরুষদের মত কর্ত্তব্য জ্ঞানটা যেন অধিকতর ফুটিয়া উঠিতেছে। শিক্ষিতা নারীদিগের সেবা শুশ্রূষার ভিতরে প্রেমের পরিবর্ত্তে কর্ত্তব্য জ্ঞানের নিদর্শন অধিকতর দেখা যাইতেছে। ইহাতে নারীজাতির গৌরব বাড়িবে, না লঘু হইবে তাহা পাঠক পাঠিকাগণ বিচার করিয়া একটা জবাব দিলে সুখী হইব।

সাময়িক প্রসঙ্গ

অলস স্বামীর আইন।—চিকাগোর এক পত্রপ্রেরক গত ১৮ই জুন তারিখে লিখিয়াছেন, একটি নূতন আইন পাস হইয়া ওয়াশিংটনের সীটল নগর পরিত্যক্তা স্ত্রী ও অলস স্বামীর স্ত্রীর পক্ষে স্বর্গ হইয়াছে। এই আইন অনুসারে যে সকল স্বামী বসিয়া থাকে তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক কার্য্যে নিযুক্ত করা হইবে এবং স্ত্রী পুত্র কন্যার ভরণ পোষণের জন্য উপার্জ্জন করিতে বাধ্য করা হইবে। যে সকল স্বামীর অপরাধ প্রমাণিত হইবে তাহাদিগকে সীটল নগরের বাহিরের অরণ্য পরিষ্কার করিতে নিযুক্ত করা হইবে। তাহারা রক্ষকগণের অধীনে কয়েদী হইয়া থাকিবে এবং তাহাদের স্ত্রীগণ তাহাদের মজুরী প্রতিদিন ২।৶০ পাইবে! এই আইন পাস হইবামাত্র অনেক দুঃখিনী স্ত্রীলোক আসিয়া কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু আইন পাস হইবার পূর্ব্বে যে সকল স্বামী আলস্য করিয়াছে তাহাদিগের অপরাধ ধরা হইবে কিনা তাহা এখনও স্থির হয় নাই। ব্রহ্মদেশে বা আসামে এরূপ আইন হইলে বড় বিপদ!

এদেশের নারীজাতি সম্পর্কে পাশ্চাত্যগণের ধারণা—"গ্রেটথট্" (Great Thoughts) নামক পত্রিকার এপ্রিল সংখ্যায় "হিন্দু মহিলার গার্হস্থ্য জীবন" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তৎসম্পর্কে ইণ্ডিয়ান্ লেডিজ ম্যাগাজিন বলেন :—

ভারতবর্ষ এবং ভারতের অধিবাসী সম্বন্ধে যে সব বিষয় বিলাতে লেখা হয়, তাহা কেমন শোচনীয় ভ্রমে পূর্ণ, তা' এই প্রবন্ধটি পাঠেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। প্রবন্ধ লেখক বলিতেছেন, ভারতের হিন্দু স্ত্রীলোক তাহার আত্মার জন্য প্রার্থনা করিতে পায় না, কিন্তু তাহাকে তাহার স্বামীর জন্য প্রার্থনা করিতেই হইবে। অশ্রাব্য গল্প সকল তাহারা শ্রবণ করে। তাহাদের চরিত্র পূর্ব্বাপর হীন এবং ঘৃণিত। তাহারা উপযুক্ত পরিমাণে খাইতে পরিতে পায় না। অসুস্থ হইলে তাহাদের উপর দেবতার অভিসম্পাত পতিত হয়। ভারতের সহস্র সহস্র স্ত্রীলোক অযত্ন এবং অবহেলায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। লেখক আরও বলেন, প্রথম যেদিন হিন্দু বালক তাহার মাতাকে গালি দেয়, সেদিন পিতার নিকট উৎসবে পূর্ণ হইয়া উঠে। হিন্দু-মহিলাগণ বৈধব্য-জীবনকে দুঃখের আকর এবং বিধবাকে দেবতাগণ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত মনে করেন। যেদিন স্বামীর মৃত্যু হয় সেদিন দশ বারটি নাপিতের স্ত্রী বিধবার উপর পতিত হয় এবং তাহার অলঙ্কার সমূহ বলপূর্ব্বক কর্ণ ও নাসিকা হইতে কাড়িয়া লয়। তারপর বিধবা স্ত্রীলোকটিকে অন্ধকার গৃহে চতুর্দ্দশ দিন অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হয়। তৎপর স্বামীর চিতাভস্ম নিকটবর্ত্তী নদীতে নিক্ষিপ্ত করা হয়। স্বামীর আত্মার সম্বন্ধে সংস্কার, এই যে, আত্মা তর্পণের পর কোন বিশেষ জন্তু অথবা কীটদেহ ধারণ করে। কিন্তু স্ত্রীলোকের দেহধারণ করাই আত্মার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর শাস্তি।

ইহা হইতে ভয়ঙ্কর অত্যুক্তি আর কি হইতে পারে! পাশ্চাত্যগণের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে ধারণা তাহা এইরূপ বর্ণনাতে স্পষ্ট বুঝা যায়। ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোক নিরক্ষর হইতে পারেন, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস পাশ্চাত্য মহিলা হইতে তিনি অধিক শিক্ষিত, অধিক বিশ্বস্ত, স্বামীর প্রতি অধিক অনুরক্ত, গুরুজনের প্রতি অধিক ভক্তিমতী, অধিক মানব-সেবা-তৎপর এবং তাঁহার ইউরোপীয় ভগ্নী হইতে অধিক ধর্ম্মপ্রাণ। আজ পর্য্যন্ত কোনও ভারত মহিলা মন্ত্রিসভার সভ্যগণকে আক্রমণ করেন নাই, দুয়ার জানালা ভাঙ্গেন নাই, ইউরোপীয় উগ্রচণ্ডা স্ত্রীলোকের কার্য্যাবলী অনুকরণ করেন নাই। সত্যই ভারতবাসী তাঁহাদের স্ত্রীলোকদের জন্য গৌরব অনুভব করেন এবং তাঁহাদিগকে লক্ষ্মীস্বরূপা মনে করেন। প্রত্যেক সমাজে সু এবং কু উভয়ই আছে। কিন্তু শুধু মন্দগুলি লইয়াই ভারতে কোন নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

ইউরোপীয় রণচণ্ডী ভোট-প্রার্থিনী স্ত্রীলোকগণ গৃহদাহ করিয়া, সম্পত্তি নষ্ট করিয়া, দুয়ার জানালা ভাঙ্গিয়া এখনও

তাঁহাদের প্রলয়কারী কার্য্যে অগ্রসর হইতেছেন। সেদিনকার সংবাদে জানিতে পারা গেল যে, অবস্থা দিন দিন অধিকতর শোচনীয় হইতেছে। মিসেস পাঙ্কহার্ষ্টের কারাবাস হইয়াছে বলিয়াই ঐ সকল স্ত্রীলোকগণ গৃহে গৃহে আগুন লাগাইয়া বেড়াইতেছেন। এই সকল উন্নত স্ত্রীলোকগণ প্রকাশ্যে ঘোষণা করিতেছেন যে মানব-জীবন আর তাঁহাদের কাছে সম্মানের জিনিষ নয়।

স্ত্রীলোকের মস্তিষ্ক—ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, স্ত্রীলোকের মস্তিষ্ক পুরুষের অপেক্ষা শীঘ্র শীঘ্র পরিপক্ব হয় এবং ইহার শক্তি অধিকদিন বর্ত্তমান থাকে। স্বর্গীয় ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় পারিবারিক প্রবন্ধে লিখেছিলেন যে, দ্বাদশ বৎসর বয়সেই বালিকাগণ পাকা গৃহিণী হইতে পারে। ইহার দৃষ্টান্ত হিন্দুসমাজে প্রচুর দৃষ্ট হয়।

কলিকাতা। কলিকাতায় ১০০০ পুরুষের স্থলে ৪৭৫ জন নারী আছে। সহরতলীতে এই অনুপাতে ১০০০ পুরুষ ও ৬৩২ নারী! পুরুষনারীর এই অত্যধিক সংখ্যার অসাম্য হইতে ইহা সহজেই জানা যায় যে এখানে বহু লক্ষ পুরুষ পরিবারী হইয়া বাস করে না। কলিকাতায় দুর্নীতির প্রাদুর্ভাবের ইহা একটি প্রধান কারণ।

হিন্দুজাতিদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ১০৭৬৪১, কায়স্থ ৮৬৬৪৪, কৈবর্ত্ত ৪৩৯১০, চামার ৫৩৮০৮, গোয়ালা ৩১৪৮০, সুবর্ণ বণিক ২৮৭৮০, কাহার ২৪০০৬, তাঁতি ২১৭৫১, তেলি ও তিলি ২৬৬৪৬।

বৈদ্যদের মধ্যে শতকরা ৬৯ জন লিখিতে পড়িতে জানে, কায়স্থ ৬০, ব্রাহ্মণ ৫৭, আগরওয়ালা ৪১, গন্ধবণিক ৪৫, ওসওয়াল ৫৪৷৷০, সুবর্ণবণিক ৪৫। বৈদ্যনারীদের মধ্যে শতকরা ৪৯ জন লিখনপঠনক্ষম, কায়স্থনারী ৩৩, ব্রাহ্মণনারী ২৭। বাগ্দী, চামার, ধোবা, ডোম, দোসাদ, কাওরা এবং মুচিদের মধ্যে শতকরা দশ জনেরও কম লেখাপড়া জানে, আবার চামার, ডোম, কাওরা এবং মুচিদের শতকরা ৫ জনেরও কম লিখনপঠনক্ষম।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

নূতন বৎসর পুনরায় আরম্ভ হইল, আমরা আমাদের সহৃদয় গ্রাহক গ্রাহিকাদিগের কৃপাভিক্ষা করিতেছি। তাঁহারা যেন সত্বর স্বীয় স্বীয় দেয় মূল্য প্রেরণ করেন। দুঃখের বিষয় অনেকের নিকট ৩.৪ বৎসরের মূল্য বাকি রহিয়াছে। মহিলার মূল্য অতি সামান্য, আমাদের অবস্থা স্মরণ করিয়া একটু বিশেষ দৃষ্টি করিলেই এই মূল্য অনায়াসেই আমরা সময়ে প্রাপ্ত হইতে পারি। বার বার পত্র লিখিয়া সকলকে বিরক্ত করিতে আমরা লজ্জিত হই। তাহাতে অর্থ ব্যয়ও আছে। অতএব আমরা অতি বিনীতভাবে পুনরায় মুকুলের দয়া চাহিতেছি।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ"

১৯শ ভাগ] ভাদ্র, ১৩২০। সেপ্টেম্বর, ১৯১৩। [২য় সংখ্যা।

প্রার্থনা।

হে সৃষ্টিকর্ত্তা ও রক্ষাকর্ত্তা জগদীশ্বর, তোমাকে আমরা নিত্য নির্ব্বিকার প্রেম-স্বরূপ বলিয়া বিশ্বাস করি, এই ভয় বিঘ্ন-পূর্ণ জীবন-পথে তোমার দয়াই আমাদের একমাত্র সম্বল, এই জানি। সকল সাধু মহাজনগণই তোমাকে দয়াময় নাম দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যখন ভয়ঙ্কর জলপ্লাবনে, বাত্যায়, ভূমিকম্পে বা অন্যান্য রূপে তোমার ভৈরবরূপ প্রকাশ হয় তখন আমাদের ক্ষুদ্র বিশ্বাস যেন লোপ পায়, চারিদিকে দুঃখ যাতনা ও মৃত্যু দেখিয়া আমাদের মন অবসন্ন হইয়া পড়ে। মনে হয় যেন সৃষ্টি বিনাশ হইতে চলিল, আর বুঝি তুমি দয়া করিবে না, আর কখনও তোমার প্রেমমুখ দেখিতে পাওয়া যাইবে না। কিন্তু ভয়ঙ্কর ব্যাপারের পরক্ষণেই দেখিতে পাই তোমার মঙ্গলস্বরূপ অটল ভাবে কার্য্য করিতেছে, সাময়িক ভয়ঙ্কর অবস্থার ভিতর দিয়াও তোমার মঙ্গল জ্যোতি প্রকাশিত হইতেছে; যে জল যে বাতাস যে ভূমি আমাদিগকে বিপন্ন করিতে-ছিল তাহারাই আবার তোমার মঙ্গল নিয়মে আমাদিগের মঙ্গলসাধন করিতেছে। তখন প্রাণ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া দেখিতে পায়, সত্যই তুমি নিত্য মঙ্গলময়। তখন স্বীকার করিতে হয় তোমার মঙ্গলস্বরূপ আমাদের বুদ্ধির আয়ত্ত নয়। তাই তোমার চরণে প্রার্থনা করি, হে দেবতা, আমাদিগকে তোমার শান্ত শিব স্বরূপে অটল বিশ্বাস দেও, আশীর্ব্বাদ কর যেন দুঃখ বিপদে জলপ্লাবনে দুর্ভিক্ষে তোমার মঙ্গলস্বরূপে অটল বিশ্বাস করিতে পারি।

দামোদরের বন্যা।

আমাদের দেশের প্রতি ভগবানের অশেষ প্রকারের কৃপাদৃষ্টি পড়িয়াছে। এখানে শীতের অত্যাচার নাই বলিলেই

হয়, গ্রীষ্ম প্রবল হইলেও অসহ্য নয়, এবং গ্রীষ্মের ক্লেশ দূর করিবার জন্য, কত ফল, কত মূল, কত ছায়াদানের জন্য বৃক্ষ, সুশীতল জলপূর্ণ সরোবর, নদী প্রভৃতি রহিয়াছে। অন্য দেশে কৃষিকার্য্যের জন্য যত ব্যয়, কষ্টস্বীকার, সাবধান থাকার প্রয়োজন, আমাদের দেশে তাহার কিছুই প্রায় করিতে হয় না। অধিকাংশ স্থানেই আকাশের বর্ষার জলেই জমী যথেষ্ট রস পায়। একবার জমীতে লাঙ্গল দিয়া দুটি ধান ছড়াইয়া দিলেই প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। চাষের এরূপ সহজ ব্যবস্থা হয়ত আর কোন দেশে নাই। বর্ত্তমান সময়ে প্রবল প্রতাপ বৃটিশ রাজ্যের সুনিয়মে ও সুশাসনে বিদেশের শত্রু আমাদের নিকট আসিতে পারে না, দেশের দুর্বৃত্ত লোকেরাও আমাদের ধন মান প্রাণের অনিষ্ট করিতে পারে না। যদি স্বাভাবিক নিয়মে অজন্মা হয় বা লোকপীড়া উপস্থিত হয় তাহা হইলেও আমাদিগের সরকার বাহাদুর ও দেশের সহৃদয় ধনিগণের সাহায্যে আমরা সহজেই রক্ষা পাই। আশ্চর্য্য যে এত সুখ সুবিধা সম্ভোগ করিয়াও আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ নই। বিধাতা আমাদের জন্য এত প্রকারের সুব্যবস্থা করিয়াছেন ও আমরা এত সুখাভ্যস্ত হইয়াছি যে কোন বিষয়ে একটুকু অসুবিধা হইলেই অন্ধকার দেখি। আমাদের প্রতি এত অনুগ্রহ, আমাদের সংসারের সুখ শান্তির এত সুব্যবস্থা তথাপি সময় সময় দুঃখ, কষ্ট, ক্লেশ, শোক উপস্থিত হয়, ইহাতে অবশ্যই বুঝিতে হইবে যে বিধাতা আমাদিগকে কেবল সংসারের সুখ দিবেন তাহা নয়, ইহার পর তিনি ইহা অপেক্ষাও কোন উচ্চতর সুখের রাজ্যে আমাদিগকে লইয়া যাইবেন।

গত ২৫শে শ্রাবণ শনিবার বর্দ্ধমানের নিকটে দামোদর নদীতে বন্যা আসিয়া বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়, এবং বর্দ্ধমান নগর ও তাহার চারিদিকের বিস্তৃত স্থান সকল জলমগ্ন হয়। বর্দ্ধমান নগরের নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকলের অধিকাংশ বাড়ীই মাটীর দেওয়াল দিয়া প্রস্তুত। মাটীর দেয়ালের গোড়ায় জল গেলে ও ক্রমে জল বাড়িলে ঘর আপনি পড়িয়া যায়, আর যে সকল বাড়ী পাকা তাহার ভিতরেও জল প্রবেশ করিলে মানুষ বাস করিতে পারে না। হঠাৎ নগরে ও গ্রামে জল আসিয়া পড়াতে মহা বিপদ হয়। পরদিন রবিবার কলিকাতায় এই জলপ্লাবনের সংবাদ প্রকাশিত হয়।

ক্রমে সংবাদ আসিতে লাগিল যে তারকেশ্বর, হরিপাল প্রভৃতি গ্রামও জলমগ্ন হইয়াছে। দামোদরনদীর তীরস্থিত আমতা উলুবেড়ে অঞ্চল ও অপর দিকে কাঁথি প্রভৃতি স্থানও সেইরূপ জলমগ্ন হইয়া যায়। ন্যূনাধিক একশত মাইল দীর্ঘ ও দশ বা পনের মাইল প্রশস্ত বিস্তৃত ভূমি খণ্ড যাহাতে সহস্র সহস্র লোক সুখে কালযাপন করিতেছিল তাহা সমুদ্রবৎ অকূল জলপূর্ণ হইল। কলিকাতায় ও অন্য সকল স্থানে তারযোগে ও লোকমুখে এই সকল সংবাদ যাইতে লাগিল। ঐরূপ

স্থানের অধিবাসিগণের জন্য সকলে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন, বিশেষ যাঁহাদের আত্মীয় পরিবার জলমগ্ন স্থানে রহিয়াছেন তাঁহারা মহা বিপদ আশঙ্কা করিয়া উন্মাদের ন্যায় হইলেন। এ দিকে বন্যাতে বর্দ্ধমানের নিকট রেলের লাইন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, অনেকস্থানের তারের সংবাদও পাওয়া যাইতেছিল না। রবিবার হইতে আরম্ভ করিয়া ৪।৫ দিন যে শত সহস্র লোকের কি ক্লেশ, কি অশান্তি, কি দুশ্চিন্তা গিয়াছে তাহা বর্ণনার অতীত।

আমাদের পাঠিকাগণ হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন যে এরূপ দুর্ঘটনা হঠাৎ উপস্থিত হইল কেন? সত্যই ইহা সকলেরই গভীর চিন্তার বিষয়। আমরা জানি পৃথিবীতে চিরদিনই এরূপ আকস্মিক ঘটনা ঘটিতেছে! মানুষ পৃথিবীকে আপনাদিগের অধিকারভুক্ত প্রাচীন সম্পত্তি মনে করে, কিন্তু বিধাতা মনোবুদ্ধির অগোচর ঘটনা সকল ঘটাইয়া দেখাইয়া দেন যে ইহা তাঁহার সৃষ্ট ও তাঁহার ইচ্ছায় পরিচালিত, নিত্য নূতন পৃথিবী। আমাদের এই ভারতবর্ষেই কত মহা দুর্ঘটনা ঘটিতেছে। মসুলীপটম পূর্ব্ব উপকূলে সমৃদ্ধিশালী বন্দর ছিল, হঠাৎ ১৮৬৪ সালে কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যার রাত্রে একটি সমুদ্রের ঢেউ আসিয়া নগরের উপর পড়িল, এক রাত্রে স্ত্রীলোক পুরুষ বালক বৃদ্ধ—পঞ্চাশ হাজার লোকের মৃত্যু হইল, সেই হইতে মসুলীপটম হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে। ১৮৭৬ সালে শোনদ্বীপ হাতীয়া পরগনা প্রভৃতিতে সমুদ্র তরঙ্গ আসিয়া প্রায় ২লক্ষ লোককে পরলোকে লইয়া গেল। এইরূপ ঘটনা যখন তখন ঘটে, দামোদরের বন্যা হওয়া নূতন নয়। দামোদরের বন্যা প্রায় প্রতি বৎসরই হইয়া থাকে। কারণ দামোদর গয়ার ফল্গু নদীর মত পার্ব্বত্য নদী। নদীগর্ভ অগভীর, অধিকাংশ স্থানে প্রস্তর ও বালুকাপূর্ণ বলিয়া অধিক গভীর হইতে পারে না, যখন পর্ব্বতে অধিক বৃষ্টি হয় তখন জলের বেগ বৃদ্ধি হইয়া নদীর দু ধারের জলপ্লাবন হয়। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে একবার ভয়ানক বন্যা হইয়া বহু লোকের সর্ব্বস্ব নষ্ট হয়। তাহার প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে আর একবার এইরূপ ভয়ানক ব্যাপার হয়—পুনরায় পঞ্চাশ ষাট বৎসর পরে এই বন্যা আসিয়াছে।

নদীর জল এইরূপ সময়২ বৃদ্ধি হইয়া জলপ্লাবন করে, এজন্য নদীর ধারে ধারে বাঁধ বাঁধিয়া রাখা হয়। সাধারণতঃ যেরূপ জল আসে তাহা বাঁধ ভাঙ্গিতে পারে না, কিন্তু জল অধিক প্রবল হইলে বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়, তাহাতে চারিদিকের শস্য ক্ষেত্র ডুবিয়া যাইয়া মহাদুঃখ উপস্থিত করে। এ বৎসর যেরূপ বন্যা হইয়াছে বহুদিন সেরূপ হয় নাই। এই বন্যাতে প্রায় এক হাজার বর্গ মাইল ভূমি জলমগ্ন হইয়াছে ও এক হাজার গ্রামের লোকের ভয়ঙ্কর ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে। জল ক্রমে ক্রমে বাড়িয়াছে কাজেই লোকের ডুবিয়া মরিবার কোন কারণ নাই, তথাপি শুনিতে পাওয়া যায় কোথাও কোথাও লোক মারা পড়িয়াছে, কিন্তু প্রধান কষ্ট যে বাড়ী ঘর জিনিষ পত্র সর্ব্বস্ব হীন

হইয়া গৃহস্থগণ ভয়ানক বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। শিশু রোগী প্রভৃতি লইয়া কেহ দুই দিন কেহ বা অধিক কাল অনাহারে আকাশের নীচে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অধিকাংশ গ্রামের ও সহরের কোন কোন অংশের অবস্থা দেখিলে মনে হয় যেন কোন দৈত্য আসিয়া ধনধান্য লক্ষ্মীশ্রী সর্ব্বস্ব ধ্বংস করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

ভগবান এক দিকে তো এই ভীষণ লীলা করিয়াছেন, দেখিয়া মনে হয় যে তাঁহার যেন দয়ামায়া নাই। আবার ইহার অপর দিক অন্যরূপ অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার। রবিবার দিন বর্দ্ধমানে জলপ্লাবনের সংবাদ প্রকাশ হয়, তখনই শত সহস্র লোকের অন্তরে সহানুভূতির তার বাজিয়া উঠে, মাড়োয়ারী, সাহেব, বাঙ্গালী, মুসলমান, সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠেন। সোমবার হইতেই বিপন্ন লোকদিগকে নানারূপে সাহায্য করিতে বহুলোক উপস্থিত হন। বর্দ্ধমানের মহারাজার রাজপ্রাসাদে তিন চারি সহস্র ব্যক্তি আশ্রয় পায়, মহারাজা স্বয়ং দুঃখীর দুঃখ দূর করিতে নিযুক্ত হন, তাঁহার অমাত্যবর্গ সকলেই মহা ব্যস্ত হইয়া লোকের সন্ধান লইয়া সাহায্য দান করিতে থাকেন। এ দিকে কলিকাতা হইতে দলে দলে ধনী মাড়োয়ারী বাঙ্গালী অন্ন বস্ত্র লইয়া বর্দ্ধমান ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে বহু কষ্টে উপস্থিত হন। সহৃদয় নেতাগণের অধীনে শত শত যুবকগণ স্বেচ্ছা সেবক হইয়া সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হন। এদিকে ধনী মধ্যবিত্ত এমন কি দরিদ্রগণ পর্য্যন্ত যথাসাধ্য অর্থ অন্ন বস্ত্র প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রস্থলে পাঠাইতে থাকেন। কলিকাতার কোথাও জল নাই, অথচ কলিকাতায় ঘরে ঘরে জলের ক্লেশের কথা আলোচনা হইতেছে, মুটের মাথায় চড়িয়া ও রেলে চড়িয়া নৌকা সকল উপস্থিত হইল। যুবক বাবুগণ কখনও নৌকায় চড়িয়া গ্রামে যাইতে লাগিলেন, কখনও নৌকা তাঁহাদের উপর চড়িতে লাগিল। দামোদর নদের বন্যা আসিয়া আমাদের সাধারণের মনে, বিশেষ আমাদের যুবক ছাত্রবৃন্দের মনে যে প্রেমের মহাবন্যা আনয়ন করিয়াছে তাহার বিষয় বিস্তৃত আলোচনা করিতে ইচ্ছা রহিল।

নারীর-আদর্শ।

নূতন ভারতের সকলই নূতন। পুরাতন ভারতের বহু পরিবর্তন কি ঘটে নাই? নদ নদী জনপদ নগর মরু পর্ব্বতেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। জনসমাজ এবং সামাজিক রীতিনীতি নবীন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে। ব্যাস এবং বাল্মীকি ভারতীয় মনুষ্য-সমাজের যে চিত্র আঁকিয়া অক্ষয় কীর্ত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন, তাঁহারা আর একবার অধুনাতনকালে ভারত ভ্রমণ করিলে দেখিতে পাইবেন তাঁহাদের অঙ্কিত চিত্র বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এখন আবার নূতন চিত্র আঁকিবার কাল সমাগত। তাঁহারা এদেশীয় নরের এবং নারীর চরিত্র গঠনার্থ যে আদর্শ রাখিয়া গিয়া-

ছিলেন সে আদর্শ পানে সম্প্রতি আর নরনারীগণ চক্ষু রাখিতেছেন না। অথচ আদর্শ সম্মুখে রাখিতে না পারিয়া এখনকার লোক চরিত্র গঠন করিতে ক্লেশ বোধ করিতেছে। পুরুষেরা উচ্ছৃঙ্খল বা বিচিত্র ভাবাপন্ন হইতেছে। নারী ও নব শিক্ষা প্রভাবে নব পরিবর্ত্তনে আপনাকে কি ভাবে দণ্ডায়মান করিবে তাহা স্থির করিতে পারিতেছে না। ইহা কি এতদ্দেশীয় মহিলাকুলের পক্ষে একটি অমীমাংসিত সমস্যার অবস্থা নহে?

অশিক্ষিতা অপেক্ষা শিক্ষিতা মহিলাদিগেরই ইহা অধিকতর চিন্তার বিষয়! কিন্তু শিক্ষিতা মহিলাগণ কি এ বিষয়ে কখন স্ব স্ব চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করেন? তাঁহারা প্রায় ইউরোপীয় প্রণালী অনুসারে শিক্ষালাভ করেন। অথচ তাঁহাদের মাতা ও মাতামহী প্রভৃতি মহিলাবর্গ পূর্ব্বতন আদর্শে জীবন গঠনপূর্ব্বক সেই আদর্শ তাঁহাদের সম্মুখে ধরিয়া আছেন। তাহা নব্যশিক্ষিতাগণের তেমন পছন্দমত হইতেছে না। সীতা সাবিত্রী যেদেশে এতকাল নারী-চরিত্রের আদর্শস্থল ছিলেন তাঁহারা এখন আর সেইরূপ সম্মান ও সম্বর্দ্ধনা পাইতেছেন না। অদ্যাবধি পুরাতন শ্রেণীর রমণী বঙ্গে বা ভারতবর্ষে নিঃশেষ হয় নাই। আজও দেশশুদ্ধ সমস্ত মহিলাকুল শিক্ষাচক্রে নিপতিত হয় নাই। কিন্তু একটা নূতন ভাবের তরঙ্গ সমস্ত দেশকে প্লাবিত করিতেছে।

বর্ত্তমান কালে সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার মত সর্ব্ববিষয়ে সুচরিতা মহিলা কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না। বাল্যাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার চরিত্র সমস্ত বাঞ্ছনীয় গুণাবলীপূর্ণ, শুদ্ধ শান্তরসাশ্রিত এবং প্রেম সহানুভূতির আধারস্বরূপ। শ্রদ্ধাস্পদা ভিক্টোরিয়ার মাতৃবৎসলতা, শিক্ষয়িত্রীর আনুগত্য, ধর্ম্মভয়, প্রার্থনাশীলতা এবং নিরভিমানতা, উচ্চপদের উপযুক্ত কর্ত্তব্যপরায়ণতা, নির্ভীকতা, পতিপ্রেম ও সন্তানবৎসলতা, গৃহিণীর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এবং দাস দাসীর প্রতি স্নেহ মমতা, অপরাধীর প্রতি ক্ষমাশীলতা, দুঃখীজনের প্রতি অগাধ সহানুভূতি এবং স্বাধীনতা বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষিতা রমণী সমাজের আদর্শস্থল বটে। আগেকার কাল থাকিলে এবং হীন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিলে ভারতীয় রমণীকুলে যেমন সাবিত্রী-ব্রত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তেমনি ভিক্টোরিয়া-ব্রত প্রতিষ্ঠিত হইত। কিন্তু এখন কি তাহা আর হইবে? যাহা হোক পূজ্য ভিক্টোরিয়া দেবী রাজ্ঞীরূপে ভারতীয় প্রজাবৃন্দেরও জননীস্থানীয়া। এদেশীয় শিক্ষিতা মহিলাগণের সকলেরই তাঁহার চরিত্রাধ্যয়ন ও চরিত্রানুশীলন একটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম বটে।

খ্রীষ্টদেব উপদেশচ্ছলে মনুষ্য-জাতির প্রতি একটি অনুজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছিলেন:—

"তোমরা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার ন্যায় পূর্ণ হও।" ইহা নরনারী নির্ব্বিশেষে উভয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু খ্রীষ্টানগণ খ্রীষ্টের এ উপদেশ অনুসরণ করেন কি? তাঁহারা খ্রীষ্টদেবকেই আপনাদের পরিপূর্ণ আদর্শস্থল করিয়াছেন।

কেননা অদৃশ্য স্বর্গস্থ পিতাকে তাঁহারা দেখিবার আশা করেন না। যাঁহাকে না দেখা যায় তাঁহাকে কিরূপে আদর্শ করা যাইবে?

ভারতবর্ষে সেই কাল এবং সেই বিধান প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, যে কাল এবং যে বিধানের প্রসাদে নরনারীগণ অদৃশ্য ঈশ্বরকে ভক্তিনেত্রে সন্দর্শন পূর্ব্বক তাঁহার পূর্ণতা স্ব স্ব জীবন এবং চরিত্র গঠনের আদর্শ করিবে। পৃথিবীতে যে সকল মহাপুরুষ এবং মহীয়সী মহিলা জনসমাজের আদর্শরূপে নানা দেশে ও নানা সমাজে গৃহীত হইয়াছিলেন, সম্প্রতি তাঁহাদের সেরূপ সমাদর দৃষ্ট হয় না। ইহা দেখিয়া অনেক লোক জনসমাজের অধঃপতনের দিন নিকটবর্ত্তী বলিতেছে। কিন্তু যাঁহারা কালের গতি ও ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তাঁহাদের প্রতীতি স্বতন্ত্র। মনুষ্য-জাতির নিয়ন্তা হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা পুরুষ মনুষ্য-জাতিকে কখনই অধঃপতিত হইতে দিবেন না। চির উন্নতিশীলতা নরনারীর নিয়তি। ভারতের নারীকুলের কি অন্য গতি হইবে? কখনই নহে। ঈশ্বর সর্ব্বাঙ্গীন সমুন্নতি বিধানের জন্যই ভারতীয় রমণী সমাজে নব শিক্ষা ও নব পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছেন।

সীতা, সাবিত্রী, লোপা ও অহল্যাবাই প্রভৃতি পুণ্যশীলা মহিলাকুল কি নব্য শিক্ষিতা মহিলাদিগের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবেন না? তাঁহাদের পবিত্র চরিত্র কি শিক্ষিতাগণের উপকারে আসিবে না? অবশ্য আসিবে। কিন্তু ইঁহারা কেহই নারীর আদর্শ হইবেন না। আদর্শ তিনি, যিনি বিশ্বজননী ও জগৎ-প্রসবিনী, যিনি আদ্যাশক্তি ও অনন্ত জ্ঞান-পুণ্যময়ী। যাঁহার প্রেম ক্ষুদ্র দুঃখিনী ভারতরমণীকেও কোলে লইয়া লালন পালন রক্ষণাবেক্ষণ করে, তিনিই প্রত্যেক মহিলার চরিত্র এবং জীবন গঠনের পরিপূর্ণ আদর্শ। ইঁহার সহিত সমস্ত চরিত্রবতী পুণ্যশীলা মহিলাগণ বর্ত্তমান রহিয়াছেন। গার্গী এবং মৈত্রেয়ী হইতে অহল্যাবাই পর্য্যন্ত সকলের চরিত্র-শক্তি নব শিক্ষিতা মহিলাকুল সহায়রূপে প্রাপ্ত হইবেন। আদর্শের জন্য জগন্মাতা ভিন্ন অন্যের প্রতি কেহই নেত্রপাত করিবেন না।

আমরা যে সর্ব্বোচ্চ আদর্শের বিষয় উল্লেখ করিলাম, বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষিতা মহিলাগণের একজনও যদি এই আদর্শের প্রতি ভক্তিপূর্ণ দৃষ্টিস্থাপন পূর্ব্বক একপদ অগ্রসর হইতে পারেন তবে অসংখ্য ভারত-রমণী তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিবেন ইহাতে অনুমাত্র সংশয় নাই। কারণ ঐ আদর্শই এইক্ষণে সকল নারী জ্ঞানে বা অজ্ঞানে লক্ষ্য করিতেছে। পূর্ব্বকালে নারী-আদর্শ যে প্রকারে নারীসমাজে পরিগৃহীত হইত এখন সে কাল গত হইয়াছে, নারী আর নারীকে সেরূপে গ্রাহ্য করিতে প্রস্তুত নহে। নারী-চরিত্রের সর্ব্বদিকের সম্যক্ আদর্শ কোন মহিলাও হইতে পারেন না।

বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়গণ এক এক জন মহাপুরুষের ধর্ম্ম ও জীবনকে অবলম্বন

পূর্ব্বক সংসারে দণ্ডায়মান ছিলেন। কালক্রমে ধর্ম্মসম্প্রদায় সকলও সেইরূপে দণ্ডায়মান থাকিতে ক্রমে অশক্ত বোধ করিতেছেন। বিধাতার বিধানেই সকল ব্যাপার পূর্ব্বেও ঘটিত, বর্ত্তমান কালেও ঘটিতেছে। ইহাতে মানুষের কোন দোষও নাই, গুণও নাই। বিধাতা পুরুষই ক্রমে অবস্থান্তর ঘটাইতেছেন। আমাদের দেশে শিক্ষিতা মহিলাগণ কি তাহা পর্য্যবেক্ষণ এবং অনুধাবন করেন না? জীবনের আদর্শ কি তাহা জানিয়া তদনুসরণও শিক্ষার একটি গুরুতর বিষয় বটে। এ বিষয় জানিতে যত্ন করা এবং জানিয়া তদনুরূপ জীবন গঠন শিক্ষা করা শিক্ষার সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য। চরিত্র যেমন নরের তেমনই নারীর সর্ব্বপ্রধান বিষয়। আমরা চরিত্রযোগে সংসারে ও কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করি, এবং চরিত্র লইয়াই পরলোকে বা সুরলোকে গমন করিব। চরিত্রই জীবনের সারধন। চরিত্রের আদর্শ কি হওয়া আবশ্যক এ বিষয়ে কি শিক্ষিত মহিলা উদাসীন থাকিবেন? এ বিষয়ে প্রত্যেক শিক্ষিত মহিলার চিন্তা এবং চেষ্টা বিনিয়োগ করা আবশ্যক। বঙ্গদেশে মহিলা-শিক্ষাস্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে। বহুসংখ্যক বঙ্গীয় কুলবালা সেই স্রোতে বিসর্জ্জিত হইয়া পুরাতন নীতিধর্ম্ম ও আদর্শকে পূর্ব্বের মত আঁকড়িয়া ধরিতে অসমর্থ হইতেছেন। তাঁহাদের জন্য নবীন আদর্শ প্রয়োজন। সেই আদর্শ তাঁহারা আপনারা অনুধাবন পূর্ব্বক বুঝিয়া গ্রহণ করিবেন। অন্যের শিক্ষা বা উপদেশে এ বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ উপকৃত হইবেন আমরা সে আশাও করিতে পারি না। তাঁহারা স্বয়ং চিন্তা ও প্রার্থনা করুন; স্বয়ং বুঝিয়া নব আদর্শ গ্রহণ করুন; তদ্দ্বারা তাঁহাদের ও জগতের কল্যাণ হইবে। শ্রীঃ।

সন্ধ্যা প্রসঙ্গ।

শুভক্ষণে আমরা চারিজনে মিলিত হইয়াছিলাম। শুভক্ষণে সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের সন্নিধানে আমরা পরস্পরে আধ্যাত্মিক প্রেমে চিরআবদ্ধ হইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম। আজ চারিজনেই দূরে দূরে রহিয়াছি। শারীরিক ভাবে আমরা আজ দূরে। প্রাণে প্রাণেও কি দূরে? আমাদের প্রেমবন্ধন কি ছিন্ন হইয়াছে? কখনই নয়। কোনও দিন তাহা বিশ্বাস করি নাই, এবং এখন যদিও ইহার কোনও প্রমাণ পাইতেছি না, তথাপি প্রাণের ভিতরে অনুভব করিতেছি যে এ বিশ্বাস সত্য বিশ্বাস। প্রিয় ভগ্নীগণ, তোমাদের সঙ্গে সদালাপ করিবার ইচ্ছা সর্ব্বদাই প্রাণে বলবতী রহিয়াছে। অনেক দিন হইতে তাহার উপায় অন্বেষণ করিতেছি এবং কিছুদিন হইল উপায় দেখিতে পাইয়াও বলের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।

অনেক দিন পূর্ব্বে আমি যখন সন্ধ্যার সময় একাকী ছাদে বসিয়া থাকিতাম, তোমাদের সঙ্গে সৎপ্রসঙ্গ করিতে ইচ্ছা হইত, এবং প্রিয় মহিলার সঙ্গে তোমরা

সকলেই আলাপ করিয়া থাক এ জন্য এইখানেই প্রতি মাসে একবার করিয়া কথা বার্ত্তা কহিব এইরূপ ভাব মনে উদয় হইয়াছিল। এখানে আরও অনেকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হইতেও পারে, মাঝে মাঝে প্রাণে এইরূপ আশা হইয়া থাকে।

প্রিয় ভগ্নীগণ, মনে কর আমরা সকলে মিলিয়া ছাদে বসিয়াছি। এবার আমরা সময় বিষয়ে কথা কহিব। এ বিষয়ে কথা কহিব আগে মনে করি নাই, ঈশ্বরকে আনা এই বিষয়ে প্রসন্ন করিব ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু কাল গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া অমূল্যধন সময়ের কথা মনে হইল। মনে হইল যেন জাহাজের ছাদে ঘুমাইতেছি (আমি কখনও জাহাজে উঠি নাই) হঠাৎ জাগিয়া দেখি আমার গলার মূল্যবান মুক্তার মালা ছিঁড়িয়া একটী একটী করিয়া মহাসমুদ্রের জলে পড়িয়া যাইতেছে। সেই মহামূল্য রত্ন সমূহের যে গুলি ডুবিয়া গিয়াছে আর তাহা উদ্ধারের কোনও উপায় নাই। যে কয়টী অবশিষ্ট আছে, তাহাও যেন হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া সেই ঘুমের জড়তায় রক্ষা করিতে পারিতেছি না। উঃ কি ভয়ানক! সত্য সত্যই যখন অমূল্য সময় কত নষ্ট হইল এ বিষয়ে চৈতন্য হয়, তখন মানুষের এইরূপ অবস্থা হয়। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা চৈতন্য লাভ করিয়া আর তাহা হারাইয়া না ফেলেন। প্রিয় ভগ্নীগণ, আমরা যেন ইহাঁদের একজন হই। যেন মৃত্যুর সময় সমস্ত রত্নগুলিই মহাসাগর গর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছি ভাবিয়া হতাশ হইয়া মরিতে না হয়। ভগ্নীগণ, তোমরা কি সময় নষ্ট কর? এস, সময়ের মূল্য একবার হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করি। সকল মানুষই সৌন্দর্য্য ভালবাসে, আর স্রষ্টা কতই না সৌন্দর্য্য অকাতরে ঢালিয়া দিয়াছেন। সুনীল অনন্ত আকাশ, কত শত বৃক্ষ, নদ নদী হ্রদ পর্ব্বত, শোভায় বিশ্বভরা। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী উড়িয়া বেড়ায়, সারি সারি গাছ জন্মে, দলে দলে হরিণশিশু খেলা করে, ময়ূর নৃত্য করে, রাশি রাশি ফুল ফোটে, কিন্তু দুটী মুহূর্ত্ত কখনও এক সঙ্গে আসে না। যে মুহূর্ত্ত যায় সে আর ফিরে আসে না। আছে আমাদের এই বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত। যাহা গিয়াছে তাহা আর ফিরিবে না এবং পরে আর এক মুহূর্ত্তও আমার সম্বন্ধে আসিবে কি না জানি না। অতএব বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত যেমন ব্যবহার করিব তাহাই আমাদের জীবন। আমি তোমাদের মুখ দেখিতে পাইতেছি না, কিন্তু, প্রিয়ভগ্নীগণ, তোমরা যে এই কথার গুরুত্ব অনুভব করিতেছ, তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। সন্ধ্যা হইয়াছে, সূর্য্য অনেকক্ষণ অস্ত গিয়াছে। এক ঘণ্টা সৎপ্রসঙ্গ করিব মনে করিয়া বসিয়াছিলাম, তার চেয়ে অনেক বেশী সময় চলিয়া গিয়াছে। বোধ হয়, চিন্তার দ্বার খুলিয়া যাইবার জন্য যথেষ্ট কথা হইয়াছে। মাসান্তে আবার দেখা হইবে আশা রহিল। আর একটী কথা, ইহাতে তোমাদের সায় চাই। মহিলার নিকটেই হউক কিম্বা তোমাদের

নিজের মুখেই হউক, যেন সাড়া পাই, এই প্রার্থনা। আজ তবে এখন উঠি।

শ্রীঅ—

ম্যাডাম রোলাণ্ড।

কোন বিখ্যাত অধ্যাপক একবার "সাধনা ও ধর্ম্ম" সম্বন্ধে উপদেশ দিবার সময় বলিয়াছিলেন যে আদর্শ না থাকিলে মানুষ কখনও জীবনে মহৎ হইতে পারে না। এই অশেষ দুঃখ কষ্ট পরিপূর্ণ সংসারে কাহার বলে সে আপন জীবনের পথ তৈয়ারী করিয়া লইবে? যে জীবনে আদর্শ নাই তাহা বৃথা, এখানে তাহার কোন মূল্য নাই। যদি মানুষ হও, তবে মানসিকই হউক বা আধ্যাত্মিকই হউক, একটী আদর্শ চক্ষের সম্মুখে রাখ. এবং ধ্রুবতারার মত সেই আদর্শ প্রদর্শিত পথ ধরিয়া কোন বাধা বিঘ্ন না মানিয়া নির্ভীক হৃদয়ে আপন গন্তব্য স্থানে চলিয়া যাও, দেখিবে তুমি তোমার ঈপ্সিত ধন নিশ্চয়ই পাইবে। এই আদর্শ ঠিক করিবার আবার একটী সময় আছে, তাহা হৃদয় যখন তরল থাকে; কারণ তখন তাহাকে যে ছাঁচে ঢালিবে, তাহার আকৃতি ঠিক সেইরূপই হইবে। জীবনের এই শুভ মুহূর্ত্তে আদর্শ ঠিক করিতে না পারিলে ভবিষ্যৎ শুধুই বিফলতা। কারণ পরিণত বয়স পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট আদর্শে গঠিত নিজ হৃদয়ের শিক্ষাদানে অপরের জীবন গঠন করিবার সময়; তখন আর নূতন করিয়া আদর্শ ঠিক করিবার সুযোগ কিছুতেই পাওয়া যায় না।

অদ্য আমরা যে প্রতিভাশালিনী রমণীর কথা বলিব, তাঁহার জীবনে এই আদর্শের সফলতা পরিপূর্ণ-ভাবে দেখিতে পাইব। ম্যাডাম রোলাণ্ড ফ্রান্সের একজন বিখ্যাত রমণী। বোধ করি, অনেকেই এই ক্ষমতাশালিনী নারীর নাম শুনিয়া থাকিবেন। ১৭৫৪ সালে প্যারী নগরে তাঁহার জন্ম হয়; তাঁহার পিতা ভাস্করকার্য্য ও জহরতের ব্যবসায় করিতেন। তিনি বেশ সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন। সুতরাং বালিকা ফিলিপনের (রোলাণ্ডের বাল্য বয়সের নাম) বাল্য জীবন সুখেই কাটিয়াছিল। শিশুকালে এক কৃষকরমণীর হাতে তিনি পালিতা হন। তাঁহার শরীর সুস্থ ও সবল ছিল, তিনি পরে একজন অসাধারণ সুন্দরী বলিয়া সমাজে গণ্য হন। বাল্যকালেই তাঁহার চিত্তের দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। বিশেষতঃ বাধা প্রাপ্ত হইলে তাহা আরও দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিত। কিন্তু স্নেহ ও নম্রতার কাছে তিনি পরাজিত হইতেন। একটী গল্প আছে, একবার তাঁর ব্যারামের সময় তাঁহার পিতা তাঁহাকে এক অতি বিস্বাদ ঔষধ খাইতে বলেন। রোলাণ্ড রাজী হইলেন না। দ্বিতীয় বার ভয় দেখাইলেন, তাহাতেও কিছু হইল না। তৃতীয় বার শারীরিক শাস্তি দিবেন বলিলেন, কিন্তু বালিকা অচল অটল হইয়া শাস্তিভোগের অপেক্ষা করিতে লাগিল। এমন সময় তাঁহার মাতা আসিয়া দুইটী মধুর বাক্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সেই ঔষধ খাওয়াইয়া দিলেন। পিতা কন্যার

চিত্তের এই দুর্দ্দমনীয় দৃঢ়তা দেখিয়া তাহার পর হইতে নিজের স্ত্রীর উপরই তাঁহার শুশ্রূষার ভার দিলেন।

বালিকা রোলাণ্ড অতি বাল্য বয়স হইতেই পুস্তকের ভক্ত ছিলেন। তিনি অনবরত তাঁহার পিতার পাঠাগারে বসিয়া অতীতকালের বীর পুরুষদিগের গৌরবময় কাহিনী সকল পাঠ করিতেন। গ্রীস ও রোমের জগদ্বিখ্যাত বীরগণের বীরত্বের গাথায় তাঁহার ক্ষুদ্র হৃদয়টী পূর্ণ ছিল। সেই ক্ষুদ্র ভাবপ্রবণ হৃদয়টীতে এই সকল দেশের ইতিহাসের বীরমহিমা এরূপ গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল যে মাঝে মাঝে পড়িতে পড়িতে সেই তন্ময় বালিকার হস্ত হইতে পুস্তক পড়িয়া যাইত ও দুইটী চক্ষু বহিয়া অবিরল-ধারে অশ্রু ঝরিত! প্রাণের আবেগে তিনি বলিয়া উঠিতেন, "কেন আমি গ্রীক হই নাই, স্বাধীন দেশের বীর সন্তান হই নাই। দেবতুল্য মহাবীর শিপিওর স্বদেশবাসিনী রূপে জন্মগ্রহণ করি নাই।"

পাঠক পাঠিকা, বুঝিতে পারিবেন এই অপূর্ব্ব বালিকার হৃদয়ের তেজ ও স্বাধীনতাভিলাষ কি ভয়ানক ছিল! বাল্যের এই সময় হইতেই একটা নির্দ্দিষ্ট উচ্চ আকাঙ্ক্ষা তাহার মনের চারি পাশে দৃঢ়ীভূত হইতেছিল। অতীত ইতিহাসের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তগুলি তাঁহার জীবনাদর্শের সম্পূর্ণ পরিপোষক ছিল। মানবের উন্নতি ও স্বাধীনতা তাঁহার জীবনের প্রধান আদর্শ। শত শত আত্মত্যাগের গৌরবময় কাহিনী তাঁহার হৃদয়ে প্রচণ্ড অগ্নি জ্বালাইয়া দিয়াছিল।

পরিণত বয়সে রোলাণ্ড তাঁহার এই আদর্শের দ্বারা তাঁহার স্বদেশবাসীকে চালাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যদিও তাঁহাকে এই মহৎ কার্য্যে অকৃতকার্য্য হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার মৃত্যু বৃথা হয় নাই। সহস্র সহস্র নরনারী এই অপূর্ব্ব জীবন-কাহিনী পড়িয়া মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছে যে জীবন শুধু স্বপ্ন নহে—এখানে শুধু কাজ, শুধু কাজ। এখানে অলস নিদ্রিত যাহারা তাহারা ঘৃণিত, পদদলিত। কর্ম্মশীল জগতে তাহাদের কোন স্থান নাই। এখানে সবাই স্বাধীন, কেহ কারও পরাধীন নহে! সবাই মানুষ, সবারই সমান অধিকার। উচ্চ চিন্তা, মহৎ কার্য্য স্বদেশের জন্য প্রাণপণ উন্নতির চেষ্টা, ইহাই প্রত্যেক নরনারীর কর্ত্তব্য। এ কর্ত্তব্য যে না করিবে সে পৃথিবী হইতে সরিয়া যাউক।

রোলাণ্ডের বাল্যজীবনের ইহাই আদর্শ ছিল। এই আদর্শই তাঁহাকে সাধারণ জীবন অপেক্ষা অনেক উন্নত করিয়াছিল, তাঁহাকে চিন্তা ও ভাবের রাজ্যে লইয়া গিয়াছিল। নিত্য সংসারের দূষিত বায়ু তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

রোলাণ্ড অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্মিয়াছিলেন। ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে এই সময়ে ফ্রান্সের কি অবস্থা। মানবের উপর মানবের অত্যাচার ইহার বেশী আর কখনও কোথায়ও বুঝি হয় নাই! এই সময় ফ্রান্সে অনেক প্রতিভাসম্পন্ন নরনারী

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আমাদের রোলাণ্ডও তাঁহাদের একজন। তাঁহার হৃদয়ের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, স্বদেশের জন্য তাঁহার সহানুভূতি, তাঁহার চরিত্রের নির্ম্মলতা, তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও সর্ব্বশেষে তাঁহার অতুল সৌন্দর্য্য—এই সকলের জন্য তিনি তাঁহার স্বদেশে দেবী বলিয়া পরিচিতা। মেরী এণ্টনিয়ো ব্যতীত ঐ সময়ে তাঁহার সমকক্ষ রমণী আর কেহ ছিল না। তাঁহার অনন্য-সাধারণ প্রতিভা ও তেজস্বিনী বক্তৃতা প্রভাবে, তখনকার ফ্রান্সের অনেক বিখ্যাত লোক তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট ও তাঁহার ভক্তমধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রের ক্ষমতা ও হৃদয়ের অসীম উৎসাহে সমগ্র ফ্রান্স চমৎকৃত হইয়াছিল। নিজ দেশের দুর্গতি দেখিয়া তাহার স্বাধীনতা লাভের জন্য তিনি নিজ দেহ মন সম্পূর্ণ ভাবে নিয়োগ করিয়াছিলেন। ফ্রান্সের ত্রাণকর্ত্রী জোয়ান ডি আর্কের মত তিনি সকল বিষয়ে, সকল বিপদে আপদে সর্ব্বসাধারণের অগ্রে দাঁড়াইতেন। এরূপ মহৎ স্ত্রীলোকের পদতলে সমগ্র ফ্রান্সবাসীর মস্তক নত হইয়াছিল।

রোলাণ্ড শীঘ্রই বুঝিলেন যে পঞ্চদশ লুইয়ের রাজত্বকালে ফ্রান্সের উন্নতির কোন আশা নাই। তিনি কিঞ্চিৎ নিরুৎসাহ হইয়া গেলেন। কিন্তু এরূপ নারীর এ ভাব কদিন থাকে! তিনি পুনর্ব্বার নববলে বলীয়ান হইয়া পৃথিবীর যত ধর্ম্মবীর আছেন তাঁহাদের জীবন পড়িতে লাগিলেন। ইতিহাস আপাততঃ বন্ধ রহিল। এই সকল পাঠ করিয়া তাঁহার হৃদয় আর এক নূতন ভাবে নূতন চিন্তায় পূর্ণ হইয়া গেল। ধর্ম্মের জন্য কত নরনারী কত যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন, অবশেষে হাসিমুখে নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন, এই সকল মহান ত্যাগের কাহিনী পড়িতে পড়িতে তাঁহারও হৃদয়ে আত্মত্যাগের ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠিল। সকলেই বুঝিল রোলাণ্ডের জীবনের পরিণাম সুখের নহে। তাহা হউক, রোলাণ্ড সে সুখ চায় না! তাঁহার ইচ্ছা ছিল তিনি এমন ভাবে জীবন কাটাইবেন যাহাতে পৃথিবী চমৎকৃত হবে! বাস্তবিক হইয়াছেও তাহাই।

তাঁহার অস্থির চিত্ত কাজের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। ধর্ম্মের কার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিবেন, পিতাকে এইরূপ অভিপ্রায় জানাইলেন। তিনি ১৭৬৫ সালে কবোর্গ সেণ্ট মার্সেলএ এক কনভেণ্টে গেলেন। তথায় নিজ প্রতিভা প্রভাবে তাঁহার অপেক্ষা অনেক বড় বয়সের বালিকার অপেক্ষাও অনেক বেশী শিখিয়া ফেলিলেন।

কনভেণ্টের শান্তিপূর্ণ কোলাহলহীন আশ্রমসদৃশ স্থানে থাকিয়া তাঁহার মনের উদ্যম, আবেগ কতকটা শান্ত হইয়াছিল। সেখানকার ধর্ম্মচর্চ্চা, সঙ্গীত ও প্রার্থনা সেখানকার শান্ত গম্ভীর নিস্তব্ধতা ও নিরবচ্ছিন্ন শান্তি তাঁহার মনকে এক নূতন ভক্তিরসে আপ্লুত করিয়া দিল। পূর্ব্বের ঐতিহাসিক বীরগণের পঠিত চরিত্রচিত্র সকল স্মৃতিপটে ক্রমে ক্ষীণ

হইয়া আসিল। এ যেন আর এক জীবন। রোলাণ্ডের হৃদয় কবিত্বভরা ছিল। নীরব কবিত্বের মাঝে নিজের ভাবময় ক্ষুদ্র হৃদয়টীকে সম্পূর্ণ সচ্ছন্দতার সহিত ডুবাইয়া দিয়া রোলাণ্ড এই কন্‌ভেণ্টে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

বাটী ফিরিয়া কিন্তু রোলাণ্ড আবার এক নূতন জীবনের মধ্যে পড়িলেন। তিনি দেখিলেন যে তাঁহার পিতা তখন রাজনীতির ভীষণ আবর্ত্তে পড়িয়া ঘূর্ণিত হইতেছেন। ফ্রান্সের সমাজ ও সমগ্র প্রজাশক্তি এক নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া স্বদেশের আমূল সংস্কারের জন্য উন্মুখ হইয়া আছে।

রোলাণ্ড এই সব কারণে পিতাকে ছাড়িয়া মাতামহীর নিকট কয়েক বৎসর নীরবে যাপন করিলেন, এবং মনোনিবেশ সহকারে গৃহধর্ম্মাদি শিখিতে লাগিলেন। কিন্তু অদৃষ্টের আদেশ এই সময় হইতেই তাঁহার শান্তিপূর্ণ হৃদয়ে পুনরায় ভাবের ও চিন্তার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। অগ্নি কখনও ভস্মে চাপা থাকে না।

যে একবারে মূর্খ—সে নিশ্চিন্ত, কারণ সে অনায়াসেই সব জিনিষেই বিশ্বাস করে; কিন্তু যার শিক্ষা অসম্পূর্ণ তার ভয়ানক বিপদ, কারণ সে সকল জিনিসকে সন্দেহের চক্ষে দেখে। যতক্ষণ না সে সকল সন্দেহ জয় করিয়া সরল বিশ্বাসে আনিতে পারে, ততক্ষণ সে নিশ্চিন্ত নহে, সে ততক্ষণ পর্য্যন্ত নিজের মনের উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারে না। এই রকম সময়ে মনের অবস্থা অতি খারাপ হয়। রোলাণ্ডের তাহাই হইল। যদিও তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস তিনি নিজ অন্তরের সহিত পোষণ করিতেন, কিন্তু তবু সেটা যেন অনেকটা তাঁর ভাবরাজ্যের অন্তর্গত, একটা সরল অমিশ্রিত শুদ্ধ বিশ্বাসের জোর তাহাতে ছিল না। চিরকালই তাঁহার মন উদ্যম, আবেগপূর্ণ, সুতরাং এই সন্দেহের বাধা পড়াতে হৃদয় সম্পূর্ণ বিদ্রোহী উঠিল। সন্দেহের বীজ মন হইতে উপড়াইয়া ফেলিবার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন। ফ্রান্সের ধর্ম্মসম্বন্ধে তখন সন্দেহ ও অবিশ্বাসের প্রবল ঝড় বহিতেছে। সুতরাং সমসাময়িক গ্রন্থকারগণের পুস্তক পাঠ করিয়া সন্দেহের সমাধানের পরিবর্ত্তে তিনি ঘোর নাস্তিক হইয়া উঠিলেন। এবং তখনকার সাম্যবাদী জগদ্বিখ্যাত লেখকদিগের রচনা পড়িয়া তাঁর মন একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। রোলাণ্ড একজন গোঁড়া বিপ্লববাদিনী হইয়া উঠিলেন। কিন্তু এ হেন অবস্থায় পড়িয়াও তিনি নিজের পথচ্যুত হন নাই। নিজের আদর্শ হারান নাই। তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা, মনের একাগ্রতা, তাঁহার প্রতিভার প্রচণ্ড প্রভাব ঠিক পূর্ব্বেরই মত ছিল। তাঁহার বুদ্ধি বিচলিত হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার হৃদয় পর্ব্বতের মত অচল, অটল, স্থির। সেইজন্য কিছুদিন পরে এই হৃদয়ের একাগ্রতাপূর্ণ চিন্তার প্রভাবে রোলাণ্ড সমস্ত নাস্তিকতার হাত এড়াইয়া পুনরায় ঈশ্বরপদে মতিস্থির করিতে পারিয়াছিলেন।

কিন্তু ঈশ্বরের বিধান অন্যরূপ। সামান্য

স্মানবে কি করিবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ফ্রান্সে তখন অত্যাচার অবিচারের ঝড় বহিতেছে। আভিজাত্যের নির্ম্মমতায় প্রজাসাধারণ উন্মত্ত! চতুর্দ্দিকে অশান্তির দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। ধর্ম্ম, পবিত্রতা মনুষ্যত্ব প্রভৃতি মানবীয় গুণ সকল দেশ হইতে অন্তর্হিত হইল। মিথ্যা ও ভণ্ডামি দেশের নিত্যকার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। রোলাণ্ড এই সকল দেখিলেন—দেখিয়া ঘৃণায়, ক্রোধে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। নূতন প্রভাবে নূতন উত্তেজনার সহিত বাল্যে পঠিত রোম ও গ্রীস ইতিহাসের অদ্ভুত স্বার্থত্যাগ ও বীরত্বকাহিনী আবার তাঁহার হৃদয়কে ভরিয়া ফেলিল; স্বদেশ-হিতৈষিতার অনন্য সাধারণউজ্জ্বল দৃষ্টান্তে প্রণোদিত হইয়া তিনি আবার নূতন উৎসাহে, নূতন উদ্যমে তাঁহার উচ্চ আদর্শকে সম্মুখে ধরিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইলেন। এই সময় ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি রোলাণ্ড ডি লা প্লেটিয়ারি নামক একজন রাজনৈতিক ও বিপ্লববাদীকে বিবাহ করিলেন। এই বিবাহে তাঁহার জীবনের কার্য্য আরও নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল।

কিন্তু এই বিবাহই তাঁহার কালস্বরূপ হইল। তিনি ভুলিয়া গেলেন যে তাঁহার উচ্চ আদর্শের সিদ্ধিপ্রাপ্তির পথে অনেক বিপদ। তিনি ইতিহাস পড়িয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি এরিষ্টাইডিস, সক্রেটিস প্রভৃতি স্বদেশভক্ত বীরদিগের পরিণাম কি হইয়াছিল তাহা দেখিলেন না। মহৎকার্য্যে পরিণাম দেখিয়া করিলে কখনইবা সফল হয়? তিনিও সফল হইলেন না। সত্যের গৌরবময় আদর্শে, কর্ত্তব্যের সাধনায় সমাজের শৃঙ্খলিত দশা দেখিয়া তিনি আবেগরুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"O Liberty! idol of earnest souls, thou art but a name for me." হায়, স্বাধীনতা, মহাত্মাগণ তোমার পূজা করেন, কিন্তু আমার নিকট একটি শব্দ মাত্র!

এই সময় রোলাণ্ডের সম্বন্ধে মনস্বী কার্লাইল তাঁহাকে নারীশ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করিলেন। এই সময় বাস্তবিকই তিনি দেবীর মত ফ্রান্স বাসীর চক্ষে প্রতিভাত হইয়াছিলেন।

তাঁহার স্বামী যে বিপ্লববাদীদিগের মধ্যে ছিলেন, সেই দলটীকে লোকে গিরোণ্ডিষ্টম সম্প্রদায় নামে অভিহিত করিত। কি গৃহধর্ম্মে কি রাজনীতি ক্ষেত্রে রোলাণ্ডের কখনও নিজ আত্মমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তিনি পূর্ব্বাপর তেমনই মহীয়সি রমণী ছিলেন। তিনিই একজন এই গিরোণ্ডিষ্টম সম্প্রদায়ের নেত্রী ছিলেন। গিরোণ্ডিষ্টমগণ ফ্রান্সের রাষ্ট্রবিপ্লবে সমাজের সম্পূর্ণ ধ্বংসের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহাদের মত ছিল তখনকার রাজবংশের গৌরব ও আভিজাত্য বজায় রাখিয়া ফ্রান্সের সংস্কার করিতে হইবে। এইজন্য তাঁহাদের অন্য নাম ছিল।

কিন্তু ফ্রান্সের জনসাধারণ তখন সমাজের আমুল সংস্কারের পক্ষপাতী। কোন বাধাই তাহাদের সম্মুখে টিকিতেছিল না। শত বৎসরের অত্যাচারের ফল ফ্রান্সের অভিজাত সম্প্রদায় মর্ম্মে মর্ম্মে

বুঝিতেছিলেন। সুতরাং রাজবংশের পতনের সঙ্গে সঙ্গে গিরোণ্ডিষ্টগণেরও আয়ু ফুরাইয়া আসিল। প্রজাতন্ত্রী দলের বিজয় দুন্দুভিতে ফ্রান্সের সমগ্র ভূমি তখন কম্পিত হইয়া উঠিল। তাহাদের সঙ্গে মতের যাহাদের সামান্য পার্থক্যও ছিল—তাহাদেরও জীবন বাঁচিল না।

সুতরাং ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে যে মাসে এই গিরোণ্ডিষ্টগণ ধৃত হন। তন্মধ্যে এক রোলাণ্ডের স্বামী প্রোটিয়ারী পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচান। রোলাণ্ড ধৃত হইয়া কারাগারে আবদ্ধ হন বন্দিনী অবস্থায় এই অপূর্ব্ব নারীর প্রভাব যেন আরও সহস্র গুণে বর্দ্ধিত হইয়া গেল। তিনি বাস্তবিকই দেবী হইলেন। তাঁহার মনের বল, চরিত্রের দৃঢ়তা, হৃদয়ের সত্য ও মহৎ আদর্শের প্রতি অপূর্ব্ব অনুরাগ, স্বদেশের জন্য প্রাণের বিশাল সহানুভূতি তাঁহাকে পৃথিবীর সকল যন্ত্রণা হইতে দূরে রাখিয়াছিল। গভীর চিন্তায় ও পাঠে তাঁহার দিন কাটিত। এই সময়ই তিনি তাঁহার আত্মজীবনী লিখেন। অধিকাংশ সময় তিনি "রিউক" নামক এক প্রসিদ্ধ দার্শনিকের সহিত কথোপকথনে দিন কাটাইতেন। এই রিউক রোলাণ্ডের বন্দী অবস্থা সম্বন্ধে বলিতেছেন—

তাঁহার বিরুদ্ধে কোন দোষ না পাইলেও বিপ্লববাদীদিগের বিচারালয় হইতে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। কিন্তু রোলাণ্ড দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়াও অচল, অটল, নির্ভীক, গম্ভীর। বিচারালয় বলিল যে তিনি ফ্রান্সের শত্রু লুকাইবার সহায়তা করিয়াছিলেন ও তিনি তাঁহার স্বামীর গোপন স্থান বলিতে নারাজ—সুতরাং প্রাণদণ্ড! ফ্রান্স তখন রক্তপিপাসু রাক্ষস—একটা ছল ত চাই।

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে তাঁহার মৃত্যুদিন। ঐ দিন লামার্ক নামধেয় আর এক ব্যক্তিরও প্রাণদণ্ড হয়। লামার্ক ভয়ে কাঁদিয়া আকুল হইলেন। কিন্তু রোলাণ্ড মহীয়সী দেবী প্রতিমার মত নিজের স্বর্গীয় রূপের ও পবিত্রতার জ্যোতি ছড়াইতে ছড়াইতে বধ্যভূমিতে উপনীত হইলেন। গিলোটাইন যন্ত্রের সম্মুখেই প্রজাতন্ত্রবাদিগণ স্বাধীনতার এক বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। স্বাধীনতাপিপাসু নারী স্বাধীনতার চরণেই আত্মবলি দিলেন।

তাঁহার মৃত্যুকাহিনী অতি অদ্ভুত। গিলোটাইনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আমায় কিছু কাগজ কলম দাও, আমার মনে এখন যে সব আশ্চর্য্য চিন্তা আসিতেছে সে সকল লিখিব!" গত জীবনের ও অচির আগত জীবনের ঘটনা ও চিন্তা সেই মৃত্যু মুহূর্ত্তে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া ফেলিয়াছিল।

কিন্তু তাঁহার অনুরোধ গ্রাহ্য হইল না। তখন তিনি ঘাতকদিগকে কিছুক্ষণের জন্য নিবারণ করিয়া বলিলেন, "ঐ বৃদ্ধকে (লামার্ক) অন্ততঃ আমার মৃত্যু দেখার যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি দাও। উহাকে আপাততঃ এখান হইতে সরাইয়া লইয়া যাও।" ঘাতক বলিল, "সেরূপ আদেশ আমরা পাই নাই।" রোলাণ্ড বলিলেন,

"নারীর শেষ অনুরোধও রাখিবে না।" ঘাতক কথা না কহিয়া অনুরোধ রাখিল।

গিলোটাইনের তক্তার উপর চড়িয়া রোলাণ্ড সম্মুখস্থ স্বাধীনতার প্রতিমূর্ত্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—স্বাধীনতা, স্বাধীনতা, তোমার নামে কত দুষ্কার্য্য কৃত হইতেছে! মুহূর্ত্ত পরে তাঁহার দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইল।

এইরূপে এই অপূর্ব্ব নারীজীবনের অবসান হইল। তিনি পরে ফ্রান্সের কেন জগৎবাসীর চক্ষে ধর্ম্মার্থে নিহত বলিয়া অভিহিত হইলেন।

বঙ্গ মহিলার যাপান যাত্রা।

(১৩১৯। অগ্রহায়ণ মাসের পর)

১৩ই নবেম্বর-রেঙ্গুনে জাহাজের ডাক্তার আরোহীদের পরীক্ষা করার পর দুইটার সময় জাহাজ ছাড়িল। রেঙ্গুন হইতে আজ আমাদের ক্যাবিনে আরও দুইজন জাপানী উঠিলেন। ইহাঁদের একজন সাংহাই ও একজন জাপান যাইবেন। আমরা অন্য ক্যাবিনে গেলাম। এই ক্যাবিনটী বেশ ভাল। ঘরে টেবিল, চেয়ার, গদি দেওয়া বেঞ্চ, বিছানা, আর্শি ইত্যাদি; পার্শ্বেই স্নানাগার। সকল রকমেই সুবিধাজনক ও সুসজ্জিত; প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্যাবিনের মত জাপানী "বয়" (Boy) যখন যা প্রয়োজন হয় করে দেয়। "ডেকে"ও বেশ জায়গা আছে,—বেড়ান যায়; ঘরেও বেশ বাতাস আসে। এ দিকে জাহাজের বড় কর্ম্মচারীরা থাকেন, তাই এমন সুবন্দোবস্তু। আমাদের সম্মুখের গৃহ ওঁদের ভোজনাগার (dinner Room)। এখানে আমাদের আশাতীত সুবিধা হয়েছে। বিন্দুমাত্র অসুবিধা নাই। সমুদ্রপীড়া হয় নাই। জাহাজ বেশ স্থিরভাবে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। আজকাল মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়, গরম খুব বেশী। আমার একটু জ্বর হইল। আমি মাঝে মাঝে এস্রাজ বাজাই। আস্তে আস্তে গান করি, সেলাইও এক আধটুকু করি। প্রায়ই "ডেকের" উপর বেড়াই ও অনন্তের রচিত অনন্ত নীলাকাশ ও নীল সমুদ্র দেখি। সূর্য্যাস্তের সময় দৃশ্য বড়ই সুন্দর!

১৭ই নবেম্বর—প্রাতে পিনাঙ্ পৌঁছিলাম। শরীর অসুস্থ থাকায় ও বৃষ্টি হওয়াতে তীরে নামিলাম না। ১৮ই—বৈকালে জাহাজ ছেড়ে ২০শে প্রাতে সিঙ্গাপুর পৌঁছিলাম। সারাদিন বৃষ্টি। ২১শে—সহরে বেড়াতে চলিলাম। সমুদ্রের তীরবর্ত্তী স্থানগুলি বড় সুন্দর। সমুদ্রের তীরেই ছোট ছোট পাহাড়, তদুপরি সুদৃশ্য পুষ্পবৃক্ষাদি পূর্ণ বাগান-পরিবেষ্টিত ছবির মত সুন্দর সুন্দর বাড়ী। জাহাজঘাট থেকে হেঁটেই সহরে গেলাম। অনেকটা দূর। রাস্তায় ধূলা নাই; তৈলে সিক্ত সহরে রাস্তার উভয় পার্শ্বে দোকান, তৎসম্মুখে ফুটপাথ। ফুটপাথের উপর ছাদ। রৌদ্র বৃষ্টিতে পথিকদের কষ্ট হয় না। রাস্তায় ট্রাম, ঘোড়ারগাড়ী,

রিক্স (মানুষটানা গাড়ী) ইত্যাদি চলে। চীনা ও মালয়ী লোকই বেশী। এখানে জাপানীও অনেক আছে। ফিরিবার সময় ট্রামে ফিরিলাম। আমি এই প্রথম ট্রামে উঠিলাম। এখানে সমুদ্রতীরে কতকগুলি ভিক্ষুক শ্রেণীর লোক বাস করে। যখন জাহাজ আসে বা ছাড়ে সেই সময় ছোট ছোট নৌকায় তাহারা জাহাজের নিকটস্থ হয়। জাহাজ থেকে আরোহীরা জলে পয়সা ফেলে দেয়, আর উহারা নৌকা থেকে জলে লাফিয়ে পড়ে ডুব দিয়ে জল থেকে পয়সা নিয়ে নৌকায় উঠে। ২।৩টী পয়সা একেবারে লইতে পারে। এতে সকলেই তামাসা দেখে আর উহারাও কিছু উপার্জ্জন করে। আমাদেরও কয়েক সেণ্ট (cent—এখানকার পয়সা) খরচ হইল। বৈকালে একটী জর্ম্মন জাহাজ আসিল; তীরে লাগিবার পূর্ব্বে ব্যাণ্ড বাজাইল। এখানে খুব গরম।

২৩শে নবেম্বর—প্রাতে আমাদের জাহাজ পিনাঙ্ ছাড়িল। আমরা ডেকে দাঁড়াইয়া দেখিলাম। পরে ঘরে এসে চা খাইলাম। আধ ঘণ্টাখানেক পর দাঁড়ান অসম্ভব হইয়া উঠিল। কারণ, এখন স্থির সমুদ্র ক্রমে অস্থির হইয়া উঠিতেছে। বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। জাহাজ খুব দুলিতে লাগিল। শরীর অস্থির—গা বমি বমি করিতে লাগিল। দুজনেরই শরীর অত্যন্ত খারাপ, জাহাজশুদ্ধ সকলেরই প্রায় তাই। আকাশ ঘনমেঘাচ্ছন্ন, বৃষ্টি, প্রবল উত্তুরে বাতাস, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র সব অদৃশ্য। সমুদ্রের ঢেউ ও গর্জ্জন ভয়ানক। জাহাজ সম্মুখে পশ্চাতে দুলিতেছে। আমরা জাহাজের মধ্যভাগে, তাই কষ্ট কম। যাহারা সম্মুখ ও পশ্চাদ্দিকে, তাদের অবস্থা আরও কষ্টকর। ২৭শে পর্য্যন্ত একই অবস্থা। তবে প্রথম দিনের মত শারীরিক উদ্বেগ কিছুই নাই। আমি সর্ব্বদা শুয়েই থাকি। উঠিলে পড়িয়া যাই, মাথা ঘোরে। ভাত খাই না বলিলেই হয়, কমলালেবু ও বিস্কুট কিছু কিছু খাই। আহারে রুচি মোটেই নাই। শুয়ে থাকিলে কোন কষ্ট নাই। উনি (Mr. Takeda) খান বেড়ান, কোন কষ্ট নাই। ২৮শে আকাশ একটু পরিস্কার দেখা গেল। সমুদ্র ও জাহাজ কিছু স্থির হইল। আমি উঠিয়া স্নান করিলাম, কয়েক দিন পর বেশ রুচির সহিত আহার করিলাম। সারাদিন বসে রইলাম, ২৯শে আবার ঘন মেঘ দেখা দিল। প্রবল বাতাসে জাহাজ এবার আড়া আড়ি ভাবে দুলিতে লাগিল। মধ্যাহ্ন-আহারের পর শুইয়া পড়িলাম। বৈকাল হইতে জাহাজ অত্যন্ত দুলিতে লাগিল। সমুদ্রের ঢেউ ভয়ানক গর্জ্জনে জাহাজের উপর হুস্ হুস্ ক'রে এসে সব ভিজিয়ে দেয়। জিনিষ পত্র যাহা উপরে ছিল নীচে পড়ে একবার এ পাশে আবার ওপাশে গড়াইতে লাগিল। পরে দুইজন "বয়" এসে সব জিনিস নীচে পরস্পর ঠেকা দিয়ে রেখে গেল। কিছু না ধরে কেহই দাঁড়াতে পারে না। বেঞ্চে বসলে সম্মুখ দিকে পড়ে যেতে হয়। বিছানায়

চারিদিকে কাঠের ফ্রেম, তাই পড়বার ভয় নাই। তবুও আমাদের বিছানা পাশাপাশি ভাবে থাকাতে ও কিছু লম্বা হওয়াতে একবার পায়ের দিকে নেমে যেতে হয় আবার মাথার দিকে উঠ্‌তে হয়। বিছানা জোর করে ধরে ধাক্কা সাম্‌লাতে হয়। ঘুম হয় না। মাথা একবার নীচে যায় আবার উপরে উঠে। খাওয়া হল না; জাহাজে প্রায় ১০০০ চাইনীজ্ আরোহী, সব উপবাস। ৩০শে, আকাশ, সমুদ্র, জাহাজ সকলেরই এক অবস্থা। কেবল ভাত সিদ্ধ ক'রে চাইনীজ্‌রা আহার করিল। কিন্তু তাহাতেও কত বিড়ম্বনা! কিছু না ধরে দাঁড়াতে পারে না। সমস্ত শরীরে ভাত পড়ে একাকার। তাকেদাসান চা রুটী খেলেন। আমার আহারে রুচি নাই। কিন্তু শারীরিক কোন উদ্বেগ নাই। কমলালেবুই আমার আহার। এই ভাবে ২রা ডিসেম্বর প্রাতে হংকং পৌছিলাম। জাহাজখানি নাকি ঘণ্টায় ৯॥০ মাইল চলে। এই কয়দিনে ৪।৫ মাইলও চলিয়াছে। ৫।৬ দিনের স্থানে ৯ দিনে হংকং আসিলাম। আজ অত্যন্ত শীত—কাল থেকে হঠাৎ যেন শীত পড়িল; আগে বেশ গরম ছিল।

হংকংএ বেড়াতে নামিলাম। সহরটী একদিকে যেমন সুদৃশ্য তেমনি জাঁকজমকে পূর্ণ। পর্ব্বতময় স্থান বলিয়া রাস্তাগুলি কোনটা উঁচু, কোনটা নীচু। ৫।৬ তালা পর্য্যন্ত উচ্চ বড় বড় বাড়ী। নিম্নতলে রাস্তার উভয় পার্শ্বে সুসজ্জিত দোকান। ফুটপাথের উপর ছাদ। রাস্তায় ট্রাম, রিক্স ও সীডন্ চেয়ার (অনেকটা ছাদশূন্য পাল্কির মত)। ঘোড়ার গাড়ী দেখিলাম না। হংকং পীক্ ট্রামে উঠিতে হয়। পীক্ ট্রামওয়ে এক আশ্চর্য্য জিনিষ। পীকের উপরে ট্রামওয়ে ষ্টেশনস্থিত ইঞ্জিনের চাকায় আবদ্ধ লৌহরজ্জুদ্বারা দুইটী ট্রাম বাঁধা থাকে। চাকাটী ঘুরান হয়, তৎসঙ্গে ট্রাম দুইটী সমসূত্রে আকর্ষিত হয়ে একটী উপরে উঠে ও অপরটী নামিয়া আসে। খাড়া পাহাড়ের উপর এরূপে যাতায়াত আশ্চর্য্য ব্যাপার! ট্রাম শেষ পর্য্যন্ত যায় না। যেখানে শেষ হইয়াছে সেখানে পীক্‌হোটেল (Peak Hotel) নামে একটী হোটেল আছে। এখান থেকে হেঁটে উপরে উঠিতে হয়। উপরে সুন্দর সুন্দর বাড়ী ও বাগানাদি আছে। স্থানে স্থানে বিশ্রামের জন্য বেঞ্চ। রাস্তার উভয় পার্শ্বে নানা প্রকার সুদৃশ্য বৃক্ষাদি আছে। পীকে হেঁটে উঠিবার জন্য একটী রাস্তা আছে। পাহাড়ের উপর হইতে সমুদ্রের বড় বড় জাহাজগুলি অতি ক্ষুদ্র দেখায়।

রাত্রে সমুদ্র হইতে হংকংএর দৃশ্য আরও মনোহর। পাহাড়ের উপর সহরে ও গৃহে গৃহে আলো দেখিয়া বোধ হয় যেন অসংখ্য নক্ষত্র আকাশে শোভা পাইতেছে! বাস্তবিক স্থানটী বড়ই সুন্দর! এখানে নানা দেশীয় লোকের বাস। অধিকাংশই বোধ হইল চাইনীজ্।

৪ঠা ডিসেম্বর—বৈকালে ৪টার জাহাজ

ছাড়িল। আকাশ পরিষ্কার, এবার আর কোন কষ্ট হল না, কারণ ঝড় বৃষ্টি আর হয় নাই। জাহাজও বেশ স্থির ভাবে চলিতেছে। ৯ই প্রাতে সাংহাই পৌঁছিলাম। শীতের জন্য ঘরে পাইপে গরম জল লওয়া হয়েছে। তাহাতে ঘরখানি বেশ গরম থাকে। ইয়াংসিকিয়াং খুব বড় নদী। এখানে অসম্ভব শীত। এত শীতবস্ত্র পরিধান করিয়াও শীতে শরীর যেন অবসন্ন হইয়া যাইতে লাগিল। সহরটী বেশ পরিষ্কার। রাস্তাগুলি ইটে বাঁধান, সিমেণ্ট করা, সাদা ধব্‌ধবে, ধূলা নাই। দুইদিকে সুন্দর চাইনীজ্‌ ধরণের বাড়ী। প্রায় ৫ ঘণ্টা হেঁটে বেড়ালাম। রাস্তার উভয় পার্শ্বে বৃক্ষ আছে কিন্তু তাহা পত্রশূন্য। ১০ই বৈকালে ৩॥০টায় জাহাজ সাংহাই ছাড়িল।

১৩ই ডিসেম্বর—প্রাতে জাপানের প্রথম পোর্ট মোজি পৌঁছিলাম। ডাক্তার জাহাজের আরোহীদের পরীক্ষা করিলেন। আমরা নৌকা ক'রে নেমে বেড়াতে গেলাম। জাপান দেখে বেশ আনন্দ হইল। বৃষ্টি হওয়াতে রাস্তা কর্দ্দমময় ছিল, জুতাপায়ে চলা মহামুস্কিল; তার উপর আবার খুব শীত। দেখিবার জিনিস বিশেষ কিছুই নাই। সহরটী অপরিষ্কার কর্দ্দমময় দেখা গেল। নিকটেই সমুদ্রের অপর পারস্থ সহর সিমোনোসেকি। ফেরী-ষ্টীমারে করে গেলাম। সহর প্রায় একরকমই। এখানে "তেনজিন সামা"র (স্বর্গবাসীর) একটী দেবমন্দির দেখিলাম। সমুদ্রতীরস্থ পাহাড়ের উপর মন্দিরটী স্থাপিত। উঠিবার জন্য সিঁড়ি। প্রবেশপথে প্রস্তর-নির্ম্মিত "তোরি" নামক ফটক। দরজার চৌকাঠের নিম্নদিকের কাঠখানা না থাকিলে যেরূপ হয়, ঠিক্ সেই ধরণে দুইদিকে প্রস্তর বা লৌহাদি দ্বারা প্রস্তুত দুইটী স্তম্ভ ও উপরে আড়াআড়ি ভাবে আর একটী—দুটী থামকে সংযোগ করিয়াছে। অভ্যন্তরে নির্জ্জন শান্তির আলয় স্বরূপ সুদৃশ্য বাগান ও মন্দির, সম্মুখে সমুদ্র, উপর হইতে বড়ই সুন্দর দেখা যায়!

এখানে অনেক জাপানী আমাকে বিদেশী দেখে ব্যগ্র হয়ে দেখিতে লাগিল।

১৫ই ডিসেম্বর—বৈকালে কোবে পৌঁছিলাম। জাহাজ লাগিবার পূর্ব্বে ডাক্তার পরীক্ষা করিলেন। হংকংএর পর হইতে মাত্র ৩।৪ জন জাপানী আরোহী ছিলেন। আমরা এখানে নামিব; পূর্ব্বেই এক হোটেলে জানান হয়েছিল। হোটেলের লোক এসে আমাদের জিনিস পত্র গুছাইয়া লইল। আমরা নৌকা ক'রে তীরে উঠিলাম। কাষ্টম্ হাউসে (Custom House) জিনিষগুলি দেখাইতে হইল। বৃষ্টি হইয়া রাস্তা এত খারাপ হইয়াছে যে চলা দুষ্কর। এদেশের রাস্তা ভাল নয়।

আমরা হোটেলে উঠিলাম। বাড়ীটী কাঠের; বেড়া, প্রাচীর, গৃহের মেজে, সব কাষ্ঠ নির্ম্মিত। মেজেতে মাদুর মোড়া। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। নীচে জুতা খুলে চক্‌চকে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠিলাম। বসিতে তুলাভরা কুশন

(আসন) দিল। হোটেলের দাসীগণ যখন যাহা প্রয়োজন হয় অত্যন্ত যত্নের সহিত ও বিনীত ভাবে সম্পন্ন করে। ইহাদের আদর যত্ন বড়ই প্রীতিকর। প্রবেশ মাত্র মাথা নোয়াইয়া অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসাদি করে। হাঁটু গেড়ে বসিয়া নম্র ও সুমিষ্ট ভাবে কথা বলে। সম্মুখ হইতে যাওয়ার সময় মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করে।

সন্ধ্যাকালে দুইজন পত্রিকার সম্পাদক সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। এবং আমাদের বিষয় জ্ঞাত হইয়া সংবাদপত্রে আমাদের সংবাদ ও ছবি দিতে চাহিলেন। ইণ্ডিয়ায় তাকেদাসানের এক জাপানী বন্ধু কাওয়াগুচিসান্ (Kawaguchisan) আমাদের বিবাহের পর কাশী হইতে যে পত্র লিখেছিলেন তাহা দেখান হইল। পত্র খানির মর্ম্ম এই—"তুমি যাঁহাকে বিবাহ করিয়াছ তাঁহার পিতা অতি সৎলোক বলিয়া খ্যাত। অনেকের নিকট তাঁহার সুনাম শুনিতে পাই। এই সকল সুলোকের সহিত সর্ব্বদা সদ্ভাবে থাকিবে। আশা করি তুমি যুদ্ধে পশ্চাৎপদ হওয়ার ন্যায় জাপানীদের দুর্নাম করিবে না।"

তৎপরদিন "খবরের কাগজে বাহির হইল," "মিঃ তাকেদা ইণ্ডিয়ার অমুকের কন্যাকে বিবাহ করিয়া কয়েকবৎসর পর সস্ত্রীক পরমানন্দে স্বদেশাগমন করিয়াছেন। আনন্দ যেন তাঁহার চক্ষু হইতে উথ্‌লাইয়া পড়িতেছে।" ইত্যাদি।

জাপান হইতে টেলিগ্রাম করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু প্রতি শব্দে প্রায় ৩৲ টাকা খরচ হয় বলে করিলাম না।

১৭ই ডিসেম্বর—প্রাতে ৮টার ট্রেণে রওনা হইয়া অপরাহ্ণ ৩টায় ওঁদের বাড়ীর নিকটবর্ত্তী ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। এখানে ট্রেনের ব্যবস্থা বেশ সুখকর। গাড়ীর সম্মুখ ও পশ্চাৎ দিকে দুটী দরজা, এবং ট্রেণে চলাচল করার জন্য সেতু আছে। মাঝে মাঝে ষ্টেশনে গাড়ীগুলি ঝাড়ে ও জল দিয়া মুছিয়া দেয়। তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীগুলি আমাদের দেশের মধ্যম শ্রেণী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। শীতের জন্য গরম জলের পাইপ আছে। আরোহিগণ সঙ্গে অধিক জিনিস লয় না, সমুদায় জিনিস মালগাড়ীতে দেয়। ট্রেণে উঠিবার সময় ঠেলাঠেলি করিতে হয় না। স্থানীয় কর্ম্মচারী ও যাত্রিগণ পরস্পর পরস্পরের সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সাহায্য করিতে প্রস্তুত। জাতীয় একতা পথে ঘাটেও পূর্ণরূপে অনুভব করা যায়। পর্ব্বতময় দেশ বলিয়া ট্রেণ মাঝে মাঝে পর্ব্বতের মধ্য দিয়া যায়। যখন অধিক্ষণ অন্ধকারে থাকে তখন আলো জ্বালাইয়া দেওয়া হয়।

ক্রমশঃ।

শ্রীহরিপ্রভা তাকেদা।

(ভারতমহিলা)

বেথুন-স্মৃতি।

মহাত্মন,

কোন শুভক্ষণে এ ভারতভূমে
করেছিলে তুমি চরণপাত;
ব্রিটনিয়া হতে সুদূর ভারতে
প্রেরিলা তোমারে জগতনাথ।

কনকস্যন্দনে ভারত বিমানে
তোমার উদয় হইল যবে ;
ঘুচে গেল ঘোর তমস আঁধার
তপন হাসিয়া উঠিল তবে ?
ভারত মাতার বিষাদ মলিন
কালিমাজড়িত নয়ন পরে ;
উঠিল ফুটিয়া সুমধুর হাসি
অশ্রুসিক্ত আনন ভরে।
তোমারি মধুর ও শুভ আহ্বানে
হেরিলা চাহিয়া স্বশির তুলি ;
হাসি বিকশিত কুসুমের প্রায়
উঠিলা বিগত বিষাদ ভুলি।
মায়ের-মন্দিরে তব আগমনে
শুভশঙ্খ-ধ্বনি উঠিল বাজি,
শুনিয়া মধুর সে বাজনা ধ্বনি
ঘুচিল অলীক স্বপন রাজি।
মায়ের কাননে শত শত দল
আবার কিরণে উঠিল ফুটি ;
বিটপে বিটপে বিহগ সকল
আবার মধুরে গাহিল উঠি।
ভারতের পুণ্য করম-মন্দিরে
মধুর হাসিয়া পশিলে যবে,
পরদেশবাসী হে করমবীর,
ভারতে আবার জাগালে সবে !
তিমির সাগরে ডুবি চিরতরে
ছিল ভারতের ললনা যত ;
তুমি তাহাদেরে আনিতে আলোকে
সহিলে জীবনে যাতনা কত।

দেব,

আমাদের কোন্ মহাপুণ্যবলে
তুমি এসেছিলে ভারত পরে,
জগতজননী পাঠায়ে তোমারে
মোদের লাগিয়া করুণা করে ;
দেখালেন তাঁর করুণা অপার
আমাদেরি পরে জগতমাঝে ;
ভারত আবার সাজিবে বলিয়া
তাহার পূর্ব্ব-গরব সাজে।
কনক কিরীট শোভিত ও শির
জননী আশীষে জগতে তুলি ;
দাঁড়ালে মহান্ আদর্শ লইয়া
নিজের সকল বেদনা ভুলি।
তাই এ নারী এই সৌধমালা
লইয়া আপন হৃদয় পরে ;
রয়েছে দাঁড়ায়ে স্বশির তুলিয়া
দেখায়ে সবারে গরব ভরে।
ভারত ললনা তব গাথা শুনি
আসিল ছুটি তোমারি দুয়ারে ;
লয়েছ তাদেরে আপন আলয়ে
কতই আদর যতন ভরে।
তোমার মতন কে আর এমন
নারীর অশ্রু চেয়েছে মুছাতে ?
মুদিত ভারত ভাগ্য শতদল
বিদেশী আর কে আসে ফুটাতে ?
তুমি এ ভারতে দিয়েছ অনেক
আমরা তোমারে কি দিব আজি,
তব পুণ্য নামে উঠুক মোদের
সুপ্ত পরাণ গভীরে বাজি।
ভারতের কোলে আসিয়া বসিলে
মায়ের লাগিয়া সকল ফেলে,
আপনার জন, ত্যজি মাতৃভূমি,
পরেরে আপন করিয়া নিলে।
পুণ্যা ভারতের স্নেহের তনয়
সকলি ভারতে করিয়া দান,

এ ভারত অঙ্কে চির নিদ্রা ভরে
যতনে আরামে লভিলা স্থান।
আজ তুমি হেথা ঘুমে অচেতন
প্রভাতের সনে নাহি জাগিবে;
তোমারি প্রাণের বিদ্যালয় প্রতি
নয়ন মেলিয়া নাহি চাহিবে?
তুমি নাই ব'লে আমরা আজিকে
দুখেরে হৃদয়ে দিব না স্থান,
আমরা তোমার স্নেহের তনয়া
গাহিব তোমার বিজয় গান।

সংক্রামক রোগ ও তাহার পরিব্যাপ্তি *।

অদ্য আমাদের আলোচনার বিষয় সংক্রামক রোগের শুশ্রূষা। সংক্রামক রোগ কাহাকে বলে এবং কিরূপেই বা উহা এক ব্যক্তি হইতে অপর ব্যক্তিতে সংক্রামিত হয় এবং ক্রমশঃ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে, প্রথমতঃ তৎসম্বন্ধে ২।৪টী কথা সংক্ষেপে বলিব।

সংক্রামক রোগ বলিলে সচরাচর যাহাকে 'ছোঁয়াটে' রোগ বলা যায় (যেমন হাম, বসন্ত, পান-বসন্ত ইত্যাদি), তাহাই আমরা বুঝিয়া থাকি। কিন্তু এমন অনেক সংক্রামক রোগ আছে, যাহা স্পর্শদ্বারা রোগীর শরীর হইতে সুস্থ শরীরে সঞ্চারিত হয় না, যেমন ম্যালেরিয়া জ্বর, কালাজ্বর ইত্যাদি। অন্য উপায়ে ইহারা এক শরীর হইতে অন্য শরীরে সংক্রামিত হইয়া থাকে।

সংক্রামক রোগ মাত্রেরই এক প্রকার বিষ আছে, রোগ ভেদে এই বিষের প্রকৃতি ভিন্ন হইয়া থাকে। কতকগুলি সূক্ষ্ম জীব (Parasites), বা উদ্ভিদ্‌জাতীয় পদার্থ (Bacteria) এই বিষের উৎপত্তি স্থল। ইহারা কোনও রূপে মনুষ্য দেহে প্রবেশ করিলে সংক্রামক রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমরা সংক্রামক রোগের বিষ সাধারণতঃ "রোগের বীজ" বলিয়া এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিব।

সচরাচর রোগের বীজগুলি স্পর্শদ্বারা, অথবা রোগীর স্পৃষ্ট বস্ত্র বা শয্যাদির সাহায্যে, কিম্বা বায়ুর দ্বারা পরিবাহিত হইয়া একস্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হয় এবং এক ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তিতে সংক্রামিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত মাছি, মশা, পিপীলিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র প্রাণীগণ দ্বারাও সংক্রামক রোগ পরিব্যাপ্তি লাভ করে।

অধিকাংশ সংক্রামক রোগের বীজ মল, মূত্র, কফ্ প্রভৃতির সহিত দেহ হইতে নির্গত হইয়া যায়। রোগের বীজ দুষ্ট এই সকল পদার্থ ভূমি বা জলাশয়ে নিক্ষিপ্ত হইলে তথায় ঐ বীজ সংখ্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পরে ভূমি হইতে ধূলির সহিত উত্থিত হইয়া নিঃশ্বাসের সাহায্যে, অথবা জলাশয় হইতে পানীয় জলের সহিত, আমাদিগের দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে উক্ত রোগের আবির্ভাব হইয়া থাকে। সংক্রামক রোগীর মল মূত্রাদির উপর মাছি

---

* (ভিক্টোরিয়া মহিলা বিদ্যালয়ে ডাঃ শ্রীচুণীলাল বসু কর্ত্তৃক পঠিত প্রবন্ধের প্রথমাংশ।)

বসিলে উহাদিগের পদদেশে অসংখ্য রোগের বীজ সংলগ্ন হইয়া যায়। এরূপ অবস্থায় যদি উহারা আমাদিগের কোন খাদ্যদ্রব্যের উপর উপবেশন করে তাহা হইলে ঐ খাদ্য রোগের বীজে দুষ্ট হইয়া পড়ে। এরূপ দূষিত খাদ্য গ্রহণ করিলে ঐ সকল সাংঘাতিক রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা। কলেরা, টাইফয়েড জ্বর প্রভৃতি রোগে বমি ও মলের সহিত রোগের বীজ অসংখ্য পরিমাণে নির্গত হয়। আমাদের দেশের লোক অজ্ঞতা নিবন্ধন মল-সংলগ্ন বস্ত্র বা শয্যা পুষ্করিণীর জলে কাচিয়া থাকে; এইরূপে ঐ পুষ্করিণীর জল রোগের বীজদ্বারা দূষিত হয় এবং উহা পান করিলে গ্রামের মধ্যে কলেরা রোগ মহামারীরূপে প্রাদুর্ভূত হয়। যক্ষ্মাগ্রস্ত রোগী কু-অভ্যাসবশতঃ কফ্ তুলিয়া যেখানে সেখানে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। উহা ধূলির সহিত মিশ্রিত হইয়া শুষ্ক হইয়া গেলেও তন্মধ্যে যক্ষ্মা রোগের বীজ নিহিত থাকে এবং ঐ বীজ মিশ্রিত ধূলি উড়িয়া নিঃশ্বাসের সহিত আমাদের দেহে প্রবেশ করিলে ক্ষয়কাশ রোগ উৎপন্ন হয়।

ম্যালেরিয়া, প্লেগ, আসামের কালাজ্বর, আফ্রিকার কাল-নিদ্রা প্রভৃতি কতিপয় সংক্রামক রোগ মশক বা অন্য প্রকার কীটের দংশন দ্বারা রোগীর শরীর হইতে সুস্থ ব্যক্তির শরীরে সংক্রামিত হইয়া থাকে। এনোফিলিস্ নামক এক জাতীয় মশক ম্যালেরিয়া রোগীকে দংশন করিয়া উহার রক্ত হইতে ম্যালেরিয়া রোগের বীজ উঠাইয়া লয়; পরে ঐ বীজ মশকের শরীরে পরিবর্দ্ধিত হয় এবং যখন ঐ মশক সুস্থ ব্যক্তিকে দংশন করে তখন তাহার শরীরে ঐ বীজ প্রবেশ করাইয়া দেয়। এইরূপে ম্যালেরিয়া জ্বর এক ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তিতে সংক্রামিত হইয়া থাকে। অতএব যাহাতে বাটীর মধ্যে মশার উপদ্রব না হয় তাহার ব্যবস্থা করিলে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকোপ অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়।

ইঁদুরের গায়ে এক প্রকার ক্ষুদ্র পোকা জন্মে। উহাকে ইংরাজীতে রাট্ ফ্লী কহে। সকলেই অবগত আছেন যে ইঁদুরের বিস্তৃত ভাবে প্লেগ হইয়া থাকে। প্লেগগ্রস্ত ইঁদুরের গায়ে যে সকল পোকা থাকে, তাহারা মনুষ্যকে দংশন করিলে সেই ব্যক্তির প্লেগ রোগ উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ এইরূপে প্লেগরোগ প্রথমতঃ ইঁদুর হইতে মনুষ্য শরীরে সংক্রামিত হইয়া থাকে। কোন কোন প্লেগরোগীর ফুস্‌ফুসের প্রদাহ হইতে দেখা যায়। এইরূপ স্থলে রোগীর কফের সহিত প্লেগ রোগের বীজ নির্গত হয় এবং কোন প্রকারে যদি ঐ কফ্ সুস্থ ব্যক্তির মুখের মধ্যে অথবা বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া নিঃশ্বাসের সাহায্যে তাহার দেহের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি প্লেগ-রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। মৃত ইঁদুর হাত দিয়া স্পর্শ করিয়া অনেক সময়ে প্লেগরোগ হইতে দেখা গিয়াছে। যাহাতে বাটীর মধ্যে ইঁদুরের উপদ্রব না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। ইঁদুর মরিলে কখনও তাহা হাত দিয়া স্পর্শ

করা উচিত নয়: উহাকে চিমটা দিয়া উঠাইয়া খোলা জায়গায় খড় ও কেরোসি-নের সাহায্যে পুড়াইয়া ফেলা উচিত, এবং যেস্থানে মৃতদেহ পতিত থাকে, তাহা ফেনাইল্ প্রভৃতি যে কোন বিশোধক পদার্থ দ্বারা পরিষ্কৃত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

হাম, বসন্ত, পানবসন্ত প্রভৃতি রোগের বীজের প্রকৃতি এপর্য্যন্ত নিশ্চয়রূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই। তবে ঐ সকল রোগের বীজ, হাম, বসন্ত শুকাইবার সময় যে 'ছাল' উঠে, তাহার মধ্যে লুক্কায়িত থাকে এবং স্পর্শদ্বারা এক ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তিতে সংক্রামিত হয়। এতদ্ব্যতীত উক্ত বীজ বায়ু এবং রোগীর বস্ত্র বা শয্যাদির সাহায্যে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হয় এবং সুস্থ ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিলে তাহার ঐ রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ডিপথিরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি রোগ গুলিও অত্যন্ত সংক্রামক। ঐ সকল রোগের বীজ কফের বা নিঃশ্বাসের সহিত নির্গত হইয়া বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয় এবং ঐ দূষিত বায়ু নিঃশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিলে সুস্থ শরীরে রোগ প্রকাশ পায়।

রক্ত আমাশয়, কলেরা, টাইফয়েড জ্বর প্রভৃতি সংক্রামক রোগ, রোগীকে স্পর্শ করিলে উৎপন্ন হয় না। মলাদির সহিত ঐ সকল রোগের বীজ নির্গত হয় এবং ইহারা কোনও রূপে পানীয় জল বা খাদ্য-দ্রব্যের সংস্পর্শে আসিলে উক্ত জল বা খাদ্য দূষিত হইয়া পড়ে। ঐ দূষিত জল বা খাদ্য গ্রহণ করিলে ঐ সকল সংক্রামক রোগ উৎপন্ন হয়। এই সকল রোগি মল-সংস্পৃষ্ট বস্ত্রাদি পুড়াইয়া ফেলিলে বিপদের আশঙ্কা অনেক কমিয়া যায়।

খোস্, পাঁচড়া, দাদ প্রভৃতি সংক্রামক রোগ হইলেও উহারা মারাত্মক নহে। তবে ইহারা বড় কষ্ট দেয় এবং সহজে আরোগ্য হইতে চাহে না। এই সকল রোগের বীজ স্পর্শদ্বারা, অথবা যাহাদের খোস পাঁচড়া হইয়াছে তাহাদের ব্যবহৃত গামছা, তোয়ালিয়া, বস্ত্র বা শয্যাদি ব্যবহার করিলে এক ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তিতে সংক্রামিত হইতে থাকে। যাহাদের খোস পাঁচড়া হইয়াছে, তাহাদিগকে কিছুদিন পৃথক্ করিয়া রাখিলে এবং তাহাদিগের ব্যবহৃত বস্ত্রাদি কাহাকেও ব্যবহার করিতে না দিলে ঐ রোগ বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে না।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

বিগত ৩০এ শ্রাবণ শুক্রবার মাননীয়া শ্রীমতী লেডী কারমাইকেল ঢাকাস্থ ব্রাহ্মিকা মহিলা সমিতিতে উপস্থিত হইয়া পরিদর্শন করিয়াছেন। এজন্য ঢাকার রামমোহন রায় লাইব্রেরী হল সুন্দররূপে সজ্জিত করা হইয়াছিল। লেডী কারমাইকেলকে সমাদরে গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে ফুলের মালাদ্বারা সম্বর্দ্ধনা করা হয়। মহিলারাই সঙ্গীত এবং ভিন্ন ভিন্ন রূপে এস্রাজ ও বেহালাদি বাদ্য শুনাইলেন; তৎপরে একতান বাদ্যও করিয়াছিলেন। মহিলা

সমিতির সম্পাদিকা সমিতির রিপোর্ট ইংরাজীতে পাঠ করিয়া শুনান। লেডী কারমাইকেলও সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করেন। বিশেষতঃ মেয়েদের বাদ্যাদিতে এতটা উন্নতি দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্যভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। লেডী কারমাইকেলের সঙ্গে মেয়েদের স্কুলসমূহের ইনস্পেক্টেস্ এবং শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেব স্বীয় পত্নীসহ উপস্থিত ছিলেন। এ ব্যাপারে বোধ হয় মহিলা সমিতির দেড়শত টাকা খরচ হইয়াছে কার্য্যান্তে সকলেই চা সহ প্রচুর জলযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর পূর্ব্বে ভারত-মহিলা পত্রিকার সম্পাদিকা শ্রীমতী সরযূবালা দত্ত ও স্বর্গীয় সবজজ হরিশচন্দ্র সেন মহাশয়ের বিধবা কন্যা শ্রীমতী নির্ম্মলা দাস এই দুইটি মহিলার চেষ্টায় ঢাকা সহরে একটি হিন্দু বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দুই বৎসরে আশ্রমবাসিনীর সংখ্যা ১৪টি হইয়াছে। আশা করি সহৃদয়া মহিলাগণ এই আশ্রমের হিতসাধনে যত্নবতী হইবেন।

বিলাত হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে গত ২৫শে আগষ্ট সোমবার কুচবিহারের দ্বিতীয় রাজকুমার কুমার জিতেন্দ্রনারায়ণের সহিত বরোদার মহারাজ গাইকোয়াড়ের একমাত্র কন্যা রাজকুমারী ইন্দিরা দেবীর বিবাহ লণ্ডন বাকিংহাম প্যালেস হোটেলে ব্রাহ্মমতে সম্পন্ন হইয়াছে। বিবাহের পূর্ব্বে রাজকুমারী ইন্দিরা দেবী বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছেন। আমরা এই বিবাহের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সুখী হইয়াছি। ভগবান্ বর কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করুন এবং উভয় রাজ্যের মঙ্গল বিধান করুন।

অবরোধ প্রথাটা স্বাভাবিক নয়। নারী-গণকে গৃহের প্রাচীরাভ্যন্তরে আবদ্ধ করিয়া রাখা, মুখে ঘোমটা দিয়া থাকিতে বাধ্য করা, নারীকে মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার হইতে বঞ্চিত করা অর্থাৎ চক্ষু থাকিতে দেখিতে না দেওয়া কাহারও অধিকার নাই। ভারতের উত্তর ভাগে, বিশেষ বঙ্গ বিহারে নারীগণের প্রতি এই অবিচার বহুকাল হইতে চলিতেছে বলিয়া নারীগণ এই অত্যাচারকেই স্বাভাবিক অবস্থা মনে করিয়া লইয়াছেন। এখন যদি বাঙ্গালা দেশের ভদ্রমহিলাগণকে ঘোমটা দেওয়া হইতে অব্যাহতি দেওয়া যায় তাঁহারা তাহা গ্রহণ করিতে চাহিবেন না। সম্প্রতি কলিকাতার স্বাস্থ্যের বিষয় আলোচনা করিতে যাইয়া স্বাস্থ্যবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ দেখাইয়াছেন যে কলিকাতাতে যক্ষ্মা রোগের আক্রমণ বৃদ্ধি হইতেছে। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, যে সকল স্ত্রীলোক ঘরের ভিতরে থাকেন, ঘোমটা দেন, তাঁহাদের মধ্যে যক্ষ্মা রোগ অধিক হয়। এ কথাটি সামান্য নয়, মহিলাগণ এবিষয় ভাবিয়া দেখিবেন যে ঘোমটা ও পরদা প্রথা কেবল মনের বিকাশের পক্ষে ভয়ানক অনিষ্টকর তাহা নয়, জীবনের পক্ষেও হানিকর।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৯শ ভাগ] আশ্বিন, ১৩২০। অক্টোবর, ১৯১৩। [৩য় সংখ্যা।

প্রার্থনা।

হে বিশ্বেশ্বর, হে জগতের স্রষ্টা ও পাতা মহাপ্রভু, সকল নরনারী তোমারই সৃষ্ট জীব, এবং যাহার যে ধন জন যাহা কিছু আছে সে সকলই তোমার দান ইহা যখন ধ্রুব সত্য, তখন আমরা তোমাকে পর ভাবিয়া তুমি আমাদের কোন অনিষ্ট করিতে পার এরূপ আশঙ্কা করি কেন? তোমার যে সকল কন্যাকে তুমি পুত্র কন্যা ধন মান লক্ষ্মী শ্রী দিয়াছ তাঁহারা তোমার দয়াতে সকল পাইয়াছেন ইহা স্বীকার করিয়া তোমার নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইবেন, তোমাকে দয়াময়ী মা জানিয়া ভাল বাসিবেন এবং তুমি যখন যাহা কর সকলই মঙ্গলের জন্য কর ইহাতে বিশ্বাস করিবেন ইহাইতো সমীচীন অবস্থা; কিন্তু সংসারে দেখিতে পাই তোমার যে সকল কন্যাকে অনেক দিয়াছ তাঁহারা সে সকলকে আপনার মনে করিয়া তোমাকে যেন পর ভাবেন এবং তুমি যেন অন্যায় করিয়া তাঁহাদের আপনার প্রিয় বস্তু কাড়িয়া লইবে এই সন্দেহ করেন। তোমার কন্যাগণের এই ভ্রান্তি ভয়ানক অশান্তি ও দুঃখের কারণ হইয়াছে। তাই তোমার চরণে প্রার্থনা করি, তোমার কন্যাগণকে প্রকৃত অবস্থা দেখিতেদেও। তুমিই যে সকল ধন জন দিয়াছ তাহা যেন সর্ব্বদা তাঁহাদের মনে থাকে, যেন সকলে তোমাকে মঙ্গলময় ঈশ্বর জানিয়া তোমার নিকট বিনীত ও কৃতজ্ঞ হইয়া তোমার সকল দান সম্ভোগ করেন এবং তুমি যখন যাহা কাড়িয়া লও তাহাও মঙ্গলের জন্যই কর ইহাতে যেন তোমার কন্যাগণের দৃঢ় বিশ্বাস থাকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

জন্মান্তরবাদ খণ্ডন।

এক এক দেশের এক একটা বিশেষত্ব থাকে, সেটা হয়ত দেশের জল বাতাসের গুণে বা অন্য কোন বিশেষ প্রভাবে ঘটিয়া থাকে। এক দেশের লোক সাহসী, কষ্টসহিষ্ণু, কঠোরহৃদয় হয়, অন্য দেশের লোক ভীতু, দুর্ব্বল-দেহ, কোমল-হৃদয়, অলসভাবাপন্ন হয়। যে সকল দেশের লোকের প্রকৃতির সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া জীবন ধারণ করিতে হয়, তাহারা মানুষের শক্তির অতীত বিরুদ্ধ ভাবকেও অন্তরের বলে ও বিশ্বাসে জয় করিতে চেষ্টা করে, আর যাহারা প্রকৃতির একান্ত আনুকূল্যে এখানে নানা সুবিধা সম্ভোগ করে তাহারা যখন ভয়ানক দুঃখ, দুরবস্থা ও মৃত্যু সম্মুখে দেখে তখন অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে। প্রকৃতি এত নিষ্ঠুর হইতে পারে তাহা ধারণ করিতে না পারিয়া অন্যত্র তাহার কারণ অনুসন্ধান করে। আমাদের দেশের কর্ম্মফল-বাদ বা জন্মান্তর-বাদ এই জাতীয় একটা কল্পনা, তাহার সন্দেহ নাই। যে কারণেই এই সংস্কারের উৎপত্তি হউক না, ইহা যে জাতীয় মনে স্থায়ী রাজ্য স্থাপন করিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অথচ পৃথিবীর অন্য সকল দেশের মহাজন, সুখী লোক, দুঃখী লোক, জ্ঞানী লোক, মূর্খ লোক কাহারও প্রায় জীবন-সমস্যা পূরণ করিতে জন্মান্তরের কর্ম্মফলের আশ্রয় লইতে হয় নাই। অপর এ দেশের অনেক মনস্বী লোকও স্বাধীন চিন্তা ও ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপে বিশ্বাসের বলে এই কর্ম্মফলকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করিয়া জীবনের সুখ, দুঃখ ও মৃত্যুর অন্ধকারের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছেন ও যাইতেছেন। আমরা এই ভাবকেই সকলের নিকট উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করি। এ বিষয়ে সর্ব্বদাই আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। জন্মান্তর-বাদ অগ্রাহ্য করিয়াও জীবন চলে, ইহা সকলে স্মরণ রাখেন ইহা প্রার্থনীয়। আমাদের দেশের নারীগণের মনে এই অদৃষ্টবাদ বড়ই প্রবল, আমরা মধ্যে মধ্যে ইহার অনিষ্টকারিতা দেখাইতে চেষ্টা করিয়া থাকি, কিন্তু দেখিতে পাই তাহাতে বিশেষ কোন ফল হয় না। তবে আশা করি যাহা সত্য, যাহা যুক্তিসঙ্গত, যাহা মনস্বিগণের অনুমোদিত তাহা পুনঃ পুনঃ মহিলাগণের সম্মুখে উপস্থিত করিলে কখনও বৃথা যাইবে না; অন্ততঃ যাঁহারা চিন্তাশীল ও যাঁহারা সংসারের সুখ দুঃখে একান্ত আবদ্ধচিত্ত নহেন তাঁহারা জন্মান্তরের কর্ম্মফলে বিশ্বাস যে মিথ্যা সংস্কার, কল্পনামাত্র তাহা অবশ্য বুঝিতে পারিবেন।

আমরা সকলেই জানি যে মনুষ্যসমাজ নামক যে মহা ব্যবস্থান, ইহাতে কেবল পুরুষ বা কেবল স্ত্রীলোক হইতে পারে না, কেবল শিশু বা কেবল বৃদ্ধ হইতে পারে না, সকলেই ধনী বা সকলেই নির্ধনী হইতে পারে না, সকলেই সুস্থ হইবে বা সকলেই রোগী হইবে তাহা হয় না, সকলেই শারীরিক পরিশ্রম করিবে অথবা সকলেই মানসিক পরিশ্রম করিবে তাহাতে সমাজ চলে না; কয়লার খনিতে নামিয়া কয়লা কাটিয়াও বহন করিয়া আনাও

যেমন প্রয়োজন, বিচারাসনে বসিয়াও বিচার করাও তেমনই প্রয়োজন। যদি এই ভাবে আমরা স্বীকার করি যে, সমাজ ঠিক এক বয়সের ও এক ভাবের লোক লইয়া রচনা হইতে পারে না, অথচ এই বিচিত্রতা কেবল কার্য্যগত ভিন্নতা নয়, ইহাতে জ্ঞানোন্নতি, সুখ স্বচ্ছন্দতার অত্যন্ত পার্থক্য রহিয়াছে। যিনি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সমাজের সেবা করিবেন তিনি মনের উন্নতি ও শরীরের আরাম যত পাইবেন, যিনি নিম্নস্থানে অবস্থিতি করিয়া কার্য্য করিবেন তাঁহার পক্ষে সে সকল কখনও সম্ভব নহে। যদি এই সকল উচ্চনীচ অবস্থাকে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল বলা হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে ইহা মানুষের পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের দণ্ড বা পুরস্কার নহে, ইহা বিধাতার অভিপ্রায়; কারণ সমাজ যদি বিধাতার ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে উচ্চ নীচ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হওয়াও তাঁহারই ব্যবস্থা। এরূপ বিভিন্ন অবস্থাপন্ন হওয়া যদি কোন পূর্ব্বজন্মের ফল না হয়, তাহা হইলে অন্য যে সকল পার্থক্য আমরা দেখিতে পাই তাহার মীমাংসা করিতেও অদৃষ্ট বা কর্ম্মফল কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই। অল্প বয়সে মৃত্যুকেও অনেক সময় অদৃষ্টের ফল মনে করা হয়। তাহার প্রধান যুক্তি এই যে, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলে পৃথিবী যে সকল উন্নতি ও সুখ দেয় তাহা লাভ না করিয়া পৃথিবী ত্যাগ করা জীবনের অসার্থকতা, অতএব তাহা একটা দণ্ড মনে করিতে হয়। যাঁহারা মনে করেন যে, মনুষ্য এখানে যে উন্নতি লাভ করে ও এখানে যে সুখ পায় তাহাই আত্মার শেষ উন্নতি ও একমাত্র সুখ, তাঁহারা এরূপ কথা বলিতে পারেন; কিন্তু যাঁহারা আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করেন, যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে পরমেশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়া ইহাকে আপনাতে রক্ষা করিতেছেন এবং ইহলোকে যেমন তিনি জড় ও জীবের বাহ্যজগৎ এবং মনুষ্যগণের সহিত আমাদিগকে রক্ষা করিয়া আমাদিগের উন্নতিবিধান করিতেছেন, তেমনি পরলোকে অর্থাৎ অন্য অবস্থায় রক্ষা করিয়া আমাদিগের উন্নতি-বিধান করিতে পারিবেন না, এ কথা কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে?

জনসমাজে বিভিন্ন অবস্থার লোক দেখা সকলেরই অভ্যাস আছে, তাহা তেমন মনে লাগে না; কিন্তু এই বিচিত্র অবস্থা যখন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর প্রভেদ মনে হয়, যখন সাধারণ সীমার অতীত হয়, তখনই জন্মান্তর-বাদের আশ্রয় বিশেষ-ভাবে গ্রহণ করা হয়। যেমন একজন সাধুচরিত্র ধনীর গৃহে সুস্থ ও সবল দেহ লইয়া জন্ম লাভ করিল, অপর একজন হীনচরিত্র দরিদ্রের গৃহে মহা রোগ লইয়া জন্মিল, এরূপ ভয়ানক প্রভেদ অবশ্য পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে হইয়াছে ইহাই এ দেশের সাধারণ লোকের বিশ্বাস। অথচ অনেক সময়ে দেখা যায় যে ধনী সৎ-লোকের গৃহের সন্তানগণও ক্রমে দরিদ্র ও অসৎ হইয়া পড়ে, এবং সুস্থ শরীর রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে; অপর দিকে জন্মে

যে দরিদ্র বা রুগ্ন বা অন্যরূপ হীন অবস্থাপন্ন হয়, জীবনে সে অনেক উন্নত, সুস্থ ও সুখী হয়। বাস্তবপক্ষে আমরা আপাত দৃষ্টিতে যাহাদিগকে ধনী জ্ঞানী বা সুখী মনে করি তাহাদিগের অভ্যন্তরে অনেক সময়ে তাহার বিপরীত অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। যে সুখ দুঃখের আধিক্য দেখিয়া মানুষ পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল স্থির করে তাহাতে তাহাদের মনের দুর্ব্বলতাই প্রকাশ পায়। অদৃষ্টের নাম করিয়া অলস হইয়া জীবনযাপন করা এ দেশের প্রাণহীনতার চিহ্ন।

সৃষ্টিকর্ত্তার বিচার অলঙ্ঘ্য, মানুষ যে কাজ করে তাহাকে তাহার ফল অবশ্য ভোগ করিতে হইবে, এই ন্যায়ের বিধির কাল্পনিক প্রসারেই কর্ম্মফলে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু এস্থলে বিচারের প্রধান বিষয়টিই অনুপস্থিত। মানুষ কর্ত্তব্যজ্ঞানবান্, চৈতন্যময় ব্যক্তি; তাহার চৈতন্যের বা জ্ঞানের অংশ ত্যাগ করিলে আর তাহাকে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বজন্মে যদি কেহ কোন মন্দ কার্য্য করিয়া থাকে, তাহার জন্য দণ্ড এজন্মে দেওয়া হইলে তাহাকে দেখাইয়া দিতে হইবে যে, তোমার এই কার্য্যের জন্য এই দণ্ড দেওয়া হইল; যখন তাহার পূর্ব্বজন্মের কোন স্মৃতি নাই তখন তাহাকে দণ্ড দেওয়ার কোন অর্থ নাই। যদি মনুষ্য আপনার অন্তরের ন্যায়ান্যায় জ্ঞানদ্বারা দণ্ডিত না হয়, তাহা হইলে তাহার দণ্ড ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না। এইজন্য অজানিত অপরাধের জন্য দণ্ড ন্যায়বান্ বিচারপতির অযোগ্য ও ন্যায়বুদ্ধিযুক্ত অপরাধীর প্রতি অযোগ্য। পূর্ব্বজন্মের পাপ বা দুষ্কার্য্যের দণ্ড ইহজন্মে হইতে পারে না।

বর্ত্তমান সময়ে সমাজের সকল শ্রেণীর লোক যেরূপ উন্নতি ও সুখ সুবিধা লাভ করিতে ব্যস্ত হইয়াছে, এবং ধর্ম্ম ও উচ্চ জ্ঞান মিলিত হইয়া মানুষের রোগ, দারিদ্র্য, অনীতি, অজ্ঞানতা ইত্যাদি দূর করিতে যেরূপ মহা যত্ন করিতেছে তাহাতে পৃথিবীর অনেক প্রকারের দুঃখ দূর হইতেছে; এবং আশা হয় দিন দিন মানুষের যত্নে ও ঈশ্বরের প্রসাদে পৃথিবী হইতে অবিচার, অত্যাচার, দুরাচার, দুঃখ, অকাল মৃত্যু প্রভৃতি কমিয়া যাইবে। তখনও উচ্চপদস্থিত ও নিম্নপদস্থিত ব্যক্তি থাকিবে, তখনও রোগ অকালমৃত্যু পাপাচার একেবারে চলিয়া যাইবে আমরা বলিতে পারি না; কিন্তু একথা সত্য যে আমাদের দেশের লোক অদৃষ্টের নাম করিয়া নিশ্চেষ্ট না হইয়া যদি সকল শ্রেষ্ঠজাতির সহিত মিলিত হইয়া সুনীতি, সত্যধর্ম্ম ও উচ্চজ্ঞানাশ্রয়ে সকল প্রকারের রোগ, দুঃখ, পাপ দূর করিতে যত্নবান্ হন তাহা হইলে তাঁহাদের মঙ্গল হয়, জগতেরও মঙ্গল হয়।

জন্মান্তরবাদের এই এক মহৎ দোষ যে তাহার প্রতীকার হইতে পারে না। পূর্ব্বজন্মে দুষ্কার্য্য করা হইয়াছে এজন্মে তাহার দণ্ডলাভ করিতেই হইবে, অতএব তাহার কোন উপায় করা অসম্ভব। এরূপ বিশ্বাসে মানুষের মনে যে এক অসহায়তার ভাব উপস্থিত হয় তাহাতে অবসন্ন হইয়া পড়া ভিন্ন অন্য ভাব আসিতে পারে না।

ম্যালেরিয়ার স্থানে যাইয়া সপরিবারে বাস করিলাম, পুত্র কন্যাগণ ভুগিতে ভুগিতে একে একে মরিতে লাগিল। যদি বিশ্বাস করি যে আমার অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইতেছে, তাহা হইলে স্থানত্যাগ করিবার কথা আসে না; কিন্তু যদি দেখিতে পাই যে ম্যালেরিয়ার বিষ শরীরে প্রবেশ করিয়া এরূপ রোগ ও মৃত্যু উপস্থিত করিতেছে, তাহা হইলে একজনের পীড়া বা মৃত্যু হইলেই ঐ স্থান হইতে পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইতে পারি। প্রকৃতপক্ষে নিষ্ঠাবান্ অদৃষ্টবাদী কেহ হইতে পারে না। যাহা ইচ্ছা তাহা লাভ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে, যখন ইচ্ছার বিরুদ্ধ ঘটনা হয় তখনই অদৃষ্ট দেখিতে পায়। অথচ যখন ইচ্ছা অনুসারে কর্ম্ম হয়, যখন শুভঘটনা ঘটে তখন কেহ অদৃষ্টের নাম করে না। কেবল যখন কাহারও উন্নতি দর্শন করিয়া মনে হিংসা হয়, তখন দুঃখের সহিত বলে লোকটার কপাল ভাল তাহাতেই তাহার উন্নতি বা সুখ।

আমরা বলি এসব কল্পনার পথে যাইবার কোন প্রয়োজন নাই। মঙ্গলময় ঈশ্বর সকলকেই জন্ম দিয়াছেন। তিনি যাহাকে যে অবস্থায় রাখিয়াছেন সেই অবস্থাতেই তাহার উন্নতির পথ খুলিয়া রাখিয়াছেন। ঈশ্বর মঙ্গলময়, এই বিশ্বাসে দৃঢ় হইয়া উন্নতির পথে চলিতে হইবে, পৃথিবীতে যে উন্নতি বা সুখ হইল না তাহা তিনি মৃত্যুর পর দান করিবেন।

মাতা ও সন্তানশিক্ষা।

ভক্ত রামপ্রসাদ একদা একটী গানে গাহিয়াছিলেন—"শুধু প্রসব ক'রলে হয় না মাতা।" তিনি কি ভাবে এই গান গাহিয়াছিলেন সে বিষয়ে সূক্ষ্ম অনুসন্ধান অনাবশ্যক; তবে এই সঙ্গীতে সন্তান প্রতিপালন বিষয়ে জননীর গুরুতর দায়িত্বের আভাস যে স্পষ্টই সূচিত হইয়াছে সে বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। জনয়িত্রী হইলেই প্রকৃতপক্ষে জননী হওয়া যায় না, যিনি সন্তানকে পূর্ণাঙ্গ মানব-জীবন লাভের অধিকারী হইতে কায়মনোবাক্যে সাহায্য করিয়া থাকেন কেবল তিনিই "স্বর্গাদপি গরীয়সী" জননীপদবাচ্য।

আমাদের দেশের জননীদিগের হৃদয়ে এই গুরুতর দায়িত্ববোধ সম্পূর্ণরূপে জাগ্রৎ হইয়াছে কি? এই প্রশ্ন করিলে হয়তো অনেক বিদ্যাবতী জননী লেখকের বিরুদ্ধে মানহানির দাবিতে নালিশ রুজু করিতে উদ্যত হইবেন। কিন্তু আমি জননী সম্প্রদায়ের কোনরূপে মানের লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধ লিখিতে অগ্রসর হই নাই। সত্যই আমি অতি ব্যাকুলভাবে সরল অন্তঃকরণে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি, কারণ শিক্ষকতা কার্য্যে কিছুকাল নিযুক্ত থাকিয়া আমি অভিজ্ঞতা হইতে এই দৃঢ় ধারণায় উপনীত হইয়াছি যে, জননীদিগের মধ্যে এই দায়িত্ববোধ অতি উজ্জ্বলভাবে জাগ্রৎ না হইলে সমাজের ও দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল এখনও সুদূর পরাহত। শিশুরাই দেশের

ভাবী ভরসাস্থল, কিন্তু গৃহ এবং জনক জননী সুযোগ্য না হইলে সন্তানগণ যে কখনই দেশের সুযোগ্য অধিবাসী হইতে পারে না, একথা বুঝিবার জন্য তর্ক শাস্ত্রের যুক্তির আশ্রয় লইতে হয় না; নিরপেক্ষ ভাবে যিনিই এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিবেন তিনিই সংসারের নিত্য ঘটনাবলীতে এই সত্যের অজস্র ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন।

অনেকেই বলিবেন এটা অতি মোটা কথা এবং ইহা সকলেই জানেন। কিন্তু আমি বলি "জানা" এক কথা এবং হৃদয়ে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা আর এক কথা। "ভগবান্ সত্য"—একথা বোধ হয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটী সুকুমার শিশুও জানে: কিন্তু মোস্‌লেম ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদ সাহেব যে ভাবে এই সত্যের উপলব্ধি করিয়াছিলেন সেভাবে আর কত জন উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। তিনি উপাস্য দেবতার সম্মুখে দাঁড়াইবার পূর্ব্বে উত্তমরূপে সাজসজ্জা করিতেন, কারণ তাঁহাকে বিশ্বভুবনপতি মহারাজের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে। তাহার পর প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রভুর নাম করিবার সময় সেই অকপট সেবকের সর্ব্বাঙ্গ স্বেদসিক্ত হইয়া উঠিত। ইহাকেই বলে ভগবানের সত্যে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি। আমি জিজ্ঞাসা করি শিশুপালনের গুরুত্ব সম্বন্ধে জননীকুলের হৃদয়ে এই ভাবের উপলব্ধি জন্মিয়াছে কি? জ্ঞান মানুষকে মুক্তি দিতে পারে না, বিশ্বাস তাহা দিতে পারে। সেই দৃঢ়বিশ্বাস লাভ হইয়াছে কি?

শুধু বলিলে চলিবে না যে এখন আমরা জ্ঞানে ও বিদ্যায় সমুন্নত। জ্ঞানের উন্নতি বরণীয় বস্তু—সন্দেহ কি? কিন্তু কর্ম্মসম্পর্কে বিরহিত জ্ঞান মানুষকে অধিক দূর অগ্রসর করিতে পারে না। এ যুগের জননীগণ বলিবেন যে তাঁহাদের পূর্ব্বযুগের মাতৃকুলে শিশুশিক্ষার দায়িত্ব-বোধ সজাগ ছিল না, কারণ তাঁহারা বিদ্যায় ও জ্ঞানে বঞ্চিত ছিলেন। তখন তাঁহারা গৃহের অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত ছিলেন, রন্ধনশালা তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র ছিল এবং পরিবারের পুরুষ-বর্গের শারীরিক অভাব মোচনই তাঁহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। তাঁহারা শিক্ষার আলোক প্রাপ্ত হন নাই, সুতরাং সন্তান শিক্ষার মহিমা তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন না। তাঁহারা সন্তানদের খাওয়াইতেন, পরাইতেন, গৃহস্থলীর কার্য্যে সহায় করিয়া লইতেন, এবং সন্তান রোগাক্রান্ত হইলে মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা করিতেন অথবা দেবতার দুয়ারে মানসিক করিয়া মাথা খুঁড়িতেন। শিক্ষার সম্বন্ধে—তাঁহারা শিশুদিগকে পাঠশালায় প্রেরণ করিতেন; সেই পাঠশালে শিশুরা শমনাবতার গুরুমহাশয় কর্ত্তৃক নির্দ্দয়ভাবে প্রহৃত হইলে সযত্নে উত্তপ্ত চুণ ও হরিদ্রার ব্যবস্থা করিতেন, পূজা পার্ব্বণে গৃহজাত লাউ কুমড়া বা আম্র শশার উপহারে সন্তানের ভাগ্যবিধাতা গুরুমহাশয়ের তুষ্টি-সাধনে প্রযত্নপর হইতেন। এতদ্ভিন্ন শিশুদিগের শিক্ষা সম্বন্ধীয় অন্য কোন লক্ষ্য তাঁহাদের চিন্তার বিষয়ীভূত ছিল না।

কিন্তু এক্ষণে সময়ের পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, সুসভ্য ও সুশিক্ষিত ইংরাজের শাসনাধীনে দেশে জ্ঞানের আলোক সমুজ্জ্বল তপন কিরণের ন্যায় সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছে এবং গৃহের রমণীকুলও সে শিক্ষালোকের প্রসাদ হইতে বঞ্চিত হন নাই। এখন স্ত্রীলোকেরা উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া উচ্চউপাধি লাভ করিতেছেন, এখন তাঁহারা আর প্রাচীন যুগের রমণীগণের ন্যায় অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন নহেন।

আমরাও এ কথা স্বীকার করিতেছি। দেশে নারীজাতির মধ্যে শিক্ষা দিন দিন বিস্তৃত হইতে দেখিয়া আমরা পরম সুখী। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আর সহস্রবিধ কর্ত্তব্যের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য—দেশের স্ত্রীজাতিকে শিক্ষিত করিয়া তোলা। যতদিন স্ত্রীজাতি শিক্ষায় উন্নত না হইতেছেন তত দিন পর্য্যন্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উন্নত জ্ঞান ও আদর্শ দেশের মঙ্গল সাধন বিষয়ে সম্পুর্ণরূপে ব্যর্থ হইবেই হইবে। দেহের অর্দ্ধেক অংশ অসুস্থ ও বিকৃত অবস্থায় থাকিলে দেহের কল্যাণ অসম্ভব। শিক্ষিত যুবকগণ উচ্চ নীতি ও দর্শনের আলোকে উচ্চ আদর্শের আভাস লাভ করিয়া যখন মুক্তপক্ষে ঊর্দ্ধ আকাশে উড়িবার চেষ্টা করিবেন, তখন তাঁহাদের অশিক্ষিতা সঙ্গিনীগণ গুরুভার প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় তাঁহাদের ঊর্দ্ধপ্রবৃত্তি প্রতিরোধ সাধন করিয়া তাঁহাদিগকে মৃত্তিকার দিকে টানিয়া রাখিবেই রাখিবে। দ্রুতগামী অশ্বের সহিত মন্থরগতি মেষকে এক 'হালে' জুড়িয়া যেমন কোন ব্যক্তি কৃষিকার্য্যের সুফল প্রত্যাশা করিতে পারে না, তেমনি উচ্চ জ্ঞানালোক প্রাপ্ত পুরুষের সহিত অজ্ঞানান্ধকার ও শোচনীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন নারীর সম্মিলনে দেশের মঙ্গল প্রত্যাশা করা বাতুলতা মাত্র।

কিন্তু শিক্ষা বলিতে কি বুঝায় ইহাই সর্ব্বপ্রথমে জানিবার ও আলোচনা করিবার বিষয়। এ বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। পিতামাতাকে যদি জিজ্ঞাসা করি সন্তানের শিক্ষা অর্থে তাঁহারা কি বুঝেন—তবে মুখে তাঁহারা যাহাই বলুন না কেন—কার্য্যতঃ তাঁহারা জানাইয়া থাকেন যে, শিক্ষার অর্থ জীবিকার্জ্জনের জন্য প্রস্তুতি। সন্তানগণ উপযুক্তরূপে জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া সংসারে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করিবেন—ইহাই শিক্ষাদানের লক্ষ্য। যদি বিদ্যালয়ের শিক্ষককে এই প্রশ্ন করা যায় তবে তাঁহারা বলিবেন—জ্ঞান উপার্জ্জনই শিক্ষার উদ্দেশ্য। শিক্ষা মানুষকে উত্তরোত্তর জ্ঞানের সোপানে অগ্রসর করিয়া দিবে। কেহ কেহ হয়তো ইহা অপেক্ষাও শিক্ষার সঙ্কীর্ণ অর্থ গ্রহণ করিয়া বলিবেন—শিক্ষার অর্থ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া। পরীক্ষাসিন্ধু মন্থন করিয়া উপাধিরত্নের সঞ্চয়ই ইঁহাদের মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য। এইরূপে নানা জনে শিক্ষাকে নানা অর্থে গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু শিক্ষাজগতের যাবতীয় চিন্তাশীল ব্যক্তি এক্ষণে এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন যে, উপরি উল্লিখিত উদ্দেশ্য-

গুলিতে শিক্ষার পূর্ণ অর্থ প্রকাশিত নহে। এ সকলে আংশিক সত্য নিহিত আছে—কিন্তু উহাদের মধ্যে পূর্ণ সত্য প্রকাশিত হয় নাই। জ্ঞান উপার্জ্জন বা জীবিকার্জ্জনের প্রস্তুতি—শিক্ষার একাংশ মাত্র—কিন্তু ইহাকেই শিক্ষা বলা চলে না। শিক্ষার অর্থ আরো বিস্তৃত—শিক্ষার অর্থ মানবের চরিত্রগঠন। এস্থলে একটি কথা বলা আবশ্যক—চরিত্র বলিতে মানুষ পূর্ব্বে কেবল নৈতিক চরিত্রই বুঝিত। যদি কোন লোক চুরি না করেন, মিথ্যা না বলেন, অপরের প্রতি সদয় ব্যবহার করেন এক কথায় যদি তিনি নীতির নিয়মগুলি জীবনে মানিয়া চলেন—তবেই তিনি চরিত্রবান্ ব্যক্তি—তখন লোকের এইরূপ ধারণা ছিল। তিনি সুস্থকায় কি না, তিনি সমাজের দশজনের সহিত উপযুক্ত সম্বন্ধ বজায় রাখিয়া চলিতে জানেন কি না, পরিবারের সকল লোকের প্রতি তাঁহার ব্যবহার উপযুক্তরূপ কি না—বেশ ভূষা বিষয়ে তিনি উপযুক্তরূপ সাবধান কি না—তাঁহার হাস্যের ভঙ্গি ভদ্রোচিত কি না—তাঁহার বাক্য মিষ্ট কি না—ইত্যাদি বিষয় তখন চরিত্রের সীমাভুক্ত ছিল না। কিন্তু এখন চরিত্রকে আর পূর্ব্বের সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করা হয় না। এখন চরিত্রের অর্থ—মানবের যাবতীয় আচরণ। চরিত্র এখন জীবনের ছয় আনাও নহে—দশ আনাও নহে—কিন্তু ষোল আনা। চরিত্রের এই অর্থ গ্রহণ করিয়া আমরা বলিতে পারি শিক্ষার প্রকৃত অর্থ—চরিত্র গঠন।

যদি ইহাই শিক্ষা হয় তবে জিজ্ঞাস্য এই—আমাদের মধ্যে কয়জন এই শিক্ষা লাভ করিয়াছে? আমরা উপাধিধারী গ্রাজুয়েট হইতেছি সত্য—কিন্তু আমরা কি চরিত্রবান্ হইয়াছি। জ্ঞান উপার্জ্জন এক কথা, আর জ্ঞানকে কার্য্যে পরিণত করিয়া জ্ঞানলব্ধ সত্যের আদর্শে জীবনকে গঠিত করিয়া তোলা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা।

আমাদের দেশের রমণীগণ এক্ষণে জ্ঞানলাভ করিতেছেন—সুখের কথা। বিধাতার আশীর্ব্বাদে তাঁহারা আরো জ্ঞানমার্গে দিন দিন অগ্রসর হউন—ইহাই দেশের প্রার্থনা। জ্ঞান আলোকস্বরূপ—এ আলোক না থাকিলে গন্তব্য পথ দেখিয়া লওয়া সুকঠিন। কিন্তু আলোক পথই দেখাইতে পারে—আলোক মানুষকে পথে চালাইতে পারে না। আর পথ ধরিয়া না চলিলে যে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায় না—আশা করি এ কথা বুঝাইতে কাহাকেও কোন আয়াস লইতে হইবে না। তবেই কথা দাঁড়াইতেছে এই—এখনকার স্ত্রীলোকেরা তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তিনীগণের অপেক্ষা জ্ঞানে সমুন্নত হইলেও, তাঁহারা কি তাঁহাদের উন্নত জ্ঞানকে কার্য্যক্ষেত্রে যথাযথভাবে প্রয়োগ করিতেছেন?

শিশুশিক্ষার কথাই আমাদের আলোচ্য, ইহা ধরিয়াই আলোচনা করা যাউক। এখন মাতৃগণ হয়তো সন্তানের উচ্চশিক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। তাঁহারা সন্তানদিগকে যথারীতি স্কুলে প্রেরণ করিয়া থাকেন, অবস্থায় কুলাইলে তাঁহারা তাহাদের জন্য গৃহেও উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। শিক্ষাদান সম্বন্ধে যে

বিদ্যালয়ের খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁহারা আপনাদের আরাম ও সুখকে খণ্ডিত করিয়াও সন্তানবর্গকে সেই স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। শিশুদিগের স্বাস্থ্য ও বেশ-ভূষার প্রতিও তাঁহারা তীক্ষ্নদৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। আপনাদের আরাম উপেক্ষা করিয়া শিশুদিগের সুখ শান্তির জন্য বিধি-মতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। এ সকলই দেশের পক্ষে শুভ-লক্ষণ। ইহা অপেক্ষাও আনন্দের বিষয় এই যে পিতৃমাতৃকুল সন্তানদের নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষার জন্যও ব্যাকুল হইয়াছেন। হিন্দু ও মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ইহার প্রমাণ।

এখন আমাদের প্রশ্ন এই—সন্তান-দিগের শারীরিক আরাম ও পরিচ্ছদের পারিপাট্য বিষয়ে মনোযোগ অর্পণ করিয়া জননীগণ কি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন যে তাঁহারা তাঁহাদের সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন? অবশ্য এখন কেহই একথা স্বীকার করিবেন না—সকলেই অন্ততঃ মুখে বলিবেন—শরীর অপেক্ষা মন উচ্চ, সুতরাং শরীরের শোভা সম্পাদন করা অপেক্ষা মনের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করাই উচ্চতর কর্ত্তব্য। কিন্তু হায়! নীতি ও ধর্ম্মশাস্ত্রের সহস্র তত্ত্বকথা সত্ত্বেও মানবের মন বাহিরের সৌন্দর্য্যের জন্যই অধিকতর ব্যাকুল ও তাহাতেই অধিক মুগ্ধ। বিবাহ ব্যাপারে এই কথার উজ্জ্বল প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার সময় কয়জন পিতামাতা তাঁহাদের ভাবী পুত্রবধূর মন ও হৃদয়ের সৌন্দর্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। পাত্রী যদি সুন্দরী হন, তাঁহার যদি সঙ্গীত-বিদ্যা জানা থাকে, সমাজে মিশিবার উপযুক্তরূপ আদব কায়দায় যদি তিনি নিপুণা হন, যদি তিনি পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে পারেন—তবেই তিনি যোগ্যা পাত্রী বলিয়া বিবেচিত হন। কিন্তু যে পাত্রীকে আমরা বহুকাল ধরিয়া জানি, যাঁহার মন উদার, হৃদয় কোমল, বিনয় সরলতা গুণ যাঁহাতে প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান—এমন পাত্রীও যদি রূপবতী না হন, অথবা লোক-মনোরঞ্জিনী বিদ্যায় নিপুণা না হন—তবে তিনি আমাদের নিকট যোগ্যা বলিয়া বিবেচিতা হন না। কারণ কি? কারণ মানুষের বাহ্যসৌন্দর্য্যপ্রিয়তা। সঙ্গীত-বিদ্যা চিত্রবিদ্যা প্রভৃতিকেও আমি বাহ্য ভূষা বলিয়া গ্রহণ করিলাম—কারণ যেখানে হৃদয় কোমল নহে, মন উদার ও সহানু-ভূতিপূর্ণ নহে—সেখানে চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা বা সঙ্গীত-নৈপুণ্য আমাদের কি উপকারে আসিতে পারে? সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এই আধুনিক শিক্ষিত যুগেও নরনারী বাহিরের সৌন্দর্য্যকেই পূজা অর্পণ করিতে-ছেন। পূর্ব্বে অশিক্ষিত সমাজে নরনারী সিন্দূররাগে দেহ রঞ্জিত করিয়া সৌন্দর্য্য-সম্পাদনের চেষ্টা করিত, অধুনা বডিসে ও লেসে, ছড়িতে ও চষমায় সেই সিন্দূরের কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। উহা শারীরিক সৌন্দর্য্যের আদর্শ ও প্রকার ভেদ মাত্র, কিন্তু মানুষের মন এখনও উহার মোহ হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই।

যাঁহারা সন্তানগণের শারীরিক সৌন্দর্য্যে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া তাহাদের মানসিক

ও অধ্যাত্ম উন্নতির জন্য ব্যাকুল, তাঁহাদের প্রতি আমার প্রশ্ন এই—তাঁহারা কিরূপে সন্তানের এরূপ উন্নতি সাধন করিবেন? শিশুদিগকে নীতি ও ধর্ম্মে উন্নত করিতে হইলে কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে? তাঁহারা কি মনে করেন স্কুলে ও কলেজে নীতিশিক্ষার উপায় বিধান করিয়া সেখানে ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ দান করিলেই শিশুগণ ও যুবকগণ ধর্ম্মে উন্নত হইয়া উঠিবেন? তাঁহারা কি মনে করেন কেবল উপদেশে ও শাস্ত্রালোচনায় ধর্ম্ম উপার্জ্জিত হইবে? অথবা সন্তানদিগকে পারিবারিক উপাসনায় ও সামাজিক ধর্ম্মের ব্যাপারে যোগদান করাইতে পারিলেই তাহারা ধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠিবে? যাঁহারা এ বিষয়ে অনুধাবন করিয়া দেখিবেন, যাঁহারা চতুর্দ্দিকের ঘটনাবলী ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিবেন তাঁহারাই বলিবেন, কার্য্য ব্যতীত জ্ঞানের কোনই সার্থকতা নাই। ব্যাকরণের সহস্র সূত্র কণ্ঠস্থ করিয়া যদি রচনার ক্ষেত্রে উহাদের প্রয়োগ করা না হয় তবে ব্যাকরণ জ্ঞান সর্ব্বৈব বৃথা। সন্তরণের নিয়ম জানিলেই কেহ সন্তরণপটু হইতে পারে না, অঙ্কণের বিধি জানিলেই কেহ নিপুণ চিত্রকর হইতে পারে না। তেমনি ইহাও সম্পূর্ণ সত্য যে ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ জানিলেই কেহ ধার্ম্মিক হয় না। ধর্ম্ম সাধনের বস্তু—উপদেশকে কার্য্যে নিযুক্ত করিতে না পারিলে চরিত্রগঠন অসম্ভব। কার্য্যসাধন করিয়াই মানুষ কার্য্যপটু হয়, ধর্ম্মসাধন করিয়াই মানুষ ধর্ম্মলাভ করে। ইহা শুধু প্রতিজ্ঞার কথা নহে—শুভ-ইচ্ছার কথা নহে—কিন্তু কার্য্যের কথা। সাঁতার সম্বন্ধে রাশি রাশি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া সাঁতার শেখা যায় না, সাঁতার কাটিয়াই সাঁতার শিখিতে হয়।

যদি এই উক্তিগুলির যাথার্থ্য সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ না থাকে তবে পিতামাতা ও অভিভাবকগণকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে শিশুদিগকে নীতি ও ধর্ম্মপরায়ণ করিতে হইলে কেবল তাঁহারা ধর্ম্মোপদেশ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন কি না। উপদেশ অনেক হইয়া গিয়াছে, স্কুলপাঠ্য এমন একখানি গ্রন্থও নাই যাহাতে নীতির উপদেশ বহুল পরিমাণে পরিদৃষ্ট না হয়। প্রকৃত কথা এই—উপযুক্ত উপকরণ থাকিলেই কার্য্যসম্পন্ন হয় না, উপকরণের ব্যবহার না হইলে সকলই বিফল। ধর্ম্মশিক্ষাতেও উপদেশ অপেক্ষা সদ্দৃষ্টান্ত অনুসরণ ও সদভ্যাস গঠনই অধিক প্রয়োজনীয়। ইহা ব্যতীত আরও একটী কথা আছে, সেটি এই—কেহ স্বভাবকে একেবারে অতিক্রম করিয়া চলিতে পারে না। স্বভাবের কথঞ্চিৎ সংস্কার সাধন সম্ভবপর হইলেও স্বভাবের আমূল পরিবর্ত্তন অসাধ্য। এই সত্য উপলব্ধি করিয়াই কবি বলিয়াছেন—"অতীত্য হি গুণান্ সর্ব্বান্ স্বভাবো মূর্দ্ধ্নি বর্ত্ততে।" সকল গুণকে অতিক্রম করিয়া স্বভাবই মস্তকে বিদ্যমান থাকে (প্রবল হয়)।

আমরা আগামীবারে এই বিষয়ে আরও দুই চারি কথা বলিব।

শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার।

আকাঙ্ক্ষা।

মহান্ বিশ্বের মাঝে কতটুকু আমি
তোমারে লভিতে চাই হে জগৎ স্বামী ?
বিশ্বময় পরিপূর্ণ করিয়া রেখেছ
তোমার অনন্ত সত্তা ; অনন্ত জ্ঞানের
অতূল জলধি তলে মগ্ন ধরাতল ;
মগ্ন চরাচর বিশ্ব স্থাবর জঙ্গম।
ক্ষুদ্র তৃণকণা আমি পথিপার্শ্বে থাকি,
ক্ষুদ্র সে অস্তিত্ব মোর ধূলিগাত্রে ঢাকি,
বিলীন করিতে চাই তোমারি সত্তায়,
তোমারে লভিতে চাই পূর্ণ মাত্রায় !
আপন অন্তর মাঝে ওহে স্বপ্রকাশ,
সংসার সমুদ্র তীরে ক্ষুদ্র বালুকণা—
কোথায় যাইব উড়ি প্রতিকূলবায়,
অথবা ডুবিব গিয়া গভীর অতলে,
নাহিক ঠিকানা তার লক্ষ্যহীন প্রাণ।
ক্ষম মোর স্পর্দ্ধা প্রভু, অকিঞ্চিৎকর
ক্ষুদ্র জীবে দয়া কর হে রাজেন্দ্ররাজ,
তোমারে লভিতে গিয়া নিরাশ অন্তরে
যেন না ফিরিতে হয় সংসার মন্দিরে।
ক্ষুদ্র দেবশিশু ধ্রুব শৈশবের কোলে,
অনায়াসে লভেছিল তপস্যার বলে,
তোমার অমৃত ক্রোড় ওহে দয়াময়।
ছোট বড় সবাতরে সকল সময়
মুক্ত তব প্রেমবাহু অনন্ত নির্ভয়।
দুঃখ শোক বিভীষিকা বিপদের মাঝে
প্রেমময় তব মূর্ত্তি চিরানন্দময়।
মলিন হৃদয় মম ধুইয়া মুছিয়া
পাতিয়া রেখেছি দেব কমল আসন,
বারেকের তরে আসি যুগল চরণ
রাখিয়া সার্থক ক'রো তুচ্ছ এ জীবন॥

দানাপুর, ক্যান্টনমেণ্ট। শ্রীইন্দুপ্রভা দেবী।

ব্রাহ্মসমাজ ও নারীশিক্ষা।

নারীর উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কাহারও মতদ্বৈধতা এখনও নাই, কখনও ছিল না। উপযুক্ত শিক্ষার সংজ্ঞা সম্বন্ধে পার্থক্য আছে এবং চিরকাল থাকিবে এবং এ পার্থক্য পাশ্চাত্য দেশেও বর্ত্তমান। যখন এ দেশের মেয়েদের সম্বন্ধে কিরূপ শিক্ষা দান করা যাইবে এ বিষয় লইয়া গবর্ণমেণ্ট এ দেশবাসীদের অভিমত সংগ্রহ করেন, তখন স্বর্গীয় এ, এম্ বসু ও রজনীনাথ রায়, এবং শ্রীযুক্ত ডাক্তার পি, কে, রায়, প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারিগণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী অধ্যয়ন প্রবর্ত্তন এবং সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষোত্তীর্ণ মেয়েদিগকে উপাধিদান পক্ষে মত দান করেন এবং যাহাতে গবর্ণমেণ্ট সেই মত গ্রহণ করেন তৎপক্ষে বিধিমত চেষ্টা যত্ন করেন। তাহার ফলে প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয়ানুযায়ী শিক্ষা মেয়েদের জন্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ডাক্তার পি, কে, রায়ের প্রথমা কন্যা এবং স্বর্গীয় মেঃ রজনীনাথ রায়ের প্রথমা কন্যা প্রেসিডেন্সি কালেজে পড়িতে আরম্ভ করেন। অল্পদিন মধ্যেই উক্ত দুই মহাত্মা বুঝিতে পারিলেন যে কন্যা দ্বয়ের উপর প্রচলিত প্রণালীর উচ্চ শিক্ষাতে অতিরিক্ত পরিশ্রম পড়িয়াছে, এবং তাহাতে তাঁহাদের স্বাস্থ্য রক্ষা পাওয়া দুষ্কর। তাঁহারা তাঁহাদের কন্যাদ্বয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিলাভের চেষ্টা

মঙ্গলপ্রদ হইবে না ভাবিয়া তাহাদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন বন্ধ করিয়া দেন। তদবধি তাঁহাদের অপর কন্যাগণ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন নাই। বিলাত প্রত্যাগত অনেক ভদ্রলোকের কন্যাগণই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন না। অনেক Biologistsএর (জীবতত্ত্ববিদের) মত যে নারীশিক্ষার পার্থক্য থাকা প্রয়োজন। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যাহারা দরিদ্র তাহারা কন্যাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়নকে বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করেন। কেন না অনেক ব্রাহ্মই গৃহহীন এবং সম্বলহীন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভে কন্যাগণের উচ্চ বেতনে চাকুরী হয় এবং তদ্দ্বারা কন্যাগণ নিজেদের এবং পিতা মাতা ভাই ভগিনীর সেবা করিতে সক্ষম হয়েন। অনেকে ডাক্তারী পাশ পত্নী লাভ করিয়া কিম্বা পত্নীকে ধাত্রীবিদ্যায় ডিপ্লোমা লাভ করাইয়া নিজে ঘরে বসিয়া জীবিকা সংস্থান করেন। কোন কোন ব্রাহ্ম পত্নীর উপার্জ্জনে বিলক্ষণ সঙ্গতি-সম্পন্ন হইয়াছেন। কালে ব্রাহ্মদের একাংশ ব্রহ্মদেশের অবস্থা প্রাপ্ত না হইলে হয়। ব্রহ্মদেশের রমণীরা উপার্জ্জন করেন এবং পুরুষেরা ঘরে বসিয়া আহার পরিচ্ছদ লাভ করেন। এখন দেখা যাইতেছে, এ দেশের পুরুষদের যেমন অর্থ উপার্জ্জনই লেখা পড়ার উদ্দেশ্য, ব্রাহ্মসমাজের নারীদের শিক্ষারও সেই উদ্দেশ্য দাঁড়াইতেছে। এমতাবস্থা ব্রাহ্ম সাধারণের কল্যাণপ্রদ হইবে কি? ব্রাহ্ম-যুবকেরা অধিকাংশস্থলে পত্নী, ভগিনীর উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করিতে লজ্জা-বোধ করেন না। আবহমানকাল হইতে নারীকে চাকুরী করিতে দেওয়া নিতান্ত দুর্ভাগ্য মধ্যে গণ্য হইয়া আসিয়াছে। আজ সেই নারীর অল্প শিক্ষাতে অধিক বেতনের চাকুরী লাভ হওয়াতে নারী-শিক্ষার জন্য গরিব ব্রাহ্মদের বড় অধিক আকর্ষণ বাড়িয়াছে। দ্বিতীয়তঃ নারীর উচ্চ উপাধিধারণে অনেকটা সম্মানবৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং পাওয়াও উচিত। সঙ্গে অহঙ্কারও হৃদয়কে অধিকার করিতেছে। এখন এই শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নারী-জীবনে ঈশ্বরে বিশ্বাস প্রেম ভক্তি কিরূপ বিকশিত হইতেছে সেইটী দেখা উচিত। কয়টী উপাধিধারিণী আপনার উচ্চ প্রেম-ভক্তির পরিচয় দিতেছেন? তাঁহাদের মধ্যে উপাসনাশীলতা কিরূপ দেখা যাই-তেছে—যদি উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চনীতি এবং ঈশ্বরে বিশুদ্ধ বিশ্বাস প্রেম ভক্তি প্রকাশ না পায় তবে সেই শিক্ষা নাস্তিকতা সংশয়বাদিতার মধ্যে লইয়া ফেলিবে। এইজন্য বেটাছেলে-দের মত ধর্ম্মহীন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নারীদের পক্ষে ক্ষতিজনক। নারী হইতে উচ্চনীতি এবং ধর্ম্ম স্থায়িভাব লাভ করে, এবং নারীর ধর্ম্ম বিশ্বাসই ভাবিবংশ এবং ভাবিসমাজ গঠন করে। অতএব শিক্ষার পরিমাণে যদি ধর্ম্ম বিশ্বাস ও ভক্তি না থাকে তবে দেশময় বড় দুর্দ্দশা। ব্রাহ্ম-সমাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের নারীশিক্ষাতে প্রেম ভক্তির প্রকাশ এবং নারীজনো-চিত শীলতা, কোমলতা, শুভ্রতা ও

উচ্চদরের সতীভাব তেমন উজ্জ্বলরূপে চতুর্দ্দিকের লোকের চিত্তে মুদ্রিত না হওয়াতেই মহাকালী পাঠশালা প্রভৃতির সৃষ্টি হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজের বিশ্বাস, ভক্তি এবং উচ্চনীতি এ দেশকে জাগাইয়া তুলিয়াছিল। বর্ত্তমানে যদি শিক্ষিতা মহিলারা উচ্চ ধর্ম্ম, ভক্তি এবং নীতি প্রদর্শন করিতে পারেন তবেই রক্ষা। তাঁহারা পবিত্র প্রেম-পরিবার ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠা করিয়া যেমন ক্ষুদ্র আকারে দেখাইবেন, তেমনি সেই উচ্চনীতিমূলক বিশুদ্ধ প্রেমে বৃহৎ মানব পরিবার গঠনের সূত্রপাতের মূল হইবেন। অন্যথা নারী-শিক্ষার ফল সাধারণ শিক্ষার মত অব্যব-স্থিত থাকিয়া যাইবে। এবং নারীশিক্ষা অর্থকরী বিদ্যাই থাকিয়া যাইবে। জ্ঞানের জন্য জ্ঞান নারীশিক্ষাতে স্থান পাইল না। ধর্ম্মপ্রাণা রমণীরা পার্থিব ধনসম্পৎ এবং উচ্চপদশালীর সঙ্গে জীবন মিশাইতে ব্যস্ত হয়েন না। তাঁহারা সেই সব ব্যক্তিকে অন্বেষণ করেন যাঁহারা জীবন-পথে তাঁহাদিগকে ক্রমিক আধ্যাত্মিক এবং মানসিক প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গীণরূপে ঈশ্বরমুখী জীবনপথে অগ্রসর করিয়া দিবেন এবং দিতে সক্ষম। তাঁহারা আত্মিক বলিতে পূর্ণ বিকাশ বুঝেন। ঈশ্বর বলিতে পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ সত্য, পূর্ণ প্রেম, অসীম অনন্ত সকলই বুঝায়। ঈশ্বরপ্রেম হইল পুণ্য শুদ্ধতা রক্ষা হইল না, এ স্থলে ঈশ্বর প্রেম, ঈশ্বর প্রেমই নয়। ঈশ্বরের এক স্বরূপে সমস্ত স্বরূপ বিদ্যমান। এই স্বরূপে অবস্থান প্রতি-নিয়ত যে সব নারীরা প্রয়াস করেন, তাঁহারা প্রকৃত শিক্ষালাভ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ব্রাহ্মসমাজ এই স্বরূপে অবস্থানটী নারীজীবনের শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চরম লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। তদ্রূপ না হইলে নারীশিক্ষা দ্বারায় নূতন বিধানের নববিকাশ দেশ মধ্যে হইল না—এবং তাহা না হইলে নব জাগরণ আসিবে না। ধর্ম্মের এবং শিক্ষার বাহ্য লক্ষণ দ্বারায় জীবনগত ধর্ম্ম ও শিক্ষা কতদূর লাভ হইয়াছে তাহা বুঝা যায় না। অতএব জ্ঞানময় জ্যোতি যে পরমব্রহ্ম, শিক্ষাতে সেই আদি জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময়ী হও-য়াই প্রকৃত নারীশিক্ষার উদ্দেশ্য—তৎপর তদ্দ্বারা অর্থাগম হইবে কি না তাহা বিবেচ্য বিষয় নয়। অগ্রে স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর, পশ্চাৎ যাহা কিছু আবশ্যক তাহা প্রদত্ত হইবে। শিক্ষা সম্বন্ধেও একই কথা।

শ্রীবি—

সন্ধ্যা-প্রসঙ্গ।

(২য়)

আবার তোমাদের সঙ্গে প্রসঙ্গ করিতে আসিলাম। কলিকাতায় ছাদই সাধারণতঃ নির্জ্জনে বসিবার স্থান। আমাদের এ বাড়ীটীতে আবার ছাদে উঠিবার উপায় নাই। কি করি? শয়ন গৃহকেই বিজন তপোবন করিয়াছি। প্রয়োজন হইলে এখানে আসিয়া জানালার আকাশের

সম্মুখে বসি। ছোট বেলা নাম পাইয়াছিলাম "স্বর্গের পবিত্র পাখী।" যিনি এই নাম দিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন "আমি নিজে তোমাকে এ নাম দি নাই; স্বয়ং ঈশ্বর তোমাকে আমার নিকটে এই ভাবে প্রকাশিত করিয়াছেন। নিশান্তে স্বপ্ন দেখিলাম তুমি একটী পাখী হইয়া আমার নিকটে বসিয়া মধুরস্বরে গান করিতেছ, আর তখনই দৈববাণী হইল, 'ইনি স্বর্গের পবিত্র পাখী'।" জ্যাঠামহাশয়ও সময়ে সময়ে আমাকে "পাখী" বলিতেন। প্রচারযাত্রায় ২।১ বার তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিলাম। পথে আমরা গান গাহিতে গাহিতে যাইতাম। কিছুক্ষণ যদি গান বন্ধ হইত অমনই বলিতেন "পাখী আর গান গায় না কেন? পাখী বুঝি ফুল খেয়েচে?" আজ তাঁহারা দুই জনেই স্বর্গে। কিন্তু তাঁহাদের সেই স্নেহের স্বর আজও যেন আমার কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে। গানের জন্যই তাঁহারা এই নাম দিয়াছিলেন। কিন্তু আমি আমার জীবনে গগনবিহারী বিহঙ্গের এই বিশেষ লক্ষণ দেখিয়াছি যে আকাশ আমার অত্যন্ত প্রিয়। জীবনের অধিকাংশ সময় এই জনকোলাহলময় প্রকাণ্ড কলিকাতা সহরেই কাটিয়া গেল, যেখানে মুক্ত আকাশতলে বাস পায় অসম্ভব। কিন্তু অধিকাংশ গৃহেই ছাদগুলি সেই অভাব মোচন করে। কাজে অবসর পাইলেই ছাদে যাইতাম, আর মনে হইত যেন স্বর্গে আসিলাম।

একদিন শুনিলাম, "কলিকাতায় তোমাকে আর বাস করিতে হইবে না; তুমি যাহা ভালবাস প্রকৃতির প্রিয় নিকেতন সুন্দর পার্ব্বত্য প্রদেশে তোমার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।" শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দ হইল। আমি সেই স্থানের বর্ণনা একখানি পুস্তকে পাঠ করিয়া সেখানকার প্রতি আশ্চর্য্য আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিলাম। দয়াময়ের বিধান দেখিয়া অবাক্ হইলাম। প্রকৃতির লীলাভূমি সেই সুন্দর সুরম্য উপত্যকায় প্রায় দশ এগার বৎসর বাস করিলাম। কৈ আমার সে স্বর্গ কোথায়? আমার প্রাণের প্রিয় তপোবন পুণ্যাশ্রম সেখানে স্থাপন করিতে পারিলাম না। আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। এখানে আসিয়া দেখি আর আমার সে ভক্তলীলাভূমি আদরের স্থান কলিকাতাধাম নাই। একে একে প্রায় সকলেই প্রস্থান করিয়াছেন। এখন এই মহা লোকালয় যেন বিজন অরণ্যের ন্যায় বোধ হয়। সময়ে সময়ে সন্ধ্যাবেলা যখন রাজপথের সম্মুখে বারাণ্ডায় বসিয়া অসীম জনসঙ্ঘ দর্শন করি, তখন মনে হয়, সমুদ্রের জলে ডুবিয়া মানুষ যেমন জল অভাবে কাতরে হয় আমিও সেইরূপ এই অনন্ত লোক সমাগমের নিকটে বসিয়া আপনাকে নিতান্ত একাকী অনুভব করিতেছি।

আর একদিকে ঐ দেখ সহস্র প্রাণ উদ্বেলিত-হৃদয়ে মানব-সেবায় আত্মদান করিবার নিমিত্ত উধাও হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, একি দুঃখের বন্যা না সুখের বন্যা? আর আমি কিনা বলিতে চাই কলিকাতা শ্মশান? আরও কত নবীন ভক্ত

ইহাকে নবরাগে রঞ্জিত করিবার নিমিত্ত ইহার পূর্ব্বগগনে উদিত হইতেছেন, আমি তাহার কি খবর রাখি? স্বজাতীয় ভাই ভগ্নীকে মুক্ত আকাশে উড়িতে দেখিলে পিঞ্জরের পাখী যেমন ছট্‌ফট্‌ করে, ঐ মহা জীবন স্রোতের তরঙ্গ দেখিয়া আমিও সেইরূপ আকুল হইতেছি। ভগ্নীগণ, তোমরা বোধ হয় মনে করিতেছ, "তবে কি তুমি বলিতে চাও যতকিছু সুন্দর, যতকিছু সুখকর, যতকিছু প্রিয় এবং মঙ্গল সমস্তই অতীতে চলিয়া গিয়াছে, এখন তোমার জীবনে আছে কেবল দুঃখের ক্রন্দন?" কাল সন্ধ্যার পরে জানালায় বসিয়া এই সব কথা ভাবিতেছিলাম। সুনীল সন্ধ্যা-গগনে সপ্তমীর সুবিমল চন্দ্র ভাসিয়া যাইতেছিল। আকাশ কি সুন্দরই দেখা-ইতেছিল। এমন সময় একখানি ঘন কালো মেঘ সেই অর্দ্ধচন্দ্রখানি ঢাকিয়া ফেলিল। কিন্তু তাহার সীমান্তরাল হইতে উজ্জ্বল রজতরেখা ঝক্‌মক্‌ করিয়া আশার কথা বলিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে সেই মেঘখণ্ড অপসারিত হইল এবং নভোমণ্ডল দ্বিগুণ সৌন্দর্য্যে হাসিতে লাগিল। যদি এক পশলা বৃষ্টি হইয়া যাইত তবে আরও সুন্দর হইত। আমাদের জীবনা-কাশেও ঠিক এইরূপ হয়। কিন্তু সেই আশার আলোকরেখার দিকে দৃষ্টি রাখা চাই। বারিপাত হইলেত কথাই নাই। কারণ বর্ষার প্রবল বারিধারার পর শান্তি এবং সৌন্দর্য্য আসিবেই আসিবে। আজ এইখানেই উঠি। শ্রীম—

বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

ষ্টেশনে আমার দুই দেবর এসেছি-লেন। আমরা রিক্সে করে বাড়ী আসিলাম। জাপানে ঘোড়ার গাড়ী নাই বলিলেই হয়। এখানে রিক্সে একজন বসে ও মানুষ ঘোড়ার মত টানে।

সন্ধ্যার অল্প পূর্ব্বে বাড়ী এসে পৌঁছি-লাম। বাড়ী একখানা গ্রামে; চারিদিকে শূন্য মাঠ। এখন মাঠে গম ও মূলা গাছ। অন্যান্য বৃক্ষ ও "কুবানোকি" (সিল্ক পোকা যে বৃক্ষের পাতা খায়) প্রভৃতি অনেক পত্রশূন্য বৃক্ষ শুষ্ক তরুর ন্যায় দণ্ডায়মান। ষ্টেশন হইতে এই গ্রামটী অনেক দূর। গ্রামের নিকটস্থ হইতেই আত্মীয় স্বজনগণ পরিবেষ্টন করিয়া বহুলোক একত্রে আনন্দ প্রকাশ ও অভিবাদনাদি করিতে লাগি-লেন। আমরা গৃহ-প্রবেশের পূর্ব্বে নিকটস্থ পূর্ব্বোল্লিখিত "তোরি" অভ্যন্তরস্থ নির্জ্জন স্থানে ক্ষুদ্র প্রার্থনায়,—যিনি আজ আমা-দের বুকে করে, কত অবস্থায় রক্ষা করে, এতদিনের প্রার্থিত স্থানে আনিয়া প্রিয় ও পূজনীয় জনগণের সহিত মিলিত হইবার সুযোগ দান করিলেন, সেই বাঞ্ছা-কল্পতরু ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম। আমরা গৃহে আসিলে, আমাদের বসিবার আসন, অগ্নি-পাত্র, দুগ্ধ-শর্করা ব্যতীত এদেশীয় "ওচা" (চা) ও কিছু পিষ্টক দিলেন। তাকে-দাসানের আত্মীয়স্বজনগণ, আজ আমরা আসিব বলে নিমন্ত্রিত হইয়া একত্র হইয়াছিলেন। আজ ৯ বৎসর পরে—যে

পিতামাতা ও আত্মীয়গণ বহুদিন পুত্রের কোন সংবাদ না পাইয়া বিদেশে তাঁহার মৃত্যুই স্থির করিয়াছিলেন ও পরে সংবাদ পাইয়াও সশরীরে মিলিত হইবার আশা প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারাও আজ কত আনন্দিত হইলেন! চারিদিকে উপস্থিত সকলে ঘিরিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। ছোট বড় সকলেই টুপী খুলিয়া জানুর উপর উপবেশন পূর্ব্বক মস্তক অবনত করিয়া (আমাদের দেশে পদধূলি লওয়া ব্যতীত প্রণামের নিয়মানুসারে) পরস্পর পরস্পরকে অভিবাদন করিলেন। একে একে সকলে নিজ নিজ পরিচয়ের সঙ্গে অভিবাদন, কুশলাদি জিজ্ঞাসা, ধন্যবাদ ও আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি কথা বলিতে পারি না বলে নীরবে প্রণাম করিলাম। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, আমি গুরুজনদের প্রণাম করিতেছি, কিন্তু দেখি দেশীয় প্রণালী অনুসারে উঁহারাও মাথা মাটিতে ঠেকাইয়া আছেন।

আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী স্বহস্তে আমার খাবার প্রস্তুত ক'রে দিলেন। শীতের জন্য বড় কষ্ট পাইতেছি ইত্যাদি বলিয়া তাড়াতাড়ি বিছানা প্রস্তুত ক'রে দিলেন ও শীঘ্র শয়ন করিতে বলিলেন। নিমন্ত্রিতগণ আহারের পর নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন।

এদেশী আহার আমার পক্ষে অরুচিকর বলিয়া আমার নিজের তরকারী প্রায়ই নিজে রান্না করিতে আরম্ভ করিলাম। এ দেশে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় তিনবার অন্নাহার করে। রন্ধনাদি আমাদের দেশ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভাতের ফেন ফেলা হয় না। একেবারে এরূপ ভাবে জল দেওয়া হয় যাতে চাউলগুলি ঠিক রকম সিদ্ধ হয়। তৈল, ঘৃত ও মশলা ছাড়া, তরকারী, মাছ ও মাংস "সইও" নামক এক প্রকার দুর্গন্ধযুক্ত লবণাক্ত তরল পদার্থ দিয়া সিদ্ধ বা অর্দ্ধসিদ্ধ করা হয়। মাংসগুলি নামমাত্র সিদ্ধ করিয়া লওয়া হয়, কাঁচা শুষ্কমৎস্য ও লবণাক্ত মৎস্য পোড়া ইত্যাদি খুব আহার করে। মূলা এঁদের অতি প্রিয় খাদ্য। এখানে খুব বড় বড় মোটা মোটা মূলা জন্মে। কাঁচাও খায়। আবার লবণ মাখিয়া কিছু শুকাইয়া একস্থানে বন্ধ করিয়া রাখে, যখন প্রায় পচিয়া উঠে, তখন আহার করে। ছোট অনুচ্চ টেবিলের উপর কয়েকটী ছোট ছোট চীনা বাটীতে মাছ, তরকারী, মূলা, কুলের চাটনী ইত্যাদি ও একটী বাটী ভাত খাওয়ার জন্য দেওয়া হয়। ভাত একটী পাত্রে লইয়া একজনে ঐ বাটীতে ভাত উঠাইয়া দেয়। দুটী কাঠি ভাত খাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। কোন দ্রব্য হাত দিয়া খাওয়া এদের নিয়ম বিরুদ্ধ।

এখানে বাড়ীগুলি কাঠের। ফটকে দরজায় একটী ঘণ্টা বাঁধা থাকে। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টার শব্দ হয়, তাহাতে গৃহস্বামী জানিতে পারেন। দরজার চৌকাঠে উপরে ও নীচে খাঁজ কাটা থাকে। দরজায় কব্জা দেওয়া নয়, ঐ খাঁজে আট্‌কান থাকে। এক দিক হইতে অপর দিকে ঠেলে দিতে হয়।

গৃহের প্রাচীরও প্রায় কাঠের। কোন অংশ বাঁশের বেড়ার উপর মাটি প্রভৃতির লেপ দিয়া প্রস্তুত হয়, বাকি সমুদায় কাঠের। ঐরূপ উপর ও নীচের চৌকাঠের খাঁজের ভিতর কাঠের বেড়গুলি আট্‌কান থাকে। দিনে সবগুলি ঠেলে একদিকে রাখা হয়, রাত্রে বন্ধ করা হয়। অভ্যন্তরস্থ বেড়াগুলি কাগজের। কাঠের ফ্রেমে কাগজ আঠা দিয়া লাগান থাকে, সেগুলি ঐরূপ চৌকাঠের খাঁজে আট্‌কান থাকে ও ইচ্ছামত এদিক ওদিকে ঠেলে দেওয়া যায়। গৃহখানি ভূমি হইতে প্রায় এক ফুট উচ্চ কাঠের মাচার উপর অবস্থিত। ঘরের মেজে মোটা মাদুর দ্বারা আবৃত। ঘরের ছাদ মাটির খোলা বা খড় দ্বারা প্রস্তুত। গৃহে আস্‌বাব্‌-পত্র প্রায় কিছুই নাই। বসিবার জন্য চেয়ার টেবিল ব্যবহৃত হয় না। "ফুতনে"র উপর হাঁটু গাড়িয়া বসে। ঘর বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, ধূলা ময়লা নাই। বিছানাদি কাঠের বা কাগজের সুদৃশ্য বেড়ায় আবদ্ধ। এক কোণে বন্ধ করে রাখা হয়। একদিকে এক কোণে হয়ত মনোহর দৃশ্যপূর্ণ ছবি দেওয়ালে টাঙ্গান, একটী সুদৃশ্য সুসজ্জিত ক্ষুদ্র গাছ বা কিছু সুন্দর জিনিষ রক্ষিত। কোন স্থলে ছবি বা ফটো টাঙ্গান থাকে। গৃহ-সজ্জার মধ্যে ইহাই প্রায় যথেষ্ট। একখানি বড় ঘর কাগজের বেড়া দিয়া খণ্ড খণ্ড করা হয়। প্রতি গৃহে গৃহ-দেবতা বুদ্ধ-মূর্ত্তি একটী সুদৃশ্য পিতল নির্ম্মিত বাক্সে রক্ষিত। প্রতিদিন গৃহস্বামী ধূপ, ধুনা ও আলো জ্বালিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যায় পূজা করেন। গৃহকর্ত্রী কয়েকটী ভাতের ডেলা সাজাইয়া ভোগ দেন ও ফুলদানীতে ফুল ও পাতা সাজাইয়া রাখেন। কাঠের ঘরগুলি বাহির হইতে বিশেষ সুন্দর বোধ হয় না। বাহির হইতে পর্ণ-কুটীরের ন্যায় বোধ হয়, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিলে বেশ সুন্দর দেখা যায়। প্রতি বাড়ীর সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র উদ্যান থাকে; তন্মধ্যে একটী নকল পাহাড়ের মত উচ্চস্থান ও কয়েকটী সুন্দর সুন্দর গাছ থাকে। বাগানটী সর্ব্বদা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়।

এদের পোষাক আমাদের পক্ষে অদ্ভুত বলে বোধ হয়। স্ত্রী-পুরুষের প্রায় এক ধরণেরই পোষাক। পোষাকের মধ্যে "কিমোনো" প্রধান। ইহা পা পর্য্যন্ত পড়ে। সম্মুখ দিকটা খোলা, দুই ধার একটার উপর আর একটা রেখে "ওবি" নামক একটী চওড়া মূল্যবান্‌ ফিতা দ্বারা "কিমোনো"টী বন্ধ করা হয়। "ওবি"টা খুব লম্বা। কোমরে জড়াইয়া পশ্চাদ্দিকে একটী ফাঁস দিয়ে রাখে। কিমোনোর হাতের নীচে কতকটা কাপড় থলির মত ঝোলান থাকে। ইহা পকেটের কাজ করে। ইহা পুরুষের চেয়ে মেয়েদের বেশী লম্বা হয়। "ওবি"টী পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের চওড়া হয়। স্ত্রী-পুরুষের পোষাকের বিভিন্নতার মধ্যে আর যে যৎসামান্য পার্থক্য আছে তাহা বোঝা যায় না। স্ত্রীলোকেরা "ওবি"র ফাঁস খুব বড় করে দেয় ও একটী সরু ফিতা দ্বারা "ওবি"টী আট্‌কাইয়া রাখে। শীতকালে

ইহার উপরে "হাওরী" নামক আর একটী পোষাক পরিধান করে। ইহা জানুর অল্প নিম্ন পর্য্যন্ত থাকে, সাম্‌নের দিক্‌টা খোলা, একটী সুদৃশ্য ফিতা দ্বারা বুকের উপর আট্‌কান থাকে। হাতের থলিগুলি "কিমোনো"র থলির সমান হয়। শীতকালে পোষাকের রং গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা গাঢ় হয় এবং পোষাকের ভিতরে তুলা দেওয়া থাকে।

আমাদের আসার সংবাদ শুনিয়া অনেক লোক সর্ব্বদাই আমাদের দেখিতে ও ভারতের কথা শুনিতে আসিতে লাগিলেন। আমাদের দেশের আহারাদি, পরিচ্ছদ, আচার, রীতি, ধর্ম্ম আমার আত্মীয়বর্গ ইত্যাদি অনেক বিষয় সম্বন্ধে অনেকে জিজ্ঞাসা করে জানিলেন। তাকেদাসান বুদ্ধদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং অন্যান্য ভারতীয় মহাপুরুষ, ভারতের সতীধর্ম্ম ইত্যাদি নানা বিষয়ের গল্প বল্‌লেন।

এই গ্রামটীতে অনেক লোকের বসতি। নিকটেই ছোট ছোট সহর আছে; এ গ্রামে খুব সিল্কের চাষ হয়। প্রতিগৃহে সিল্ক পোকা পালন ও গুটী হইতে সূতা প্রস্তুত করে। বাড়ী বাড়ী তাঁত আছে। মেয়েরা কাপড় বুনে ও গৃহের সকল কর্ম্মই করে। এখানে চাউল পরিষ্কারপ্রণালী আমাদের দেশ হইতে ভিন্ন প্রকার। আমাদের দেশে যেমন কেবল ঢেঁকিদ্বারা ধান ভেনে চাউল প্রস্তুত করে, এখানে সেরূপ করে না। ইহারা চাউল প্রস্তুত করিতে ৩.৪টী যন্ত্র ব্যবহার করে। একটী কাঠের যাঁতাদ্বারা ধানগুলি পেষণ করে। ঝাড়িবার জন্য 'কুলা' ব্যবহার না করিয়া একটী আবদ্ধ বাক্সে উপরের খোলা মুখ দ্বারা চাউলগুলি ধীরে ধীরে ঢালে ও বাক্সের অভ্যন্তরস্থ পাখা ঘুরাইতে থাকে। পাখার বিপরীত দিকে বাক্সের একদিক খোলা থাকে। তদ্দ্বারা তুষগুলি বাহির হয় ও নিম্নের একটী খোলা মুখ দিয়া চাউল পড়ে। তৎপরে আবার জালদ্বারা প্রস্তুত চালনীর মত বাক্সে ঢালে। চাউল নীচে পড়ে ও ধানগুলি উপরে থাকে। পরে অল্প ছাঁটিয়া কুঁড়া পরিষ্কার করে। এইরূপে কতকগুলি যন্ত্রসাহায্যে অল্পায়াসে, অল্পসময়ে প্রচুর চাউল প্রস্তুত হয়।

অনেকস্থলে মেয়েরা মাঠে স্বামীসহ কৃষিকর্ম্ম করে। বাজারে, দোকানে, ষ্টেশনে, সর্ব্বত্র মেয়েরা কাজ করে। আমোদ প্রমোদের স্থলে, যেখানে অত্যন্ত জনতা হয় মেয়েরা সেখানে তত্ত্বাবধান করে। তামাসা দেখার জন্য টিকিট বিক্রয়াদি মেয়েরাই করে।

মেয়েরা সাধারণতঃ প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া ঘরের দরজাগুলি খুলিয়া দেয়। তৎপর রন্ধন আরম্ভ হয়। ইতিমধ্যে সকলে উঠিয়া মুখ ধুইতে যায়। গৃহিণীরা বিছানাদি সব ভিতরে বন্ধ করিয়া ঘর পরিষ্কার, "হিবাচী"তে (অগ্নিপাত্র) অগ্নি ও চায়ের জল বসাইয়া দেয়। সকলে একত্র আহার করে। তৎপর ছেলেরা সব স্কুলে যায়। মা সন্তানদের পুস্তকাদি ও মধ্যাহ্ন-আহারের জন্য "বেন্তো" (ভাত, কিছু মুলা ও অন্য তর-

কারী বা মাছ ইত্যাদি) একটী ছোট বাক্সে বেঁধে দেন। মেয়েরা স্কুলে যাওয়ার সময় সাধারণ পোষাকের উপর নীচের দিকে একটী ঘাঘরার মত পরে। গৃহ-কর্ত্তা কয়েক মিনিট গৃহদেবতার পূজা করিয়া স্বকর্ম্মে প্রস্থান করেন। এই কাজগুলি সংসারের অর্থসমাগমের উপায় হয়। মধ্যাহ্নে ঘটা খানেকের মধ্যে হয়ত রন্ধন ও খাওয়া শেষ হইয়া যায় ; সারাদিন নানা কার্য্যে থাকিয়া সন্ধ্যায় সকলে একত্রে আহারাদি সম্পন্ন করেন।

স্নান এখানে প্রায় সকলেই সন্ধ্যাকালে করে। গরম জলের টবে শরীর ডুবাইয়া স্নান করে। ওরূপ স্নান শীতকালে খুব আরামপ্রদ, কিন্তু জাপানীরা গ্রীষ্মকালেও প্রতিদিন প্রায় গরম জলেই স্নান করে। স্থানে স্থানে সরকারী স্নানাগার আছে। যাহাদের বাড়ীতে গরম জলের বন্দোবস্ত না থাকে তাহারা সেখানে স্নান করে। একটী চৌবাচ্চায় গরম জল থাকে। সকলে তাহার ভিতরে শরীর ডুবাইয়া স্নান করে। প্রতিজনকে স্নানের জন্য ২।৩ পয়সা করে দিতে হয়।

বৈকালে ও সান্ধ্যাহারের পর সন্তান-গণ সহ আমোদ প্রমোদ, তাহাদের নীতি-শিক্ষা দেওয়া, সঙ্গে লইয়া বেড়ান ইত্যাদি জননীর কার্য্য। পত্রিকা পাঠ, সেলাই আদি শয়নের পূর্ব্বে করে। আমাদের দেশে রন্ধন ভোজনই যেমন একমাত্র কার্য্য, ইহাদের তা নয়। কি দরিদ্র কি ধনী, জাপানী স্ত্রীগণ দিবসের প্রায় অর্দ্ধাংশ অর্থাৎ ১২ ঘণ্টার বেশী রন্ধন ভোজন ও নিদ্রায় কাটায় না। অথচ এদের তিনবার রন্ধন ও আহার করিতে হয়। অপরার্দ্ধাংশ নানা কর্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া নিজের, পরিবারের, দেশের ও জাতির উন্নতির সুযোগ করে।

মেয়েদের পতি, পতির আত্মীয়-স্বজন ও শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা পরম ধর্ম্ম। ইহার কোনরূপ অন্যথা হইলে স্ত্রী অত্যন্ত লাঞ্ছিত হন। এমন কি, শাশুড়ীর অপছন্দ হইলে স্বামী অনায়াসে স্ত্রী-পরিত্যাগ করিতে পারেন। (ক্রমশঃ।)

শ্রীহরিপ্রভা তাকেদা।
ভারতমহিলা।

নারীগণের মধ্যে অস্থিরতা।

(আমেরিকাবাসীদের অভিমত)
(ইংরাজী হইতে অনুবাদ।)

"আমি খেটে খেটে হলেম যে সারা,
একই রকম কাজ, করে নাড়াচাড়া,
আমি খেটে খেটে হ'লেম যে সারা,
পড়েছে হাত নতিয়ে,.
(তবু) কায নাহি ছাড়া,
বাঁধা থেকে সুখ নাই,
আমি চাই, তাই চাই,
পাই যদি সেই সুখ স্বাধীন জীবনে,
রব খোলা পুঁথি মত, বিহীন বন্ধনে"।

আমেরিকার যুক্তরাজ্যের অন্তবর্ত্তী বষ্টন নগরে "congregationalist" নামে পত্রিকায় এফ, পি, স্মল লিখিয়াছেন ;—

যে নারী পূর্ব্বোক্ত কবিতাটী পরিহাস করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, তাঁহার অনুরাগী স্বামী, ও শ্রীমান্ সন্তান বর্ত্তমান।

সুখের মনোরম আবাস, জীবন-সুখ-প্রদ সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য, তদ্ভিন্ন বিলাস বাসনা পূর্ণ করিবার অধিকাংশ বিভবাদি ছিল। তথাপি তিনি সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট ও অসুখী হইয়া জীবনযাপন করিতেন।

অপূর্ণ জীবন।

আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি এই উত্তর দিলেন :—

"না," আমি জানি না, আমি কি চাই, আমি মনে মনে বেশ বুঝিতেছি, চাহিবার আমার কোন অধিকার নাই, তথাপি আমি যে চাই— ঐ খোলা পুঁথির মত থাকিতে—তাই যেন আমার মনে হয়।

এই রমণী আধুনিক উচ্চ জ্ঞান সকলের অধিকারিণী ছিলেন না। তবে আজকাল-কার বিবিধ সংবাদ দিন দিন জানিবার জন্য তিনি দৈনিক সংবাদ পত্র খানা দেখিতেন। মেয়ে মহলে সাফ্রে-জিষ্ট নামে যে নূতন সম্প্রদায় হইয়াছে তাহার সহিত তাঁহার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নাই। অথবা কোন একটী বিষয়ে তিনি চরমপন্থীদিগের মধ্যে আপনাকে কখনও গণ্য করিতেন না। তিনি যথার্থ মিষ্ট-স্বভাববিশিষ্টা, সত্যপ্রিয়া, বুদ্ধিমতী, চতুর্দ্দিক-দর্শিনী, সুগৃহিণী, গৃহানুরাগিণী, সহধর্ম্মিণী ও সুমাতা ছিলেন। তথাপি তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার জীবন অপূর্ণ, ইহা হওয়া উচিৎ নয়, হয়তো শিথিলভাবে তিনি ইহা মনে করিয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু যাহা তিনি নহেন তাহা স্পষ্ট স্বীকার করিতে হইলে তিনি সত্য কথাই বলিতেন। তিনি যে আরও কিছু চান ইহা স্বীকার করিতে তাঁহার মন খোলা ও সাহসী ছিল। অবশ্য কি তাহা বলিতে পারিতেন না, কিন্তু আরও কিছু চান। আমি এই রমণীর প্রশ্নের কোনও মীমাংসা করিতে পারিলাম না। কারণ ইহাপেক্ষা বড় প্রশ্নের পরে অবতারণা করিলেন।

"আমি অনেক দিন হইতে একাগ্রতার সহিত এই বিষয়টি চিন্তা করিয়াছি, তাহার পরে আমার পরিচিত বন্ধুদিগের ভিতরে ইহা কিরূপে উত্থাপন করিতে হইবে তাহা স্থির করি।" "সম্ভবত আমার পরিচিত দলের মধ্যে আমি যাহাদিগকে মনোনীত করিয়াছি, তাহা সকলের অনু-মোদনীয় না হইতে পারে, কারণ চর্ব্বিত-চর্ব্বণ চর্চ্চা যাহা অনেক লোক করিতে ভাল বাসে অথবা অত্যধিক ব্যবহারে যাহা অকম্মণ্যপ্রায় হইয়া গিয়াছে সেই সব লোকের এবম্বিধ মত খানি চাহি না।"

শিক্ষিতা রমণী এ বিষয় কি ভাবে দেখেন।

এই প্রশ্ন আমি প্রথম যাহাকে করিয়াছি তিনি এক বিধবা। তাঁহার স্বামী সাধারণে সুপরিচিত ও সকলের অগ্রণী ছিলেন। উচ্চ পদারূঢ় স্বামীর জন্য তিনি সাধারণের চক্ষুর সম্মুখে অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। বহুদেশ পর্য্যটনও করিয়াছিলেন। তাদৃশ শিক্ষিতা ও প্রখর বুদ্ধিমতী নারী অল্পই দেখা যায়। ইহার সঙ্গে মানসিক উৎকর্ষ ও সদ্ভাবের অভিব্যক্তিতে তাঁহাকে আরো উচ্চ করিয়াছিল।

তামাসা দর্শনে যাইবার জন্য কয়েকটি

সুন্দর থলির উপর সূক্ষ্ম কারুকার্য্য করিতে ব্যস্ত রহিয়াছেন, আমি দেখিলাম, বন্ধুদিগকে উহা শীঘ্রই উপহার দিবেন। তিনি বলিলেন, "আমি জানি, সেলাই করিতে আমি ব্যস্ত থাকিলে তুমি কিছু মনে করিবে না।" যেরূপ আদর করিয়া তিনি আমাকে বসিতে বলিলেন, আমি তাহাতে স্পষ্ট বুঝিলাম তিনি আমাকে চান, আর আমি যেন তাঁর কাছে আসি।

প্রিয় মহিলা, আপনি সেলাই করুন আমি দেখিতে ভালবাসি। কিন্তু যে বিষয়টির চিন্তা আমাকে অতিশয় ব্যাকুল করিয়াছে আর যাহার নিষ্পত্তি আমি নিজে কিছুই করিতে পারিতেছি না, আপনি হয়ত তাহার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আমি সেই জন্য আসিয়াছি। তখনই তিনি সেলাইটি সরাইয়া রাখিলেন, আসন খানি আমার নিকটে টানিয়া লইয়া যেন কি শুনিবার জন্য নিবিষ্ট হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

আমি একেবারে বলিলাম;—বলুন দেখি আজকালকার অধিকাংশ মেয়েরাই কেন এত অস্থির এবং সকলেই যেন কিছু না কিছু প্রার্থী? কিন্তু দেখায় যেন কি তাহারা চায়, তাহা তাহারা নিজেই জানে না। আমি তারপর তাঁহাকে সেই নারীর কথা বলিলাম যিনি প্রথমে আমার মনে এই সংশয় জাগাইয়া দেন। উল্লিখিত কবিতাটিও তাঁহাকে শুনাইলাম।

বাঁচিবার সময় নাই।

আমার বন্ধু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোনও দেন নাই। পরে বলিলেন,—"আমি জানি তুমি যাহা বলিলে তাহা সত্য। আমি এ বিষয় সম্বন্ধে সর্ব্বদা কষ্ট ভাবিয়া থাকি। আমি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছি রমণীগণের অনেকেই জীবনের কতকগুলি ভড়ঙ্গ—বাহ্যিক জাঁকজমক লইয়া এত ব্যতিব্যস্ত যে প্রকৃত জীবন যাপন করিয়া যে সুখ তাহা অনুভব করিবার তাঁহাদের একান্ত সময়াভাব দেখিতে পাই। সুমাতা, সুপত্নী, সুগৃহিণী অথবা সুগৃহরচয়িত্রী হইতে হইলে সে সকল মৌলিক কর্ত্তব্য আছে তাহা বর্ত্তমান বিজ্ঞান ও আবিষ্কারের সাহায্যে এত সহজে ও অল্প সময়ে শেষ করা যায় যে তাঁহাদের অতিরিক্ত অবসর সকল অধিকার করিবার জন্য ঐ সকল ভড়ঙ্গ। দিনের হুজুক ও সন্ধ্যার বাচালতার স্থান ক্লাবে যোগ দেওয়া, সুন্দরীদিগের বৈঠকে উপস্থিত থাকা ও সদা পরিবর্ত্তনশীল ফ্যাশন—ভাবভঙ্গী সাজ সজ্জা প্রভৃতিতে তাঁহাদের অবসরের সময় এমন ভাবে নষ্ট করা হয় ও এমন পরিশ্রান্ত হইয়া পড়েন যে মুখ প্রক্ষালন কি গাত্র ধৌতাদি করিয়া স্নানাদি করিবার সময় পর্য্যন্ত হইয়া উঠে না।

আমার বিশ্বাস আজকালকার নারীরা মোটের উপর নিজেকে বুঝিতে শেখেন ও তাঁহাদের জ্ঞানোদ্রেক হয়, ইহা প্রথম আবশ্যক; আর তাহার পর আপনাদের স্বার্থ—যাহা অতি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে তাহা নির্ম্মূল করিতে শেখেন। অন্যকে সুখদান করা, অপরের সুখের কারণীভূত হওয়াতে মনে সন্তোষ হয়।

অনেক সময় ইহা শিক্ষা করা বড় কঠিন কার্য্য। কিন্তু পরিণামে ইহা আপনার সত্যতা পুনঃ পুনঃ প্রমাণ করিতে থাকে। প্রিয় মহাশয়, সভয়ে জিজ্ঞাসা করি আমি কি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিলাম? যদি দিয়া থাকি তবে অতি সামান্য, কিছুই নহে বলিলে হয়।

'না' আমি হাঁসিয়া বলিলাম, আপনি উত্তরের অনেক সাহায্য করিয়াছেন; আপনি সচরাচর তাহাইতো করেন।

পাদ্রি সাহেবের উত্তর।

তিনি সেলাই করিতে লাগিলেন, আমি চলিয়া আসিলাম। সে স্থান হইতে একজন ইংরাজ পাদ্রির নিকট যাই। পূর্ব্বে আমার যত সন্দেহ হইয়াছিল এই ধর্ম্মাচার্য্য তাঁহার বিদ্যা, বিনয় ও ধীরতার সহিত তাহার সুন্দর মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। যদিও আমি তাঁহার সম্প্রদায়-ভুক্ত নহি। আমি যেই মাত্র তাঁহাকে আমার প্রশ্নটি বলিলাম তিনি তখনই উত্তর দিলেন।

এই সমস্ত অস্থিরতার মধ্যে আমি মঙ্গল দেখি। ইহা কেবল যে রমণীদের মধ্যে আবদ্ধ তাহা নয়, কিন্তু চতুর্দ্দিক হইতে ইহা আমাদের দেশকে যেন সংক্রামিত করিয়াছে। তুমি কি দেখিতেছ না? ইহাতে বুঝায় নরনারী উভয়ে এ বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করিতেছে। যে চিহ্নিত পথে এত দিন তাহারা চলিতেছিল তাহা অতিক্রম করিতে এখন তাহারা শিখিতেছে। কিছু যে তাহাদের অভাব আছে ইহা তাহারা অনুভব করিতেছে। এবং সেই জন্য তাহারা অস্থির। 'হাঁ ইহা ভাল' এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। একমাত্র মঙ্গলই ইহাতে হইবে। ইহা ভগবান্ প্রেরিত এবং সেই জন্য ইহা তাহাদিগকে ভগবানের সন্নিকটে আনিবে ইহাই তাহাদিগের অভাব। তিনি যাহা বলিলেন, আমি ভাবিলাম তাহা সত্য। কিন্তু সমস্ত কথা তিনি আমাকে বলেন নাই। এমন সরল ও পবিত্র তাঁহার জীবন, সুতরাং আমি যাহা চাই তাহা তিনি ঠিক ধরিতে পারেন নাই। আমিও বিশ্বাস করি এই অস্থিরতা হইতে ভাল হইবে। কিন্তু উহা কাল্পনিক না ভৌতিক, আমি তাহাই জানিতে চাই।

পণ্ডিত কি বলিলেন।

যিনি পণ্ডিত, চিন্তাশীল ও কার্য্যকুশল তাঁহার নিকট আমি প্রশ্নটি পরে লইয়া যাই। তাঁহার বিস্ময়কর উত্তর তিনি গম্ভীরভাবে দিলেন।

"কারণ এক জাতীয় শিক্ষিত সয়তান আমরা উৎপন্ন করিতেছি।" আমি তাঁহার দিকে আশ্চর্য্য হইয়া তাকাইয়া রহিলাম, তিনি বলিতে লাগিলেন;—নিজ শক্তিদ্বারা আমরা সব বুঝাইতে পারি, সকলকে হারাইতে পারি এই ক্ষমতা আমাদের আছে। ইহাতে বিশ্বাস উত্তরোত্তর এত বাড়িতেছে, সেজন্য জীবনের রহস্য যাহা অতীব সূক্ষ্ম ও অবোধ্য হইয়াও জীবনকে সুখী করে তাহাদেরে আমরা গণনার মধ্যে আনি না। যখন লোক মনে করে তাহারা

সেইস্থানে আসিয়াছে যেখানে তাহারা সমস্ত করিতে পারে, তাহাদের ভিতর যাহা হইতেছে তাহার কারণ বুঝাইয়া দিতে পারে সেজন্য মনে করে বিশ্বাস করার কি দরকার—কিছু আবশ্যক নাই—ভাল সেইজন্যইতো বলি, কি আশ্চর্য্য ইহারা কিছু অভাব আছে মনে করিয়া কাঁদিবে না তো কাঁদিবে আর কে?

সূর্য্যের কিরণে কত উত্তাপ আছে এবং ইহা কিরূপে আমাদের রন্ধন অথবা অন্য কার্য্যের জন্য পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক, কেবল ইহা ঘরে বসিয়া চিন্তা না করিয়া একবার বাহিরে এসে দেখে যাও, অনুভব কর—রৌদ্র জড় ও জীব সকলের কেমন জীবনপ্রদ। ঐ যে জলপ্রপাত, তাহার নিজের মহিমার দিকে সতৃষ্ণ হইয়া না দেখিয়া তাহা কত অশ্ববল ধারণ করে ইহা যদি গণনা করিতে যাও। এখন বুঝিলে আমি কি বলিলাম?

অবিবাহিতা মহিলা ও ডাক্তারের মত।

চল্লিশ বৎসর বয়স হইয়াছে তথাপি অবিবাহিতা এবং সাহসের সহিত সংসারে নিজের উপায় করিয়া লইয়াছেন এরূপ একটী নারীর নিকট আমার প্রশ্নটি এবার উত্থাপন করিলাম। তিনি অল্প কথায় এই বলিলেন! দেখিতে পাই নরনারী আপনারাই আপনাদিগকে অত্যধিক স্বেচ্ছাচারে মলিন করে। খুসী করিতে যাইয়া নিজের ব্যক্তিত্ব হারাইয়া ফেলে, তাহাতে ফল এই হয় তাহারা বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা অবিলম্বে বুঝিতে পারে এমন একটী অভাব যাহা পুর্ব্বে বুঝিতে পারে নাই, তাহা আর কিছু নহে—তাহাদের ব্যক্তিত্ব। সে যাহা হউক আমি বাড়ী ফিরিয়া আসিবার সময় পথে আমাদের চিকিৎসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাকে কথাটি জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিলেন।

"স্নায়ু" আর কিছুই নহে কেবল স্নায়ুর দুর্ব্বলতা; এই যে দ্রুত পরিচালিত আমাদের কৃত্রিম জীবন ইহারাই শেষে আমাদিগকে ঘোর পরীক্ষায় ফেলে জানিও। যখনই স্ত্রীলোকেরা সমস্ত সময় নিজের কথা ভাবিতে থাকে তখনই ক্ষতি নিজমূর্ত্তিতে দেখা দেয়। যাহা বলিলেন সত্য, কিন্তু যেন তত সন্তোষজনক নহে।

নিগ্রো পাচিকার গোপনীয় কথা।

বাড়ীতে পৌঁছিয়া আমি রান্নাঘরে সোজা চলিয়া গেলাম। আমার বিশ্বস্ত পাচিকা ডিলজির নিকট আমার প্রশ্নের উত্তর চাহিলাম। তখন তাহার হাতে যে ময়দা লাগিয়াছিল তাহা পরিষ্কার করিয়া আমার দিকে উগ্রভাবে তাকাইয়া তাহার গোপনীয় কথা কি তাহা আমাকে বলিল;—

আজকাল তোমাদের একটী বিশেষ দোষ দেখিতে পাই সকলেরই যে ভাল দিক আছে, তোমরা তাহা দেখিতে শেখো নাই; ইহা বড় আশ্চর্য্য আমার মনে হয়। তোমার যাহাতে অনিষ্ট হইতেছে তাহার মধ্যেই তোমার ইষ্ট লুকান আছে, ইহা না জানাতে তোমাদের এত অস্থিরতা ও অসুখ বাড়িয়াছে। এই গুপ্ত সত্যই আমার গোপনীয় কথা জানিবে।

আমার পাচিকা দেখিতেছি কেবল পাচিকা নহেন। তিনি পণ্ডিত পাচিকা বলিলে কিছু অত্যুক্তি হয় না। আমি বিস্ময়ে তখন আক্রান্ত হইয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা, ইহার উত্তর সকলের অপেক্ষা কি জ্ঞানপূর্ণ নহে?

জীবনের উজ্জ্বল ও সুখের দিক সকলের সর্ব্বতোভাবে শিক্ষণীয়। সুখী হইবার গুণ ও অধিকার যাহার আছে সেই ব্যক্তি যথার্থ মহৎ। দুঃখ ও দীনতা হইতে আনন্দ ও আশ্বাস সংগ্রহ করিতে পারা অথবা যখন নিজের বোঝা ভারী বোধ কর তখন অপরের বোঝা লাঘব করিতে চেষ্টা করা প্রথম কর্ত্তব্য; কিন্তু ইহাতে সফল হইতে হইলে আমাদের উপর যতটা প্রভুত্ব করা বিধেয়, তাহা না হয়ে তাহার নিকটেও আমরা এখন উপনীত হই নাই এবং সেইজন্য আমরা অস্থির ও সুখান্বেষী হইয়া ঘুরিতেছি। যখন আমরা প্রকৃত উদার ভাব লাভ করি তখন বুঝিতে সক্ষম হই যে আমরা আমাদের কেহ নহি,আমরা আমাদের প্রিয়তম ও আত্মীয়তমদের নহি, কিন্তু সমস্ত মানব পরিবারের। আমরা তখন জীবনের কার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন করিবার অর্থাৎ শান্ত ও সন্তুষ্টচিত্ত হইবার অব্যক্ত ও অব্যর্থ সন্ধান লাভ করিয়া ধন্য হই।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

জর্ম্মাণীতে স্ত্রীলোকগণের মধ্যে উত্তরোত্তর জ্ঞানস্পৃহা বৃদ্ধি পাইতেছে। জর্ম্মাণীতে ৩,৪৩৭ জন স্ত্রীলোক নিয়মিত ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতেছেন, ইহা ছাড়া ১০৩৭ জন স্ত্রীলোকের নাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকাভুক্ত না থাকিলেও তাঁহারা নানারূপে শিক্ষালাভ করিতেছেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ৫১২ জন স্ত্রীলোক চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিতেন, বর্ত্তমানে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার্থিনীর সংখ্যা ৭৯০ হইয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের অনেকেই চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

৬ই সেপ্টেম্বর শনিবার অপরাহ্ণে গোলদিঘীতে সন্তরণ-প্রতিযোগিতার প্রথম বার্ষিক ক্রীড়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। দৃশ্যস্থলে বহুজনসমাগম হইয়াছিল। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় মহামান্য লর্ড ও লেডি কারমাইকেল উপস্থিত হইয়াছিলেন। লেডি কারমাইকেল স্বহস্তে বিজেতাগণকে পুরস্কার বিতরণ করিয়া সকলের ধন্যবাদভাজন হইয়াছিলেন।

ক্রীড়া শেষ হইলে পর রাজা হৃষীকেশ লা একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় সকলকে সন্তরণ-প্রতিযোগিতার মর্ম্ম এবং উপযোগিতা বুঝাইয়া দেন। তিনি বলিয়াছেন যে, "কলিকাতা সন্তরণ ও ক্রীড়া-সমিতি" বর্ত্তমান বর্ষে স্থাপিত হইয়াছে। সমিতির উদ্দেশ্য, সকলকে সন্তরণকার্য্যে উৎসাহ প্রদান করা। বহু দিবসাবধি ঐরূপ একটি সমিতি স্থাপনের কল্পনা-জল্পনা চলিতেছিল। কিন্তু শিবপুর কলেজ-ঘাটের দুর্ঘটনার পরই একটি সন্তরণ-সমিতি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষরূপে মনোযোগ আকর্ষণ করে। সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, কলিকাতায় যুবকবৃন্দকে একজন সুদক্ষ শিক্ষকের দ্বারা সন্তরণশিক্ষা দেওয়া হইবে ও প্রতিবৎসর একটি করিয়া সন্তরণ-প্রতিযোগিতা ক্রীড়া প্রদর্শিত হইবে।

ঘটনার দিন সন্তরণ বিষয়ে নানারূপ কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ছাতা লইয়া সন্তরণ, জলে পোলো খেলা, চক্ষু বাঁধিয়া সন্তরণ এবং জলমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করিবার কৌশল প্রদর্শন প্রভৃতি ক্রীড়াগুলি বিশেষ মনোমুগ্ধকর হইয়াছিল।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১১শ ভাগ] কার্ত্তিক, ১৩২০। নভেম্বর ১৯১৩। [৪র্থ সংখ্যা।

প্রার্থনা।

হে পূর্ণজ্ঞানময় ও পূর্ণপ্রেমময় পরম দেবতা, তুমি আপনার অপার মহিমাতে এই জগৎ রচনা করিয়াছ। তোমার এই বিচিত্র সৃষ্টির সকল বস্তুই তোমার মহিমা প্রকাশ করে। একটি পুষ্প বা পত্র, একটি ক্ষুদ্র বালুকণা বা ক্ষুদ্র কীট-দেহ তোমারই জ্ঞানের পূর্ণতা প্রদর্শন করে। যখন আমরা নরনারীর শরীর মনের গঠনের বিষয় আলোচনা করি তখন দেখিতে পাই যে, যতই গভীর ভাবে এই আলোচনাতে প্রবেশ করি ততই অধিক হইতে অধিকতর জ্ঞান ও প্রেম ইহাতে প্রকাশ পায়। মনে হয় যেন মানুষ-রচনাতে তোমার জ্ঞান ও প্রেম অশেষরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহার তত্ত্ব আলোচনা করিয়া কেহ শেষ করিতে পারিবে না শুধু তাহা নয়, শেষে স্বীকার করিতে হইবে যে তুমি এখানে আপনি বসিয়া জ্ঞান প্রেম প্রকাশ করিতেছ। মানুষ যখন জ্ঞানে প্রেমে অত্যন্ত হীন অবস্থায় ছিল তখনও এই শরীর মন তাহাদের সকল অভাব পূর্ণ করিয়াছে ও প্রেম জ্ঞানের সমাবেশে রহস্যময়রূপে প্রতীয়মান হইয়াছে। বর্ত্তমানে আমরা যতটুকু উন্নতিলাভ করিয়াছি, আমরাও দেখিতেছি, যে আমাদের শরীর মন আমাদের সকল অভাব পূর্ণ করিতেছে এবং ইহাদের ভিতর এখনও অনেক তত্ত্ব ও শক্তি আছে যাহার রহস্য আমরা ভেদ করিতে পারি নাই। ইহাও বিশ্বাস করিতে আমরা বাধ্য হইতেছি যে, মানুষ আরও অনেক উন্নত হইলেও এই শরীর মন তাহার সকল কার্য্যেরই উপযোগী হইবে এবং তাহার পরও অনাবিষ্কৃত শক্তি ও প্রেম ইহাতে থাকিয়া যাইবে। তোমার জ্ঞান ও প্রেমের এই মহা সমাবেশ আমাদিগকে বলিতেছে যে, এই মানব-শরীর-মনের উপযোগী গৃহ রচনা করিতে,

পরিবার গঠন করিতে আমাদিগকে যথাসাধ্য তোমার জ্ঞান ও তোমার প্রেমের নির্দ্দেশ অনুসারে চলিতে হইবে। তুমি আপনার অশেষ প্রেমের ও জ্ঞানের সমাবেশে যে মানব-শরীর-মন রচনা করিয়াছ আমরা যদি তাহার বিকাশের ও উন্নতির প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া মোহান্ধ হইয়া তাহার সহিত ব্যবহার করি, তাহা হইলে আমরা তোমার সন্তানের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিলাম এবং তোমার জ্ঞান ও প্রেমের অনাদর করিয়া তোমার বিরোধী হইলাম। তাই তোমার পাদ-পদ্মে প্রার্থনা করি, তুমি তোমার সকল কন্যাকে শুভমতি ও ধর্ম্মভীরুতা বিধান কর যে, তাঁহারা যেন আপন আপন গৃহে তোমার জ্ঞান ও প্রেমকে মান্য করেন এবং পুত্র কন্যার জন্য নূতন গৃহ রচনা করিতে যেন প্রাণপণে জ্ঞান প্রেম পুণ্যের বিধি অনুসারে গৃহ রচনা করিয়া দেন। পরি-বারের উন্নতিসাধনে যেন সকলে সযত্ন হন। তোমার পাদপদ্মে এই প্রার্থনা করিয়া বার বার প্রণাম করি।

গার্হস্থ্য জীবনের প্রস্তুতি।

সৃষ্টি পরিবর্ত্তনশীল। সকল জীব জন্তুই অবস্থার পরিবর্ত্তনের অধীন। পশুপক্ষীরও বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্য যথাক্রমে উপস্থিত হয়। তাহাদিগকেও ভবিষ্যতের অভাব দূর করিতে প্রস্তুত হইতে হয়, কিন্তু পক্ষিমাতা হয়ত ভাবিয়া চিন্তা করিয়া আপনার ভবিষ্যৎ শাবকদিগের জন্য কুলায় প্রস্তুত করে না, তাহার ভিতরে দৈবশক্তি কার্য্য করিয়া থাকে, তাহাতেই সে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হয়। মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব বলিবার ইহাই একটি প্রধান কারণ যে, মানুষ ভবিষ্যতের অভাব জানিয়া তাহার যথাসম্ভব ব্যবস্থা করে। ঠিক বর্ত্তমান সময়ের জন্য বিশেষ কিছু করিবার নাই। যাহা করিতে হয় ভবি-ষ্যতের জন্য করিতে হয়। এইরূপ সুব্যবস্থার পরিমাণই সভ্যতার মাপ বলা যাইতে পারে। ভবিষ্যৎ শিশুর অভাব দূর করিবার ব্যবস্থা করা সকল সভ্যজাতির মধ্যে চিরকাল প্রচলিত আছে। অপর সকল অবস্থার বিষয়েও মানুষ সাবধান হইয়া পূর্ব্ব হইতে ব্যবস্থা করিয়া থাকে। বর্ত্তমান যুগে সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাশিত বা অপ্রত্যা-শিত সাধারণ বা আকস্মিক সকল প্রকার অবস্থার জন্য সকলকে প্রস্তুত করা বিশেষ নিয়ম হইয়াছে। গৃহে অগ্নিদাহ উপস্থিত হওয়া অত্যন্তই বিরল, কিন্তু এখন এমন নিয়ম করা হইয়াছে যে, যে গৃহে অধিক লোক একত্র বাস করিবে তাহাতে কিরূপ অগ্নিদাহ উপস্থিত হইলে কি করা হইবে তাহা স্থির করিয়া সমস্ত ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতে করা থাকে। কেহ জলমগ্ন হইলে বা উচ্চস্থান হইতে পতিত হইলে বা শকটাদির নীচে পড়িয়া গেলে কি উপায় করা হইবে তাহার ব্যবস্থা স্থির করা আছে। যেন সর্ব্বদাই সকল প্রকার দুর্ঘটনার জন্য সকলে প্রস্তুত রহিয়াছে। সভ্যজগৎ শরীর-সম্পর্কে বিশেষ বিশেষ

সাধারণ বা অসাধারণ অবস্থার জন্য যেমন সকল ব্যবস্থা করিয়া প্রস্তুত রহিয়াছে, সেইরূপ মন সম্পর্কেও মানুষের পরিবর্ত্তিত অবস্থার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত হইয়া আছে। কোন লোক যদি নীতির বিধি অগ্রাহ্য করিয়া জনসমাজের অনিষ্ট করে তাহাকে অনিষ্ট করিতে বাধা দিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। যদি সে অত্যন্ত অন্যায়কারী হয় তাহা হইলে তাহাকে দশ জনের সহিত বাস করিতে দেওয়া হয় না, পৃথক করিয়া রাখা হয়। যদি কেহ মানসিক বিকারগ্রস্ত হয় তাহার জন্যও ব্যবস্থা আছে। পক্ষান্তরে যখন কোন ব্যক্তির মানসিক উচ্চতা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তখন তাহাকে উচ্চস্থান দিবার ব্যবস্থা আছে।

সভ্যতা সকল প্রকার অবস্থার জন্য প্রস্তুত, এই নিয়মানুসারে প্রত্যেক রাজ্য আপনাকে রক্ষা করিতে বহু ব্যয় করিয়া সৈন্যদল রক্ষা করেন। কে শত্রু তাহা জানা নাই, কিন্তু শত্রু আসিতে পারে চিন্তা করিয়া তাহাকে পরাভূত করিবার সকল প্রকার ব্যবস্থা করিয়া রাখা হইতেছে। এজন্য বহু অর্থব্যয় করিয়াই রাজনীতিজ্ঞগণ সন্তুষ্ট থাকেন না, তাঁহারা সময় সময় কৃত্রিম যুদ্ধ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে তাঁহাদের সৈন্যদল সকল প্রকার কল্পিত শত্রুকে পরাজিত করিতে সমর্থ আছে কি না। যদি এক দেশ নূতন কোন অস্ত্র বা যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া নূতন বললাভ করেন অন্য সকল দেশের লোক তাহা গ্রহণ করিয়া সেইরূপ বা ততোধিক বল লাভ করিতে ব্যগ্র হন। কোথাও যুদ্ধ নাই, অথচ সকল রাজ্যই যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত। এইরূপ সকল বিষয়েই প্রস্তুত থাকা উচ্চ সভ্যতার নিয়ম।

আমরা যে অবস্থায় জীবনধারণ করিতেছি তাহাতে আমাদিগকে অনেক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ও একবারেই ভাবিতে হয় না, এ সকল বিষয়ে আমাদিগের প্রস্তুতির প্রয়োজন নাই। আমাদিগের নারীগণের আরও অল্প বিষয়ে প্রস্তুত থাকিতে হয়। তাহাদিগের কর্ত্তব্যের ক্ষেত্র ক্ষুদ্র, তথাপি তাঁহাদিগকেও আপন আপন কর্ত্তব্যের ভূমিতে কার্য্য করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। নর ও নারী মিলিত হইয়া পরিবার রচনা করেন। এই পরিবারই যখন সকল সামাজিক জীবনের মূল উপাদান, তখন এই পরিবারের প্রতি সকল প্রকার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার ভার পড়ে, এজন্য পরিবার রচনা করিতে যথাবিধি প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। যদি নরনারীগণ অপ্রস্তুত ভাবে সংসার রচনা করেন, তাহা হইলেও স্বাভাবিক ভাবে একটির পর একটি কর্ত্তব্য আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং তাঁহারা সে সকল কর্ত্তব্য পালন করিতে প্রস্তুত নহেন বলিয়া বিবিধ প্রকারের বিশৃঙ্খলতা, অভাব, রোগ, মৃত্যু প্রভৃতি উপস্থিত হইবে। রোগ হইবার পূর্ব্বে যদি সুচিকিৎসকের সহিত ব্যবস্থা না করা থাকে তাহা হইলে হয়ত সুচিকিৎসা হইবে না—মৃত্যু ঘটিবে। গৃহে অগ্নি প্রজ্জলিত

তাহা গ্রহণ করিয়া সেইরূপ বা ততোধিক

না করা থাকে তাহা হইলে হয়ত যথা-সর্ব্বস্ব ভস্মীভূত হইবে, সেইরূপ অন্ন বস্ত্রের ব্যবস্থা না করিয়া যদি পরিবার রচনা করা হয়, ক্ষুধার জ্বালায় হয়ত চৌর্য্য অবলম্বন করিতে হইবে, অথবা শিশুর জন্মের পূর্ব্বে যদি তাহার অভাব সকল মোচন করিতে প্রস্তুত না থাকা হয় হয়ত শিশু রোগগ্রস্ত হইবে কিম্বা অকালে কালগ্রাসে পতিত হইবে। আমাদের দেশে একটা প্রচলিত অথচ অর্থশূন্য কথা আছে. "অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহাই হইয়াছে"। সুচিকিৎসার অভাবে রোগী মারা গেল, সুব্যবস্থার অভাবে অগ্নিদাহে ধনক্ষয় হইল, অর্থোপার্জ্জনের অভাবে দারিদ্র্য পাপে মৃত্যুতে পতিত হইল, মাতার অপ্রস্তুতির জন্য শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হইল অথচ এক অদৃষ্টের দোহাই দিয়া সকল অপরাধ ঝাড়িয়া ফেলা হইল। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই, এখন সকল প্রকার রোগ, বিপদ, দুর্ঘটনার জন্য প্রস্তুত থাকা সভ্য-জগতের নিয়ম হইয়াছে, যে ব্যক্তি অপ্রস্তুত আছে সে তজ্জন্য ফলভোগ করিবে। অদৃষ্টের দোষ দিয়া নিস্তার পাইবে না।

কুমারীগণ স্কুল বা কলেজে পড়িতে পড়িতে হঠাৎ গৃহিণী হইয়া যান। সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় সংসারে প্রবেশ করিয়া সংসারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, কাজে কাজেই আপনি বিপন্ন হইয়া পড়েন ও অন্যকে বিপন্ন করেন,—হয়ত ক্রোড়স্থ প্রিয়তম শিশুর মৃত্যুর কারণ হন। বর্ত্তমান সময়ে এরূপ দুঃখের অবস্থা যখন তখন ঘটিয়া থাকে। ইউরোপ ও আমেরিকায় ভিন্ন ভিন্ন দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদ পত্রে পাঠ করিয়াছি যে বিলাতে একস্থানে একটি বিদ্যালয় হইয়াছে—এই বিদ্যালয়ে সংসার প্রবেশার্থিনীগণ শিক্ষালাভ করিবেন। কোন কুমারীর বিবাহ স্থির হইলে তিনি এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবেন এবং ছয়মাস কাল বিবিধ প্রকারের গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য সকল সম্পাদন করিতে শিক্ষা করিবেন—তাহার পর বিবাহ সম্পন্ন হইবে। অন্য এক দেশে কুমারীগণের শিক্ষার জন্য এক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে—ইহাতেও কুমারীগণকে বিবাহিত জীবনের জন্য প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইবে। উপযুক্তরূপ শিক্ষা হইলে তাঁহাদিগকে প্রশংসাপত্র দেওয়া হইবে—তাঁহারা certificated bride হইবেন। এইরূপ আরও অনেক উপায় অবলম্বন করিয়া কুমারীগণকে গার্হস্থ্য জীবনের কর্ত্তব্য সম্পাদনযোগ্য করিয়া দেওয়া হইতেছে।

আমাদের দেশের কুমারী ও বর্ষীয়সীগণ হয়ত এ সকল কথা শুনিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন। তাঁহারা হয়ত বলিবেন যে আমাদের দেশে এ সকল বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য কোন বিদ্যালয়ের প্রয়োজন নাই। তাঁহারা বলিবেন যে এ দেশ প্রাচীন সভ্যতার দেশ, এখানে মনুর সময় হইতে গার্হস্থ্য ও সামাজিক কর্ত্তব্য সকল সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে; মাতার নিকট গৃহকর্ম্ম শিক্ষা করিয়াই কন্যা আপ-

নার সংসারের সমস্ত কার্য্য চিরদিন উত্তমরূপে সম্পাদন করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা বর্ত্তমান সময়ের নানা শ্রেণীর গৃহস্থগণের পারিবারিক অবস্থা অবগত আছেন, তাঁহাদিগকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে কি সকল অবস্থার উপযোগী ব্যবস্থা আছে? গৃহে মিতব্যয়িতা ও সুব্যবস্থা কি আছে? শিশুগণের শরীর রক্ষা ও উন্নতির ব্যবস্থা কি আছে? তাহাদের মনের বিকাশের সুযোগ কি আছে? গৃহে ভৃত্য, আশ্রিত, প্রতিবেশীর প্রতি কি যথোপযুক্ত ব্যবহার হয়? এ সকল প্রশ্নের কি উত্তর পাওয়া যাইবে? গৃহে নবশিশু আসিলে, রোগ আসিলে, দারিদ্র আসিলে বা মৃত্যু আসিলে সমচীন ব্যবহার হয় কি না, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। সময় সময় নূতন বস্তু, নূতন শিক্ষা, নূতন ব্যবস্থা নূতন আদর্শ গ্রহণ করা প্রয়োজন হয়—তখন পুরাতন ত্যাগ করিতে হয়, এরূপ পরিবর্ত্তনও গার্হস্থ্য জীবনের আনুষঙ্গিক কর্ত্তব্য। অপরদিকে যে পরিবার আপনার কর্ত্তব্য সকল সুসম্পন্ন করে, কিন্তু সমাজের সহিত যোগ রাখে না বা যথাশক্তি সমাজের সেবা করে না তাহাকেও সুব্যবস্থিত পরিবার বলা যায় না; সর্ব্বোপরি পরিবার যদি সত্যধর্ম্মের সাধন-স্থান-রূপে গৃহীত না হয়, যদি কেবল শরীর ও মনের অভাব দূর করিতে ও উন্নতি করিতে ব্যবস্থা থাকে, যদি আত্মার স্বাস্থ্যেরও উন্নতির ব্যবস্থা না থাকে তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে পরিবারের ব্যবস্থা পূর্ণ হয় নাই।

বর্ত্তমান সময়ে শারীরিক, মানসিক ও ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিষয়ে যে আদর্শ আসিয়াছে, গৃহের ব্যবস্থা এরূপ হওয়া প্রয়োজন যে তাহা সেইরূপ জীবন ও চরিত্র গঠন করিতে পারে। আমরা গৃহের যে আদর্শ উপস্থিত করিলাম তাহা যদি গ্রহণীয় হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান সময়ের কুমারীগণের বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইতে কোন কোন বিষয়ে শিক্ষা, সাধন ও গঠন প্রয়োজন তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

যাঁহারা মনে করেন যে, যিনি জীবন দিয়াছেন তিনিই উপজীবিকা দিবেন, যিনি সন্তান দান করেন সন্তান রক্ষার জ্ঞানও তিনিই দিবেন, তাঁহারা ঈশ্বরের ব্যবস্থা দেখিতে পান নাই। ঈশ্বর মানুষের অন্তরে স্নেহ দিয়াছেন, মনে বুদ্ধি দিয়াছেন, পৃথিবীতে নানারূপ সামগ্রী দিয়াছেন, ইহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে মানুষকে স্নেহের তাড়নায় বুদ্ধি ও শক্তি ব্যয় করিয়া প্রয়োজনীয় বস্তু সকল সংগ্রহ করিতে হইবে। ফলে মানুষ আদিকাল হইতে এইরূপই করিয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমান সময়েও সেই চির-প্রচলিত নিয়ম অনুসারে কার্য্য করিতে হইবে; কিন্তু তাহার পূর্ব্বে সময়ের উপযোগী কার্য্য করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে হইবে, ইহারই নাম আমরা জীবনের জন্য প্রস্তুতি বলিতেছি। নারী গৃহিণী হইয়া জীবনে যে সকল কার্য্য করিবেন, তাহার জন্য প্রস্তুত না হইলে কখনও তাহা সুসম্পন্ন করিতে পারিবেন না।

আমরা অনেক সময়ে দেখিতে পাই, কন্যা-মনোনয়ন বিষয়ে কেহ বা দেহের সৌন্দর্য্য দেখেন, কেহ সঙ্গীত-প্রবৃত্তি দেখেন, কেহ বিদ্যা দেখেন, কেহ কেহ বংশ দেখেন, কোথাও পরিবার দেখিয়া থাকেন; এ সকলই দেখিবার বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু যদি স্বাস্থ্য না থাকে অথবা গার্হস্থ্য-জীবনের উপযোগী শিক্ষা না থাকে তাহা হইলে কখনও সুখী পরিবার হইতে পারিবে না। বিবিধ প্রকারের গৃহকর্ম্ম করিবার অভ্যাস না করিলে ইচ্ছা থাকিলেও নারীগণ কিছু করিতে পারেন না। রন্ধন, সীবন, গৃহসংস্কার, রোগীর শুশ্রূষা, শিশুপালন প্রভৃতি কার্য্যও নিজের হাতে না করিলে প্রকৃত শিক্ষা হয় না। সুগৃহিণীর পক্ষে একান্ত সহিষ্ণু হওয়া, অন্যের অভাব দুঃখের সহিত সহানুভূতি করা ও সকল বিষয়ে উজ্জ্বল কর্ত্তব্য জ্ঞান থাকা চাই। গৃহে সুশৃংখলতা ও সুনীতি রক্ষা করা সকল অবস্থায় অত্যন্ত প্রয়োজন, যিনি গৃহিণী হইতে প্রস্তুত হইতেছেন তাঁহাকে এ বিষয়ে সুশিক্ষিতা হইতে হইবে।

সর্ব্বোপরি নারীজীবনের জন্য প্রস্তুতির পথে ধর্ম্মশিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। যে গৃহিণী লক্ষ্মীরূপিণী বিশ্বজননীকে আদর্শরূপে দর্শন করিয়া তাঁহার অনুকরণ করিতে যত্ন করেন না, যিনি সকল মঙ্গল কার্য্যের জন্য মঙ্গলময়ীকে ধন্যবাদ করেন না, যিনি দুঃখ বিপদে দয়াময়ী মাতার চরণাশ্রয় লইতে শিক্ষা করেন নাই, তাঁহার সংসার সুখ শান্তির সংসার হইবার আশা নাই। গৃহিণী হইবার পূর্ব্বে ধর্ম্মদীক্ষা লওয়া ও ধর্ম্মসাধন আরম্ভ হওয়া প্রয়োজন।

নারীর আদর্শ এবং কার্য্য

ভারতবর্ষ জ্ঞান ও সভ্যতা বিস্তারের আদিস্থান। সুতরাং এদেশের নারীবৃন্দ পুস্তকের বিদ্যা অভ্যাস না করিয়া অনেকরূপ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। আদর্শ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকরূপে শিক্ষা না পাইয়াও কার্য্যতঃ ইহাঁরা উচ্চতা প্রদর্শন করিতেন। নারীর জীবনের কার্য্যক্ষেত্র জনসমাজ এবং পরিবারের আশ্রয়রূপ গৃহ। ভারতের গৃহে গৃহে আপন আপন কার্য্য ও সেবা শুশ্রূষা এমন পরিপাটীরূপে নিষ্পন্ন করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন যে তাহাতে তাঁহাদের ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা ভক্তি বিশ্বাস এবং নির্ম্মল প্রীতি ত প্রকাশ পাইতই, তদুপরি তাঁহাদের জ্ঞানেরও পরিচয় লাভ হইত। কোন সময়ে এদেশীয় কোন উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারীকে আমাদের দেশীয় রমণীগণের জ্ঞানাভাবের বিষয় স্মরণ করাইয়া বলা হইয়াছিল যে এ অবস্থায় এদেশীয় মহিলারা গৃহকর্ম্ম বিষয়ে কিরূপে দক্ষতা প্রকাশ করিবেন। উক্ত ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী তৎক্ষণাৎ বলিলেন "গৃহধর্ম্ম ও গৃহকর্ম্ম বিষয়ে নারীগণ জ্ঞান-শিক্ষাদ্বারা পাশ্চাত্য দেশেও উৎকর্ষ লাভ করে না। নারীগণ প্রাকৃতিক ভাবেই সে বিষয়ে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দুই এক জন মহিলা এমনও দেখা যায় যে জ্ঞানে উন্নত হইয়াও গৃহকর্ম্মে অনিপুণ।"

একথাটি বর্ত্তমান সময়ে আমাদের শিক্ষা-প্রাপ্তা মহিলাদিগকে অনুসন্ধানপূর্ব্বক বুঝিতে হইবে। আমরা এখন বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছি। আমাদের বাল্য এবং যৌবনকালে আমরা বহু অশিক্ষিতা জননী, ভগিনী এবং গৃহিণীগণকে ভদ্রগৃহে সন্দর্শন করিয়াছি! অথচ তাঁহাদের অনেকে বিষয় জ্ঞানে, সাংসারিক কর্ত্তব্য অবধারণে, গৃহকার্য্যে এবং জনসেবায় আশ্চর্য্য দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। নারীজাতিকে মূর্খ করিয়া রাখাই তখন এতদ্দেশীয় জনসমাজের চেষ্টা ও কর্ত্তব্য ছিল। অথচ বহুকাল হইতে হিন্দুজাতি মধ্যে জ্ঞানের আলোচনা ও সভ্যতার বিস্তার হইতেছে। তৎপ্রভাবে নারীগণ স্ব স্ব স্বভাবের মধ্যে লুক্কায়িত শক্তির গুণে জ্ঞান শক্তি সেবা ভক্তি ও আত্মত্যাগ শিক্ষা করিয়াছিলেন।

শিক্ষা এক, স্বভাবের পরিস্ফুরণই অন্য বস্তু। শিক্ষা দেওয়া এবং স্বভাবকে পরিস্ফুরিত হইতে দেওয়া উভয়ই আবশ্যক। কিন্তু উক্ত উভয় বিষয়ে সমভাবে দৃষ্টি রাখিয়া কি মহিলাদিগের শিক্ষাকার্য্য এখন সম্পন্ন হইতেছে? শিক্ষাদ্বারা স্বভাবের স্ফুরণ বাধা পাইতেছে। যাঁহারা বর্ত্তমান সময়ে সুশিক্ষিতা হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিভূষণে বিভূষিত হইয়াছেন, যাঁহারা অধুনা নানাস্থানে বালিকা ও যুবতীবৃন্দের শিক্ষয়িত্রী হইয়া শিক্ষাকার্য্য পরিচালনে নিযুক্ত রহিয়াছেন, তাঁহাদের এসকল বিষয় চিন্তা করা আবশ্যক। পূর্ব্বকালের অশিক্ষিতা অথচ গৃহকার্য্য এবং সেবাবিষয়ে সুশিক্ষিতা মহিলাগণের সহিত বর্ত্তমান কালের প্রণালীমত জ্ঞান-শিক্ষাপ্রাপ্তা যুবতী ও গৃহিণীগণের তুলনা করিয়া দেখা এবং দেখানও আমরা শিক্ষার এক অঙ্গরূপে অঙ্গীকার না করিয়া পারি না। আদর্শ, জ্ঞান প্রভাবে উজ্জ্বল ও খুব উচ্চ হয়। কিন্তু সে আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করা কঠিন অভ্যাসের আয়ত্ত। এ অভ্যাসে ক্লেশ আছে, ত্যাগ-স্বীকার আছে এবং পদস্খলনে নিরাশ হইবারও সম্ভাবনা রহিয়াছে। পূর্ব্বতন কালের রমণীবৃন্দ বাল্যকালাবধি ক্লেশ স্বীকারে ও আত্মত্যাগে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হইয়া উঠিতেন। সুতরাং যৌবনে বা জীবনে তাঁহারা সেবাব্রত ও গৃহকর্ম্ম-সুসাধন-ব্রতে নিরাশ কোন সময়েও হইতেন না। অধুনা জ্ঞান শিক্ষাদ্বারা অনেকের আদর্শ উচ্চতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ত্যাগস্বীকারে ও কার্য্যসাধনে অনভ্যাস-বশতঃ কার্য্যে বিনিযুক্ত হইতে ভয় ও নিরাশা আসিয়া উপস্থিত হয়। কার্য্যতঃ তাঁহারা অনেকে সেবা ও গৃহকর্ম্মের ক্লেশ স্বীকারে কুণ্ঠা প্রকাশ করিয়া থাকেন। বঙ্গীয় জনসমাজে বর্ত্তমান কালে প্রলয় উপস্থিত হইয়াছে। পুরাতন প্রথা রীতি প্রণালী ও অভ্যাস কি অধুনা অনেক পরিমাণে বিদূরিত হইয়া যায় নাই? অনেক নূতন ভাব গতি রীতি ব্যবহার বঙ্গীয় সমাজে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ভাল মন্দ বিচার করা এখন বড় সহজ নহে। তবে সমাজ হিতৈষিণী মহিলাগণের এ বিষয়ে চিন্তা করা কর্ত্তব্য বটে। ভাল মন্দ চিন্তার চক্ষেই পরিষ্কার প্রকাশ পায়।

যাঁহারা চিন্তা করেন তাঁহারা অন্যকে বুঝাইতেও চেষ্টা করিতে পারেন। যাঁহারা যুবতীবৃন্দের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের এবিষয়ে চিন্তা না করিলে কর্ত্তব্যে অবহেলা বুঝা যায়। তাঁহারা প্রাচীন কার্য্যতৎপরতার সহিত যদি বর্ত্তমান আদর্শের উচ্চতা মিলাইয়া শিক্ষাকার্য্য পরিপূর্ণ না করেন তবে কে আর তাহা করিবে?

যুবতী বা যুবকদিগকে জ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কষ্টসহিষ্ণুতা এবং আত্মত্যাগ শিক্ষা দেওয়াও অত্যাবশ্যক। আমাদের দেশীয় বালিকা ও যুবতীগণ অধুনা কেবল শিক্ষয়িত্রী হইবার উপযোগী শিক্ষা লাভ করেন। কিন্তু তাহার উপযোগী স্বাধীন চিন্তাশক্তির ব্যবহার শিক্ষা করিতে অভ্যস্ত হন কিনা সন্দেহ। প্রচুর অর্থ ভিন্ন শিক্ষাকালেই তাঁহাদের স্বীয় আবশ্যকতা পরিপূর্ণ হয় না। ব্যয়ের অল্পতা সাধনও শিক্ষণীয় বিষয় বটে। সকলেই এ জীবনে প্রচুর অর্থ বিত্তের অধিকারিণী হইবেন এমন নহে। কাহাকে দুঃখ দারিদ্র্য অভাব অনটনের তরঙ্গাঘাতে মুহুর্মুহুঃ হয়ত আহত হইতে হইবে। আত্মত্যাগ ও ক্লেশস্বীকারে অভ্যাস না থাকিলে তখন তাঁহারা দশদিক অন্ধকার দেখিতে বাধ্য হইবেন।

আমাদের দেশীয় আদর্শ রমণীগণের জীবন-চরিতে দেখিতে পাই তাঁহারা সুখের পরে দুঃসহ দুঃখে এবং স্বচ্ছল অবস্থার পরে দুঃসহ অস্বচ্ছলতার সমুদ্রে পড়িয়াছেন। অধুনা বঙ্গীয় শিক্ষিত জনসমাজ মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্ত না দেখা যায় এমন নহে। এজন্যই কষ্টসহিষ্ণুতাদিও শিক্ষা-বিষয়ের মধ্যে গণনা করিবার জন্য আমরা পরামর্শ দান করি।

জ্ঞানবলে আদর্শটী আধ্যাত্মিক বা মানসিক ভাবে অভ্যস্ত করিয়া শিক্ষা দেওয়া কঠিন নহে। কিন্তু কার্য্যতঃ সেই আদর্শানুসারে জীবনে ব্যবহারগত শিক্ষা দেওয়া খুবই কঠিন। আহার বিহার ঘরকন্না, আত্মীয় এবং অপর জনসেবা, রোগীর পরিচর্য্যা ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক আশা উৎসাহের সহিত নির্ব্বাহ করা খুবই আত্মত্যাগ এবং অভ্যাসের কর্ম্ম। গরুর গাড়ীর গরু যেমন দিন রাত্রি গাড়ী টানিতেছে, কখন আহা উহু করে না, তেমনি রমণীবৃন্দকে প্রতি গৃহে গৃহকর্ম্মের বিচিত্রতারূপ গাড়ী প্রতিনিয়ত টানিতে হয়। নিজের আহার নিদ্রা বিশ্রাম আমোদ আহ্লাদ ফাঁকে ফাঁকে নির্ব্বাহ করিয়া ঘরের সকলের জ্ঞানশিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা, গৃহের পারিপাট্য ও শৃঙ্খলা রক্ষা কার্য্যে সমস্ত শরীর মন প্রাণ ঢালিয়া দিতে হয়। এরূপ ঢালিয়া দিতে কেহ মনে করিলেই একদিনে সক্ষম হয় না! ইহার জন্য হৃদয়ভরা প্রীতি চাই, প্রাণভরা সঙ্কল্প চাই, দৃঢ়তর আশা চাই, অবিরাম উৎসাহ এবং আত্মত্যাগ চাই। অধিকন্তু ইহা সুস্পষ্টরূপে সম্পাদনার্থ উপযোগী নব্যশিক্ষা ও অভ্যাস আবশ্যক। সুতরাং শিক্ষার সহিত অভ্যাসের সামঞ্জস্য যাহাতে সংঘটিত হয় তাহাই প্রার্থনীয়। অভ্যাস, আত্মত্যাগ এবং কষ্ট-সহিষ্ণুতা পুরাকালে অস্মদ্দেশে নারীসমাজে যথেষ্টরূপে বিদ্যমান ছিল। বর্ত্তমান কালে জ্ঞানের প্রবর্ত্তনা

হইয়াছে। সুতরাং অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমানের মিলন অধুনাতন শিক্ষিতা মহিলার আত্মোন্নতি ও সামাজিক সমুন্নতি সাধন জন্য অলঙ্ঘনীয়রূপে প্রয়োজন। আমরা কেবল আকাশব্যাপী আদর্শের বিষয় বলি না, ভূতলে কিরূপে বিচরণ করিতে হয় তাহাও আমাদের পাঠিকাবর্গের মনে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। তাঁহারা স্বকল্যাণ ও স্বদেশের কল্যাণের জন্য এসকল বিষয়ে প্রণিধান করুন। সীতা সাবিত্রী গার্গী মৈত্রেয়ী গোপা প্রভৃতির জন্ম ও লীলাভূমি এ ভারতভূমি। তাঁহাদের পূতচরিত্র ও কর্ম্মঠতা এখানে নানারূপে বর্ত্তমান। পাশ্চাত্য মহিলাগণের চরিত্র-গাথা এবং কর্ম্মঠতারও অধুনা এ ভারতে গুণগান হইতেছে। আমাদের মহিলাগণ পূর্ব্বের সহিত পশ্চিমের মিলনকে এবং জ্ঞানের সহিত কর্ম্মঠতাকে গ্রহণ করেন, কেনা ইহা আকাঙ্ক্ষা করে? কিন্তু মহিলাগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এবিষয়ে চিন্তা ও ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির না করিলে কোন পুরুষের চেষ্টায় ইহা হইবে না। ঈশ্বর এবিষয়ে সহায় হউন, আমরা এই প্রার্থনা করি। আদর্শও ও ঈশ্বরের দান, কর্ম্মশক্তিও তাঁহারই দান। জীবনে এবং গৃহকর্ম্মে ঈশ্বর তাঁহার কন্যার সাক্ষাৎ সহায়, ইহাতে আমরা অণুমাত্র সন্দেহ করি না।

শ্রীঈশানচন্দ্র সেন

মাতা ও সন্তানশিক্ষা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

পিতা মাতা বি এ. এম, এ উপাধি লাভ করিলেই যে সন্তানশিক্ষার উপযুক্ত হইতে পারেন না—সন্তানশিক্ষার ব্যাপার যে অতিশয় গুরুদায়িত্বপূর্ণ তাহার কথঞ্চিৎ আভাস দিবার জন্য অদ্য আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ হইতে আধুনিক যুগে যে এ বিষয়ের ধারণার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে—তাহারই সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব। আপনারা "কিণ্ডার গার্টেনের" প্রতিষ্ঠাতা জর্ম্মাণ দেশীয় মনোবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত ফ্রেডারিক ফ্রোবেলের নাম শুনিয়াছেন। শিশুশিক্ষার সংস্কার সাধন বিষয়ে তাঁহার প্রাণপণ প্রচেষ্টা জগদ্‌বিশ্রুত। অনন্যসাধারণ প্রতিভা, গভীর সূক্ষ্মদৃষ্টি ও উদার সহানুভূতি বলে তিনি শিশুদিগের অভাব ও আকাঙ্ক্ষা যেরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন—এমন অতি অল্প লোকেই পারিয়াছেন। তিনি প্রতিভা ও অভিজ্ঞতা হইতে যে তত্ত্বে উপনীত হইয়াছিলেন—আমরা তাহার সম্বন্ধেই দুই চারি কথা বলিব। আজকাল কোন জিনিষের উপর "বিজ্ঞানের" মোহর অঙ্কিত না থাকিলে—বাজারে তাহার কোনই মূল্য থাকে না; পাঠক পাঠিকাকে নির্ভয় করিবার জন্য আমি প্রথমেই বলিয়া রাখিতেছি যে ফ্রোবেল দীর্ঘকাল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়াছিলেন এবং বিজ্ঞান জগতের ক্রমবিকাশ নীতিকেই

শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার জন্য তিনি জীবনব্যাপী পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার কথা "পাগলের প্রলাপ" বলিয়া উড়াইয়া দিবার যো নাই।

প্রাচীনকালে লোকে শিক্ষা অর্থে সাধারণতঃ জ্ঞানের বৃদ্ধিই বুঝিতেন। মানবের চতুর্দ্দিকে অনন্ত জ্ঞাতব্য বিষয় বিদ্যমান; এই অনন্ত জ্ঞাতব্য বিষয় হইতে যত অধিক পরিমাণ জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া শিক্ষার্থীর মনের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিতে পারা যায়—ততই শিক্ষার্থী শিক্ষিত হইয়া উঠে। অর্থাৎ মানুষ যত অধিক বিষয় জানিবে ততই সে শিক্ষিত বলিয়া বিবেচিত হইবে। যদি কোন ব্যক্তি অঙ্ক শাস্ত্রের অতি কঠিন প্রশ্ন গুলির সমাধান করিতে পারেন তবে তিনি শিক্ষিত ব্যক্তি; যদি কেহ তর্কশাস্ত্রের বিচার ও মীমাংসা লইয়া সূক্ষ্ম আলোচনা করিয়া কোন প্রতি-দ্বন্দ্বীর সহিত সপ্তাহকাল বাক্‌যুদ্ধ চালাইতে পারেন—তবে তিনি শিক্ষিত ব্যক্তি; যদি কোন লোক ব্যাকরণ শাস্ত্রের সূত্রগুলি অবিকল আওড়াইয়া যাইতে পারেন এবং সেই সকল সূত্রের টীকা টিপ্পনী লইয়া বিচার ও তর্ক করিতে পারেন—তবে তিনি শিক্ষিত ব্যক্তি। জ্ঞানই শিক্ষার অভ্রান্ত লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত ছিল। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত গাণিতিক বিদ্যায় সুপণ্ডিত ব্যক্তি সংসারের ও গৃহস্থলীর কাজকর্ম্মে যদি সূক্ষ্ম যুক্তির পরিবর্ত্তে যুক্তিহীনতারই পরিচয় প্রদান করেন—যদি তিনি ভাবী দুর্ভিক্ষের বিচার না করিয়া নিজের গোলায় সঞ্চিত ধান্যগুলি বিক্রয় করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন—তাহা হইলেও কি তাঁহাকে সুশিক্ষিত বলিতে হইবে?—এরূপ প্রশ্ন কাহারও মনে কখন উদিত হইত না, সুতরাং তিনি "শিক্ষিত" নামেই চলিয়া যাইতেন। সুনিপুণ তার্কিক যদি "কুমড়া পাকা হইলে সুমিষ্ট হয় অতএব লাউ পাকা হইলেও নিশ্চিত সুমিষ্ট হইবে"—এই যুক্তিতে বাজারে গিয়া বৃহদায়তন লাউ কিনিয়া অর্থের সদ্ব্যবহার করেন—তাহা হইলেও তিনি সুশিক্ষিত; বৈয়াকরণ যদি একখানি পত্র লিখিতে বসিয়া ভাষার শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া বসেন—তাহা হইলেও তিনি শিক্ষিত, কারণ তিনি পাণিনি বা বোপদেব কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছেন। এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায় যে লোকে তখন শুধু জ্ঞানের মোহে মুগ্ধ ছিলেন—কিন্তু সেই জ্ঞান কাহার, কি উপায়ে ও কি প্রণালীতে তাহা উপার্জ্জিত হইয়াছে—সে বিষয়ে একবার চিন্তাও করিতেন না। বেশী দীর্ঘকালের কথা নহে—আমাদের ছাত্রাবস্থায়, আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ, এ সনদ লাভ করিলাম—তখন আমি যে একটী শিক্ষিত যুবক এ বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিল না। সকলেরই নিকট প্রশংসিত হইলাম। কিন্তু তাহার পরেই—সেই পরীক্ষায় পাশ হওয়া উপলক্ষে যখন আমার বন্ধু বান্ধবেরা "ভোজ" খাইতে উদ্যত হইলেন তখন সেই ভোজের উপকরণ ক্রয়কালে আমার পল্লীগ্রামের বন্ধুরা আমাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক দোকানে পাঠাইলেন না।—ইহার কারণ আপনারা অনুমান

করিতে পারুন বা না পারুন, আমি ইহার কারণ বুঝিয়াছিলাম—আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ পাইলেও প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রের সনদ পাই নাই—বন্ধুরা বেশ বুঝিয়াছিলেন যে আমি একটী "জ্ঞানী-মূর্খ।" কর্ম্ম বিরহিত জ্ঞানের এতদপেক্ষা সুতীব্র সমালোচনা আর কি হইতে পারে?

ফ্রোবেল বলিলেন—যে জ্ঞান দিয়া তোমরা মানুষের মনকে সজ্জিত করিতেছ সে কাহার জ্ঞান তাহা ভাবিয়াছ কি? সে যে পরের ধার করা জ্ঞান--পরের শ্রমোপার্জ্জিত জ্ঞানে সাজিয়া গুজিয়া জগতের বাহবা লাভ করিলে তোমার তৃপ্তি কোথায়?—তোমার স্মৃতিশক্তির প্রশংসা করি, তোমার আয়াসেরও প্রশংসা করি—তুমি স্মৃতির বলে বহু আয়াসে পরের জ্ঞানকে নিজের মনে গাঁথিয়া রাখিয়াছ। এখন ভাবিয়া দেখ, যদি তুমি তোমার ফুলের গাছে পরের বাগান হইতে বহু যত্নে সুন্দর কুসুমরাজি সংগ্রহ করিয়া সূত্রের সাহায্যে সেই ফুলগুলি বাঁধিয়া দাও—তবে তোমার ফুলের গাছে একটা ক্ষণিক রূপের শোভা ফুটিয়া উঠিতে পারে, কিন্তু তাহাতে কি তোমার মনের তৃপ্তি হয়? তোমার মনের ভিতরে কি এই অতৃপ্তি থাকিয়াই যায় না—এ কাহার ফুল—এ শোভা কতক্ষণের জন্য? অথবা ভ্রান্ত তুমি—যদি তোমারও ইহাতে কোন তৃপ্তি হয়, তাহা হইলেও তোমার সেই কুসুম তরুর তরুজীবনের সার্থকতা কোথায়? উপযুক্ত কালে প্রাণের ভিতরের আবেগপূর্ণ স্পন্দন যদি বসন্তের স্পর্শ লাভ করিয়া মনোহর কুসুম আকারে বিকশিত হইতে পারিত, তবেই তাহার ক্ষুদ্র জীবন সাফল্যের পরিপূর্ণতা লাভ করিত। কিন্তু হায়! ধার করা ফুল অঙ্গে পরিয়া সে অনাবিল আনন্দের সামান্য অনুভূতিও সে জীবনে লাভ করিতে পারিল না।

মানুষ, তুমি ভুল করিতেছ—শিক্ষা বাহিরের ব্যাপার নহে, শিক্ষকও বাহিরে নাই। বাহিরের জিনিষ জোর করিয়া তুমি ভিতরের করিয়া দিবে—সে সাধ্য তোমার নাই। পরকে কেহ জোর করিয়া কখনও "আপন" করিতে পারে না। তুমি কাগজের ফুল প্রস্তুত করিয়া বাহির হইতে তাহাতে সুগন্ধ অর্পণ করিয়া তাহাকে সুগন্ধি কুসুমে পরিণত করিতে চাহিতেছ—তোমার মহৎ ভ্রান্তি, কারণ দেখিতে পাইবে বাতাস বহিলেই তোমার সেই কৃত্রিম ফুলের কৃত্রিম সুগন্ধ কোথায় "উবিয়া" যাইবে। কিন্তু স্বভাবের নিয়মে ললিত লতার দেহে যে বিচিত্র কুসুম বিকশিত হইয়া উঠে—তাহার মর্ম্মস্থলের পুলক স্পন্দিত হইয়া যে সুধাময় গন্ধের আকারে বাহিরে প্রকাশিত হয়—সে গন্ধ বাতাসে মিশিয়া চতুর্দ্দিক আমোদিত করে। তুমি ভাবিতেছ—কেন, আমরা তো বাহিরের খাদ্য গ্রহণ করিয়াই শরীরের পুষ্টি সাধন করি, তেমনি বাহিরের জ্ঞানরাশির দ্বারা মন ও আত্মার পুষ্টিসাধন করিব। ভুল কথা—বাহিরের জিনিষকে আত্মস্থ করে কে? তুমি মৃত-মানবের মুখের মধ্যে পুষ্টিকর সুখাদ্য গুঁজিয়া ইহার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার।

তোমার উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিক প্রণালীতে প্রস্তুত আহার্য্যও মৃতের পুষ্টি-সাধন বিষয়ে সম্পূর্ণ বিফল হইবে। তোমার এ মোহ দূর কর—বাহিরের কেহ বাহিরকে "ভিতর" করিতে পারে না—ভিতরই বাহিরকে আত্মস্থ করিতে পারে—প্রাণই নিজের জীবনীশক্তি দ্বারা বাহির হইতে রসাকর্ষণ করিয়া আপনার পুষ্টি-সাধন করিতে সমর্থ হয়।

এইবার "প্রাচীন শিক্ষা" ও "নূতন শিক্ষার" মধ্যে মূলতঃ পার্থক্য কোথায়—তাহা আমরা কতক পরিমাণে বুঝিতে সমর্থ হইব। প্রাচীন শিক্ষকেরা মনে করিতেন—শিশুর মন অলিখিত কাগজ খণ্ডের ন্যায়, তাহাতে যাহা ইচ্ছা লিখিয়া দেওয়া যাইতে পারে। অথবা উহা কোমল কর্দ্দমপিণ্ডের ন্যায়—তাহাকে যেরূপ ইচ্ছা আকৃতি প্রদান করা যাইতে পারে। অন্য কথায় শিক্ষক শিশুকে যেরূপ ইচ্ছা শিক্ষা দান করিতে সমর্থ। শিক্ষা সম্বন্ধে যাঁহারা এরূপ ধারণা পোষণ করেন, তাঁহাদের নিকট বাহিরের শিক্ষক ও শিক্ষনীয় বিষয়ই প্রাধান্য লাভ করে। শিক্ষক যন্ত্রী—শিক্ষনীয় বিষয় যন্ত্র ও উপকরণ—যন্ত্রী যন্ত্রের ব্যবহার করিয়া মৃত্তিকাপিণ্ডকে ইচ্ছামত আকার দান করিবেন। কুম্ভকার যেমন কর্দ্দমপিণ্ড লইয়া নিজের ইচ্ছামত কখনও তাহা হইতে ঘট কখনও হাঁড়ি কখনও সরা—কখনও অপর কিছু গঠন করিয়া থাকে—এও কতকটা সেইরূপ ব্যাপার। অথবা শিশুর মনটী অলিখিত কাগজ খণ্ডের মত পড়িয়া রহিয়াছে, তুমি তাহাতে ইচ্ছামত যাহা কিছু লিখিয়া দিতে পার। ইহাই ছিল প্রাচীনদিগের ধারণা।

ফ্রোবেল প্রভৃতি আধুনিক শিক্ষা-প্রবর্ত্তকগণ বলেন—এরূপ ধারণা সর্ব্বৈব ভ্রান্ত এবং প্রভূত অনিষ্টকারী। শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন সে শূন্য মন লইয়া আসে না—প্রকৃতি মাতা তাহার সেই ক্ষুদ্র মনের মধ্যে মহত্ত্বের বহু উপাদান প্রচ্ছন্নভাবে সজ্জিত করিয়া রাখেন—এগুলি যেন "সম্ভাবনার" আকারে তাহার ভিতরে সুপ্ত থাকে। অর্থাৎ শিশু জন্মসময়ে প্রকৃতি হইতে বহুবিধ বৃত্তির অঙ্কুর লইয়া আসে। সেগুলি শক্তির অঙ্কুরমাত্র—একথা ভুলিলে চলিবে না।

আমাদের দেশেও প্রবাদ আছে যে শিশুর জন্মের ষষ্ঠ দিবসে বিধাতাপুরুষ গভীর রাত্রে সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিয়া শিশুর ললাটে অদৃষ্ট-লিপি লিখিয়া দিয়া যান—সেইজন্য ঐ দিবস সূতিকাগৃহে একটী দোয়াত ও কলম সজ্জিত করিয়া রাখা হয়। আপনারা কি এই জিনিষটীকে কুসংস্কার বলিয়া হাঁসিয়া উড়াইয়া দিবেন? আজকালকার তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায় অনেক জিনিষকেই কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিতেই ব্যগ্র থাকেন। আমি "আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা"র পক্ষপাতী নহি, কিন্তু তথাপি আমি এই কথা বলিতে চাই যে কোন জাতিতে বা কোন সমাজে যে জিনিষটী অতি দীর্ঘকাল ধরিয়া আপনার অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিয়াছে—সে জিনিষের মূলে কোন হিতকর সত্য ছিল—হয়তো কালে তাহার বিকৃতি ঘটিয়া তাহার

সত্যরূপ প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। উপরি-উক্ত বিষয়টী যদি কুসংস্কার হয় তবে আমি বলিব যে এই কুসংস্কারটী এইরূপ একটী মূল সত্যেরই বিকৃতি মাত্র। ফ্রোবেল যাহা বলিয়াছেন—এই সংস্কারে কি তাহারই সমর্থন হইতেছে না। সত্যই বিধাতাপুরুষ শিশুর ললাটে অদৃষ্ট-লিপি লিখিয়া দেন। কবি নীলকণ্ঠ তাঁর একটী সঙ্গীতে গাহিয়াছেন—"যা আছে কপালে, ঘটবে কালে কালে, কর্ম্মফলের ফল ফলিবে।" ভক্ত সাধক কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন—তোমরা বল বিধাতাপুরুষ শুধু ললাটে ভাগ্যলিপি লিখিয়া দেন—আমি বলি শুধু ললাটে নয়, বক্ষে চক্ষে, হৃদয়ে বাহুতে, কণ্ঠে জিহ্বায়,—সর্ব্বাঙ্গেই তিনি এ লিপি লিখিয়া দেন। ভক্তেরা শিশুকে এই চক্ষেই দেখিয়া থাকেন—সে মাংসপিণ্ড নহে, শুধু জড়-দেহী নয়; অসীম রহস্যসিন্ধুর মধ্য হইতে একটী রহস্যময় বুদ্বুদের মত সে ভাসিয়া উঠে—সে ক্ষুদ্র, কিন্তু সে অসীমেরই অংশ। সে কণিকা হইতে পারে, কিন্তু সে অনন্তেরই কণিকা; সে বীজ হইতে পারে, কিন্তু তাহার সেই ক্ষুদ্র বীজ-হৃদয়ে অনন্ত তরুপরম্পরার জীবনীশক্তি নিহিত আছে। এমন জিনিষকে নিত্য নৈমিত্তিক বলিয়া উপেক্ষা করা চলে না—এ জিনিষ শুধু জড় নহে, ইহা অমরের অমৃতে অভিষিক্ত।

ফ্রোবেলেরও ইহাই বিশ্বাস—শিশু অনন্তের সন্তান—অনন্তের শক্তি বীজের আকারে তাহার ভিতর বর্ত্তমান। তাঁহার মতে শিক্ষা বাহিরের ব্যাপার নহে—ভিতর হইতে ক্রমবিকাশের জিনিষ। কিসের বিকাশ?—ঐ প্রচ্ছন্ন শক্তিনিচয়ের অঙ্কুরের বিকাশ। শিক্ষার অর্থ মানবের মধ্যে সেই অনুভূতি জাগ্রৎ করিয়া দেওয়া যাহার আলোকে সে ভগবানের সহিত আপনার একত্ব উপলব্ধি করিয়া, সেই মহান্ গৌরবের উপযোগী জীবনযাপন করিয়া এবং এইরূপে আপনার নিয়তিকে পূর্ণ করিয়া সুখী ও ধন্য হইতে পারে। এ বিকাশ কিরূপে সাধিত হয়?

শিশুর শিক্ষা অর্থে যদি আমরা শিশুর অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক বৃত্তির বিকাশ বুঝি—তাহা হইলে বাহিরের শিক্ষক ও শিক্ষণীয় বিষয় অপেক্ষা আর একটী জিনিষ সমধিক প্রাধান্য লাভ করে—সে শিশু স্বয়ং। যদি বিকাশের আদর্শে শিক্ষাদান করিতে হয় তবে যে জিনিষকে বিকশিত করিতে হইবে—সর্ব্বাগ্রে তাহার প্রকৃতি পাঠ করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। তাহা না জানিলে উপযোগী উপায় অবলম্বন অসম্ভব। এইজন্য শিশু শিক্ষায় সর্ব্বাগ্রে শিশু-চরিত্র পাঠ আবশ্যক।

তাহার পর বিকাশের নিয়ম কি তাহাও জানা আবশ্যক। ফ্রোবেল বলেন—বহিঃপ্রকৃতির কার্য্যাবলী হইতে (যেমন তরুজীবনের বিকাশ ইতিহাস) আমরা এ বিষয়ে উপদেশ ও ইঙ্গিত লাভ করিতে পারি। তিনি তরুর এই বিকাশ নীতিকে কিরূপে মানব-চরিত্র-বিকাশের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াছেন আগামী সংখ্যায় আমরা সেই বিষয়ের আলোচনা করিব।

ক্রমশঃ।

শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার।

আতিশয্য।

কথায় বলে বাড়াবাড়ী ভাল নয়। কথাটা বড়ই ঠিক। তবু কিন্তু দুই চারি জন খাঁটি লোক ছাড়া বাড়াবাড়ী করিতে কেহ ছাড়ে না। আতিশয্যের প্রতি মানুষের কেমন যেন একটা টান দেখিতে পাওয়া যায়। বাড়াবাড়ীটা যে শুধু একটা মোহ তা নয় এটা ব্যামোহও বটে।

বিধাতা মানুষকে ক্ষুধা তৃষ্ণার অধীন করেছেন। বিধাতাই আবার গাছের ফল মুল, নির্ঝরের নির্ম্মল শীতল জল, মাতা, গাভী, ছাগাদির উপাদেয় দুগ্ধও যোগাইয়াছেন। স্বচ্ছন্দে ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ হয়। বোধ হয় লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে তা'তে কুলায় না। তাই ধান্যাদি শস্য কৃষিদ্বারা উৎপন্ন করিয়া সে অভাব পূর্ণ করা যায়। মানুষের মন কিন্তু তাতে উঠে না। আরও কিছু চাই। আর আসিবে কোথা হতে? কেন? ছাগ, মৎস্যাদি প্রাণীর ত অভাব নাই। তা'রা ত মানুষের উদরপূর্ত্তির জন্যই সৃষ্ট। তা' ছাড়া তাদের কি প্রয়োজন? আহারের সামগ্রী এইরূপে বাড়ে। বাড়ার কি শেষ আছে? কৃষি-বিজ্ঞানের বলে নূতন অস্বাভাবিক কত ফল উৎপন্ন হইতেছে। আর ছাগাদি হইতে ক্রমে অশ্ব, অশ্বতর প্রভৃতি কত প্রাণী মানবের উদর-গহ্বরে স্থানলাভ করিতেছে। কুকুর বিড়ালের অধিক বিলম্ব নাই। আরও কি হ'বে, ভবিষ্যৎ যখন বর্ত্তমান হ'বে তখন জানা যাইবে।

আহার্য্য অবশ্য উপাদেয় হওয়া চাই। আর খাদ্যকে উপাদেয় করিতে তীক্ষ্ণ ক্ষুধাই সুক্ষম। কিন্তু ক্ষুধাশান্তির পরিবর্ত্তে রসনার তৃপ্তিসাধনই ক্রমে আহারের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই খাদ্যে তৃপ্তিকর উপাদানের প্রয়োজন। নানা প্রকার মালমশলাযোগে প্রস্তুত গুরুপাক পোলাও কালিয়া মিষ্টান্ন সামান্য সুপাচ্য সিদ্ধপকের স্থান গ্রহণ করে। ফলে সুস্থ শরীর ব্যস্ত হয়। সুতরাং কাঁটাদ্বারা কাঁটা তোলার মত—গরম মসলাদিজনিত ব্যাধির উষ্ণতর মসলা ভিন্ন প্রতীকার হয় না। এ মসলা ডাক্তারখানার শিশি করা ছাপমারা ঝাঁঝালো মসলা। গৃহস্থের বাসভবনকে হাঁসপাতালে পরিণত করে—আতিশয্যের কি কম প্রকোপ?

শীতাতপ হ'তে দেহকে রক্ষা করিবার জন্য আচ্ছাদন চাই। বল্কল আছে; মেষাদির অতিরিক্ত লোম আছে; মৃত পশুর চর্ম্ম আছে। প্রয়োজন সাধনে বড় বেশী ব্যাঘাত হইবার কথা নয়। বোধ হয় পরিমাণে কুলাইত না। বেশ, কার্পাসাদি হইতে বস্ত্র প্রস্তুত করা যায় ধুতি, শাড়ী, উত্তরীয়ের অভাব হবে কেন? তবু কেন যেন অভাব হয়। তাই সূতার জন্য লক্ষ লক্ষ রেশমের কীটকে যত্নে লালন পালন করিয়া বিনাশ করা প্রয়োজন হয়।

আর এই সকল বস্ত্র কেবল ধুতি, শাড়ী, ওড়নারূপে ব্যবহার করিলেই চলিবে না। লজ্জা কি কুক্ষণেই সমাজে প্রবেশ করিয়াছিল—তাহাতেও বাড়াবাড়ী। জামা, পাজামা চাই; ব্লাউজ, পেটিকোট চাই। তাও না হয় হ'ল—কিন্তু ফর্দ্দ ত

এখানেই শেষ হল না। শার্ট, পাঞ্জাবী, আচকান, চাপকান, কোট, ওয়েষ্টকোট, টাই, কলার, মোজা, কম্‌ফার্টার, ট্রাউজারস্‌, ড্রয়ারস্‌, ব্রীচেস্‌, ব্রেসেস্‌, ইত্যাদি ইত্যাদি সহস্র পোষাক পুরুষের, আর—নাম জানি না, কিন্তু—অন্ততঃ সাত সহস্র আচ্ছাদন স্ত্রীলোকের প্রয়োজন। ভবিষ্যতে বোধ হয় মহা আড়ম্বরে বিন্যস্ত বস্ত্রসমষ্টি বাহিরে ও অন্তঃপুরে ঘুরিয়া বেড়াইবে; তার মধ্যে মানুষের কোন চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হইবে না। না হইবারই ত কথা। বস্ত্রভারে পিষ্ট মানবজাতি কতদিন আর টিকিবে? আতিশয্যের মোহে লোকে বিস্মৃত হয় যে বস্ত্রবাহুল্যে শরীর দুর্ব্বল হয়;—পুরুষ হীনবীর্য্য হয়; নারী সন্তান প্রসবে নিজের ও সন্তানের জীবন শঙ্কটাপন্ন করেন।

বস্ত্রাদি সম্বন্ধীয় আর্টের কথা না উল্লেখ করাই ভাল। আর্টের নির্ম্মম প্রকোপ অষ্ট্রিচ্‌, বার্ড-অব-পারাডাইস প্রভৃতি প্রাণী নির্ব্বংশ হইবার উপক্রম হইয়াছে।

বাড়াবাড়ীটা লোকের সবতাতে। জ্ঞানানুশীলনেই কি কম? সাহিত্যের দৃষ্টান্ত দি। মিল্টন ইংলণ্ডের একজন মহাকবি। তিনি সুললিত গম্ভীর ছন্দে তাঁর কাব্য লিখিয়াছেন। গুণগ্রাহী পাঠক তাহা পাঠ করিয়া প্রীত হইয়া তার সমালোচনা লিখিলেন। সাহিত্য-চর্চ্চার ইচ্ছা থাকিলে শুধু মিল্টনের কাব্য পড়িলেই হইবে না—সমালোচনাটিও পড়া চাই। কিন্তু সমালোচনার রসাস্বাদন বলিয়া ত একটা জিনিষ আছে। তাহার ফলে সমালোচনার সমালোচনা উৎপন্ন হইল। ক্রমে যে কেহ সাহিত্যিক হইবার আকাঙ্ক্ষা রাখিবে তাহাকেই মূল কার্য্যটির সহিত তাহার সমালোচনা, সমালোচনার সমালোচনা, তস্য সমালোচনা,—এইরূপে সোপানক্রমে চতুর্দ্দশ "তস্য" আয়ত্ত করিতে হইবে। তবে পণ্ডিত হওয়া যায়। বাড়াবাড়ীর কি শেষ আছে? বোঝা ক্রমেই বেড়ে যায়।

ইতিহাস বলে একটা জিনিষ আছে। তাহাতে স্বদেশ বিদেশের পূর্ব্বকথা জানা যায়। উপকথায়, কিম্বদন্তীতে জানা যাইত কবে কোন মহাপুরুষ লোকশিক্ষার জন্য অবতীর্ণ হন; কোন বীর স্বদেশকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন। পাঁচালী, কথকতায় লোকে শ্রদ্ধার সহিত সেই কাহিনী শুনিত; তাঁদের উদ্দেশে প্রণাম করিত; তাঁদের গৌরবে নিজেদেরকে গৌরবান্বিত মনে করিত। কোথা থেকে "ঐতিহাসিক তথ্য" বলে' একটি ধুয়া উঠিল। সূক্ষ্ম—অতি সূক্ষ্ম গবেষণা আরম্ভ হইল। ছোট বড়, কাজের অকাজের সকল কথাই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান পাইল। মান্ধাতার আমলের কোন্‌ রাজার কোন্‌ সিপাহীর চোখ কাণা ছিল, অথবা তাঁর রাণীর কোন্‌ পরিচারিকার পায়ে গোদ ছিল, সে তথ্যও এখন ঐতিহাসিকের স্মৃতিমন্দিরে যত্নে রক্ষিত হওয়া চাই! আতিশয্যের বড়ই বালাই।

বিজ্ঞান ও দর্শনরূপ দুই যন্ত্র আছে যাহা দ্বারা মানব নিজের স্বচ্ছন্দ স্থিতি ও

গতি নির্ব্বাহ করিবে। ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক, মূল ও স্থূল সত্যগুলি এই দুই যন্ত্রদ্বারা আয়ত্ত করিয়া মানব ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের পথ নির্দ্ধারণ করিবে। কিন্তু অতিশয়তার এমনি অমোঘ আকর্ষণ, মানুষ মূলে ও স্থূলে কি তিষ্ঠিতে পারে? জটিল শাখা পল্লবের অন্ধতিমিরে সহজ সরল পথ হারাইয়া যায়; কুটিল সূক্ষ্মের ক্ষীণতা কার্য্যভার বহনে অক্ষম। বিজ্ঞানের উচ্চ সত্য আর দর্শনের গভীর তত্ত্ব মানবকে শান্তির আবাস হইতে ভ্রান্তির প্রান্তরে উপনীত করেছে।

আতিশয্যের সার্ব্বভৌম প্রভাব। ধর্ম্মসাধনও অব্যাহতি পান নাই। অন্তর্নিহিত সত্য-শিব-সুন্দরের বিমল প্রকাশে আনন্দে আত্মহারা হওয়াই মানুষের চরমগতি। পূজা উপাসনাদি এই লক্ষ্যের সাধনা। মন্ত্রোচ্চারণ, নিবেদন, সঙ্কীর্ত্তনাদি পূজার উপচার। কিন্তু এখানেও অতিশয়তা সকল নষ্ট করিয়াছে। বাগ্‌বাহুল্য, নৈবেদ্যের আড়ম্বর, গীতবাদ্যোদ্যমে—বাহ্য আয়োজনের জটিলতায়—সরল, সশ্রদ্ধ, আন্তরিক উপাসনা লোপ পাইয়াছে। পূজার আচার উপচার পূজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। আতিশয্য কি কম অনিষ্টের হেতু?

অন্নাচ্ছাদনের আতিশয্যে শারীরিক অনিষ্ট। পাণ্ডিত্যের আতিশয্যে মানসিক অনিষ্ট। পূজোপচারের আতিশয্যে আধ্যাত্মিক অনিষ্ট। সত্যই সুধী বলিয়াছিলেন—সর্ব্বম্ অত্যন্তগর্হিতম্।

শ্রীপ্রেমসুন্দর বসু।

দুই রাবি।

অকলঙ্ক পুণ্যে ও অক্ষুন্ন শুদ্ধতায় জীবনের পঞ্চাশ বৎসর কাটাইবার পর যখন রাবি জ্যাথানের * পালিত শির শুভ্র কেশে পূর্ণ হইল তখন একটী দুর্দ্দম প্রলোভনের শক্তিকে পরাস্ত করিতে না পারিয়া বৃদ্ধ পাপে কলঙ্কিত হইলেন। পাপের সঙ্গে প্রতারণা ও অধর্ম্মের সঙ্গে ভণ্ডামী মিশ্রিত হইয়া ব্যাপারকে যাহাতে আরও আক্ষেপময় না করিতে পারে তাহার জন্য বিস্তৃত মণ্ডলীর মধ্যে সত্য ও ধর্ম্মপ্রচারের কার্য্য ত্যাগ করিয়া তিনি অনুতাপের বসন ধারণ ও মস্তক ভস্মাচ্ছ দিত † করিয়া লোকসমাজ হইতে দূরে সরিয়া গেলেন। অনুতাপের কাতরতায় বক্ষে করাঘাত করিয়া অনেক ক্রন্দন করিলেন, অনেক প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু জীবনের শান্তি আর ফিরিয়া পাইলেন না। সাধু ও ঈশ্বরভক্তগণের উপদেশের মধ্যে দেবতার বাণী শ্রবণ করিবার জন্য একদিন তিনি ধর্ম্মগ্রন্থ খুলিয়া সম্মুখে রাখিতেই এই বাক্যটী পাইলেন—'যিনি যথার্থ বন্ধু তিনি সকল সময়েই ভালবাসেন, কল্যাণকামনা ও কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করিয়া থাকেন, শেষ পর্য্যন্তই তিনি এইরূপ করেন, দুঃখ

* য়িহুদীদিগের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারক শ্রেণীর লোকদিগকে রাবি বলে।

† য়িহুদীদিগের মধ্যে অনুতপ্তদিগের জন্য এই বিধি ছিল।

ও পাপের দুর্দ্দিনে সাহায্য করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই উন্মুখ থাকেন' এই বাক্যটী পড়িয়া ন্যাথান চমকিত হইলেন এবং ভাবিলেন ঈশ্বরই দরকারের সময় সং-পরামর্শ দিয়া থাকেন; একবাটানাতে রাবি বেন আইজাক থাকেন, সাধুতা ও জ্ঞানে তাঁহার সমকক্ষ আর কাহাকেও দেখি না; মধুমক্ষিকা ভরে অবনত ক্ষুদ্র আগাছাগুলির নিকট লিবাননের পার্ব্বত্য বৃক্ষসমূহ যেমন, সাধারণ মনুষ্যের তুলনায় বেন আইজাকও সেইরূপ; আমি তাঁহারই নিকট যাইব এবং আমার পাপের কথা তাঁহার চরণে নিবেদন করিব।

এই মনস্থ করিয়া ন্যাথান নগ্নপদে দীর্ঘউপবাসে আত্মপীড়ন ও প্রার্থনা করিতে করিতে গন্তব্য পথে চলিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে একদিন মহাত্মা ডেভিডের রচিত অনুতাপসঙ্গীত মৃদুস্বরে গান করিতে করিতে চলিয়াছেন এমন সময় সেই পুরাতন প্রলোভন উপস্থিত হইয়া আবার তাঁহাকে আক্রমণ করিল। অতিশয় ঘৃণ্য ও লজ্জাকর প্রবৃত্তির তাড়-নায় তিনি শিহরিয়া উঠিলেন, আর তাঁহার অঙ্গ নিজের প্রতি ঘৃণায় ও রোষে কম্পিত হইতে লাগিলেন। পাপদানবকে হৃদয় হইতে দূর করিয়া আত্মাকে মুক্ত করিবার জন্য প্রাণপণ ক্রন্দনে ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিলেন, কখনওবা নিরুপায় ও পাগল প্রায় হইয়া শূন্যে সজোরে লাঠি ঘুরাইতে লাগিলেন।

অবশেষে একদিন যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিল, ন্যাথান অবসন্ন দেহে ক্ষতবিক্ষত পদে এক সাধুর কবরের নিকট কিছু-ক্ষণের জন্য দাঁড়াইলেন। দূরে মরুভূমির প্রান্তে অবস্থিত একবাটানা নগরের উচ্চ গৃহ-চূড়াগুলি সান্ধ্যকিরণে তাঁহার চক্ষে স্বপ্নরাজ্যের মত বোধ হইতে লাগিল। এইরূপে খানিক দাঁড়াইয়া থাকিবার পর কবরের এক পার্শ্বে একটী নতজানু মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া প্রীতির সহিত তাঁহাকে "হে ভাই অপরি-চিত, আমাদের পবিত্র পরমেশ্বর তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন" এই বলিয়া অভিবাদন করিলেন। ইহাতে সেই মূর্ত্তি চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—মুহূর্ত্তেক মধ্যে দুই শুভ্রকেশ বৃদ্ধ পরস্পরের আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া যে দেবতা দুই জনের পথ এক করিয়া এ স্থানে পরস্পরের মিলন সংঘটন করিলেন তাঁহার জয়গান করিতে লাগি-লেন। হঠাৎ আপনার পাপের কথা স্মরণ হওয়াতে ন্যাথান সজোরে বন্ধুর আলিঙ্গন-পাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া বলিলেন, "হে আমার প্রিয়তম বন্ধু এখন আর আমি আপনাকে স্পর্শ করিবার যোগ্য নহি। আপনার প্রার্থনায় যাহাতে আমার মলিন হৃদয় পরিষ্কৃত হইয়া আপনার আত্মার ন্যায় শুভ্র ও সুন্দর হয় তাহার জন্যই আমার সমস্ত পাপ ও লজ্জার কাহিনী আপনার নিকট নিবেদন করিতে আসিয়াছি, হে বেন আইজাক! আমি পাপে কলঙ্কিত, আমায় দয়া করুন"। ইহা শুনিয়া বেন আইজাক আশ্চর্য্য ও হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন, ক্ষণকাল পরে কাতরস্বরে বলিলেন "বন্ধু, কার্য্যে না

হউক কিন্তু চিন্তায় আমিও পাপী হইয়াছি, আপনি কি শাস্ত্রে পাঠ করেন নাই, 'কামনার বশে মন চতুর্দ্দিকে বিচরণ করা অপেক্ষা কার্য্যতঃ পাপে লিপ্ত অধিক দোষাবহ নয়? আমার মনে লুক্কায়িত অগ্নি রহিয়াছে, চক্ষের জল ও প্রার্থনায় তাহার নির্ব্বাণ হইতেছে না তাই আপনার অনুগ্রহ ও সাহায্যের জন্য আমিও আপনার সন্ধানেই চলিয়াছি, বন্ধু আমায় দয়া করুন, দয়া করুন। কিন্তু স্থাথান যাতনায় ক্লিষ্টস্বরে বলিলেন, "বেন আইজাক আপনিই আমার জন্য প্রার্থনা করুন।"

সন্ধ্যার ক্ষীণ আলোকে সমাধি প্রস্তরের নিকট দুই বৃদ্ধে পাশাপাশি নতজানু হইয়া বসিলেন। আকুল সহানুভূতি ও প্রেমে আপনার স্বার্থের দাবী ভুলিয়া গিয়া ভাইএর দুঃখকে আপন করিয়া গভীর প্রার্থনায় মগ্ন হইলেন। এইরূপে পরস্পরের জন্য যে শান্তি তাঁহারা অন্বেষণ করিলেন তাহা প্রত্যেকে নিজে পাইলেন; ভাইএর জন্য প্রার্থনায় তাঁহাদের নিজ নিজ ভিক্ষা পূর্ণ হইল; অবশেষে যখন পরস্পরকে আলিঙ্গন করিবার জন্য তাঁহারা উঠিলেন তখন ভাইএর মুখে পিতার ক্ষমার নিদর্শন দর্শন করিয়া সার্থকসাধন হইলেন।

কথিত আছে রাবি স্থাথানের দেহত্যাগের বহুকাল পরে একখানি ধর্ম্মপুস্তকের একস্থানে তাঁহার হস্তাক্ষরে এই কথাগুলি পাওয়া গিয়াছিল "যতক্ষণ পর্য্যন্ত না 'আমি'র মৃত্যু হয় ততক্ষণ পাপব্যাধির উপশম ও পাপের জ্বালা হইতে মুক্তিলাভের আশা দুরাশা মাত্র! প্রেম ও সেবায় 'আমি' কে ভুলিয়া যাও, তখন যে ঋণ তোমার পরিশোধের সাধ্যাতীত দেবতারাও তাহা ভুলিয়া যাইবেন, যে ব্যক্তি একাকী আসে স্বর্গের দ্বার তাহার জন্য উদ্ঘাটিত হয় না, একটী আত্মাকে মুক্তির পথে সাহায্য কর, তাহাতেই তোমার মুক্তিলাভ ঘটিবে

বঙ্গমহিলার যাপানযাত্রা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জানুয়ারীর ১৪ই আমরা টোকিওতে যাই। সেখানে ২০ দিন আমার ছোট ননদের বাড়ী ছিলাম। এখানে তাঁহার স্বামীর দোকান আছে। ১৩ই সন্ধ্যার ট্রেণে রওনা হইয়া ১৪ই প্রাতে ষিমবাসী (টোকিওর ষ্টেশন) নামিয়াছিলাম। এদেশে আরোহী ভিন্ন অন্য লোক ট্রেণের নিকটে যাইতে পারে না। যদি কেহ আত্মীয়কে ট্রেণে উঠাইয়া দিতে ইচ্ছা করেন, তবে প্লাটফরমে আসিবার জন্য কয়েক পয়সার টিকিট কিনিতে হয়।

টোকিও জাপানের রাজধানী। টোকিওতে বিশেষ বিশেষ কয়েকটী বাড়ী ব্যতীত সকলই কাঠের বাড়ী। সহরটী রাজধানী হিসাবে বিশেষ কিছু জমকাল বলে বোধ হয় না। রাস্তায় সর্ব্বদা রিক্স, ট্রাম চলে; কদাচিৎ ঘোড়ার গাড়ী দেখা যায়। বৃষ্টির পর রাস্তার অবস্থা সর্ব্বত্রই সমান হয়। কাষ্ঠ-পাদুকা পরিয়া চলাতে আরও গভীর কাদা হয়। ট্রাম ক্লেশ-

সুবিধাজনক, পাঁচ পয়সার এক টিকিটে সহরের যে কোন স্থানে যাওয়া যায়। ট্রাম বদলাইতে হইলে এক টিকিটেই চলে। গাড়ী একখান করে চলে; শ্রেণীবিভাগ নাই। ট্রামের সম্মুখ ও পশ্চাদ্দিকে দ্বার। ট্রামে উঠিলে কণ্ডাক্টার টিকিট দিয়ে যায়, নামিবার সময় তাহাকে টিকিট খানা দিয়ে যেতে হয়। নির্দ্দিষ্ট লাল রংয়ের স্তম্ভ-চিহ্নিত স্থানে ট্রাম থামে। থামিবার পূর্ব্বে কণ্ডাক্টার পরবর্ত্তী স্থানের নাম বলে ও নামিবার লোক আছে কি না জিজ্ঞাসা করে, উত্তর না পাইলে থামায় না। সময় সময় সাবধানে ধীরে ধীরে উঠানামা করিবার উপদেশ দেয়। রাস্তার ধারে স্থানে স্থানে এক একটী ক্ষুদ্র কুঠুরীতে পুলিশ বসে থাকে। তাহার কাছে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে বলে দেয়। জাপানে পুলিশের নিকট তরবারী থাকে। পুলিশ কোনরূপ অত্যাচার উৎপীড়ন না করিয়া শান্তিরক্ষা করে এবং সকলের সহিত শিষ্ট ব্যবহার করে। স্থানে স্থানে টেলিফোন করার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর আছে, পাঁচ পয়সা দিয়া টেলিফোনে পাঁচ মিনিট কথা বলা যায়।

১৬ই জানুয়ারী—আমরা একটী মেয়েদের স্কুল দেখিতে গিয়াছিলাম। স্কুলের এক শিক্ষয়িত্রী আমাদের সব দেখাইলেন। ইনি ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। সুশিক্ষিতা, ইংরাজী বেশ জানেন। ২।৩ ঘণ্টা ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলাম। সংসারে উন্নত জীবন লাভ করিয়া প্রকৃত মনুষ্য হইতে হইলে ও সন্তানসন্ততি এবং দেশবাসীদের মানুষ করিতে হইলে যে শিক্ষার প্রয়োজন তার বুঝি কোনটীরই এখানে অভাব নাই। স্কুলটিতে রসায়ণ, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূবিদ্যা, সাধারণ শরীরতত্ত্ব ইত্যাদি কলেজের পাঠ্য উন্নত বিষয় হইতে রন্ধনকার্য্য, ধোপার কাজ, গৃহাদি পরিষ্কার, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যানের কাজ, সেলাই, গান বাজনা, শিল্প কাজ, ড্রইং, নীতিশিক্ষা, ইংরাজীভাষা ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়। শিশুদের বই পড়ান হয় না। তাহাদিগকে কাগজ কাটা, ছবি আঁকা, মাটির দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা ও গল্পচ্ছলে নীতি বিষয়ে নানা প্রকার শিক্ষা দেওয়া হয়। মাটি দিয়া "ফুজিসান" (পাহাড়), "সুমিদা" (নদী) প্রস্তুত ক'রে ভূগোল শিক্ষা দেয়। ছড়া বলার মত গান ক'রে বড় বড় নগরের ও সহরের বড় বড় স্থানের নামগুলি মুখস্থ করে। শিশুদের হস্তনির্ম্মিত মাটির দ্রব্যগুলি ও চিত্রগুলি দেখিলে অবাক্ হইতে হয়।

১১ই মাঘ—মাঘোৎসব। এতদুপলক্ষে টোকিও প্রবাসী একজন ভারতবাসীর গৃহে ব্রহ্মোপাসনার বন্দোবস্ত হইল। আরও ৩।৪ জন ভারতবাসী উপস্থিত ছিলেন। সকলে একত্রে আহারাদি হইল।

কয়েকটী পার্ক আছে। তন্মধ্যে একটী "আসাকুসা কোয়েন"—আমোদ প্রমোদের স্থান। পার্কে প্রবেশ করিলেই একটী মন্দির। তৎপরে স্থানে স্থানে সার্কাস, বায়স্কোপ, নাচ, ইত্যাদি কত কিছু হইতেছে। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এ গুলি খোলা থাকে। অন্ম

পয়সায় খুব ভাল ভাল তামাসা যতক্ষণ ইচ্ছা দেখা যায়। অনেক লোক দেখিতে আসে। অত্যন্ত ভিড় হয়। নানা প্রকার বাজনা বাজে। এখানে একটী "খানন-সামার" দেবমন্দির আছে। আমরা ৩৪ দিন এখানে বেড়াতে এসেছি।

"উয়েনো" নামক আর একটী পার্ক অনুচ্চ পাহাড়ের উপর স্থিত। এখানে একটী চিড়িয়াখানা ও একটী মিউজিয়ম আছে। মিউজিয়মে—মৃত মিকাডোকে কবর দিতে লইয়া যাইবার জন্য যে সুদৃশ্য মূল্যবান বাক্সটী ব্যবহার করা হইয়াছিল তাহা আছে। একটী বৃহৎ পুষ্করিণীতে গ্রীষ্মকালে পদ্মফুল ফুটিয়া বড়ই সুন্দর দেখায়।

টোকিওর মধ্যস্থলে স্বর্গগত মিকাডোর প্রাসাদের নিকটস্থ অতি সুন্দর "হুবিয়া" নামক "কোয়েন" (পার্ক) ইউরোপীয় ফ্যাসানে প্রস্তুত। বিস্তীর্ণ স্থান। পুষ্করিণীর ভিতরে ফোয়ারা হইতে জল উঠিতেছে। অনুচ্চ ক্ষুদ্র পাহাড়, খেলিবার মাঠ নানারূপ পুষ্পবৃক্ষ, কয়েকটী সুদৃশ্য পক্ষী ইত্যাদি আছে। রাস্তাগুলি সুন্দর বাঁধান।

এখান থেকে অল্প দূরে "কুদন" নামক স্থানে "ষোকনষা" (বীরপূজার মন্দির) নামক একটী মন্দির; এখানে প্রতি বৎসর অত্যন্ত জাঁকজমকের সহিত দেশের মৃত বীরগণের উদ্দেশ্যে পূজা হয়। মন্দির-পার্শ্বেই অস্ত্রপ্রদর্শনী। বিগত যুদ্ধের দ্রব্যাদি, বীরগণের ফটো ও স্মৃতিচিহ্নগুলি রক্ষিত। রুশ ও চীন-যুদ্ধে ব্যবহৃত ও অধিকৃত অসংখ্য কামান, বন্দুক, তরবারী ইত্যাদি কত কি যে রহিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। পূর্ব্বকালীন যুদ্ধাদির সাজ, অস্ত্রাদি ও দেশের জন্য যে বীরগণ প্রাণ দিয়া দেশের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন এবং যাঁহারা দেশবাসিগণ কর্ত্তৃক দেবতাজ্ঞানে পূজিত হইতেছেন তাঁহাদের ফটো ও স্মৃতিচিহ্নগুলি রক্ষিত হইয়াছে। পোর্টআর্থার বিজয়ী স্বর্গীয় জেনারেল নোগী ও তৎপত্নী যে বস্ত্র পরিধান করিয়া ও যে তরবারী দ্বারা আত্মহত্যা করেন তাহা ও তাঁহার গৃহসজ্জাদি রক্ষিত। দেখিবার জন্য প্রতি জনকে পাঁচ পয়সার টিকিট কিনিয়া প্রবেশ করিতে হয়; বাহিরেও অনেক বড় বড় কামান রাখা হইয়াছে।

রাজপ্রাসাদ বাহির হইতে কিছুই দেখা যায় না। স্বর্গীয় সম্রাটের প্রাসাদ "মারু নোউচি" ক্রমান্বয়ে দুইটি পরিখা ও দুইটী উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। ইহার নিকটেই বর্ত্তমান রাজপ্রাসাদ। ইহাও উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত। নগরের ন্যায় বিস্তীর্ণ রাজবাটীর চারিদিকে কাছারী, বিশ্ববিদ্যালয় ও বড় বড় লোকের বাস।

২৯শে জানুয়ারী—টোকিও হইতে ট্রেনে ৫ ঘণ্টার পথ "নিক্কো" নামক স্থানে গিয়াছিলাম। নিক্কো অতি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যপূর্ণ পর্ব্বতময় স্থান। পাহাড়ের উপর চিত্র বিচিত্র নানা বর্ণে রঞ্জিত কাষ্ঠ ও পিত্তল নির্ম্মিত সুদৃশ্য বাড়ী ও প্যাগোডা (মন্দির)। একটী জলপ্রপাত হইতে ভয়ানক শব্দে হুড় হুড় করিয়া জল পড়ি-

তেছে। যে পথে জল যাইতেছে তদুপরি একটী সুদৃশ্য লাল রংয়ের কাঠের সেতু আছে। ইহা পবিত্র সেতু বলিয়া ইহার উপর গমনাগমন নিষেধ। এখানে অত্যন্ত শীত। সবই তুষারাচ্ছন্ন। শীতে যেন শরীর আড়ষ্ট হইয়া যাইতেছিল। আমরা কয়েক ঘণ্টা মাত্র এখানে ছিলাম। "ইসে" এখানকার একটী তীর্থস্থান। এখানকার দুইটি দেবমন্দিরে প্রণাম করিবার জন্য সর্ব্বদা লোক আসিয়া থাকে। নির্জ্জন সুদৃশ্য স্থানটি বাস্তবিক যেন শান্তির আলয়। একটী যুদ্ধে সাহায্যকারী দেশ হিতৈষী দেবতার মন্দির। দেশে যুদ্ধ বিদ্রোহ, কোন অশান্তি, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি আরম্ভ হইলে লোকে এখানে পূজা করিতে আসে। বৃহৎ সুন্দর উদ্যানপরি-বেষ্টিত মন্দির। বৃহৎ "তোরি" তল হইতে শূন্য মস্তকে প্রবেশ করিতে হয়। সর্ব্বদা পুলিশ পাহারা দেয় তৎপরে বাগা-নের অনেকটা পার হইয়া মন্দির দ্বারে আসিতে হয়। মধ্যপথে মন্দিরস্থ দেবতার যুদ্ধযাত্রাকালে সজ্জাগৃহ ও তাঁহার জন্য ২।৩টী অশ্ব আছে। মন্দির দ্বারে একটী বাক্সে ইচ্ছাগত কিছু দান করিয়া বিদায় হইতে হয়। দ্বারদেশ শ্বেত পরদায় আবৃত। চারিদিকে কাঠের উচ্চ প্রাচীর, বাহির হইতে মন্দিরের চূড়াগুলি ব্যতীত কিছুই দেখা যায় না।

ক্রমশঃ।

শ্রীহরিপ্রভা তাকেদা।

(ভারতমহিলা।)

বিসূচিকা বা কলেরা।

কলেরা জীবাণু কর্দ্দমময় দূষিত জলে উৎপন্ন হয়। কর্দ্দম ইহাদের উপাদেয় আহার। কাজেই কর্দ্দমময় জলে ইহারা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে বর্দ্ধিত হয়। এইরূপ দূষিত জলপান করিলে কলেরার জীবাণু পাকস্থলীতে প্রবেশ করিয়া উহার মধ্যে এক মহা বিপর্য্যয় উপস্থিত করে। রোগী শ্বেতবর্ণ কুমড়ার জলের মত মল ঘন ঘন ত্যাগ করে। তাহার সহিত বমন যোগ দিয়া ক্রমশঃ শরীরকে ক্ষীণ ও অবশেষে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করে। খাদ্য ও দুগ্ধের মধ্য দিয়াও এই জীবাণু আমাদের শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে। গোয়ালারা দুগ্ধে জল মিশায়। ঐ জলে যদি কলেরা জীবাণু থাকে, তাহা হইলে নিস্তার নাই। দূষিত জলে বাসনাদি ধৌত করিলে ও ঐ বাসনে খাইলেও কলেরা হইতে পারে।

কলিকাতা সহরে অনেকে ময়লা গঙ্গার জল বাসনাদি ধৌত করিবার জন্য ব্যবহার করেন। এই কর্দ্দমাক্ত অপরি-স্কৃত জলে ধৌত বাসন ব্যবহারে এক বাসায় ৩।৪ জনের এক সঙ্গে কলেরা হইতে দেখা গিয়াছে। কলিকাতার মিউনিসিপাল কর্ত্তাদের এ বিষয় মনোযোগ দেখা যায় না। পাইখানা ধৌত করিবার ময়লা জল অজ্ঞ লোকেরা বিশুদ্ধ জলের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিয়া এই সর্ব্বগ্রাসী কলেরা রোগকে বিশ্বব্যাপক করে।

পানীয় ও অন্যান্য ব্যবহারের জল বিশুদ্ধ হইলে কলেরা নিবারিত হয়। পল্লীগ্রামে একবার কলেরা আরম্ভ হইলে তাহা নিবারণ করা দুঃসাধ্য। সেখানকার লোকেরা একই পুষ্করিণীর জল পান করে, তাহাতে স্নান করে, কাপড় কাচে, তাহার উচ্চ পাড়ে মলত্যাগ করে ও মল ত্যাগান্তে উক্ত পুষ্করিণীর জলের উপর উপবেশন করিয়া মল প্রক্ষালন করে। আহা, যেমন সভ্যতা, তেমনি স্বাস্থ্য জ্ঞান! অথচ আমরা আর্য্য! পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয়! আমাদের চাষাও যে ফিলজফার! তাহা না হইলে কি এমন জ্ঞান হয়। যে সকল নগরে কেবলমাত্র কলের বিশুদ্ধ জল প্রণালীর প্রবর্ত্তন হইয়াছে, সেখান হইতে কলেরা দেবী অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। তবে যে মাঝে মাঝে দেখা দেন, তাহা অধিবাসীদিগের অজ্ঞতা ও কতকগুলি আকস্মিক ঘটনার ফল। যেমন মনে করুন, কলের জল ব্যবহার না করিয়া কেহ যদি আলস্য প্রযুক্ত অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী ঘোলা জল ব্যবহার করেন, অথবা বাহিরের গোয়ালা যদি নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ পথি পার্শ্বস্থ কিম্বা গ্রামস্থ কলেরা জীবাণু-দূষিত জল দুগ্ধে মিশাইয়া বিক্রয় করিতে আনে, তাহা হইলে সেই দূষিত জল ব্যবহারে ও দূষিত জল মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিলে কেনন। কলেরা হইবে।

কলেরা নিবারণ করিতে হইলে পল্লীগ্রামে পানীয় জলের পুষ্করিণী পৃথক্ করিয়া রাখা উচিত। স্নানের পুষ্করিণী পৃথক্ হওয়া উচিত এবং বস্ত্র ও আবিলাদি উত্তোলিত জলে পুষ্করিণী হইতে বহু দূরে প্রক্ষালন করা কর্ত্তব্য। জল ফিল্‌টারের দ্বারা বা নির্ম্মলী দিয়া বিশুদ্ধ করিয়া, পরে উহাকে অগ্নিতে অর্দ্ধ ঘণ্টা ফুটাইয়া, শীতল করিয়া ছাঁকিয়া একটু কর্পূর দিয়া পান করিলে পানীয় জলজাত কলেরা জীবাণুর হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। স্বচক্ষে দেখিয়া দোহাইয়া দুগ্ধ ক্রয় করিলেও তাহাকে সুসিদ্ধ করিয়া পান করিলে অনেকটা নিস্তার আছে। বাসনাদি সবই গরম জলে প্রক্ষালন করিলে জীবাণুর হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। এ সকল ব্যয়সাধ্য নহে। কেবল শ্রম-সাধ্য। এখানে ভারতবাসীর দরিদ্রতার অজুহাত খাটিবে না। পশ্চিম বঙ্গ ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কূপগুলি গভীর ও উহাদের জল স্বচ্ছ। যাঁহারা কূপের জলপান করেন, কলেরার সময় তাঁহাদের অনেককেই অনাক্রান্ত থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু এ নিয়ম সর্ব্বত্র খাটে না। অনেক সময় কূপের জলও দূষিত হয়। ইন্দুর বা অন্য ক্ষুদ্র জন্তু পড়িয়া উহাকে বিষাক্ত করে। এইজন্য কূপ জাল দিয়া আবৃত করা উচিত। সময়ে সময়ে উহার সংশোধন প্রয়োজন। মধ্যে মধ্যে সকল জল সেচন করিয়া ফেলিয়া দিয়া নীচের পাঁক তুলিয়া দেওয়া উচিত। কেহ যেন কূপের মধ্যে নিষ্ঠীবন (ছোট ছেলেদের কদভ্যাস) বা কোন দ্রব্য নিক্ষেপ না করেন। এই সকল নিয়ম পালন করিলে কলেরার হাত হইতে অবশ্যই অব্যাহতি পাওয়া যায়।

কলেরার সময় খুব সাবধানে মিতাচার

অভ্যাস করা উচিত। পাকস্থলীর অপরিপাক ও অসুস্থাবস্থায় কলেরার জীবাণু খাদ্যের সহিত ধ্বংস হইয়া যায় না। কাজেই ইহার ধ্বংসকারী হস্ত হইতে পরিত্রাণ নাই। এই সময় সাধ্যমত লঘু আহারই ব্যবস্থা।

কলেরার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

১। নির্ম্মল পানীয় জলের ব্যবস্থা।

২। বিশুদ্ধ খাদ্য।

৩। মল মূত্রাদি ঘন ঘন পরিষ্কারের ব্যবস্থা।

৪। বস্ত্রাদির পরিচ্ছন্নতা।

৫। কাঁচা ফল, বা যে কোন অর্দ্ধপক্ক বা অর্দ্ধ দগ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ না করা।

৬। কলেরা রোগীকে পৃথক্ করিয়া রাখা।

৭। উক্ত রোগীর সংস্রবে আসিলে বস্ত্রাদি বৈজ্ঞানিকরূপে বিশুদ্ধ করা।

৮। মক্ষিকা যাহাতে খাদ্যে উপবিষ্ট হইয়া জীবাণু দ্বারা উহাকে দূষিত না করে তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া।

৯। বাজারের খাবার বা রন্ধন সামগ্রী যথা চপ্ কাট্লেট্ প্রভৃতি না খাওয়া।

১০। গৃহ ও চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থান পরিষ্কার রাখা ও গন্ধকাদি জ্বালাইয়া বায়ুর নির্ম্মলতা রক্ষা করা।

কলেরা রোগীর মল যেখানে সেখানে নিক্ষেপ না করিয়া, উহাকে অগ্নিদ্বারা ধ্বংসের ব্যবস্থা করিতে পারিলে সংক্রামকতা অনায়াসে নিবারণ করা যায়।

উত্তর ইউরোপ অর্থাৎ ইংলণ্ড জার্ম্মণি প্রভৃতি দেশে ও উত্তর মার্কিনে কলেরা নাই বলিলেও চলে। এই সকল দেশে কলেরা হইলে একটা হুলস্থূল পড়িয়া যায় ও দেশব্যাপী আলোচনা ও আন্দোলন উপস্থিত হয়। কিন্তু কলেরা প্রভৃতি মড়কাদি ভারতবাসীকে ভীত করিতে পারে না। আমরা নির্ভীক হৃদয়ে ইহাদের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছি। ইউরোপীয়েরা কামানের গোলা খাইয়া মরিতে পারে, টাইটানিক বিপদে প্রাণ দিতে জানে, কিন্তু অজ্ঞতা ও আলস্য পোষিত ব্যাধির হস্তে অকালে ও অকারণে মরিতে প্রস্তুত নহে। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনটী সম্ভ্রান্ত জর্ম্মাণ পর্য্যটকের সহিত ভারতের কোন দেশীয় রাজ্যে আমাদের আলাপ হইয়াছিল ও একই স্থানে থাকিতে হইয়াছিল ইঁহারা শুনিয়াছিলেন ভারতে অত্যন্ত কলেরা হয়। পাছে কলেরা জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে এই ভয়ে ইঁহারা জলের পরিবর্ত্তে সর্ব্বদা বিয়ার পান করিতেন। অবশ্য ইহা তাঁহাদের জাতীয় পানীয়। গরম জলে স্নান করিতেন ও সর্ব্বাপেক্ষা কৌতুকাবহ এই যে সোডা-ওয়াটারে দন্ত প্রক্ষালন ও মুখাদি ধৌত করিতেন। ইহা অবশ্য অতি মাত্রা ভয়। কিন্তু ইহাতে পরিহাসের বিষয় কিছুই নাই বরং কিছু শিখিবার আছে। ইউরোপীয়েরা যে স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে কত সাবধান, ইহা তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এদেশের ইউরোপীয়েরা সংক্রামক ব্যাধিতে প্রাণত্যাগ করেন না বলিলেই হয়। ইঁহাদের পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যজ্ঞান ও স্বাস্থ্যরক্ষার চেষ্টা আমাদের অনুকরণীয় হওয়া উচিত। একটু শারীরিক শ্রম ও চেষ্টা করিলে সকলেই তাহা করিতে পারেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় আমরা বড়ই অসাড় ও শ্রমকাতর।

স্বাস্থ্য সমাচার।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

সকলেই জানেন যে সংক্রামক রোগ কোন কোন বৎসর অত্যন্ত প্রবল হয় ও তাহাতে বহু লোকের প্রাণনাশ হয়। কলিকাতায় বসন্ত রোগ ৪ ৫ বৎসর পরে এক বৎসর অত্যন্ত প্রবল হইয়া থাকে। এবার সহরের অভিভাবকগণের পক্ষ হইতে স্বাস্থ্য বিভাগের ডাক্তার সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছেন যে সম্ভবতঃ এ বৎসর কলিকাতা নগরে বসন্তের ভয়ানক প্রকোপ হইবে। এই সাংঘাতিক রোগ নিবারণ পক্ষে টীকা লওয়ার গুণ সকলেই জ্ঞাত আছেন এখন প্রত্যেক শিশুকে বসন্তের টীকা দেওয়া হয়। যে সকল শিশুর টীকা হয় নাই তাহাদিগকে অবিলম্বে টীকা দেওয়া উচিত. এবং যাহাদিগের টীকা অনেক দিন হইল হইয়াছে তাহাদিগকে পুনরায় টীকা দেওয়া উচিত। বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও বহুদর্শিতার ফল যাহা শিক্ষা দিয়াছে তাহা অনুসারে চলা সকলের কর্ত্তব্য। আমরা অনেক রোগ নিবারণের উপায় জানি না সে জন্য ভয়ে ভয়ে বাস করি। কিন্তু যে উপায় জানি তাহা না লইলে যে রোগ উপস্থিত হয় তাহা স্বকৃত ব্যাধি বলিতে হয়।

যাঁহারা রুসিয়ার সহিত জাপানের যুদ্ধের বিবরণ সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদের অবশ্য মনে আছে যে রুসিয়ার প্রধান সেনাপতি জেনারেল ষ্টোসেল বহুদিন পর্য্যন্ত পোর্ট আর্থার রক্ষা করিয়াছিলেন, পরে তাহা শত্রু হস্তগত হয়। যুদ্ধের অবসানে ষ্টোসেল রাজার বিরক্তির পাত্র হন। তাঁহার পদ সম্মান ধন সমস্ত নষ্ট হয়। তাঁহাকে গত কয়েক বৎসর নানারূপ কষ্টে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইয়াছে। এখন তিনি বৃদ্ধ ও অন্ধ হইয়াছেন। এই দুঃসময়ে তাঁহার পত্নী পতিব্রতা ধর্ম্মের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন। যিনি একদিন সমাজের সর্ব্বোচ্চ সম্মান ও বিলাসভোগ্য উপভোগ করিয়াছেন এখন কঠিন পরিশ্রম করিয়া আপনার ও স্বামীর অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি মস্কো নগরের নিকট একটি স্থানে একটা চার দোকান খুলিয়াছেন। এই দোকান সম্পর্কিত সমস্ত কার্য্য নিজহাতে সম্পন্ন করেন, ইউরোপীয় নারীগণকে যাঁহারা কেবল আমোদ ও বিলাসপ্রিয়া মনে করেন তাঁহাদের এই নারীর চরিত্র চিন্তা করিয়া দেখা উচিত।

শীতকাল আগত প্রায়। সকলেই আপন আপন পুত্র কন্যার জন্য গরম পোষাক প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত আছেন। যাঁহারা ভগবানের কৃপায় যথেষ্ট অর্থ পাইয়াছেন, তাঁহারা আপনাদের সন্তানগণের জন্য মনোমত পশমী কাপড় প্রস্তুত করিয়া কৃতার্থ হইবেন। এই সময়ে একটি নিবেদন আমাদের আছে, নিবেদন এই যে, যে সকল মাতা অর্থাভাবে আপন আপন পুত্র কন্যাগণকে উপযুক্ত শীতবস্ত্র দিতে না পারিয়া দুঃখিত আছেন এবং হয়ত তাঁহাদের সন্তানগণের পীড়ার আশঙ্কা করিতেছেন তাঁহাদের কথা স্মরণ করিবেন। হৃদয়-লিখিত নিত্য মঙ্গলবিধি বলিতেছে যে, যে মুহূর্ত্তে তোমার পুত্রের নূতন শীত বস্ত্র হইল সেই মুহূর্ত্তে পুরাতন শীতবস্ত্র নিঃস্বগণের পুত্র কন্যার হইয়া গেল—যখন বুঝিতে পারিতেছ যে শীতবস্ত্র অভাবে অন্যের কষ্ট হইতেছে, তখনই বুঝিতে হইবে যে তোমার অতিরিক্ত শীতবস্ত্র সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখিবার অধিকার নাই। এই শীতের সময় সকল পুরাতন বস্ত্র দান করিয়া মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ করুন।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ

১৯শ ভাগ] অগ্রহায়ণ, ১৩২০। ডিসেম্বর ১৯১৩। [৫ম সংখ্যা।

প্রার্থনা।

হে মঙ্গলময় প্রজাপতি, তোমারই মঙ্গল নিয়মে নরনারী মিলিত হইয়া পরিবার রচনা করেন, তুমি কোন্ পুরুষকে কোন্ নারীর সহিত মিলিত করিবে তাহা কেহ জানে না, এ কার্য্যে তোমার হাত সকলকেই দেখিতে ও স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু তথাপি তোমার কত বিশ্বাসী পরিবারের লোকেরাও বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতে তোমার ইঙ্গিত বা আদেশের দিকে দৃষ্টি করেন না, কেবল আপনাদের আদর্শ, ইচ্ছা, রুচির দ্বারা বাহিত হইতে থাকেন। পৃথিবীর লোক পৃথিবীর দৃষ্টিতে চলে তাহা বুঝিতে পারি, কিন্তু তোমার বিশ্বাসী সন্তানগণ পরিবারের এই বিশেষ কার্য্যে যেন তোমারই ইঙ্গিত বা নির্দ্দেশের অনুসারে কার্য্য করেন এইটি তুমি করিয়া দেও। হে দেবতা, তুমি কৃপা করিয়া আমাদের উপাস্য দেবতা হইয়াছ, তবে আরও কৃপা কর, আমাদের পরিবারের তুমি অভিভাবক হও। সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ে আমাদের পরামর্শদাতা হও, আমাদের পুত্র কন্যার বিবাহে তুমি ঘটক, আমরা তোমার ইঙ্গিত অনুসারে ভবিষ্যতের পরিবার রচনা করিয়া যেন পৃথিবীতে তোমার রাজ্য স্থাপন করিতে পারি, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর। তব পাদপদ্মে এই প্রার্থনা করিয়া বার বার প্রণাম করি।

বিবাহের সম্বন্ধ করা।

মানুষ একাকী বাস করিতে পারে না। কোন পরিবার অন্য পরিবার না হইলে চিরদিন চলিতে পারে না। বিধাতার ব্যবস্থা এই যে, দুই পরিবার হইতে দুজন একত্র করিয়া নূতন একটি পরিবার গঠন করেন। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের সহিত বিবাহ হইবে না, এ বিধি মানব-হৃদয়ে চিরদিন

লিখিত রহিয়াছে এবং থাকিবে। যদি কোন পরিবার অন্য-সকল-পরিবার-নির-পেক্ষ হইয়া বংশাবলীক্রমে উন্নতির পথে চলিতে পারিত তাহা হইলে হয়ত সেই সকল পরিবার অত্যন্ত উচ্চ অবস্থা লাভ করিতে পারিত; কিন্তু সংমিশ্রণ ভিন্ন নূতন পরিবার গঠন হয় না, এ জন্য নিরপেক্ষ-গতি পরিবার সম্ভব নয়। এই নিয়মে নূতন নূতন পরিবার গঠন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতি কালক্রমে সংমিশ্রিত হইয়াছে, যাঁহারা জনসমাজের আদিম ইতিহাস আলোচনা করেন তাঁহারা দেখিতে পান যে, অতি প্রাচীন কাল হইতে এই সংমিশ্রণ কার্য্য চলিয়া আসিতেছে এবং বর্ত্তমান সময়ে কোন জাতিই ঠিক প্রাচীন কালের কোন একটি জাতির সত্য বংশধর নহে অর্থাৎ বর্ত্তমান কালে সকল জাতিই অল্পাধিক মিশ্রিত জাতি।

আমাদের পৃথিবীতে আগমন বিষয়ে আমাদের মতামত কিছু ছিল না। পৃথিবীতে আসিয়া যে পিতামাতা, বর্ণ, শ্রী ইত্যাদি পাইয়াছি সে বিষয়েও আমাদের মনোনীত করিবার কোন সুযোগ বা অধিকার ছিল না। জন্মের সহিত যাহা পাইয়াছি তাহা লইয়া আমাদিগের ব্যক্তিত্ব হইয়াছে—আপনার অঙ্গের স্বাভাবিক বিকলতা অথবা শ্রী সৌন্দর্য্যের অভাব না বুঝিতে পারি তাহা নয়, এবং বিদ্যা বুদ্ধি ধন মান শ্রীসৌন্দর্য্য স্বাস্থ্য ও বল যে প্রার্থনীয় তাহা বুঝিতে না পারি তাহাও নয়; এ জন্য জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আপনার অভাব গুলির জন্য অন্তরে অন্তরে দুঃখিত থাকি, এবং যদি সম্ভব হয় আপনার অভাব গুলি দূর করিতে বা সাধারণের দৃষ্টির অন্তরালে রাখিতে যত্ন করি, এবং ইচ্ছা ও চেষ্টা করি যে আমা-দিগের সন্তান সন্ততিগণের সেরূপ অভাব বা দোষ না থাকে। যখন কৃষ্ণাঙ্গ নর গৌরাঙ্গী নারীকে পত্নীরূপে পাইতে ইচ্ছা করে, যখন কুৎসিত পুরুষ সুন্দরী স্ত্রী অন্বেষণ করে, যখন নির্ধন ধনীর সহিত বিবাহিত হইতে ইচ্ছা করে, তখন লোকে যে চক্ষে দেখুক না কেন, যত সমা-লোচনা করুক না কেন—সে ব্যক্তি স্বাভাবিক নিয়মেই করিয়া থাকে। যাহার যাহা কিছু দোষ, অভাব বা কুৎসিত আছে তাহা না থাকে, অন্তত ভবিষ্যৎ বংশে না থাকে, তাহার চেষ্টা সমস্ত সৃষ্টির স্বভাব। উচ্চ সভ্যতা, বিজ্ঞানের নিত্য নূতন আবি-ষ্কার, ধর্ম্মের সার উপদেশ কেবল এই কথাই বলিতেছে যে যাহা কুৎসিত, যাহা ক্লেশপ্রদ, যাহা অসুন্দর তাহাকে সংশোধন কর, যদি এ বংশে তাহা মজ্জাগত বা দৃঢ়বদ্ধ হইয়া থাকে ভবিষ্যৎ বংশে যাহাতে কিছু মন্দ বা কুৎসিত না থাকে তাহার জন্য একান্ত যত্নবান্ হও।

যে সকল নারী স্বামী মনোনীত করিতে অত্যন্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিশীলা এবং যে সকল পুরুষ স্ত্রী মনোনীত করিতে অতি উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া বিচার করেন তাঁহারা তাহা স্বভাবের নির্দ্দেশেই করিয়া থাকেন। আমাদের সমাজে বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ স্থলেই পিতামাতাগণ আপন আপন পুত্র বা কন্যাগণের জন্য কন্যা বা বর

মনোনয়ন করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকেও একার্য্যে আপনাদিগের বুদ্ধি বিচার ও কল্পনা-শক্তির চালনা করিয়া বহু পরিশ্রম করিতে হয়। আমাদের মধ্যে স্ত্রী-স্বাধীনতা যথেষ্ট স্থাপিত হইলে অবস্থা অবশ্যই অন্যরূপ হইবে, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে তেমন কোন পরিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। ইহার কারণ এই যে নূতন কোন শ্রেষ্ঠ কার্য্য আরম্ভ করিলেও যেমন তাহা সমাজে প্রচলিত করিবার সময় তাহার কিছু কিছু মন্দ ফল দেখা যায়, তেমনই বিবাহের সম্বন্ধ করা যে বর কন্যাদের নিজের কার্য্য এই অতি উচ্চ নিয়ম অনুসারে কার্য্য করিতে যাইয়াও বর বা কন্যাগণ কোন কোন স্থলে অত্যন্ত প্রতারিত হইয়াছেন, এবং কেবল ভাবের দ্বারা চালিত হইয়া মনোনয়ন উত্তম হয় না; হয়ত এই জন্যই কুমার কুমারীগণ এখন পিতা মাতা প্রভৃতির বহু দর্শনের প্রতি ও মঙ্গলেচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধা করিয়া আপনারাই আপনাদিগের সম্বন্ধ করিতেছেন না। অধিকাংশ স্থলে পিতা মাতা বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতেছেন।

যাঁহারা আপনাদিগের পুত্র কন্যা বা অপর কোন কুমার বা কুমারীর বিবাহের সম্বন্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহাদিগের বিষয় আলোচনা করাই আমাদের অদ্যকার উদ্দেশ্য। এ দেশের পিতা মাতা প্রভৃতি চিরদিনই মনোনীত পাত্র বা পাত্রী অন্বেষণে বহু অর্থ ও সময় ব্যয় করিয়াছেন। জাতি ও কুলের নিয়মানুসারে বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিতে যদিও অতি অল্প সংখ্যক পরিবার মধ্যে চেষ্টা করিতে পারিতেন, তথাপি সম্বন্ধ স্থির করা সহজসাধ্য ছিল না। প্রাচীন সমাজে এখনও সম্বন্ধ স্থির করা অত্যন্ত আয়াসসাধ্য ও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার হইয়া রহিয়াছে। কারণ যদিও এখন লোকে ১০।১১ বৎসর বয়সের মধ্যেই কন্যার বিবাহ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন মনে করেন না, তথাপি কন্যার বিবাহ বিষয়ে কেহ উদাসীন থাকেন না। আপন আপন অবস্থা অনুসারে শীঘ্র বিবাহ দিতে ব্যস্ত হন।

ব্রাহ্মসমাজের বিবাহ সংঘটন বিষয়ে এখন একটা ভিন্নরূপ ভাব আসিয়াছে। যে সকল কুমারী উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতেছেন তাঁহাদের বিবাহের বিষয় সাধারণতঃ কাহারও বোধ হয় অধিক মনে আসে না। তাঁহারা আপনাদিগের অভিলষিত শিক্ষা ও পদ লাভ করিয়া আপনাদিগের প্রয়োজন ও আদর্শ অনুসারে বিবাহ করিবেন ইহাই বুঝিতে হয়। অপর সকল ব্রাহ্ম পরিবারেই এখন পুত্র ও কন্যার জন্য পাত্রী ও পাত্র অন্বেষণ করা জননীগণের বিশেষ বিচার, বিবেচনা ও আলোচনার বিষয় হয়। এখনও ব্রাহ্মদিগের মন হইতে জাতি যায় নাই, ধন, মান, কুল, দেশ প্রভৃতির বিচার সকলেরই অল্পাধিক আছে—বর বা কন্যার সন্ধানে এই মায়ার বন্ধন অনেক সময়ে ছিন্ন করিতে হয়। যখন জাতি কুল ধন মান প্রভৃতির অতি মানিনী জননীও বর বা কন্যার অনুসন্ধানে অভিমান পরিত্যাগ করিয়া উদার দর্শন করিতে প্রবৃত্ত হন—তখন সরল হইয়া মনে মনে স্থির করেন যে, "জাতি কুল লইয়া কি

হইবে? আমাকে আমার প্রিয়তম পুত্র বা প্রিয়তমা কন্যার জন্য যোগ্য কন্যা বা বর বাহির করিতে হইবে।” ঠিক তখন তাঁহার অন্তরে একটা নূতন ভাব উপস্থিত হয়। যতদিন এরূপ অবস্থা উপস্থিত না হয় ততদিন নারীগণ আপনাকে অন্যের অপেক্ষা অত্যন্ত ভিন্ন বা উচ্চ মনে করেন, বিবাহের সম্বন্ধ করিতে যাইয়া সমাজকে স্বীকার করিতে হয় ও সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখিতে হয়।

কম্পাসের কাঁটা যেমন নানারূপে আন্দোলিত করিয়া দিলে এদিক ওদিক করে, কিন্তু ছাড়িয়া দিলে ঠিক উত্তর দিকে মাথা স্থির করে, তেমনই বিবাহের সম্বন্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া মুক্ত ভাবে সমাজের বিবিধ অবস্থার লোকের প্রতি দৃষ্টি পড়ে ও মন চঞ্চল হয় কিন্তু শেষে যাহার অন্তরের যে আকর্ষণের বস্তু তাহার প্রতি দৃষ্টি স্থির হয়। কোন কোন জননী আপনার কন্যার জন্য ধন ইচ্ছা করিয়া ধনী বরের দিকে দৃষ্টি করেন, কেহ কেহ মান, কেহ বা বিদ্যার দিকে দৃষ্টি করেন। যখন পাত্রীর অন্বেষণ করিতে হয় তখন সাধারণত রূপের দিকেই অধিক দৃষ্টি করা হয়। ফলে শারীরিক সৌন্দর্য্য চিরদিনই পাত্রী মনোনয়নের সর্ব্বপ্রধান বিবেচনার বিষয় হইয়া আসিয়াছে এবং এখনও সেইরূপই চলিতেছে। অবশ্য ইহার সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের নীতি চরিত্র বিষয়ে সকলেরই দৃষ্টি পড়ে। যে পরিবারে এ সকল বিষয়ে ত্রুটি আছে তাহার দিকে সাধারণতঃ কেহ অগ্রসর হন না, ইহা অবশ্য সুখের বিষয়, কিন্তু উচ্চ ধর্ম্ম-জীবন এ স্থলে বড় আদরের বস্তু হয় না—কারণ দেখা যায় কোন পরিবারে ধর্ম্ম একটু বিশেষ অধিকার লাভ করিলেই তাহাতে কতকটা গোঁড়ামি উপস্থিত হয় ও বিবাহের সম্বন্ধ বিষয়ে সে বাড়াবাড়ি কাহারও ভাল মনে হয় না। আমাদের মধ্যে শিক্ষার যথেষ্ট সম্মান আছে, আমরা শিক্ষিতা কুমারীকে আদর করি, কিন্তু পাত্রী অন্বেষণ করিতে প্রবীণাগণ উচ্চ শিক্ষাকেও উচ্চ স্থান দেন না।

বিবাহের সম্বন্ধ করিতে চিরকালের প্রথানুসারে আমাদের মধ্যেও কন্যার রূপ ও বরের উপার্জ্জন ক্ষমতাই দেখা হইতেছে। ইহাই প্রার্থনীয় অবস্থা কি না তাহা আমাদিগকে দেখিতে হয়। বর্ত্তমান সময়ে সমাজতত্ত্ব বিষয় যাঁহারা আলোচনা করেন, তাঁহারা বলেন যে মানুষ অর্থাৎ প্রত্যেক নরনারী আপনার পূর্ব্বপুরুষ হইতে—পরিবার হইতে—যেমন মুখশ্রী ও অঙ্গসৌষ্ঠব প্রাপ্ত হয়, তেমনই মনের শক্তি, স্বভাব ও চরিত্র পায়—পূর্ব্বপুরুষের কত রোগ, কত অভ্যাস, কত ভাব, বংশাবলীক্রমে চলিয়া আসিয়াছে, সেগুলির প্রতি দৃষ্টি না করিয়া যাঁহারা কেবল শারীরিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া কোন কন্যাকে আপনাদের গৃহে আনয়ন করেন, ভবিষ্যতের পুত্র কন্যার জননীত্ব দান করেন, তাঁহারা সাংঘাতিক ভ্রম করেন। রূপের আকর্ষণে অজ্ঞাত-চরিত্র পরিবারের কন্যা পরিবার মধ্যে আনয়ন করিয়া কত পরিবার মহাদুঃখে ও পাপে পতিত হয়। কেহ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কুরূপ বা বিকলাঙ্গ বা রুগ্ন কন্যাকে পুত্রবধূ করিবেন, ইহা অবশ্য

সম্ভবপর নহে, এবং যে পুত্রের ভবিষ্যৎ সুখ শান্তি সেই নারীর উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে, সে পুত্রই বা তেমন স্ত্রী গ্রহণ করিবে কেন? সে সকল বিষয় কোন মানুষকে বলিয়া দিতে হয় না —আপন আপন মঙ্গল প্রত্যেকেই অন্বেষণ করেন। কিন্তু উচ্চ আদর্শ অনুসারে চলিতে হইলে যাঁহারা বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতে প্রস্তুত তাঁহারা কেবল বাহ্য সৌন্দর্য্য দেখিয়া কখন পাত্রী মনোনীত করিতে পারেন না। দৈহিক সৌন্দর্য্য অত্যন্ত প্রার্থনীয়, কিন্তু তাহা মানুষের মাত্র মূল বস্তু নহে, জীবনের আভরণ শিক্ষা ও চরিত্র সম্বন্ধে কন্যা যোগ্যা না হইলে সেরূপ পাত্রী কে গ্রহণ করিবে? বর্ত্তমান সময়ে সকলের পক্ষেই সুশিক্ষা ও সুগঠিত চরিত্র একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে, কারণ পূর্ব্বে বালিকা অবস্থায় বিবাহ হইত —শিক্ষা, অশিক্ষা বা কুশিক্ষা যাহা হইত সমস্তই শ্বশুর গৃহে হইত। এখন কন্যা বয়স্থা হইয়া স্বামীর গৃহে গমন করেন, তাঁহাকে শিক্ষা দিবার বা তাঁহার চরিত্র গঠন সম্বন্ধে সাহায্য করিবার কেহ না থাকিবারই কথা।

গৃহস্থের গৃহে গৃহিণী যত সুন্দরী হউন বা না হউন তাহাতে অধিক ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, কিন্তু তিনি যদি গৃহকার্য্যে সুদক্ষা না হন, যদি পরিবারের সকলের প্রতি, প্রতিবাসী ও আগন্তুকের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদন না করিতে পারেন, যদি তাঁহার ব্যবহারের গুণে নিত্য নূতন ভৃত্য রাখিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার দ্বারা সংসারের সৌন্দর্য্য বা শান্তিলাভ হয় না। গৃহের কর্ত্রী কেবল শোভা সম্পাদনের সামগ্রী নন— তিনি গৃহের পরিচারিকা, গৃহের অভিভাবিকা, গৃহের শান্তি সান্ত্বনার আধার— তিনি গৃহস্থের হৃদয়ের রাণী, তাঁহাকে লইয়াই সংসার, তাঁহাকে লইয়া গৃহের সুখ, ঐশ্বর্য্য, তাঁহাকে লইয়াই ধর্ম্ম কর্ম্ম—এসকল বিষয় স্মরণ না রাখিয়া যদি কেবল শারীরিক সৌন্দর্য্য, বা উচ্চশিক্ষা, বা স্ত্রীধনের আকর্ষণে পাত্রী গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে যে ভবিষ্যতে পরিবারে অশান্তি, দারিদ্র্য, দুর্দ্দশা উপস্থিত হইবে তাহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

হয়ত অনেকে বলিবেন যে কুমার বা কুমারী বিবাহিত হইয়া কিরূপ লোক হইবে তাহা অনেক সময়ে পূর্ব্বে বুঝিতে পারা যায় না। বিশেষত কন্যাগণ বিবাহিত হইয়া এত পরিবর্ত্তিত হইয়া যান যে অবিবাহিতা অবস্থার কন্যা ও বিবাহিতা নারী যে একই মানুষ তাহাই যেন বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। সত্যই অবস্থার পরিবর্ত্তনে মানুষের আদর্শে ও চরিত্রে অনেক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। কিন্তু পূর্ব্ব হইতে যথেষ্ট যত্ন করিলে ভবিষ্যৎ গৃহিণীকে অনেকটা ইচ্ছামত প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যায়। দূরে চেষ্টার ফলও দেখা যায়। যদি কোন কুমারীর শিক্ষা, চরিত্রের গঠন, পরিবারের বিশেষ অবস্থা সকলই ভাল হয় তাহা হইলে সে কুমারী যেরূপ অবস্থায় পড়ুক না কেন অবশ্যই ভাল হইবে। ভবিষ্যৎ আমাদিগের জানা নাই বলিয়া আমরা যে কিছু করিতে পারি না তাহা নয়—এক দিক দিয়া দেখিলে ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের

সন্তান—বর্ত্তমানকে নীতি-চরিত্রে শিক্ষায় ধর্ম্মসাধনে সুন্দর কর—অত্যন্ত সম্ভব যে ভবিষ্যৎ জীবন সুন্দর হইবে। আমাদিগের মহিলাগণ এখনও অদৃষ্টের উপর এ বিষয় অত্যন্ত নির্ভর করিতে ইচ্ছা করেন—তাহার ভাব এই যে কুমারী ভবিষ্যতে কিরূপ হইবে তাহা যখন আমাদের জানা নাই আমরা সে বিষয়ে ভগবানের উপর নির্ভর করি। ইহার ফল এই দাঁড়ায় যে বিবাহের সম্বন্ধ করিতে কেবল সৌন্দর্য্য, ধন, শিক্ষা বা অন্য একটা কিছু দেখিয়া আমরা কার্য্য করিয়া যাই—ভবিষ্যতে ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে এরূপ কার্য্য করা ধর্ম্ম বিশ্বাসের কার্য্যও নহে, সংসারের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কার্য্যও নহে।

ধর্ম্মের দোহাই সকলেই দিয়া থাকেন। কিন্তু পাত্র বা পাত্রী অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া অনেকেই ধর্ম্মের প্রাধান্য ভুলিয়া যান। যাঁহারা ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা বিবাহের সম্বন্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ধর্ম্মকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে পাত্র বা পাত্রী অন্বেষণে তাঁহারা ধর্ম্মই অন্বেষণ করিতেছেন।

নূতন যুগে সামাজিক ব্যবস্থানের যে পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে তাহা সহজ ব্যাপার নহে। জাতি ও কুলের দৃঢ়বন্ধন ছিন্ন করিয়া যাঁহারা বিশ্বমানবের সহিত সমতার ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়াছেন তাঁহাদিগের পক্ষে বর ও কন্যা মনোনয়ন কার্য্য অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ। পূর্ব্বে এক দেশের এক ভাবাক্রান্ত ও সামাজিক প্রায় সমান অবস্থার পরিবার সকলের মধ্যে বিবাহের সম্বন্ধ হইত তাহাতে ভয়ের বা আশার বিশেষ কোন কারণ থাকিত না। যে সকল পরিবারের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ হইত তাহার বিষয় সাধারণত সকল কথা জানাও থাকিত, সেরূপ বিবাহে স্বামী স্ত্রীতে বিশেষ অমিলন হইবার আশঙ্কা অধিক থাকিত না; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিতে একটি ভ্রম করিলে হয়ত একটি পরিবার চিরদিনের জন্য দুঃখী হইবে, কিম্বা সন্তানগণ রুগ্ন, হীন, নীচ হইতে পারে। এরূপস্থলে বিবাহের সম্বন্ধ করা অত্যন্ত কঠিন কার্য্য, কিন্তু সেইজন্য এবিষয়ে উদাসীন থাকিলে চলিবে না। যাঁহারা কোন একটা রূপ গুণের উচ্চ আদর্শ ধরিয়া আপনাদিগের বয়ঃপ্রাপ্ত কন্যা বা পুত্রগণের বিবাহ দিতেছেন না তাঁহারা অপরদিকে হয়ত ভয়ানক অন্যায় কার্য্য করিতেছেন। বাল্যবিবাহ যেমন অনিষ্টকর, বিলম্বে বিবাহ কোনরূপে তাহা অপেক্ষা অল্প অনিষ্টকর নহে। বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করা বিষয়ে অতিবিলম্ব অনেক পরিমাণে বৃথা অভিমানের ফল এবং তাহার জন্য অতি গুরুতর দণ্ড সহ্য করিতে হয়।

হেলেন কেলার ও সামাজিক সাম্যবাদ।

যাহারা জন্মান্ধ তাহারা সমাজের ভারস্বরূপ হইয়া চিরদিন পরাধীনতা ও দুঃখে জীবনযাপন করিবে, ইহাই আমরা মনে

করি। যাহারা মূক বধির তাহাদের দশাও তাহাই হইয়া থাকে। আমাদের দেশের লোকের মন ভগবানের উপর তাহাদের দুর্দ্দশার কারণ না চাপাইয়া তাহাদেরই পূর্ব্ব জন্মের দুষ্কর্ম্মের উপর চাপাইয়া থাকে। যখন কোন লোক জন্ম হইতেই অন্ধ হয়, বা কালা বোবা হয় তখন সকলে মনে করে পূর্ব্ব জন্মের কোন পাপ ভোগ করিতে তাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের সভ্যতায় সর্ব্বদিকব্যাপী মহা উদ্যোগে অন্ধগণও পড়িতে শিক্ষা করে এবং কোন কোন কার্য্য করিয়া সমাজে আপনাদিগের প্রাপ্য স্থান গ্রহণ করে। যাহারা মূক বধির তাহারাও চিত্র প্রভৃতি কার্য্যে নিপুণ হইয়া দশ জনের একজন হয়।

মহিলার পাঠিকা ও পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই হেলেনকেলারের নাম শুনিয়াছেন। এই নারী জন্ম হইতে অন্ধ, মূক ও বধির। শিক্ষাদানের আশ্চর্য্য কৌশলে ও সহানুভূতির অলৌকিক শক্তিতে ইনি ৩৩ বৎসর বয়স্রে একজন অতি সুশিক্ষিতা নারী হইয়া উঠেন। ইনি এখন ধর্ম্মশীলা, বহু-গ্রন্থ রচয়িত্রী ও কবি। সম্প্রতি একখানি বিলাতি সংবাদ পত্রে তাঁহার বিষয় অনেক প্রশংসার কথা লেখা হইয়াছে। কেলার তাঁহার শেষ গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে আপনার সমাজ-বিজ্ঞান বিষয়ক মতের পরিবর্ত্তন অতি আশ্চর্য্যরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন মানব-সমাজের বিষয় সকল অবগত হইয়া বুঝিতে পারিলাম যে কেবল তিনিই যে অন্ধ মূক বধির তাহা নহে, সমাজের সকলেই অন্ধ, মূক ও বধির; কারণ কেহই সমাজের অবস্থা দেখিতে পাইতেছে না, দুঃখের কান্না শুনিতে পাইতেছে না এবং কেহ উচিত কথা বলিতে পারিতেছে না। যাহাদিগের ধন নাই, শিক্ষা নাই, সহায় নাই, স্বাস্থ্য নাই, বল নাই, তাহারাও সকলে মানুষ, অপর সকল মানুষের মত তাহাদিগের দুঃখের অনুভূতি আছে, তাহাদের সুখের আকাঙ্ক্ষা আছে, উচ্চতা লাভের ইচ্ছা আছে। অন্যদিকে যাহারা ধনে, মানে, বিদ্যায়, পদে বড় হইয়াছে তাহারা আপনাদিগের বৃথা আমোদ বিলাসে কত ব্যয় করিতেছে, আলস্য ও দুষ্কার্য্যের দ্বারা কত অনিষ্ট করিতেছে—এক শ্রেণী অপর শ্রেণীর উপর কত অবিচার অত্যাচার করিতেছে। কত ধনের অপব্যয় হইতেছে অথচ কত লোক অনাহারে প্রাণ হারাইতেছে। সমাজের এই ভয়ানক অসম অবস্থা দর্শন করিয়া হেলেন কেলার সামাজিক সাম্যবাদিনী হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহার মতে সমস্ত পৃথিবী,—সকল সমাজ অন্ধ, মূক ও বধির—আর যতদিন এই ভয়ানক অসমতা চলিয়া না যাইবে ততদিন পৃথিবী সত্য দর্শন, শ্রবণ ও বাক্‌শক্তি লাভ করিবে না।

সকলেই হেলেন কেলারের মত সামাজিক সাম্যবাদিনী হইবেন, অর্থাৎ ধনিগণ আর ধনী থাকিবেন না, সকল ধনে সকল লোকের অধিকার হইবে এ কথা আমাদিগের পাঠিকাগণ হয়ত গ্রহণ করিবেন কিনা জানি না; আমরা যে চক্ষু থাকিতে অন্ধ, লোকের দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিতে পাই

না, কর্ণ থাকিতেও বধির, দুঃখের ক্রন্দনও শুনিতে পাই না এবং বাক্‌শক্তি থাকিতেও মূক—কারণ ঠিক সত্য কথা বলিতে পারি না, এ বিষয় প্রত্যেকের চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। আমরা সমাজের অবস্থা যেরূপ দেখিতে অভ্যস্ত তাহাই যেন শ্রেষ্ঠ অবস্থা বা স্বাভাবিক অবস্থা এইরূপ মনে হয়। কিন্তু একটু বিশেষ মন দিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি যে আমাদিগের চারিদিকে ভয়ানক অবিচার অত্যাচার হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে কোন অবস্থার লোকই নীরবে এ সকল সহ্য করিতেছে না, আপন আপন অবস্থার বিষয় আলোচনা করিয়া তাহার উচ্চতা সাধনে যত্নবান হইতেছে। এ সময়ে কর্ণ স্বাভাবিক থাকিলে ও চক্ষুর ন্যায়দৃষ্টির শক্তি থাকিলে অবশ্যই সকলেই চারিদিকে অনেক দুঃখের অবস্থা দেখিতে পাইবেন এবং দুঃখের ক্রন্দন শ্রবণ করিবেন—যদি অন্তরে তাহাকে স্থান দান করেন ও অন্তরের প্রকৃত ভাব বাক্যে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হন তাহা হইলেই অন্ধ, বধির ও মূক হেলেন কেলারের নিকট অনেকটা চক্ষু, কর্ণ ও বাক্‌শক্তি লাভ করিয়া তাহার মত সামাজিক সাম্যবাদিনী হইবেন।

বঙ্গমহিলার জাপানযাত্রা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

জাপানের পূর্ব্বতন রাজধানী কিয়োতো এঁদের পুণ্য তীর্থস্থান রূপে গণ্য। এখানকার নানা কারুকার্য্য বিশিষ্ট বড় বড় "ওথেলা" (দেবমন্দির) গুলি দর্শনীয়। একটী বাড়ীতে পূজাদি উপলক্ষে পূর্ব্বের রাজগণ আসিলে বসিতেন। বর্ত্তমান রাজারও বসিবার ঘর আছে। গৃহের চতুর্দ্দিকস্থ বারান্দাগুলি এরূপ ভাবে প্রস্তুত যে হাঁটিবার সময় পাখীর ডাকের মত নানারূপ শব্দ হয়। প্রতিজনকে পাঁচ পয়সার টিকিট কিনিয়া বারান্দায় একবার বেড়াতে হয়। ওথেলার পিত্তল ও কাষ্ঠ-নির্ম্মিত নানা কারুকার্য্য বিশিষ্ট সুদৃশ্য বড় বড় আলমারীতে "ওসাকাসান"—বুদ্ধমূর্ত্তি। সম্মুখে পিত্তলের ফুলদানীতে ফুলপাতা, পিত্তলের পাত্রে ধুনা এবং পিত্তল নির্ম্মিত ঝাড় ও প্রদীপ। সম্মুখে আলো ও ধুপধুনা জ্বালাইয়া উৎকৃষ্ট বেশধারী "বোসান" (পুরোহিত) উন্নত আসনে উপবিষ্ট হইয়া মন্ত্রপাঠ করেন। মাঝে মাঝে বৃহৎ ঘণ্টায় ঢং ঢং শব্দ করা হয়। উপস্থিত লোকেরা মনোযোগের সহিত শ্রবণ করে ও মাঝে মাঝে "নামান্দাত নামান্দাত" (অনেকটা হরিধ্বনি বা ঈশ্বরের কোন নামোচ্চারণের ন্যায়) শব্দে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করে। যুক্তকরে ক্ষুদ্র রুদ্রাক্ষ বা কাচের মালা হাতে জড়াইয়া নমস্কার করে। পরে অপর একজন উপদেশ দেন। পূজা শেষ হইলে প্রতি জনের নিকট হইতে এক একটী ছোট ডালায় দুই, এক বা অর্দ্ধ পয়সা হিসাবে চাঁদা সংগ্রহ করা হয়।

জাপানের ওথেলাগুলি সবই প্রায় এক ধরণেরই, পূজাদিও প্রায় এক পদ্ধতিতেই সম্পন্ন হয়; তবে মন্ত্রাদি ধর্ম্ম অনুসারে বিভিন্ন হয়। কিয়োতোর মন্দিরে প্রতি

বৎসর বিশেষ পূজার সময় বহুলোক গমনাগমন করে। এখানে পাহাড়ের উপর স্বর্গীয় মিকাডোর সমাধিস্থান। এক্ষণে সমাধি ও রাস্তাদি প্রস্তুত হইতেছে, সেজন্য কাহাকেও দেখিতে দেওয়া হয় না। পাহাড়ের কতকটা নীচে দর্শনার্থীরা উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া যায়। কিয়োতোয় একটী বৃহৎ বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিটী কাষ্ঠ-নির্ম্মিত; উপরে পিতলের গিল্টি করা। আরও কয়েকটী সহর দুই একদিন করিয়া দেখিয়াছি, তন্মধ্যে নাগোয়া ও ওসাকা বড় নগর। নাগোয়া এঁদের গ্রাম হইতে খুব নিকটে; ট্রামে কয়েক মিনিটের পথ। এখানে সর্ব্বত্র এমন কি ছোট ছোট সহরেও ট্রাম চলে। বৃষ্টির পর রাস্তা বড়ই খারাপ হয়। সর্ব্বত্র এক ধরণেরই কাঠের বাড়ী। স্ত্রী পুরুষের প্রায় একই পোষাক ও একই চেহারা।

এখানকার কোন ভূমি জঙ্গলপূর্ণ হইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখা যায় না। ক্ষেত্রগুলি পরিষ্কার ও সুসজ্জিত। ধান্য, গোধূম ও অন্যান্য শস্য থাকে থাকে সারি সারি করিয়া বপন করা হয়। ইহারা মলমূত্রাদি পচাইয়া কৃষিক্ষেত্রে সাররূপে ব্যবহার করে। মটরের মত নানা প্রকার ডাল হয়; মটর ডালও হয়। ইহা প্রথম ইণ্ডিয়া হইতে আমদানী হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে "ইন্দোমামে" অর্থাৎ ইণ্ডিয়ার ডাল বলে। দারুণ শীতে যে সকল বৃক্ষলতা পত্রাদিশূন্য হইয়া কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় দণ্ডায়মান ছিল, এক্ষণে বসন্তকালে তাহা পুষ্প পল্লবে সুশোভিত হইয়াছে। এ সময় "সাকুরানোহানা"—বসন্তের চেরী ফুল ও অন্যান্য ফুল বৃক্ষ আচ্ছাদন করিয়া প্রস্ফুটিত হয়। কোন কোন স্থানে অনেক পরিমাণে চেরী ফুলের বাগান আছে। অসংখ্য লোক তাহা দেখিতে আসে। তাহাদের বিশ্রামের জন্য কয়েক খানি ঘর প্রস্তুত করা হয়। ঘণ্টা হিসাবে তাহার ভাড়া দিতে হয়। নানারূপ আমোদ প্রমোদের বন্দোবস্ত হয়, দোকান ও আহারাদির বন্দোবস্তও থাকে। চারিদিকে প্রস্ফুটিত চেরী বৃক্ষ। বসন্তে জাপানের দৃশ্য বড়ই মনোরম!

আমার প্রতি এ দেশবাসিগণের আশ্চর্য্য ব্যবহার দেখিলে অবাক হইতে হয়। আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী ও অন্যান্য আত্মীয়গণ সর্ব্বদা আমার যাহাতে কোন কষ্ট না হয় তাহাই করিতেন। আমার সকল কাজ তিনি ক'রে দিতেন। কূপ হইতে কদাচিৎ জল তুলিতে বা বস্ত্রাদি কাচিতে গেলে তাহা আমার হাত হইতে জোর করিয়া লইয়া নিজে সম্পন্ন করিতেন; আমি আপত্তি করিলে বলিতেন, "শীতে কষ্ট হইবে ও অসুখ হইবে।" ৬০ বৎসর বয়স হইয়াছে কিন্তু এত পরিশ্রম করিতে পারেন, যাহা আমাদের মত ২।৩ জনেও সমর্থ হয় না। আহারাদি প্রস্তুত, গৃহ পরিষ্কার প্রভৃতি যে কোন কাজ করিতে যাইতাম, আমাকে সরাইয়া নিজে সমাধা করিতেন। ঠাণ্ডা জল কখনও ব্যবহার করিতে দিতেন না। আমার রুচিকর খাদ্য যাহা পারিতেন প্রায়ই প্রস্তুত করিয়া বা কিনিয়া দিতেন। শীতে অগ্নি-পাত্র

লইয়া যখন বসিয়া থাকিতাম, আমার গাত্র কম্বলাদি শীতবস্ত্র দ্বারা ঢাকিয়া দিতেন; স্নান করিবার সময় গাত্র মার্জ্জনা করিয়া দিতেন। অকর্ম্মণ্য ভাবে বসিয়া থাকিতে কষ্টকর বোধ হইত বলিয়া আমাকে "কিমোনা" প্রভৃতি সেলাই করিতে দিতেন। যে সকল স্থানে কোন আনন্দের ব্যাপার বা কিছু দর্শনীয় থাকিত তথায় লইয়া যাইতেন। তাকেদাসানের ভ্রাতৃবধূ তাঁহার শিশুপুত্রকে প্রায় আমার নিকটে রাখিতেন, পাড়াপ্রতিবেশী ও আত্মীয়গণ আমাকে তাঁহাদের বাড়ী লইয়া গৃহের কার্য্যাদি, চিত্রিত কার্ড ইত্যাদি দেখাইতেন। এইরূপে আমাকে বিদেশী বলিয়া কোনরূপ ঘৃণা বা অসন্তোষ প্রকাশ ত দূরের কথা, কিসে আমার চিত্ত বিনোদন করিবেন তজ্জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। কেবল নিজ বাটীতে নয়, যে কোন স্থানে নিমন্ত্রিত হইয়া বা নিজ প্রয়োজনে যাইতাম, বিদেশী বলিয়া সকলেই আমাকে দেখিতে আসিতেন ও নানা সংবাদ শুনিতে আগ্রহান্বিত হইতেন। আমাদের অভ্যর্থনার জন্য যে কি বন্দোবস্ত করিবেন তাহার ঠিক পাইতেন না। সাধ্যানুসারে যত্নাদি করিয়াও আমার অত্যন্ত কষ্ট অসুবিধা হইতেছে, কিছুই করিতে পারিতেছেন না—ইত্যাদি বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেন। মোট কথা, বিদেশীর প্রতি ইঁহাদের আন্তরিক সহানুভূতি দেখিয়া মোহিত হইতে হয়। কোন ভারতবাসী পরিবারে কয়েক দিনের জন্য ঝি ছিল না। তাঁর স্ত্রী শিশুপুত্রটীকে লইয়া ভয়ানক শীতকালে সকল কার্য্য স্বহস্তে সম্পন্ন করিতেন। তাঁহাদের বাটীর নিকটস্থ এক সম্ভ্রান্ত ধনী জাপানী পরিবারের একটী বালিকা সর্ব্বদা উঁহাদের সাহায্য করিতেন। মেয়েটীর স্কুলের পড়া শেষ হইয়াছে। ইঁহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী গ্র্যাজুয়েট ও ইংরাজিতে অভিজ্ঞা। বালিকাটী সর্ব্বদা ওঁদের বাড়ী এসে সন্তান রাখা, বাসন ধোয়া, রন্ধনাদির সাহায্য ইত্যাদি সব করে দিতেন।

তাকেদাসান ভারতে আসার পর একবার অনেকদ্দিন পর্য্যন্ত সংবাদাদি না পাইয়া সকলে তাঁহার মৃত্যুই স্থির করিয়াছিলেন। সে জন্য দীর্ঘ নয় বৎসর কাল পরে সন্তানকে পাইয়া পিতামাতা ও আত্মীয়গণ পরমাহ্লাদিত হইয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে খুব উৎসবানন্দ হইল। সমুদয় আত্মীয়-স্বজনগণ এ সময় মিলিত হইয়াছিলেন। হিন্দুদের মত এঁদের এক এক পরিবারের একজন করিয়া পুরোহিত (বোসান) থাকেন। উৎসব উপলক্ষে মাতৃপক্ষ, পিতৃপক্ষ ও অপরাপর ১২ জন পুরোহিত ও আত্মীয়বর্গ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। বাটীস্থ সুসজ্জিত গৃহে, বুদ্ধমূর্ত্তির সম্মুখে উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান বেশধারী ১২ জন "বোসান" সমস্বরে মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন। তৎপরে পরিবারস্থ পুরুষেরা উচ্চৈস্বরে মন্ত্র বা স্তোত্র পাঠ করিয়া তন্মধ্য হইতে একজন সকলকে উপদেশ দান করিলেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারী প্রাতে ৮ টায় আরম্ভ হইয়া ৩।৪ ঘণ্টা ব্যাপী পূজাদি হইল। বৈকালে ৪টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ও তৎপরদিন প্রত্যুষে স্তোত্র পাঠ ও উপ-

দেশাদি প্রদত্ত হইল। রাত্রে "বোসান"গণ ও আমরা একত্রে আহার করিলাম। সে সময় পুরোহিতগণের সহিত আলাপ হইল। কেহ কেহ আমাদিগকে নিমন্ত্রণও করিলেন। হিন্দু পুরোহিতগণের ন্যায় ইঁহাদিগকে টাকা দিতে হয় ও তদ্দ্বারাই ইঁহারা সাধারণ অপেক্ষা পরম সুখে বাস করেন। পুনঃ পূর্ব্বদিনের ন্যায় পূজাদি হইয়া কার্য্য শেষ হইল। এতদুপলক্ষে তিন চারি শত আত্মীয় ও পাড়াপ্রতিবেশীদের খাওয়ান হইয়াছিল। পূজার পূর্ব্বে নোটিশ দেওয়া হইয়াছিল। অনেক লোক বিশেষ ভাবে আমাকে দেখিবার জন্যই আসিয়াছিলেন। এত লোক হইয়াছিল যে পূজার পর যে চাঁদা সংগ্রহ করা হয় তাহাতে প্রতিজনের নিকট হইতে এক, অৰ্দ্ধ বা সিকি পয়সা করে প্রায় ১৫।১৬ ইয়েন (২৩।২৪ টাকা, ১৷৷১০ আনায় এক ইয়েন) আদায় হইয়াছিল। সকলে আমাকে দেখিবার জন্য এত ব্যগ্র যে ভিড়ের ভিতরে আমার থাকা কষ্টকর হওয়াতে আমার দেবরেরা সকলকে ঠেলিয়া আমাকে টানিয়া গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া গৃহদ্বার বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। যখন দেখিবার জন্য সকলে খুব ব্যগ্র হইতেন, ২।৩ মিনিটের জন্য আমাকে বাহিরে আসিতে বলিতেন। এ সকল গ্রামে ও অন্যান্য সহরে, যেথানে বিদেশী বড় কেহ দেখেন নাই, এইরূপ স্থানে আমার চলা ফেরা একরকম কষ্টকর বোধ হইত। কারণ, অসংখ্য লোক প্রায় আমাকে ঘিরিয়া ফেলিত। আসিবার সময় শাশুড়ী-ঠাকুরাণী এক ননদ-পুত্র সহ "কোবে" পর্য্যন্ত আসিয়া আমাদিগকে জাহাজে তুলিয়া দিলেন। বিদায় কালে কাঁদিতে কাঁদিতে বিদায় লইলেন। আমি তাকে-দাসানকে বলিতে বলিলাম, "সকলে আমার কত যত্ন আদর করিলেন কিন্তু আমার কর্ত্তব্য আমি পালন করিতে পারিলাম না।" তাহাতে তাঁহারা—"বিদেশে কত কষ্ট পাইতে হইল কিছুই করিতে পারিলাম না" ইত্যাদি বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বিদেশে এমন সরল-স্বভাবা স্নেহপরায়ণা শ্বশ্রূঠাকুরাণীর মা'র মত স্নেহ যত্ন ভালবাসা পাইয়া ইঁহার সহিত বাস করিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু সে সম্ভাবনা কোথায়?

শ্রীহরিপ্রভা তাকেদা।

কবি রবীন্দ্রনাথ।

আমাদের রবিবাবু আমাদের সকলের প্রিয়। রবিবাবুর গান কে না ভালবাসে, রবিবাবুর গল্প কে না পড়ে, রবিবাবুর কবিতা কে না ভালবাসে? যখন আমাদের আপনার প্রিয়জনের বিদেশে মান্য হয় তাতে আমাদের বিমল আনন্দ লাভ হয়। এবার বিলাতে ও আমেরিকায় রবিবাবুর যে সম্মান লাভ হইয়াছে তাহাতে যেন সমস্ত বাংলাদেশ সম্মানিত হইয়াছে। তাঁহার গীতাঞ্জলীর অনুবাদের সুখ্যাতি এ দেশে অন্য দেশে ছোট বড় সকলের মুখে শুনিয়া আমরা কত সুখী হইয়াছি। এবার কবি রবীন্দ্রনাথ জগন্মান্য মহাকবির মান্য পাইয়াছেন ইহাতে সকল বঙ্গবাসী

বা সকল ভারতবাসীর বিশেষ আনন্দের বিষয়।

গত ১৩ই নবেম্বর বিলাত হইতে তারে সংবাদ আসিয়াছে যে এ বৎসরের সাহিত্য বিষয়ক নোবেল প্রাইজ্ (পুরস্কার) কবি রবীন্দ্রনাথকে দেওয়া হইয়াছে। এই পুরস্কারের মূল্য ৮০০০ পর্য্যন্ত অর্থাৎ এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা।

সুইড্‌জারলাণ্ডের আলফ্রেড্ নোবেল নামক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ১৭৫০০০০ পাউণ্ড মূলধন রাখিয়া যান। তাঁহার উইল অনুসারে প্রতি বৎসর পদার্থ বিদ্যা, রসায়ণ বিদ্যা, ঔষধ ও শরীর বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শান্তি বিষয়ক সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত বা কর্ম্মীকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়, বর্ত্তমান বৎসরের সাহিত্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সভা এই পুরস্কারের জন্য আমাদের প্রিয়তম কবি রবীন্দ্রনাথকে মনোনীত করিয়াছেন। ইহাতে আর্থিক লাভ লক্ষ টাকার অধিক কিন্তু গৌরব লাভ কোটি মুদ্রারও অধিক। ইউরোপের বিচারে যখন রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া বিবেচিত হইলেন, তখন এদেশেও তাঁহাকে সকলে সম্মান করিতে ব্যস্ত হইলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত রবীন্দ্রনাথের কোন সম্বন্ধ নাই। বর্ত্তমান সময়ের প্রায় সকল বড়লোকই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি ভূষণে ভূষিত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ও উন্নতি বিশ্ববিদ্যালয়-নিরপেক্ষ। অথচ তাঁহার এই গৌরবের দিনে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সম্মানিত সাহিত্যিক ডাক্তার উপাধি দান করিয়া আপনারা সম্মানিত হইতেছেন। এদিকে গত ৭ই অগ্রহায়ণ, ২৩শে নবেম্বর, রবিবার দিন কলিকাতা হইতে স্পেশাল ট্রেণ করিয়া প্রায় পাঁচ শত ভদ্রলোক কবির সম্বর্দ্ধনার জন্য বোলপুর শান্তিনিকেতনে গমন করিয়াছিলেন। স্থানীয় ও অন্যান্য লোক লইয়া প্রায় এক সহস্র গুণগ্রাহী ব্যক্তি শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হন। বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু সমবেত সম্বর্দ্ধনাকারিগণের সভাতে সভাপতি মনোনীত হন এবং তিনি ও কবিবর রবীন্দ্রনাথ নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলে, তিনি অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন, তৎপর সাহিত্য পরিষৎ, সাহিত্য সভা, জৈন সভা হইতে ও মুসলমানগণের পক্ষ হইতে অভিনন্দন পত্র পাঠ করা হয়। শ্রীযুক্ত রেভারেণ্ড মিল্‌বার্ণ ও হলাণ্ড সাহেব এই দলের সহিত উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের সহৃদয়তা, উৎসাহ ও উদারতাপূর্ণ বাক্যে সকলেই অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করিয়া একটি বক্তৃতা করিলে সভা ভঙ্গ হয় ও সকলে স্পেশাল ট্রেণে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

বিশ্বময়ী।

আজি, মঙ্গল শঙ্খ বাজিয়া উঠেছে
পরাণ আবার জেগেছে তাই,
সুখের তন্দ্রা আলস্য জড়তা
আজিকে আমার তাইত নাই।

আছ তুমি আছ ভুবন ভরিয়া
তোমারি সত্তা জগতে ব্যাপিয়া
বিশাল বিমান করি নিনাদিত
উঠিছে তোমার সঙ্গীত তান,
বিশ্ববিজয়িনি, শকতিরূপিণী,
তৃষিতচিত্তে শান্তিবারিধারা
অজস্র ধারায় ঢালিয়া দিতেছ
গাহিয়া তোমার মধুর গান।
বিজয়পতাকা উড়িছে তোমার
শান্ত পবনে প্রভাতে সাঁঝে
তীব্র রবিকরে কনক কিরীট
ঝলসি তোমার মর্ত্ত্যে উঠিছে,
আহবমাঝারে বিজয়ী তোমার
বঙ্কিমবেলা-শুভ্রনিকেতনে
থাকি থাকি যেন জগত কাঁপায়ে
বিজয়ডঙ্কা তোমার বাজিছে।
পাদপ সকল ফল পুষ্পভারে
তোমার সমুখে স্বশির নোয়ায়ে
বিহগের গীতে গাহিছে তোমার
অপার মহিমা এ ভব ভবনে,
তোমারই গন্ধ বহিছে হেথায়
প্রভাত-মৃদুল শান্তপবনে,
জননী তোমার বিশ্বময়ীরূপ
আঁকিয়া দিতেছ পরাণে যতনে।

শ্রীনলিনীবালা দাস।

ভক্ত।

আমিত ছিলাম না। তুমিই এনেছ; তোমার সাধ হ'ল, ইচ্ছার-উদ্গম হ'ল; আর আমি হলাম।

... ...

হ'য়ে, এলাম এই মহিমামণ্ডিত বিচিত্র বিশ্বে। যে দিকে তাকাই সেই দিকে সৌন্দর্য্য বৈচিত্র্য। কত সৌন্দর্য্য, কত রং, কত গন্ধ, কত রূপ, কত স্বাদ পরিপূরিত দেখি এ বিশাল বিশ্ব! আশ্চর্য্য হই, এত রূপ বৈচিত্র্য দেখে স্তব্ধ হয়ে অবাক হয়ে, আমি দেখি আর মুগ্ধ হই।

... ...

মনে হয় কেউ না করলে, না গড়লে এমনটী কি হয়? কেউ নিশ্চয়ই গড়েছে করেছে তা না হলে এরূপ বিচিত্রতা এলো কোথা থেকে? আমি যতই ভাবি ততই অবাক্ হই। জানা কি যায় না তাঁকে?

... ...

যাঁর স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য চন্দ্র প্রকাশ করে, না জানি সেই বস্তু নিজে কত সুন্দর, যাঁর জ্যোতিঃ সূর্য্য প্রকাশ করে, না জানি তিনি কত জ্যোতিষ্মান্? যাঁর রংএর আভাস রামধনু প্রকাশ করে, না জানি তাঁর কি মোহন রং? যাঁর গন্ধ ফুল অল্প অল্প জানায়, না জানি তিনি নিজে কত সৌরভময়? যাঁর রূপ প্রকৃতি অল্পরূপে প্রকাশ করে, না জানি তাঁর কি অরূপ রূপ?

... ...

যাঁর ভয়ে অগ্নি জ্বলে, সূর্য্য উত্তাপ দেয়, বায়ু বহে, তিনি কেমন? তিনি কে?

... ...

তোমার ঐশ্বর্য্য আমায় তোমার জন্য আকুল করল। আমি তোমায় বুঝবার ও জানবার চেষ্টা করলাম। প্রকৃতির ভিতরে তোমায় প্রকাশ অনুভবে বেদ রচিত হল। তোমায় আদি কারণ, সর্ব্বময় ও সর্ব্বাতীত

জেনে উপনিষদ হল, শাস্ত্র হল, শ্রুতি হল, স্মৃতি হল।

কৈ তোমায় জানা হল কৈ? যেমন অজানা ছিলে পূর্ব্বে তেমনি রইলে, আমার জানা হল না, ধ্যান করলাম, স্থিরচিত্ত হয়ে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে তোমাতে যুক্ত হলাম, স্তিমিতলোচন হয়ে তোমার মহাসত্তায় ডুবলাম। ধ্যান, ধারণা, বন্দনা, স্তব স্তুতি করলাম কোনই ধারণা হল না, বাক্য ফিরে এলো, ভাষা হেরে গেল, চিন্তা নিবৃত্ত হল, অবাঙ্মনসোগোচর অপার অগম্য অচিন্তনীয় নির্ব্বচনীয় মহান্ তুমি! তুমি কোথায়?

হিন্দু বল্লেন সেই মহান্ পুরুষ বৈকুণ্ঠে, বৌদ্ধ বল্লেন আছেন অজানিত বস্তু অজ্ঞাত দেশে, খৃষ্টান বল্লেন তুমি Heaven বা স্বর্গে, মুসলমান বল্লেন বেহস্তে আছেন তিনি।

আমি এই ব্যবধান অতিক্রম করে তোমায় জানবার জন্য যোগে যুক্ত হলাম তোমার সঙ্গে। সবিকল্প নির্ব্বিকল্প সমাধি হল আমার, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দ রস পান হল আমার জীবন সার।

তোমায় জানলাম আমি মহতোমহীয়ান্ বলে, সকল দেবতার দেবতা বলে, মহাশক্তি বলে, মহা ইচ্ছা বলে, তোমায় পুরুষ-শ্রেষ্ঠ, রাজার রাজা বলে। মহান্ ঐশ্বর্য্যশালী এক শক্তিপুঞ্জ বলে, সকল প্রাণের প্রাণ, সকলের প্রতিষ্ঠাভূমি বলে।

যতই তোমার এই সব স্বরূপ করি ধ্যান, ততই তোমার মহত্ব, বিশালত্ব, অনন্তত্ব উঠে ফুটে, ও আমার ক্ষুদ্রত্ব, হীনতা, সান্তত্ব পড়ে বেরিয়ে। তোমাতে আমাতে প্রভেদ, ব্যবধান যায় বেড়ে। তোমায় মহাপ্রভু, মহতোমহীয়ান, বিশ্বরাজ করে দীনহীন আমি তোমারি সেবায় হলাম নিযুক্ত।

আমি তোমার উদ্দেশ্যে স্তব, স্তুতি, করলাম, কত যাগযজ্ঞ করলাম, কত মন্ত্র তন্ত্র রচনা করলাম, কত কৃচ্ছ সাধনা করলাম, কত মহা মহা আয়োজন তোমার পূজা উপলক্ষে করলাম।

যাগযজ্ঞ মহাধ্যান, যোগ প্রসূত মহা সত্য সকল আবিষ্কার করলাম, জ্ঞান, বুদ্ধি, উপলব্ধি দ্বারা তোমায় ধরবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু তুমি ধরা দিলে না, যা ছিলে তাই রইলে আমার জানা হল না। জ্ঞান হেরে গেল চিন্তা ফিরে এলো। আমি যেখানে ছিলাম সেইখানেই রইলাম, আমাতে তোমাতে ব্যবধান রয়ে গেল, ধরা পেলাম না তোমার, এত যাগ যজ্ঞ, যোগ ধ্যান, স্তব স্তুতি সত্ত্বেও ব্যবধান রয়ে গেল।

তুমি দেখ্‌লে তোমার অসংখ্য প্রজার মধ্যে মুষ্টিমেয় মাত্র যোগ ধ্যান, যাগ যজ্ঞ, জ্ঞান বিজ্ঞান দ্বারা তোমার দিকে অগ্রসর হচ্চে, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দরস পান

করছে ওতে তোমার মন উঠলো না, তৃপ্তি হল না, তাই তোমার সাধ হল প্রত্যেকের কাছে নিজেকে বিকাতে।

... ...

তোমার সাধ হল এ ব্যবধান, এ প্রভেদ ভেঙ্গে ফেলবার তাই তুমি এলে নেমে আপনার প্রেমে আপনি গলে আমাদের সঙ্গে লীলা করবে বলে, মাখামাখি করবে বলে,—ব্যবধান তোমার ভাল লাগল না, তাই এলে অযাচিত ভাবে নিজেকে বিলাবে বলে। ভক্তের সেবা করবে বলে।

... ...

ছিলে বৈকুণ্ঠে, এলে নেবে ধরাতলে। ছিলে এক নির্লিপ্ত মহাসত্তা হয়ে, যোগী ঋষির দুর্লভ হয়ে, এলে নেমে সবার সঙ্গে নিত্য নব নব রসলীলা করবে বলে, সহজ লভ্য হবে বলে।

... ...

ছিলে নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার ব্রহ্ম, হলে হলে অবতীর্ণ ব্রহ্ম। যোগী ঋষি মুগ্ধকারী বিরাট বিশ্বরূপ ছেড়ে এলে সহজ ভাবে দিতে ধরা প্রত্যেকের কাছে। এ তোমার সাধ।

আপনার সাধে আপনি নেমে এসে বাজালে আপন বাঁশী। উদার সুরে জগত জুড়ে তোমার সুর উঠল বেজে, জ্ঞানাভিমানী শুনলে না, তার্কিক শুনলে না, তোমার ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ যে সেও পেলেনা শুনতে, বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য যোগী ঋষি সে তান শুনলে না, যাগ যজ্ঞ রত, ক্রিয়া কর্ম্ম নিষ্ঠা নিয়ম নিয়ন্ত্রিত যে সেও শুনলে না। তাদের কাণে বৃথাই তোমার সুর কেঁপে কেঁপে ফিরে গেল।

... ...

সে ছিল বসে পথের ধারে, তার না ছিল বিদ্যা না ছিল বুদ্ধি, সে নাকি ছিল মূর্খ অতি, তার না ছিল ধ্যান, না ছিল যোগ, তপস্যা, সাধন, ভজন নিয়ম আচার। তারই হৃদয়-তন্ত্রী উঠল বেজে তোমারই সুরে। বিবেক বংশীতে নাম ধরে ডাকলে তাকে। এ তোমার লীলা।

... ...

সে কি আর থাকতে পারে? তার যা কিছু ছিল সব ছেড়ে মেতে উঠল তোমার সুরে। এর মর্ম্ম জানে "যেই ভকত, সেই আর তুমি জানাও যারে সেই জানে।"

... ...

তখন তুমি জিজ্ঞাসা করলে তাকে, কহ শুনি ভক্তি শাস্ত্র কিবা তব?

(ক্রমশঃ)

দক্ষিণ আফ্রিকাতে ভারতবাসী।

আমাদের পাঠক পাঠিকাগণের মধ্যে যাঁহারা দৈনিক বা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র পাঠ করেন, তাঁহারা অবশ্যই দক্ষিণ আমেরিকাপ্রবাসী ভারতবাসীর অবস্থার বিষয় অবগত হইতেছেন। যাঁহারা সংবাদপত্র পাঠ করেন না, তাঁহাদিগকেও এখন এ বিষয় জানিতে হইবে; কারণ আমাদের দেশের লোক এদেশে মজুরী না পাইয়া, কোনরূপে অন্নের সংস্থান করিতে না

পারিয়া সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকাতে গমন করিয়াছে, সেখানে তাহাদিগের প্রতি যে অবিচার অত্যাচার হইতেছে তাহা আমাদিগের নিজের ঘরের কথা মনে করিতে হয়।

ইংরেজ, দিনামার ও অন্যান্য ইউরোপীয় জাতি আফ্রিকার দক্ষিণ ভাগে উপনিবাস স্থাপন করিয়া অতি বিস্তৃত আকারে চাষবাস আরম্ভ করেন। শ্বেতাঙ্গ কুলি বা আফ্রিকার কুলিগণের দ্বারা এই সকল চাষের সকল কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না, এজন্য এসিয়ার—বিশেষ ভারতের ও চীনের কুলি আমদানি করা প্রয়োজন হয়। রাঁচি, হাজারীবাগ, পুরুলিয়া প্রভৃতি জেলার লোক আসামে চা-বাগানের কুলি হইয়া যায়—বা মরিসাষ প্রভৃতি দ্বীপে কুলি হইয়া যায়, ইহা সকলেই দেখিয়াছেন। গরীবেরা দেশে খাইতে পায় না, কোন কাজ পায় না এজন্য স্ত্রীপুত্র লইয়া দেশ ছাড়িয়া সুদূর জঙ্গলে যাইয়া পরিশ্রম করে, তাহার উপর আবার নানারূপ অত্যাচার সহ্য করে। আমরা প্রায় বাল্যকাল হইতে কুলিকাহিনী পড়িয়া কত দুঃখবোধ করিয়াছি!

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথমে আফ্রিকাতে কুলি যাইবার নিয়ম হয়। তখন হইতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু লক্ষ দীন দরিদ্র অথচ সুস্থ সবল ভারতবাসী দক্ষিণ আফ্রিকাতে যাইয়া শ্বেতাঙ্গদিগের চাষের সাহায্য করিয়াছে। শ্বেতাঙ্গগণ চিরদিনই এদেশের লোকের পরিশ্রমের ফল গ্রহণ করেন, কিন্তু তাহাদিগকে ভ্রাতা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না। গ্রামে বা নগরে তাহাদিগকে সমান অধিকার দিতে প্রস্তুত নহেন—এজন্য সময় সময় সংঘর্ষ ঘটিয়া থাকে।

আমরা দক্ষিণ আফ্রিকাতে যে ইউরোপীয়দিগের উপনিবাসের কথা বলিয়াছি, কালে তাহারা ধনে জনে প্রধান হইয়া উঠে এবং কয়েকটা স্বাধীন রাজ্যের মত হইয়া উঠে। ইহার মধ্যে নেটাল নামক দক্ষিণতম দেশ সাক্ষাৎ ভাবে ইংলণ্ডের রাজার অধীন থাকে। ১২।১৩ বৎসর পূর্ব্বে যে বোয়ার যুদ্ধ হইয়াছিল তাহার বিষয়ে অনেকেরই উজ্জল স্মৃতি আছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপনিবেশগুলি স্বাধীন হইতে মহাযত্ন করিতেছিল, কিন্তু হীরকের খনি প্রভৃতিতে পূর্ণ বহুমূল্য দেশকে এরূপ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয় না—ইহা লইয়া তুমুল যুদ্ধ হয় এবং শেষে উপনিবেশগুলি ইংলণ্ডের রাজার অধীনতা স্বীকার করেন এবং রাজা তাঁহাদিগকে উপনিবেশ রাজ্যস্থাপন করিয়া ধনে জনে সুখে সম্পদে ও স্বাধীনতায় বর্দ্ধিত হইতে অবসর দেন। এই সময় হইতেই নূতন ভাবে উপনিবাস গঠিত হয়। ইঁহাদিগকে মিলিত উপনিবাস বলিয়া স্বীকার করা হয়।

যখন শ্বেতকায় উপনিবাসবাসিগণ পৃথক্ ভাবে রাজ্য লাভ করিলেন, বোধ হয় তখন হইতেই তাঁহারা ভারতবাসী কুলিদিগের প্রতি অধিক শাসন আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে এই শাসন অসহ্য হইয়া উঠিল। গত কয়েক বৎসর হইল একটি নিয়ম হইয়াছে, যে কোন এশিয়াবাসী দক্ষিণ আফ্রিকাতে থাকিবে তাহাকে ঠিকা কুলি ভাবে থাকিতে হইবে, যদি তাহার চুক্তির কাল

দক্ষিণ আফ্রিকাতে ভারতবাসী।

পূর্ণ হইয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে প্রত্যেক স্ত্রী পুরুষ বালক বৃদ্ধকে বৎসরে ৩ পাউণ্ড অর্থাৎ ৪৫৲ টাকা অতিরিক্ত ট্যাক্স্ দিতে হইবে। ভারতবাসিগণ এই অন্যায় কর দিতে কিছুতেই সম্মত হইতেছে না—অথচ দেশের শাসনকর্ত্তাগণ সে আইন পরিবর্ত্তিত করিতে কিছুতেই প্রস্তুত নহেন। ভারতবাসিগণ যেসকল খনিতে বা অন্যত্র কাজ করিতেছিল, তাহারা দলে দলে কর্ম্মত্যাগ করিয়া মুক্ত ইংরাজরাজ্যের দিকে যাইতে চাহিতেছে, তাহাদিগকে পলাইয়া যাওয়ার অপরাধে ধরিয়া জেল দেওয়া হইতেছে ও নিষ্ঠুরভাবে বেত্রাঘাত করা হইতেছে। এই ব্যাপার লইয়া নিত্য নূতন ঘটনা সকল ঘটিতেছে। শিশুবৃদ্ধ স্ত্রীলোক প্রভৃতির মহা ক্লেশ হইতেছে এবং শুনা যায় কাহারও কাহারও মৃত্যু হইতেছে।

আমাদের দেশের এই সকল দুস্থ লোকদিগের সাহায্যের জন্য ভারতের সর্ব্বত্র সভা হইতেছে এবং টাকা তুলিয়া দক্ষিণ ভারতে পাঠান হইতেছে। সাধারণ সকল প্রকার আন্দোলনে বঙ্গদেশ সর্ব্বপ্রথমে হস্তক্ষেপ করেন, কলিকাতায় বড় বড় সভা করিয়া অত্যাচারের প্রতিকার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এই দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদিগের দুঃখ দূর করিতে তাহার প্রতিকারের চেষ্টা বঙ্গদেশ এতদিন প্রায় কিছুই করেন নাই বলা যাইতে পারে। বোম্বাইর সুপ্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ মাননীয় গোকলে মহোদয় নিজ চক্ষে ভারতবাসীর অবস্থা দেখিবার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকাতে গিয়াছিলেন, তিনি আসিয়া বলিয়াছেন সত্যই ভারতবাসীর উপর অতিরিক্ত কর আদায় করা অন্যায়, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশে ছোট বড় অনেক সহরে সভা করিয়া এজন্য টাকা উঠিতেছে ও আন্দোলন হইতেছে। ইংলণ্ডে এজন্য আন্দোলন চলিতেছে। ফলে ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডের মহাসভা পারলিয়ামেণ্টের নিকট ইহার একটা উপায় করিতে বলিতেছেন, কিন্তু মিলিত উপনিবাসগুলি আপনাদিগের রাজ্যের আভ্যন্তরিক ব্যবস্থা আপনারা করিবেন ইহাই নিয়ম আছে। এজন্য যখন দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতকায়গণ ভারতবাসীকে স্বাধীনভাবে সে দেশে বাস করিতে দিতে আন্তরিক ইচ্ছা করেন না, তাঁহারা চান যে ওদেশে এসিয়ার লোক স্থায়িরূপে কখনও থাকিতে পারিবে না—কেবল প্রয়োজন মত কুলির কাজ করিবে এবং কাজ শেষ হইলেই চলিয়া আসিবে, তখন সম্রাটের সচিবগণও এ বিষয়ে কিছু বলিতে সাহস করিতেছেন না। ভারতবাসীর প্রশ্ন এখন ইংলণ্ডের জগদ্ব্যাপী—উপনিবাস সহ রাজ্যের সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ভারতবাসিগণ দক্ষিণ আফ্রিকাতে একান্ত অসহায় হইলেও তাঁহারা বন্ধুহীন নহেন। মেঃ গন্ধী (ভারতবাসী) ও মেঃ পোলক (সাহেব) ইঁহাদের প্রকৃত বন্ধু। ইঁহাদিগের দুঃখ দূর করিতে বহুদিন হইতে প্রাণপণ যত্ন করিতেছেন। এই কার্য্যের জন্য মেঃ গন্ধী পূর্ব্বেও জেলে গিয়াছিলেন, সম্প্রতিও কি আইন ভঙ্গ করিবার অপরাধে তিনি কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন।

শুনিলাম ঐ কারণে মেঃ পোলকেরও কারাদণ্ড হইয়াছে। কিন্তু ইঁহারা দেব-স্বভাব—মহাপুরুষ জেলখানায় ইঁহাদিগের কার্য্য কখনও বন্ধ করিতে পারিবে না। আফ্রিকার কলোনীর প্রধান কর্ম্মচারিগণ-মধ্যেও অনেকে ভারতবাসীর প্রতি অন্যায় করিয়া সুখী নন। তাঁহারা ভারত-বাসীকে সে দেশে বাস করিতে দিতে প্রস্তুত নহেন, কিন্তু কষ্ট দিতে চাহেন না। কেহ কেহ প্রস্তাব করিতেছেন যে যখন দক্ষিণ আফ্রিকা শ্বেতাঙ্গদিগের দেশ হই-য়াছে যখন তাহারা ভারতবাসীকে সে দেশে স্থান দিতে চায় না তবে মিথ্যা ঝগড়া করিয়া কি হইবে, সে দেশে যত ঠিকা কুলি বা স্বাধীন কুলি ও অন্য লোক আছে তাহাদিগকে দেশে ফিরাইয়া আনিয়া যার যার দেশে ছাড়িয়া দেও। এ কথা একদিকে ভাল—শুনিতে ভালই বোধ হয়, কিন্তু যখন আমরা মনে করি যে এ দেশে গরিব লোকেরা কোন কাজ পায় না, কোনরূপ উপার্জ্জন করিতে পারে না, তাহাদিগকে কাজে নিযুক্ত করিতে সরকার বাহাদুর আপনাদিগকে দায়ী মনে করেন না তখন তাহারা স্বদেশে আসিয়াই খাইবে কি? তাহাদের গতি কি হইবে?

আজকাল দক্ষিণ আফ্রিকার উপ-নিবাসের সংবাদ সমস্ত সভ্য জগৎকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। এখন আমাদের কলিকাতায়ও জাগরণের সংবাদ পাইতেছি এবং বঙ্গদেশে ও কলিকাতায় নানাস্থানে সভা হইয়া এইরূপ অত্যাচারের প্রতিবাদ করা হইতেছে, এবং দুস্থ ভারতবাসীর জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হইতেছে। ৩রা ডিসেম্বর বুধবার কলিকাতায় টাউনহলে একটি বিরাট সভা হইয়াছে, তাহাতে দক্ষিণ আফ্রি-কার ভারতবাসীদের প্রতি এই ব্যবহারের জন্য প্রতিবাদ প্রকাশ করা হইয়াছে এবং অর্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠান হইয়াছে।

আমরা আশা করি আমাদের দেশের জননীগণ, মহিলাগণ, আপনাদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসুবিধা কষ্টের ভাবনা কিছু ভুলিয়া যাইয়া দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী দুস্থ ভারত সন্তানগণের বিবিধ প্রকারের অসুবিধা ও দুঃখের কথা ভাবিবেন, এবং যিনি যাহা এ জন্য দান করিতে পারেন তাহা করিবেন।

আচার্য্যের জন্মদিনে ভাগলপুরে জনৈক মহিলা কর্ত্তৃক পঠিত।

বঙ্গদেশ যখন নানা কুসংস্কার, ভ্রম ও পৌত্তলিকতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন, সেই সময় পরে পরে কয়েকজন মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া দেশের এই অন্ধকার দূর করিয়া আলোকের পথ দেখাইয়া দেন। ৺রাজা রামমোহন রায় এক ঈশ্বর বই আর দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই এই সত্য প্রাণপণে ঘোষণা করিয়া গিয়াছিলেন। 'ঈশ্বর সত্য' ইহা চিন্তন ও শ্রবণই তাঁহার উপাসনা ছিল।

স্বর্গীয় মহর্ষি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে আরও সরস ও সজীব করিয়া তোলেন। আর্য্যঋষিদিগের যোগসাধন তিনি নিজজীবনে সাধন করেন এবং সেইরূপ উপদেশাদি প্রচার করিয়া রাজা

যে ধর্ম্মের কেবল একটী বহিশ্চিত্র অঙ্কন করিয়া যান ৺মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং পরে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন সেই চিত্রে যেখানে যাহা প্রয়োজন সেখানে সেরূপ রং দিয়া তাহাকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া তোলেন। কিশোর বয়সেই আচার্য্য কেশবচন্দ্রের প্রাণ ধর্ম্মেতে অনুরাগী হইতে আরম্ভ হয়। মহর্ষি বলিয়াছেন যে "আঠার বৎসর বয়স্ক কেশবচন্দ্রকে ধর্ম্মের গূঢ় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তখনই নিজের হৃদয়ের সরল ও স্বাভাবিক ভাষায় তাহার উত্তর দিতেন। বেদ, বাইবেল, কোরাণ ইত্যাদি কোন গ্রন্থেই ঐরূপ উত্তর পাওয়া যাইত না, সুতরাং উহা কেশবের নিজের হৃদয়ের উত্তর অথচ অতি প্রাঞ্জল, জ্ঞানগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী, শ্রুতমাত্র ব্যুৎপত্তি-প্রদায়ক বলিয়া অনুভূত হইত।" পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই নিজের স্ত্রী, পুত্র, পরিবারের জন্য জীবনধারণ করে কিন্তু ইঁহার জন্ম সমস্ত পৃথিবীর জন্য। ইনি অল্পবয়সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদেশ পূর্ণ পুস্তক লিখিয়া ছাপাইতেন।

তাঁহার হৃদয় ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভেই প্রার্থনার জন্য ব্যাকুল হয়। প্রার্থনাতেই তিনি হৃদয়ে আলোক পাইতেন। জীবনবেদে দেখিতে পাই তিনি বলিতেছেন "পাপবোধ আমার অনেক প্রবল, পাপ কি, কি করিলে আমার পাপবোধ হয় এ সকল বিচার করিয়া আমার পাপবোধ হয় নাই। ... .. চুরী ডাকাতি, পরদ্রব্য হরণকে পৃথিবীতে পাপ বলে। যিনি তোমাদিগের নিকট এখন কথা কহিতেছেন ইঁহার অবিধানে পাপ গ্লানি, পাপ ব্যাধি, পাপ অহঙ্কার, পাপ দৌর্ব্বল্য; পাপ, পাপ করিবার সম্ভাবনা।"

ক'জন লোকের পাপবোধ এত প্রবল হয়? তাঁহার পাপবোধ এত প্রবল হইয়াছিল বলিয়াই তিনি জগতে মহাবিপ্লব আনয়ন করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন সর্ব্বদা উৎসাহের অগ্নিতে উত্তপ্ত থাকিত, তাই তিনি এত লোকের হৃদয়ে উৎসাহের সঞ্চার করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন "সত্য মন্ত্র জানিতে হইলে অগ্নিমন্ত্র জানিতে হয়। অনেক জীবনে শীতলতা থাকে অগ্নি থাকে না।... ... ... নিষ্ক্রিয়, উপাসনা ও বিশ্রামের পক্ষপাতী হইয়া শৈত্যপ্রধান জীবন ক্রমে ক্রমে অবসন্ন হইতে থাকে।" এই শীতলতা যে মৃত্যু তাহা প্রতিদিন অনেকেই নিজের নিজের জীবনে দেখিতে পান। এবং যখন কোন সাধু ও উৎসাহী লোকের কাছে যাই বা তাঁহার কথা শুনি, তখন অল্পক্ষণের জন্যও হৃদয় উৎসাহিত হয়। সেইজন্যই মহাপুরুষগণ, যাঁহাদের হৃদয় 'অগ্নিমন্ত্রে' পূর্ণ তাঁহারা সহস্র বাধা, বিপদেও বীরের ন্যায় অগ্রসর হইয়া জীবনের কার্য্য সমাধা করেন। যত বড় পরীক্ষাই আসুক, তাঁহাদের উৎসাহের কাছে সে সকল তৃণসমান।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবন বিশ্বাস, বিবেক এবং বৈরাগ্য লইয়া আরম্ভ হয়। শেষে ভক্তি আসিয়া শুষ্কতা দূর করিয়া তাঁহার জীবনকে এবং ব্রাহ্মসমাজকে এক নূতন বন্যাতে ভাসাইয়া অনেক দূর অগ্রসর

করিয়া দিল। ভগবানকে মাতাপিতা, সখা, সুহৃদ বলিয়া ডাকিয়া সকলে কৃতার্থ হইলেন।

তাহার পর তিনি ঘোষণা করিলেন যে পৃথিবীর সকল মহাজনদের সহিত সামঞ্জস্য আছে, সকল ধর্ম্মবিধানের মধ্যে পরস্পর যোগ ও সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে একতা আছে। কাহাকেও বাদ দিলে হইবে না। কেবল আর্য্যঋষিদের বা কেবল মহম্মদকে বা কেবল ঈশা বা চৈতন্যকে লইলে পূর্ণ ধর্ম্মসাধন হইবে না। সকল মহাজন ও সাধুদিগের মধ্যে যাঁহাতে যে পরিমাণ ব্রহ্ম-চরিত্রের গুণ এবং উচ্চ আদর্শ আছে সেই পরিমাণে তাঁহাদিগকে স্বীকার ও শ্রদ্ধা করা উচিত এই 'নূতন বিধান' প্রচার করাই তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য।

ব্রাহ্মধর্ম্মের বর্ত্তমান যে আদর্শ তাহার অধিকাংশ তাঁহারই চিন্তা ও জীবনের কার্য্য হইতে উৎপন্ন। তিনি সাধারণ লোক-দিগের শিক্ষাবিস্তার কার্য্যে ও তাহাদের নৈতিক চরিত্র উন্নত করিতে এবং স্ত্রীলোক-দিগেরও শিক্ষার জন্য যথেষ্ট যত্ন ও চেষ্টা করেন।

ইহা বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে আধুনিক ভারত তাঁহার জীবনের কার্য্য ও শিক্ষার ফল। আমরা যে এরূপ সময়ে দেশের এমন অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়াছি ইহা যে আমাদের পরম সৌভাগ্য তাহা বুঝিয়া যেন জীবনকে এই উচ্চ আদর্শে গড়িয়া তুলিতে পারি, ভগবা-নের নিকট এই প্রার্থনা।

সাধের বিনয়েন্দ্র !

১

সুদ্রুত তাড়িত আজ কি বার্ত্তা আনিল !
মনের মতন ফুল খসিয়া পড়িল !
প্রাণের "বিনয়" নাই আজি কি শুনিতে পাই,
পাণ্ডিত্য, কবিত্ব পুণ্য চরিত্রে গঠিত
দুটী ফুল ছিল—প্রিয় "বিনয়" "মোহিত।"

২

একে একে দুটী ফুল পড়িল খসিয়া,
একে একে গেল দুটী কোরকে ভাঙ্গিয়া ;
কি কহিব আর আমি জানেন সে অন্তর্য্যামী
কি আঘাত আজ হায় লাগিল আবার,
মর্ম্মাহত বজ্রাহত এই পরিবার।

৩

কি কহিব ভাই আজ, "সত্যেন্দ্র" সোদর
বিষম পরীক্ষা তাঁর মোদের উপর,
পিতৃদেব গেলে পরে ছিলে যাঁরে সবে ধরে
সেই ভাই আমাদের গিয়াছেন চলি,
কি সান্ত্বনা দিব আজ—কোন কথা বলি ?

৪

তোমরা বালক আজো "সত্যেন্দ্র" "রাজেন্দ্র",
তোমরা শিশুর মত "দ্বিজেন্দ্র" "দেবেন্দ্র",
কনিষ্ঠ "ধীরেন্দ্র" ভাই তোমাদের বলি তাই,
শিশুর প্রকৃতি সেই ঋষিসম ভাই
হারায়েছি সেই রত্ন আমরা সবাই।

৫

"সুমতি" "সরলা" "শান্তি" "হেমন্ত" "প্রভাত"
মিশাই চখের জল তোমাদের সাথ,
জননীর আর্ত্তনাদ জননীর সে বিষাদ
পারিনা করিতে আজ হৃদয়ে ধারণ,
ডাকি তাঁরে যিনি চিরশান্তি-নিকেতন।

প্রিয় ভগ্নি "শকুন্তলা" এ ক্রুশ তোমার
ভক্তিমতী ব'লে তুমি এসেছে এবার,
তাঁহার বিধানে তুমি শোক তাপ অতিক্রমি
বক্ষে লও "অন্নপূর্ণা"—তব প্রিয়ধন
তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হোক্ বল অনুক্ষণ।

৭

সাধুর সহধর্ম্মিণী—ভক্ত কন্যা তুমি
তপস্বিনী তুমি ভগ্নি—তব পদে নমি,
তাঁরে ডাকা তব কাজ নিবেদন এই আজ
তাঁরেই কেবল ডাক—ডাক প্রাণভরে,
এসেছি আমরা তাই এসেছি এবারে।

৮

না জানি পরীক্ষা কত মানুষের আছে
এসেছি থাকিতে মোরা সদা তাঁর কাছে,
তাঁর পদে মাথা দিয়ে ক্রুশ তার কাঁধে নিয়ে
তাঁহার ইচ্ছায় মোরা চলি চিরদিন,
ইচ্ছার ভিতরে ইচ্ছা হউক বিলীন।

শোকার্ত্ত—গৌরী।

ম্যাডাম গেয়োঁ।

ধর্ম্মশীলা ফরাসী-নারীর জীবন বৃত্তান্ত শ্রীনির্ঝরিণী ঘোষ প্রণীত। ঢাকা, পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য কাপড়ে মলাট এক টাকা, কাগজের মলাট বার আনা।

প্রাপ্তি স্থান;—কলিকাতা এস্ কে লাহিড়ী, ৫৬নং কলেজ ষ্ট্রীট, ঢাকা গ্রন্থ প্রকাশক ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

শ্রীমতী নির্ঝরিণী ঘোষ প্রণীত এই জীবন চরিত খানি পাঠ করিয়া বড়ই সুখী ও উপকৃত হইয়াছি। ইংরাজীতে ম্যাডাম গেয়োঁর জীবন-চরিত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে লিখিত হইয়াছে। তাহা আমাদের মহিলাগণের অনেকেই পাঠ করেন নাই। আশা করি এই গ্রন্থখানি সকলেই পাঠ করিবেন। ঈশ্বরের প্রতি আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধা ও তাঁহার সন্তানগণের সেবা যে সার ধর্ম্ম ইহা সকলই স্বীকার করিবেন এবং সকল দেশের ও সকল কালের ধার্ম্মিকগণের জীবনে ইহা দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে সামাজিক অবস্থা ও ধর্ম্মমতের ভিন্নতা অনুসারে সত্য ধর্ম্ম কতকগুলি বাহ্য নিয়ম নিষ্ঠার ভিতর দিয়া গ্রহণ করিতে হয়। ম্যাডাম গেয়োঁ খৃষ্টীয় সমাজের রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের এক বিশেষ শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। আমরা সেই সকল সাম্প্রদায়িক বিধি ব্যবস্থার কথা বিচার করিতে পারি না, কিন্তু ম্যাডাম গেয়োঁর জীবনের ধর্ম্ম আপনার ধন মান রূপ যৌবন স্বামী পুত্র সকল প্রকারের সাংসারিক অন্তরায় ভেদ করিয়া স্থির আলোক প্রকাশ করিয়াছে, পক্ষান্তরে কঠিন অপমান নির্য্যাতন শোক, যাতনা, নির্ব্বাসন, কারাবাস সকল প্রকারের দুঃখ কষ্ট ভেদ করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। প্রকৃত ধর্ম্ম যে কি অদ্ভুত সামগ্রী ইহা যে কিছুতেই পরাভূত হয় না, ইহা যে কোন শত্রুকে ভয় করে না, ইহা যে অগ্নিতে দগ্ধ হয় না, জলে নিমজ্জিত হয় না, ইহা যে সংসার-বিজয়ী, মৃত্যু-বিজয়ী ইহা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অত্যাশ্চর্য্য পদার্থ—ম্যাডাম গেয়োঁর জীবন-চরিত এই সত্যই প্রদর্শন করে। আমরা শান্তিপূর্ণ

সুজলা সুফলা ভারতমাতার ক্রোড়ে স্থান পাইয়া ভগবানের নাম করি। আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাস আমাদের শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতার অনুরূপ। যদি কখনও গৃহে বা পরিবারে অভাব, রোগ, অবিচার, নির্ব্বাসন বা অন্য কোনরূপ গুরুতর পরীক্ষা উপস্থিত হয় তখনই আমাদের ধর্ম্ম বিশ্বাস টলিয়া যায়, উপাসনা শুকাইয়া যায়, প্রার্থনা যেন মরিয়া যায়। সমস্ত সংসার প্রতিকূল হইলেও দয়াময় দীনবন্ধু বলিয়া ভগবানের চরণাশ্রয় করিয়া বিশ্বাসে দৃঢ় হইয়া থাকা জীবনের সার ধর্ম্ম এ কথা আমাদের মনেই থাকে না। এ জন্য ম্যাডাম গেয়োঁর জীবন-চরিত পাঠ করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম বিশ্বাস ও নিষ্ঠাকে জীবনে লাভ করিতে যত্ন করা সকলের প্রয়োজন।

শ্রীমতী নির্ঝরিণী ঘোষ এই পুস্তক লিখিয়া বঙ্গনারীর পাঠ্য পুস্তক সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া বিশেষ উপকার করিয়াছেন। এরূপ ধর্ম্মশীলা নারীগণের জীবন-চরিত যত লিখিত হয় ততই দেশের মঙ্গল। আমরা একান্ত অনুরোধ করি, মহিলাগণ এই গ্রন্থখানি যত্নে পাঠ করুন ও আপন আপন গৃহে রক্ষা করিয়া এই চরিত্রকে সম্মুখে রক্ষা করুন। বিশেষ যাঁহারা সংসারের কোন প্রকার প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া সত্য ধর্ম্ম সাধন বিষয়ে ভিতরে ভিতরে নিরাশ হইয়াছেন তাঁহারা এই নারীর ধর্ম্মজীবন পাঠ করুন, ইহাতে অবশ্যই উপকার লাভ করিবেন।

অশ্রুজলে—অশ্রুজল।

১

তাড়িত বারতাবহ কোন্ সমাচার
আনিলে আবার আজ সিন্ধুপার হ'তে?
আবার কি অশ্রুজল—শোকের নীহার
বহিল আবার আজ সেই চক্ষু হতে?

২

সেই চক্ষু হ'তে সেই অশ্রুবিন্দু হায়
নির্ঝর ধারার মত দেখেছি ঝরিতে,
আজ সেই বিন্দু হল সিন্ধুসম হায়,
একি সমাচার আজ পাইনু শুনিতে!

৩

নৃপ "নৃপেন্দ্রের" তরে—সেই শোকগাথা
"ভগিনীর অশ্রুজল"—সেদিন বহিল,
আবার কি শুনি আজ নিদারুণ কথা
"অশ্রুজলে" অশ্রুজল আবার মিশিল!

৪

আদরের আমাদের প্রিয় সকলের
রাজেন্দ্র "রাজেন্দ্র" আর নাহিক ধরায়!
আবার কি বজ্রাপাত—আবার মোদের
সে ভাঙ্গা পরাণ পুনঃ ভাঙ্গিল কি হায়!

৫

ভস্ম-সমন্বয়—পিতা পুত্রের মিলন,
সুদূর "বেঙ্গিল" তীরে "ক্রোমার" বেলায়
দুয়ে এক একে দুই—আত্মিক দর্শন
মহা সমন্বয় এই তাঁর ব্যবস্থায়।

৬

প্রত্যাদিষ্ট ভক্ত পিতা, তোমারে ভগিনী,
ক্রশ হাতে দিয়ে তিনি তাঁহার আদেশে
না মানি লোকের বাধা—তাঁর ইচ্ছা জানি
পাঠালেন তোমা এই বিহার প্রদেশে।

ক্রশ হাতে ল'য়ে তুমি চলেছ ভগিনি,
চলিতেই তুমি, ভগ্নি, এসেছ হেথায় ;
ঈশার পথের পথিক তাঁর কন্যা জানি
চল ভগ্নি চল তুমি তাঁহার ইচ্ছায়।

৮

এসেছি সহিতে মোরা—সহিব জীবনে
ক্রশ বহা আমাদের—তাঁহার বিধান ;
"সুনীতি" তোমার নাম তাঁর ইচ্ছা জেনে
করিলেন ভক্ত তাই এ নাম প্রদান।

৯

কি বলিব আজ আর ভগিনি "সুনীতি"
আমাদের শিক্ষাতরে তুমি যে প্রেরিত,
কি বলিবে আজ তোমা সুদীনা "সুমতি"
হউক তাঁহার ইচ্ছা জীবনে সাধিত।

(সুমতি—কুচবিহার)

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রায় বাহাদুর ডাক্তার চুণীলাল বসু মহাশয় কলিকাতার ছাত্রগণের স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে যুবক খৃষ্টীয়ান এসোসিয়েশনে একটি মূল্যবান বক্তৃতা করেন। অধ্যাপক আরকুহার্ট সাহেবের লিখিত মুখবন্ধ সহিত ইহা পুস্তিকাকারে প্রকাশ হইয়াছে। আমরা উপহার স্বরূপ ইহার একখণ্ড পাইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষার উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা প্রতি বৎসর অনেক বাড়িতেছে। স্বাস্থ্য, নীতি ও চরিত্রহীন পরীক্ষোত্তীর্ণ যুবক যে কি কৃপাপাত্র অব্যবহার্য্য সামগ্রী, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। চুণীবাবু যে বিষয়টি বলিয়াছেন তাহাতে ঠিক সেই দিক রক্ষা করিবার জন্য যথেষ্ট যত্ন করা হইয়াছে। সকল বিষয়ে পরিষ্কার থাকা, সময়ের বিষয়ে ও স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়ে বিশেষ যত্ন করা প্রত্যেক যুবকের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। এবিষয়ে এ পুস্তিকা অত্যন্ত ফলপ্রদ হইবে আশা করা যায়। ইহাতে কেবল শরীর মনের স্বাস্থ্য ও উন্নতির বিষয় কেবল বলা হইয়াছে তাহা নয়—যুবকগণ যাহাতে আত্মার অন্নপান স্বরূপ পরমেশ্বরের পূজা বন্দনা করেন ও সকল প্রকার মঙ্গলের জন্য তাঁহার চরণে প্রার্থনা করেন সে জন্যও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ছাত্র ও ছাত্রীগণ এই পুস্তিকা পাঠ করিয়া আপন আপন শরীর মন ও আত্মার উন্নতির পক্ষে কর্ত্তব্য স্থির করিতে অনেক সাহায্য পাইবেন।

প্রকৃতি—বালক বালিকাদিগের জন্য সচিত্র মাসিক পত্রিকা—ইহার মূল্য ডাকমাশুল সহ বার্ষিক এক টাকা মাত্র। প্রকাশের স্থান ৪১নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা। এই ক্ষুদ্র পত্রিকাখানি প্রথম ৪।৫ বৎসর অত্যন্ত নিয়মমত বাহির হইয়া বালক বালিকাগণের শিক্ষার ও আমোদের সাহায্য করিয়াছে। পরে নানারূপ অনিবার্য্য কারণে নিয়মমত প্রকাশ হইতে পারে নাই। আমরা সম্প্রতি শ্রাবণ—আশ্বিন সংখ্যা পাইয়া জানিতে পারিতেছি যে ইহার কার্য্যাধ্যক্ষ নূতন উৎসাহের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং আগামী মাঘ মাস হইতে পুনরায় ঠিক প্রতিমাসের

১লা তারিখে "প্রকৃতি" গ্রাহক গ্রাহিকাগণের নিকট পাঠান হইবে।

সকলেই শুনিয়া সুখী হইবেন যে সাধারণের উদ্যোগে ও সরকারী সহায়তায় বেলগাছিয়া মেডিকাল স্কুলটি এক পূর্ণায়তন মেডিকাল কলেজে পরিণত হইবে। আমাদের শিক্ষার্থী যুবকগণ চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা করিতে একান্ত যত্নশীল হইয়াও মেডিকাল কলেজে প্রবেশ করিতে পারেন না, কারণ বর্ত্তমানে যে মেডিকাল কলেজ একমাত্র উচ্চ চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষাদানের স্থান সেখানে অতি অল্পসংখ্যক ছাত্র শিক্ষা করিতে পারেন। অপরদিকে সরকারী উচ্চ বেতনভোগী চিকিৎসকগণ মেডিকাল কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক। বেসরকারী মহাপ্রতিভাশালী চিকিৎসকগণও এখানে কার্য্য করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন না। কলিকাতাতে বেসরকারী চিকিৎসকগণ যে সুযোগ্য চিকিৎসক তাহা গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণও স্বীকার করিয়া থাকেন। এবার বেলগাছিয়াতে যে কলেজ হইতেছে তাহার সাহায্যের জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রথমে পাঁচ লক্ষ টাকা দিবেন। দেশস্থ ধনী দাতাগণ এ পর্য্যন্ত এলবার্ট ভিক্টর হাঁসপাতালের জন্য অনেক দান করিয়াছেন তাহাতেই ইহার উন্নতি হইয়াছে—আশা করি এবার তাঁহারা উপযুক্ত সাহায্য করিয়া নূতন মেডিকাল কলেজটিকে সময়ের উপযোগী শিক্ষার সকল ব্যবস্থাতে পূর্ণ করিয়া কলিকাতার ও দেশের মঙ্গল করিবেন। সুশিক্ষিত ডাক্তারের সংখ্যা এখনও অত্যন্ত অল্প বলিয়া অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত চিকিৎসকগণ নানারূপে অনিষ্ট করিতেছে। আশা করি অদূর ভবিষ্যতে দেশের সে দুঃখ দূর হইবে। শুনা যাইতেছে মেও হাঁসপাতালের প্রধান প্রধান কার্য্যও বেসরকারী ডাক্তারগণের দ্বারা নির্ব্বাহিত হইবে; ইহাতে বেসরকারী প্রধান প্রধান ডাক্তারগণের চিকিৎসা অনেকে পাইতে পারিবেন এবং তাঁহারাও অধিকতর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া উন্নত হইতে পারিবেন।

আমরা শুনিয়াছি তান্ত্রিক সাধকগণ পশু বলিদান করিয়া তৃপ্ত হইতেন না, নরবলি পর্য্যন্ত দান করিতেন। নরবলি দান এখন সম্পূর্ণ উঠিয়া গিয়াছে, অন্তত কোন সভ্য দেশে আর নরবলি হইবে না ইহাই সকলের বিশ্বাস। কিন্তু ইতিমধ্যে ইউরোপের রুশিয়া দেশে কীভ্ নামক নগরে ধর্ম্মার্থ হত্যা করা লইয়া মহা আন্দোলন চলিতেছে। ১৯১১ সালের ২৫শে মার্চ এণ্ডু নামক একটি ১৩ বৎসর বয়স্ক বালক স্কুলে যায় তাহার আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। ৯ দিন পরে নিকটস্থ এক পর্ব্বতের গুহায় তাহার মৃত দেহ ও পুস্তকাদি সমস্ত পাওয়া যায়। মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে শরীরের প্রায় ৪০ স্থানে তীক্ষ্ণ ছুরী বা অন্য অস্ত্র দ্বারা রক্ত বাহির করা হইয়াছে, অথচ শরীরে বা নিকটে রক্তের কোন চিহ্ন নাই।

এই অঞ্চলে ইহুদী ও খৃষ্টান দুই জাতি বাস করে, এই বালক খ্রীষ্টিয়ান ছিল। খ্রীষ্টানগণ অনুমান করেন যে ইহুদীগণ বিশেষ পর্ব্বের দিনে খাম্বীরহীন রুটি প্রস্তুত করিতে খৃষ্টানের রক্ত ব্যবহার করিয়াছে। ইহুদীদিগের এইরূপ খৃষ্টান হত্যা পূর্ব্বকালে প্রচলিত ছিল, খ্রীষ্টানগণ সন্দেহ করেন যে এই বালককে সেইরূপ হত্যা করা হইয়াছে। পুলিস ধর্ম্মার্থ হত্যা অপরাধে মেণ্ডেল বীলিস নামক একজন ইহুদীকে সন্দেহ করিয়া ধৃত করে। প্রায় দুই বৎসর চেষ্টা করিয়া সাক্ষী প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়। বিচারে ইহুদী খ্রীষ্টানের পরস্পরে ভয়ানক বিদ্বেষ প্রকাশ পাইয়াছে, অপরাধও একরূপ প্রমাণিত হইয়াছিল। সংবাদ আসিয়াছে আসামীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"
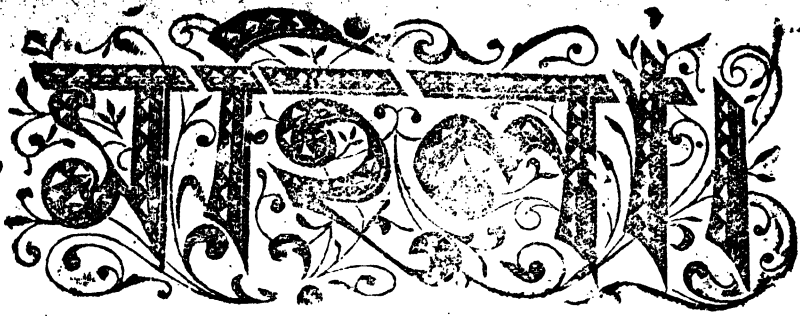
১১শ ভাগ] পৌষ, ১৩২০। জানুয়ারী, ১৯১৪। [৬ষ্ঠ সংখ্যা।

প্রার্থনা।

হে শুদ্ধস্বরূপ নির্ব্বিকার পরমদেবতা, তুমি নরনারীকে পৃথিবীতে স্থাপন করিয়াছ, কিন্তু তাহাদিগকে পৃথিবীর অতীত পবিত্র স্বর্গলোকের জন্য প্রস্তুত করিতেছ, তুমি অন্তরে ও বাহিরে থাকিয়া তাহাকে পরিষ্কার, নির্ম্মল ও শুদ্ধ হইতে বলিতেছ। এই সত্য উপলব্ধি করিয়াই আমরা তোমাকে বিধাতা, মুক্তিদাতা, পরিত্রাতা বলি। তোমারই ইঙ্গিতে মানুষ সকল প্রকার মলিনতা, পাপ, দুর্নীতি ত্যাগ করিতে চিরদিন যত্নবান্ রহিয়াছে। আমরা আমাদের দেশের ও বর্ত্তমান সময়ের প্রয়োজন অনুসারে পরিষ্কার ও শুদ্ধ হইতে যত্ন করি, ইহা তোমারই বিধান; কিন্তু যখন আমরা তোমার পুণ্য বিধান বা স্বর্গের নীতি ভুলিয়া যাই, কেবল দেশের ও কালের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করি, তখন আমরা বিভ্রান্ত হইয়া বাহিরের আচার আচরণ করিয়াই তৃপ্ত হই এবং তাহার বিরুদ্ধ আচরণ দেখিলে অসন্তুষ্ট হই ও নিন্দা করি। তাই তোমার চরণে প্রার্থনা করি, তুমি আমাদিগের অন্তরের চক্ষু খুলিয়া দেও যেন আমরা প্রত্যেক আচার আচরণে তোমার পুণ্যবিধি দর্শন করিয়া ও তাহা পালন করিয়া শুদ্ধ ও সুখী হই। তোমার পাদপদ্মে এই প্রার্থনা করিয়া বার বার প্রণাম করি।

দেশাচার ও ধর্ম্মনীতি।

আমরা বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যাইয়া দেখিতে পাই যে প্রত্যেক দেশে দৈনিক ধর্ম্মজীবন এবং সামাজিক ও পারিবারিক কর্ত্তব্য পালন বিষয়ে কতকগুলি আচার নিয়ম প্রতিষ্ঠিত আছে; লোকে সেই সকল চিরপ্রচলিত নিয়ম অনুসারে আচার আচরণ করিলেই দশজনের একজন হইয়া নির্ব্বিবাদে জীবনযাপন করিতে

পারে। এই সকল দেশাচারের ভিতরে ধর্ম্ম ও নীতি অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে। লোকে অধিক বিচার করে না; যে প্রদেশে যেরূপ আচার অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত আছে তাহাকেই ধর্ম্ম বলে এবং অন্য ধর্ম্মাক্রান্ত লোকের নিকটে তাহাকেই হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে যদি কেহ সাহসী হইয়া এই দেশাচারের বিরুদ্ধ কর্ম্ম করে তাহা হইলে দশ জনে মিলিয়া তাহাকে শাসন করিতে প্রবৃত্ত হয়, কারণ তাহারা মনে করে যে দেশাচারের বিরুদ্ধ কর্ম্ম করা আর ধর্ম্ম বা নীতিবিরুদ্ধ কর্ম্ম করা একই কথা। সাধারণ লোকে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মকে অর্থাৎ দেশাচারকেই সত্যধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করে এবং মনে করে যে হিন্দুধর্ম্ম বলিতে তাহারা যাহা বিশ্বাস করে অন্য দেশেও যেন তাহাই বিশ্বাস ও দেশাচার। একজন নিষ্ঠাবান বঙ্গদেশের শাক্ত ব্রাহ্মণ যাহা সত্যধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন অর্থাৎ যে সকল পান ভোজন পূজা পাঠ ব্রত নিয়মকে ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া মনে করেন একজন তেলুগু দেশের শৈব ব্রাহ্মণ তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মবিরোধী মনে করিবেন। মৎস্য মাংস ভোজন বঙ্গদেশের আচরণে কোন রূপে ধর্ম্মবিরোধী নহে, কিন্তু তেলুগু দেশে মৎস্য মাংস ভোজন সকল উচ্চজাতির পক্ষে একান্ত পরিত্যাজ্য। ব্রাহ্মণ কখনও মৎস্য মাংস খাইবে ইহা তেলুগু ব্রাহ্মণ ভাবিতেই পারিবে না। মনে হয়, বাঙ্গলা দেশের সাত্বিক ব্রাহ্মণ গোমাংস ভোজন যেমন ঘৃণিত দুষ্কার্য্য মনে করেন, দক্ষিণ দেশের ব্রাহ্মণগণ মৎস্য মাংস ভক্ষণকে ঠিক তেমনই মনে করেন। এই উভয় প্রকার দেশাচার এদেশে প্রচলিত রহিয়াছে এবং সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে দক্ষিণ ভারতে যেমন ধর্ম্ম আছে বাঙ্গলা দেশেও তেমনই ধর্ম্ম আছে। এস্থলে আহারটা দেশাচার মাত্র। ধর্ম্ম ও নীতির সহিত তাহার যোগ নাই। বাঙ্গলা দেশে মৎস্য আহার অত্যন্ত প্রচলিত, তাহার কারণ এই যে এদেশে মৎস্য অধিক পরিমাণে জন্মে অর্থাৎ এদেশে নদী নালা বিল ঝিলে অনেক জল থাকে।

বঙ্গদেশে যেমন মৎস্যের ব্যবহার অধিক তেমনই জলেরও ব্যবহার অধিক। এমন কি এদেশের ধর্ম্মাচরণে বা পূজা পার্ব্বণে জলের স্থান যেন সর্ব্বোপরি। উত্তমরূপে অবগাহন স্নান না করিলে কাহারও দেবপূজার অধিকার হয় না। পূজাদিতে যত সামগ্রী ব্যবহার হয় তাহা যতদূর সম্ভব ধৌত করিতে হয়। কোন স্থানকে পবিত্র করিতে হইলে জলদ্বারা ধৌত বা লেপন করিতে হয়। পারলৌকিক কার্য্যেও প্রতিবিষয়ে জলের প্রচুর ব্যবহার। বস্ত্র বা বাসনপত্র শুদ্ধ করিতে হইলে জলদ্বারা ধৌত করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। অথচ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, পঞ্জাবে বা সিন্ধুদেশে এরূপ আচার প্রচলিত নাই। অবশ্য হিন্দুসন্তান বিশেষ দিনে বিশেষ স্থানে স্নানাদি করিয়া থাকে, তাই বলিয়া স্নানের উপর বিশেষ কিছু নির্ভর করে না। কোন পূজাদিতে মস্তকে জলস্পর্শ করিলেই যথেষ্ট হয়। বস্ত্রাদি ধৌত করার প্রথা বোধ হয় একবারেই নাই। আসন শুদ্ধ

করিতে হইলে পঞ্জাবে ধূলাদ্বারা মাজিয়া ঝাড়িয়া ফেলাই যথেষ্ট। অথচ বাঙ্গলা দেশের দেবসেবায় বা অন্য সাত্ত্বিকব্যবহারে এরূপে পরিষ্কৃত বাসন কখনও ব্যবহৃত হইবে না। এক বিষ্ণু বা শিবকে বাঙ্গলা দেশের উপাসক যে আচার নিয়মে শ্রদ্ধা-প্রকাশ দ্বারা পূজা করিয়া তৃপ্তকাম হইতেছেন, সেই সেই দেবতাকে অন্য প্রদেশের লোক সম্পূর্ণ ভিন্ন আচার নিয়মদ্বারা শ্রদ্ধা-প্রকাশ করিয়া পূজা করিতেছেন। যদি এক দেশের আচরণ গ্রহণীয় হয় তাহা হইলে অন্য দেশের আচরণ গ্রহণীয় হইতে পারে না। আমরা দেখিতে পাই যে ধর্ম্ম যদিও দেশাচার দ্বারা প্রকাশিত হয়, তথাপি ধর্ম্ম ও নীতি দেশাচার নহে, তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ ও স্বতন্ত্র বস্তু।

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই হিন্দুদিগের মধ্যে জাতিভেদ রহিয়াছে। বাঙ্গলা দেশে আমরা যেরূপ জাতিভেদ দেখিতে পাই ভারতের অন্যান্য অংশে সেরূপ কিছু দেখা যায় না। আমরা দেখিতে পাই হীনজাতির স্পর্শে উচ্চজাতি যেন অশুচি হইয়া যায়, তাহাকে স্নান করিতে হয়। দক্ষিণ ভারতের হীনজাতিকে এত হেয় মনে করা হয় যে তাহার মুখদর্শনেও অশুচি হয়। অথচ উত্তর পশ্চিমে সেরূপ নহে; পঞ্জাবে স্পর্শদোষ অত্যন্ত অল্প এবং সিন্ধুদেশে স্পর্শদোষ নাই।

বাংলা দেশের সাত্ত্বিক আচরণসমূহ হইতে যদি "এঁটো" "শুঁকড়ি" বাদ দেওয়া যায়, মনে হয় ধর্ম্মাচরণ অত্যন্ত অল্প অবশিষ্ট থাকে। দেবসেবার বিশেষত্ব উচ্ছিষ্ট বিচারে হইয়া থাকে। অপর দিকে সমাজ ও পরিবারের উচ্ছিষ্ট বিষয়ে সর্ব্বদা বিচার করিয়া চলা হয়। ছোটর উচ্ছিষ্ট বড় খাইবে বা এক ভদ্রলোকের উচ্ছিষ্ট অন্য ভদ্রলোক খাইবে ইহা যেন একটা অতি গর্হিত কার্য্য। একবার এক উচ্চ হিন্দু-পরিবারে একটি ভদ্রলোক অতিথি হইয়া অতি আদরে গৃহীত হইলেন। তাঁহার ধর্ম্মভাব বিনয় সৌজন্যে সকলে অত্যন্ত প্রীত হইলেন। আহারের পূর্ব্বে তিনি ব্রাহ্মরীতি অনুসারে অন্নদাতা পরমেশ্বরকে কৃতজ্ঞতা দিয়া প্রণাম করিয়া অন্ন গ্রহণ করিলেন, ইহাতে আরও সকলের শ্রদ্ধা বাড়িল। প্রবীণা মহিলাগণ ও গৃহস্বামী সমস্ত আহারের সময় মিষ্ট আলাপে প্রীত হইলেন। ব্রাহ্ম ভদ্রলোকটি আহারান্তে ডালভাতমাখা ডান হাতে জল পান না করিয়া বাম হাতে গ্লাস ধরিয়া জল পান করিলেন। অমনই তাঁহার বিষয়ে সকলের বিশেষতঃ মহিলাগণের মত ফিরিয়া গেল। সকলেই বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়া একজন অপরের দিকে দৃষ্টি করিলেন—কেহ বা মৃদুস্বরে বলিলেন, এটো শুঁকড়ি জ্ঞান নাই এ আবার কেমন মানুষ! আমাদের দেশে সর্ব্বত্র এইরূপ জ্ঞান। গোবর গঙ্গাজল প্রভৃতি ব্যবহার করা, পুনঃ পুনঃ হাত ধোয়া ইহার উপর সকল ধর্ম্মাচরণ নির্ভর করে। অনেকে সময়ের নবালোক লাভ করিয়াও এই সকল নিষ্ঠা নিয়ম রক্ষা করিবার একান্ত পক্ষপাতী। অন্য সকল দেশাচারের যেমন উপযোগিতার ব্যাখ্যা আছে, ইহারও তেমনই সমর্থন করা যাইতে পারে।

কিন্তু বাংলা দেশের বাহিরে যাও, অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

বিহারে, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে, মান্দ্রাজ প্রদেশে ও মধ্যভারতে লেপনকার্য্যে গোবর যথেষ্ট ব্যবহার করা হয় এবং গঙ্গা যমুনা গোদাবরী কাবেরী নর্ম্মদা প্রভৃতির জলকে পবিত্রজল মনে করা হয়; কিন্তু বাংলাদেশের মত "এটো" "শুঁকড়ি" আর কোথাও নাই এবং গোবর ও গঙ্গাজলের এরূপ ব্যবহারও দেখা যায় না। আহারের সময় বাম হাতে জল খাওয়া প্রায় সকল দেশের নিয়ম। বাংলাদেশের শুচি অশুচি জ্ঞানের সঙ্গে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লোটা মাজা ও চৌকার সৌসাদৃশ্য আছে। এক ঘরে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন প্রকারের সামগ্রী রন্ধন করিয়া ভোজন করিবে তাহাতে ধর্ম্মের ব্যাঘাত হইবে না, কেবল প্রত্যেকে আপন আপন চৌকার পবিত্রতা রক্ষা করিবে। চৌকা অর্থ চারিকোণ করিয়া লেপিয়া শুদ্ধ করিয়া লওয়া একটি স্থান। যতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্য লোক এই চৌকার ভিতর না আসিল ততক্ষণ জাতি ধর্ম্ম ঠিক থাকিল। ব্রাহ্মণের চৌকার পার্শ্বে শূদ্রের চৌকা হইলেও কোন আপত্তি নাই, কিন্তু এক ব্রাহ্মণের চৌকার ভিতরে অন্য ব্রাহ্মণ প্রবেশ করিলেই চৌকা নষ্ট হইল। মনে হয় যদি কোন লোক অন্য সকল প্রকারের ধর্ম্মানুষ্ঠান ত্যাগ করিয়া কেবল নিষ্ঠার সহিত লোটা মাজে ও আপনার চৌকার শুদ্ধতা রক্ষা করে তাহা হইলেই তাহাকে নিষ্ঠাবান্ হিন্দু বলিয়া গ্রহণ করা হইবে।

এই সকল দেশাচার ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিচিত্রতা দেখিলে স্বভাবতই মনে হয় যে, আমরা সকলেই অনেক সময়ে দেশাচারকে ধর্ম্মানুষ্ঠান মনে করি এবং দেশাচারবিরুদ্ধ কেহ কিছু করিলে তাহাকে ধর্ম্মবিরুদ্ধ মনে করি। পূর্ব্বে একপ্রদেশের লোক অন্য প্রদেশের লোকের সহিত এত মিলিত হইত না। এখন দেশব্যাপী রাজকীয় শান্তি ও সমতার গুণে এবং রেল জাহাজ প্রভৃতি যোগে গমনাগমনের সুবিধার জন্য প্রদেশগুলি পরস্পরের অত্যন্ত নিকট হইয়াছে। এখন এক প্রদেশের আচার নিয়ম অন্য প্রদেশের লোকের নিকট সর্ব্বদা উপস্থিত হইতেছে। এজন্য যাঁহারা একটু সূক্ষ্মদর্শী তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের দৈনিক জীবনের নিষ্ঠা নিয়মের ভিতর কোথায় কতটা দেশাচার ও কতটা প্রকৃত ধর্ম্মনীতি তাহা দেখিতে পাইতেছেন। এখন মহিলাগণ যদি এদিকে একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন তবে অতি সহজেই আমাদের দেশের প্রচলিত আচার সকলকে দেশাচার মাত্র জানিয়া তাহার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না বিচার করিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশাচারও ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইতেছে ও হইবে। এখন যাঁহারা দেশাচারকে সংশোধিত করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা সহজেই বিভিন্নপ্রদেশের দেশাচার বিচার করিয়া আপনাদিগের চলিত আচরণের অনিষ্টকর বা বৃথা ভাগ পরিত্যাগ ও অন্য দেশের উত্তম আচরণ গ্রহণ করিতে পারেন। ধর্ম্মনীতি দেশাচার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ তাহা অবশ্য আমরা সকলেই জানি।

"ভূতে পাওয়া।"

একদিন কেহ কাহারও সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, "তিনি যখন একটা বিষয় বলিতে আরম্ভ করেন তখন ক্রমাগত সেই কথাই বলিতে থাকেন, তাঁর প্রাণ পাগল হইয়া উঠে", সম্প্রতি তাঁর —— সম্বন্ধে 'ভূতে পাইয়াছে' ইহা বলা খুবই ঠিক; কিন্তু যাঁর বিষয় বলা হইল তাহা হইলে তিনিই কি ভুল করলেন? আমাদের তো এ সমস্যা খুব শক্ত সমস্যা লাগে না। চারি দিকে চেয়ে দেখি, দেখি সকলকেই ভূতে পেয়েছে। কারুর পেছনে "আজ কি রান্না হবে, কি করে অমুক জিনিসটা করা যায়" সম্বন্ধে ভূত; কারুর কেবলই পাস করাবার ভূত, কারুর কেবলই পড়বার ভূত, ... এই রকম চলেছেই। তবে বুঝি "ভূতে পাওয়াই" স্বাভাবিক?

"দেবীর আদর্শের" ভিতর রমণীর "কর্ত্তব্য" বিষয়ে আলোচনার বেশী প্রয়োজন, না "ভালবাসার" "প্রেমের" কথার আলোচনার বেশী প্রয়োজন, এই প্রশ্নের মাঝখানে কেবলই "রণচণ্ডী"দিগের কথা বলার ভূত আজ আমাদের কেন চাপিল জানি না। শুধু জানি ভূতে পাইয়াছে, যখন পাইয়াছে বলিতে হইবে পাইয়াছে, স্বীকার করা ছাড়া আর উপায় নাই। "শান্ত ভাবের" মত এক সময় ছিল এখন যে নাই তাহা নহে, আছে,—আরও হয়তো বেশী ভাবে মুক্তকণ্ঠে আমরা স্বীকার করি, কিন্তু তার সঙ্গে বোধ হয় আরও কিছু যোগ হইয়াছে, যে অশান্ত ভাব বুঝি সত্য সত্যই শান্তি আনিবার জন্য আসে। কেবলই শান্তির আলোচনাই হবে? শান্তভাব যখন খাটাইতে পারিতেছি না তখন অশান্ত ভাব দেখাইতে কিসের লজ্জা? আমরা যা আমরা তাই. নিন্দা প্রশংসায় কিছু কমে বাড়ে না।

তাই অনেক দিন আগে যখন আমরা "মহিলাকে" "রণচণ্ডী"দিগকে দাঁতে চিবাইতে দেখিলাম তখন আনন্দ হইয়াছিল, এই আনন্দে জয়ধ্বনি করিবার সাধ বুঝি তখনি হইয়াছিল, কিন্তু আমাদের আনন্দ হয়তো তখন ছিল না। এই অবহেলার জন্য আমরা মহিলার কাছে ক্ষমা চাই।

"স্বভাব না যায় মলে, ইল্লত না যায় ধুলে।" হাজার হউক আমরা ভারতের আর্য্যনারী! পরের গুণ গাওয়া নিজের দোষ দেখাই তো আমাদের স্বাভাবিক। তাই হয়তো রণচণ্ডীর গুণ ক্রমাগতই আলোচনা করিতেছি। তাঁহাদিগের সম্বন্ধে তাঁহাদিগের দেশের লোক কি বলেন শুনিলে আমাদের আনন্দ বাড়িবে বই কমিবে না, আমাদের সাহায্যই হইবে মনে হয়। আমাদিগের বর্ত্তমান সীতা সাবিত্রীর দেশের নিঃস্বার্থ কাহিনী নিজেরা আগে নাই বলিলাম? ইহাতে আমাদের উচ্চতা ছাড়া তো নীচতা প্রকাশ পাইবে না, আমরা ভারতের আর্য্যনারীই থাকিব, প্রেম ভালবাসার প্রতিমূর্ত্তিই থাকিব!

The Rev. Edwin A. Mould (Vicar of St. James, Barrow) বন্ধুভাবে সকল anti Suffragists দিগকে পত্র লিখিতেছেন।

প্রিয় ভোটপ্রার্থিনীদিগের বিরুদ্ধবাদী দল,

আপনাদের সঙ্গে একটু বন্ধুভাবে কথা বলিতে চাই। আপনারা খুব ক্ষমতাশালী, কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, হয়তো খুব ভাল করিতেছেন ভাবিয়াই আপনারা আপনাদিগের ক্ষমতাকে অন্যায় রূপে অন্যায় উদ্দেশ্যে চালনা করিতেছেন। আমি সেজন্য আপনাদিগকে দোষ দি না। আপনাদিগের দলের মধ্যে মহাসভার ও দলবিশেষের প্রতারকেরা যাঁহারা জিনিষটা কি জানিয়া বুঝিয়াও না লইয়া পাপ করিতেছেন তাঁহাদিগকেই, দোষ দিতেছি। যদিও সাধারণ লোকে বাইবেলের ভাষায় কথা বলাকে অভদ্রতা ও পাপ কার্য্য মনে করেন, তথাপি যদি ইঁহাদিগকে (প্রতারকদিগকে) কিছু বলিতে হইত তাহা হইলে হয়তো বাইবেলের ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় লেখা অসম্ভব হইত। কিন্তু আমি যথন যাঁদের দোষ দি তাঁহাদিগকে বলিতেছি না যাঁহাদিগকে দোষ দি না বরং ভালবাসি ও শ্রদ্ধা করি তাঁহাদিগকে লিখিতেছি তখন আমার বাইবেলের ভাষা ব্যবহার করিবার আর আবশ্যক কি? আমি আপনাদিগের অনেককে জানি—স্ত্রী ও পুরুষ দুই শ্রেণীরই অনেককে জানি। আমি আপনাদিগকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি ও আমার মনে হয় ও আশা হয় যে আমার চেষ্টা কতকটা সফলও হইয়াছে এবং আমি যতটুকু বুঝিয়াছি সেইটুকু আলোকের সাহায্যে আপনাদিগের Suffragist সম্বন্ধে যাহাতে মত বদলাইয়া যায় সেই বিষয় সাহায্য করিব। যা আমি বলিব তাহার প্রত্যেক কথা যে আপনাদিগের প্রত্যেকের জন্য তা নয়, যাহার জন্য যাহা তাহা নিজেরা বাছিয়া লইবেন ও জীবনে খাটাইবেন।

নূতন মতে অপছন্দতা।

প্রথমতঃ আপনারা এমন ভাবে গঠিত যে কোন একটা নূতন মত কি নূতন কথা শুনিলেই আপনারা চমকাইয়া যান। চমকান খুব স্বাভাবিক তা বুঝি, কিন্তু আপনারা ইহাও তো নিশ্চয়ই বুঝেন যে প্রত্যেক মত এক সময় নূতন ছিল। প্রত্যেক পুরাতন শিক্ষা এক সময় নূতন ছিল। আমিও আপনিও এক সময় নূতন ছিলাম, আর যখন নূতন হইয়া পৃথিবীতে আসিলাম তখন কত কর্ম্ম, কত উৎপাত ও কত যন্ত্রণা দিয়া তবে আসিয়াছি। তার পরে আমাদের থাকাটাই সকলের কাছে স্বাভাবিক হইল, লোকেরা আমাদের পাইয়া আহ্লাদিত হইলেন এবং এতদিন আমাদের ছাড়িয়া যে কি করিয়া ছিলেন তাহা ভাবিয়াই অবাক্। ভোট প্রার্থীনীদিগের সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই হইবে। একটা নূতন মত দেখিয়া শুনিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হওয়া বৃথা, কেন না যখন সেই মত প্রতিষ্ঠিত হইবে নিজেকেই বোকা সাজিতে হইবে। সকল অপেক্ষা সোজা পথ, সেই মতগুলিকে বুঝিতে চেষ্টা করুন। দয়া করিয়া এইটুকু মনে করুন, যে যদিও প্রায় সর্ব্বদাই আপনারা যাহা ভাবিয়াছেন তাহাই ঠিক দাঁড়াইয়াছে তথাপি এই ভোট সম্বন্ধে হয়তো কিছু একটু ভুল ধারণা আপনাদিগের হইয়া থাকিতেও

পারে। আর যদি আমি এইটুকু বলি যে আপনাদিগেরও এই নূতন মত—যে নূতন মত আজ ৫০ বৎসরের পুরাতন হইলেও তবুও নূতন—শুনে শুনে কাণ ভোঁতা হইয়া আসিয়াছে তাহা হইলে কি প্রাণে আঘাত দেওয়া হয়? আপনারা প্রথমে ইহাকে এমন বিষচক্ষে দেখিয়াছিলেন যে এখন যদিও আপনাদিগের মতান্তর হইয়াছে, কিন্তু আপনাদিগের গর্ব্ব তাহা স্বীকার করিতে দিতেছে না। কিন্তু আমি জানি ইহা আমাদিগের উপযুক্ত ব্যবহার নহে। আমি আপনাদের এত কাপুরুষ মনে করি না। মতান্তর হওয়া লজ্জার বিষয় নহে। ভুলে যান, প্রেরিত পল একদিন অত্যাচারী সল (Saul) ছিলেন।

স্বর্গীয় আদর্শ।

আপনারা স্ত্রীজাতিকে আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের জন্যই আপনারা তাঁহাদিগকে রাজনৈতিক গোলমাল হইতে দূরে রাখিতে চাহেন। তাঁহাদিগের আত্মা এত পবিত্র যে আপনারা তাহাদিগের শরীর ও মনকে জীবনের নির্জ্জন কোলাহলবিহীন মন্দিরে রাখিতে চাহেন, সেইখানে রাখিয়া রক্ষা ও পূজা করিতে চাহেন, যদি দরকার হয় তাহা হইলে আপনারা মরিতেও প্রস্তুত। কিন্তু বন্ধুগণ সত্যি কথা বলিতে হইলে বলিতে হয় আপনারা না জানিয়া না শুনিয়া প্রতারক হইতেছেন। আপনারা স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে কখনই এই সকল মত পোষণ করেন না, যদি করেন তাহা হইলে আপনারা ভাল লোক নহেন। কেন? কেন না আপনারা যা বিশ্বাস করেন, তা কৈ কার্য্যেতে ত পরিণত করেন না? আপনারা 'স্বর্গীয় দেবী'দের আপনাদিগের ঘর নিকাইতে দিতেছেন, অর্দ্ধাশনে বর্দ্ধিত স্বর্গীয় দেবকন্যাদিগকে জঘন্য বেতনে বিরক্তিকর ক্লান্তিযুক্ত কাজ করিতে দিতেছেন, পবিত্র মাতৃজাতিকে স্বর্গীয় দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে বুকে লইয়া খাটিয়া খাটিয়া মরিতে ও জঘন্য পাড়ায় বাস করিতে দিতেছেন, আর পুরুষের দরিদ্রতা ও লালসা মেয়েদের একটুকরা রুটীর জন্য জীবন বিক্রি করিতে বাধিত করিতেছে ইহাও আপনারা সন্তুষ্ট হইয়া শান্তভাবে দেখিতেছেন। প্রিয় বিরুদ্ধবাদিগণ এই সকল যে সত্য ঘটনা তা আপনারা জানেন, আর জানেন, সমাজ স্ত্রীজাতিকে দেবী বলিয়া পূজা করেন না। স্ত্রীজাতি দেবী নন, তাঁহারা পূজা চাহিতেছেন না, তাঁহারা পেট ভরিয়া খাইতে চাহিতেছেন। কোন স্ত্রীলোক ভাল, কেহ মন্দ, কেহ চালাক, কেহ নির্ব্বোধ, কাহারও স্বভাব মিষ্ট, কাহারও বিরক্তিকর, ঠিক পুরুষদিগের মধ্যে যেমন বিভিন্নতা আছে। আর 'ভোট' চাহিবার এই তাৎপর্য্য যে পুরুষেরা ভোটের অধিকার পাইয়া নিজেদের ভগবান প্রদত্ত ক্ষমতার সদ্ব্যবহারের (নিজেদের উন্নতিসাধনের) যেটুকু সুযোগ পাইয়াছেন স্ত্রীলোকেরাও ভোটের অধিকারী হইয়া নিজেদের ভগবান প্রদত্ত ক্ষমতার সদ্ব্যবহারের সেইটুকু সুযোগ ভিক্ষা করিতেছেন, ভোটের অধিকার প্রার্থনা—ইহার জন্য, ইহা হইতে তাঁহারা

বেশী প্রত্যাশা করেন না, কমও প্রত্যাশা করেন না। আজ পর্য্যন্ত আপনারা আপনাদিগের কল্পিত স্বর্গ কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেন না, 'দেবীদের' জীবন সুন্দর ও সুখী করিতে পারিলেন না। ইহা আপনাদিগের দোষ নহে, কেন না পুরুষ একলা ইহা করিতে পারেন না, নারী একলা ইহা করিতে পারেন না, কিন্তু স্ত্রী ও পুরুষ একত্রে ভগবৎ-প্রণোদিত হইয়া ইহা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন। একটা ডানায় কি পাখী স্বর্গের দিকে উড়িতে পারে? স্ত্রীজাতি ভোট চাহিয়া কল্পিত দেবীর আদর্শকে ছোট করিতে চাহেন না, কিন্তু সত্য সত্য পতিত পুরুষ ও স্ত্রীজাতিকে একটু তুলিতে চাহেন, প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহেন। অন্য দিক দিয়া দেখিতে গেলে যদি স্ত্রীজাতি সত্য-সত্যই দেবীর জাতি হন—যেমন আপনারা বিশ্বাস করেন—তাহা হইলে নিশ্চয়ই জানিবেন যে রাজনীতির সংস্রব দেবীদিগকে পতিত না করিয়া রাজনীতিকেই বিশুদ্ধ করিয়া দিবে। বাইবেলের সুন্দর কথাগুলি বোধ হয় মনে পড়ে—"তাঁহার বর্ত্তমানতা তাহাদিগকে রক্ষা করিল।" আমাদিগের সামাজিক জীবনে যত বেশী ভাবে দেবীরা জড়িত হন ততই মঙ্গল।

শারীরিক ও মানুষিক অক্ষমতার মত।

কিন্তু আপনাদিগের স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে মতের যেন ঐক্য নাই। স্বীকার করি ঐক্য থাকা সহজ ব্যাপার নহে। আপনাদিগের কতকগুলি যুক্তি বোঝায় যে আপনারা তাঁহাদিগকে খুব শ্রদ্ধা করেন, কতকগুলি বোঝায় যে আপনারা তাঁহা-দিগকে ঘৃণা করেন। আপনারা বলেন স্ত্রীজাতির শারীরিক ও মানসিক শক্তি পুরুষের সমান নহে, সুতরাং তাঁহারা ভোট পাইবার উপযুক্ত নহেন। নারীরা অস্ত্র ধারণ করিতে পারেন না, পুরুষেরা যুদ্ধ করিতে পারেন, সুতরাং আপনাদিগের মতে পুরুষেরাই শাসন করিবেন। কিন্তু ইহা যে মূর্খের কথা। স্ত্রীজাতি যুদ্ধ করিতে পারেন না, কিন্তু পুরুষজাতি সন্তান প্রসব করিতে পারেন না। পুরুষজাতি Dread-nought প্রস্তুত করিবার আগে স্ত্রীজাতি হইতে উৎপন্ন হইবেন। আপনারা যদি ধার্ম্মিক হন—আমি বিশ্বাস করি আপনারা ধার্ম্মিক, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বলিতে চাহেন না যে শারীরিক শক্তি সমাজ ও জাতির জীবনের ভিত্তি। যখন ইউরোপ ও আমেরিকার স্ত্রীলোকরা ভোটের অধি-কারী হইবেন তখন তাঁহারা যাহাতে যুদ্ধ একেবারে না হয় তাহারই জন্য আপনা-দিগের সাহায্য করিবেন। আধ্যাত্মিক ও মানসিক শক্তিই পৃথিবীকে শাসন করিবে। কিন্তু আপনারা বলেন স্ত্রীজাতির মানসিক শক্তি প্রবল নহে, তাঁহারা তর্ক-শাস্ত্রানুযায়ী নহেন। সব পুরুষই কি এই দুই শক্তিতে অদ্বিতীয়? আজকালকার দিনে এ সব খাটে না। ছোট ছোট স্কুলে ও ইউনিভারসিটিতে, মেডিকেল কলেজে লাইব্রেরীতে, সভাসমিতিতে, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মিলনে যান এবং দেখুন বুঝিতে পারিবেন আপনি যা বলিতেছেন তাহা অনর্থক বাক্য। স্বীকার করি স্ত্রীলোকেরা কেহ

কেহ বোকা, কিন্তু যেমন দিনকাল দাঁড়াইয়াছে বোকা সাজিলে লাভ বলিয়া অনেক স্ত্রীলোক বোকা সাজেন, কিন্তু পুরুষেরা নিরর্থক বোকা সাজেন, কেন না তাঁরা সত্য সত্যই বোকা। তবুও তাঁহারা ভোটের অধিকারী। যাই বলুন স্ত্রীজাতি 'স্বর্গের দেবী' ও 'ক্ষীণমনা' দুই এক সঙ্গে কখনই হইতে পারেন না, যদি হন তাহা হইলে 'দেবী' ও 'বোকা' এই কথার কোন পার্থক্য নাই। যাঁহারা তর্ক-শাস্ত্রানুযায়ী নহেন বলিয়া ভোটের অধিকার দিতে অস্বীকার করেন তাঁহারা নিজেরা যেন তর্ক-শাস্ত্রানুযায়ী হন।

গৃহের পবিত্রতা।

সকল অপেক্ষা ইহাই আপনাদিগের ভাবনার বিষয়। স্ত্রীজাতির প্রকৃতি ও ক্ষমতা সম্বন্ধে আপনাদিগের ভুল হইতেও পারে, কিন্তু স্ত্রীজাতির কার্য্যস্থল সম্বন্ধে মত যে অকাট্য ইহা নির্ভয়ে বলেন—স্ত্রীলোকের কার্য্যস্থল গৃহ। কিন্তু আপনারা কি সকলকে গৃহ দিয়াছেন? সেই অসংখ্য বালিকা ও নারী যাঁহারা গৃহহীন কিম্বা যাঁহারা গৃহ থাকিতেও অবস্থায় পড়িয়া গৃহ চালাইবার জন্য গৃহের বাহিরে থাকিতে বাধ্য তাঁহাদের বিষয় কি বলিতে চাহেন? পুরুষেরা কি তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন? কোন কোন স্থলে করিতেছেন—মূল্য লইয়া। সেই স্থলে রক্ষক কথা মন্দ ভাবেই ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু যথার্থ কথা বলিতে হইলে বলিতে হইবে যে এই স্ত্রীলোকেরা রক্ষকবিহীন, তাহাদিগকে পৃথিবীতে বাহির হইয়া জীবন সংগ্রাম করিতে হয়, আর বলিতে হইলে সাধারণ প্রার্থনার ভাষায় বলিতে হয় যে ইঁহাদিগের মধ্যে বেশীর ভাগই "বসতিহীন ও অত্যাচারিত।" এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা ভোটের আশ্রয়ে রক্ষিত হইতে চাহেন। ক্ষমা করিবেন, আপনাদিগের "সুখী পরিবার" কথা সমস্তই কল্পনা, শুধু অভিপ্রায় বিশিষ্ট গল্প। কল্পনা করা কি মত পোষণ করা দোষের কথা নহে, খুব ভালই; কিন্তু আপনার ভুল কল্পনায় মত্ত। আমরা সুখী ও সুন্দর পরিবার চাই, কিন্তু নিজেরটাই চাই, না সকলে সুখী হয় তাই চাই? সুন্দর গৃহ, সুন্দর সুখী পরিবার, কি জঘন্য গলীর ভিতর প্রত্যাশা করেন? যতদিন না পিতামাতা সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হন, তাঁহাদিগের প্রশস্তভাবে জীবনযাপন করিবার মত আয় না হয় ততদিন সুন্দর পরিবারত গঠন হইতে পারে না। আমরাও চাই যে স্ত্রীজাতি গৃহের রাণী হন, কিন্তু অনেকের দুর্দ্দশা করিয়া কয়েকজনার রাণীত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহি না; গৃহের পবিত্রতা রক্ষা করিতে চাই, কিন্তু পাপের যাজিকার অনুগ্রহে যাঁহার অলৌকিক সংস্কারের দৃশ্যের প্রথম পট প্রতি রাস্তার কাহিনীতে দেখা যায়, তাঁহার গৃহের পবিত্রতা রক্ষা করিতে চাহি না। জাতীয় কর্ত্তব্য এমন অবস্থায় সৃজন কর, যাহাতে গৃহের পবিত্রতা রক্ষা পায় ও স্থায়ী হয়; এবং যদি—যেমন আপনারা নিজেই স্বীকার করিতেছেন—গৃহ স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ স্থান ও কর্ম্মস্থল হয়, তাহা হইলে স্ত্রীলোককে 'সুখী পরিবার গঠন' বিষয়ক জাতীয়

সমস্তায় অংশী হইতে দিতেই হইবে। এখন বুঝিতে পারিতেছেন কি যে যদি সাংসারিক পবিত্রতা রক্ষা আপনাদিগের আদর্শ হয় তাহা হইলে স্ত্রীলোকদিগকে ভোটের অধিকার দিন।

নিয়মের উপর ভক্তি।

এই স্থলেই আপনারা নিজেদের মত নিজেরাই বেফাঁস করেন। স্ত্রীলোকের সামরিক ভাব আপনাদিগের কাছে এক বিভীষিকা হইয়াছে। আপনাদিগের ধর্ম্ম-পূর্ণ সহজ ভাবকে অপমানিত করিতেছে। আপনাদিগের স্বভাব বদলাইয়া দিয়াছে। আপনারা সাধারণতঃ শান্তিপ্রিয়, আরাম-প্রিয়, ভদ্রলোক। দুঃখের কথা এই যে আপনাদিগের ভাল স্বভাব, উচ্চ প্রকৃতিই আপনাদিগকে উচ্চ-পথ দেখাইয়াছে। আপনাদিগের উদ্দেশ্য ভাল, আপনারা যাহা বুঝিয়াছেন তাহাই প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু আপনাদিগের আলো অস্পষ্ট। আর আপনাদিগের ব্যবহার যে কি হাস্তাস্পদ তাহা আপনারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। কেননা আপনারা যদিও মেয়েদের ভোট দিবার জন্য কোন কালে কোন চেষ্টা করেন নাই এবং এইরূপ রণচণ্ডী না হইলে যে ভবিষ্যতে কখনও দিবার চেষ্টা করিতেন না ইহা ধ্রুব সত্য; তথাপি আপনারা বলিতে ছাড়েন না যে আপনারা স্ত্রীজাতির ভোটের অধিকারী হওয়াতে কিছুতেই সায় দিতে পারেন না, কেননা তাঁহারা সয়তান সদৃশ ব্যবহার করিতেছেন। এখন আপনারা আপনাদিগের স্বর্গীয় দেবীর মত পরিত্যাগ করিয়াছেন, ক্ষীণমনা মত পরিত্যাগ করিয়া সেই স্থলে খাঁটি ধূর্ত্ত (ভণ্ড) মত স্থাপন করিয়াছেন, আপনাদিগের আনন্দপূর্ণ "সুখী পরিবারের" গান বন্ধ করিয়াছেন এবং নিয়মের পবিত্রতা সম্বন্ধে খুব বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আপনারা নিয়ম লঙ্ঘনের সামরিক ভাব ও বিনাশের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া খুব ঠিক করিয়াছেন। এই সমস্ত ঘৃণাদায়ক কর্ম্ম। যদি এই দেশে কেহ সামরিক ভাব বিরোধিদল প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন আমি প্রথমেই গিয়া তাহার সভ্য হইব ও যথাসাধ্য চাঁদা দিয়া তাহার সাহায্য করিব। আমি সকল যোদ্ধাদিগকে একত্রে ডকের উপর দেখিতে চাই,—Prime Minister এবং Foreign Secretary কেননা তাঁহারা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছেন এবং পরস্পর ভিন্ন জাতির যুদ্ধে শান্তভাবে বিচার করিয়া শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা না করিয়া কেবলই যুদ্ধার্থ সসজ্জ সৈন্তের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন; Sir Edward Carson Mr. F. E. Smithকে তাঁহাদিগের ইংরাজ সেনাপতিদিগের ও Ulster সৈন্তদলের সহিত দেখিতে চাই; Unionist পত্রিকার সম্পাদককে সাধারণকে উত্তেজিত করার জন্য এই স্থলে দেখিতে চাই, Mr. Murphy Mr. Larkin এবং Dublin এর পুলিশের দল যাঁহারা মস্তক চূর্ণ করিতেছেন, তাঁহাদিগকেও চাই, Mrs. Pankurstকে চাই, প্রতারিকা ও নির্লজ্জ Christabelকে বিখ্যাত cat & mouse নিয়মের প্রবর্ত্তক Mr. Mc. kinnaর সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে চাই। সামরিক ভাব

বিরোধী দলের কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত, কিন্তু আমার মনে হয় আপনারা তাহাতে যোগ দিবেন না। আপনারাতো সামরিক ভাবকে ঘৃণা করেন না আপনারা ভালবাসেন, এবং আপনাদিগের মতলব সিদ্ধির জন্য যখন যা প্রয়োজন হয় সেইরূপ স্বপক্ষ ও বিপক্ষ মত গ্রহণ করেন। কেবল যখন কয়েকটী দুঃসাহসিক নারী উপদ্রব করেন তখন আপনারা অগ্নিশর্ম্মা হইয়া প্রতিশোধ দিবার জন্য প্রাণপণ করেন। ইহার পর আপনারা তর্কশাস্ত্রানুযায়ী বলেন যে আপনারা সমগ্র নারীজাতিকে ভোটের অধিকার দিবেন না, কেননা কয়েকটী নারী রণচণ্ডী হইয়াছেন। কিন্তু প্রিয় বিপক্ষদল, আপনারা সত্য সত্যই কি এখন একটু একটু বুঝিতেছেন না যে এই যে নিয়মভঙ্গ ও রাজবিদ্রোহিতা ইহার নিশ্চয় কোন কারণ আছে? কারণ এই যে, মানবগঠিত নিয়ম সব সময় ভক্তি পাইবার উপযুক্ত হয় না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা অসভ্য ভাষায় একদিন প্রথম চার্লসকে বলিয়াছিলেন 'রাজশক্তিরও একটা সীমা আছে'; আজ সভ্য ভাষায় আলষ্টারের লোকেরা বলিতেছেন যে 'অধিকাংশের শক্তির একটা সীমা আছে'। সে সময় যেমন রাজার আবশ্যক ছিল, এ সময় সেইরূপ অধিকাংশের মতের আবশ্যক। রাজা কিম্বা অধিকাংশ কেহই ভগবানের স্থান পাইতে পারেন না, কিন্তু প্রত্যেকেরই বিচার করিবার জন্য ঈশ্বরীয় শক্তি আছে। যাহা পবিত্র নহে তাহাকে পবিত্র বলা পাপ। অপবিত্রকে পবিত্র বলিলে, মুষা যে ভগবানের দশটী নিয়মের কথা বলিয়াছেন তাহার প্রথম তিনটী ভঙ্গ করা হয়। যাহা আলষ্টারের সম্বন্ধে সত্য তাহা শ্রমজীবী জগৎ সম্বন্ধেও—যেখানে আজ নিয়মভঙ্গ ও সামরিকতা দেখিতেছেন—সত্য। যদি আপনারা শিক্ষা দিয়া লোকের আচার ব্যবহার, নীতি, বংশপরম্পরায় উন্নত করেন এবং তাহার পর মূলধন ধর্ম্মের ঈশ্বরীয় শক্তির, রাজনীতিবিষয়ক নিয়মের পবিত্রতা, ইত্যাদি বিষয় প্রচার করেন, এবং সেই সঙ্গে আজ্ঞা করেন যে একটী লোকের জঘন্য পাড়ায় স্নানাগারবিহীন ঘরে প্রতি সপ্তাহে এক পাউণ্ড ভাড়া দিয়া খুব ভাল তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই আপনার ঈশ্বরীয় শক্তির ও নিয়মের পবিত্রতা সম্বন্ধে প্রচার গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন দিবে। যদি নদীর গতিরোধ করেন, নদী ছাপিয়া উঠিয়া উপত্যকাকে ছারখার করিয়া দিবে। বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা কি চাই? আমাদের দেশের আদিব্যবস্থান constitution সকল এমন ভাবে গঠিত হওয়া প্রয়োজন যাহা সত্যসত্যই প্রতিনিধি স্বরূপ হইবে, কেবল সংখ্যায় প্রতিনিধি নহে ছোটরও প্রতিনিধি হইবে, এবং সাধুর দল যাঁহারা সুবিচার করেন ও ভ্রমকে সংশোধন করেন তাঁহাদিগের দ্বারাই দেশ শাসিত হওয়া প্রয়োজন। এইরূপ করিতে হইলে রাজ্যশাসনের ব্যবস্থা করিবার ভিতর নিশ্চয় স্ত্রী ও পুরুষ দুই প্রতিনিধি থাকিবেন, নারী ও পুরুষ উভয় জাতিরই প্রতিনিধি চাই। আমি যেভাবে সামরিক ভাব ঘৃণা করি, আপনা-

রাও যদি সেইভাবে ঘৃণা করেন তাহা হইলে নারীজাতিকে ভোট দিবার অধিকার দিন।

এখানে আমার বক্তব্য শেষ করি। প্রিয় বিপক্ষবাদিদল আমি জানি আপনারা এই কাগজ কিনিয়া আমার বক্তৃতার কাহিনী পড়িবেন না, কিন্তু বোধ হয় আপনাদিগের কোন suffragist বন্ধু আপনাদিগকে পয়সা খরচ করিয়া একখানি কিনিয়া দিতে পারেন। যদি তাই হয় আমার আশা যে আপনারা তাহা হইলে পড়িবেন। আপনাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছি, আশা করি লেখার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আপনারা সত্যসত্যই দেশভক্ত নগরবাসী হইতে চাহেন জানিয়াই আপনাদিগকে লিখিলাম।

আপনাদিগের অনুগত—
এড্‌ইন এ মোল্‌ড্‌।

সন্ধ্যাপ্রসঙ্গ।

৩য়।

গতবারে মেঘের কথা হইতেছিল। জড়জগতে মেঘের দ্বারা কি মঙ্গল সাধিত হয় তাহা আমরা সকলেই জানি। অধ্যাত্ম জগতেও কি তাই? আমার এইরূপ বিশ্বাস। কি কারণে মেঘের উদয় হয় তাহা অনেক সময় বুঝিতে পারা যায় না; কিন্তু পরিণামে যে তাহাতে কল্যাণ হয় এ বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নাই।

স্কুল ছাড়িবার পর একটী শিশু আমার জীবনের কেন্দ্রস্থল অধিকার করিয়াছিল। শিশু যখন তিন বৎসরের বালক, তখনই তাহার সঙ্গে বেড়াইতাম, খেলা করিতাম, গল্প করিতাম এবং পড়াও করিতাম। কলিকাতার পাকা সানের মেজের উপর মাটি ঢালিয়া আমরা বাগান করিবার সখ মিটাইতাম। তাহাতেই কত আনন্দ। আমি যখন পড়িতাম সে আমার পাশে বসিয়া থাকিত, অথবা আপনার মনে ইতস্ততঃ খেলিয়া বেড়াইত। পড়া শেষ হইলে ছুটিয়া আসিয়া বলিত "আমাকে বল।" মুখে মুখে তাহাকে কত কথা শিখাইতাম। যখন বলিত "আমাকে সব বল" তখন পুস্তকে সুন্দর ছবি থাকিলে তাহা দেখাইয়া সেই সম্বন্ধে যতদূর বলা যায় তাহা বলিতাম। একদিন আল্‌ফ্রেড্‌ দি গ্রেটের ছবি দেখাইয়া তাঁহার জীবনের কথা কিছু কিছু বলিয়া বলিলাম "তুমি শিগ্‌গির শিগ্‌গির লেখা পড়া শিখে লও, তা হ'লে তুমি নিজে পড়ে আরও ভাল ক'রে বুঝতে পার্‌বে, আর তুমিও এই রকম একজন খুব বড়লোক হবে।" তাহাতে বালকের কি অসীম উৎসাহ জাগিত! তাহার সেই উৎসাহদীপ্ত উজ্জ্বল মুখখানি আমার মুখের উপরে ভক্তিভরে স্থাপিত যেন এখনও স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। সে জীবন কত সুখের! শিশুর সঙ্গে আমি যেন শিশু হইয়া গিয়াছিলাম। আর কোনও ভাবনা চিন্তা কিছুই ছিল না। কেবল সে কিরূপে উচ্চ হইবে, কিরূপে মহৎ চরিত্র লাভ করিবে, ইহাই একমাত্র ভাবনার বিষয় ছিল।

তারপর তোমাদের সঙ্গে দেখা।

তোমাদের সঙ্গে কত সুখে কতদিন কাটিয়া গিয়াছে। প্রতিদিন আমরা একত্রে ছাদে বেড়াইতাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ছাদে বসিয়া কত গল্প করিতাম, কত উচ্চ উচ্চ বিষয়ে প্রসঙ্গ করিতাম। কত সময় মনে করিয়াছি, সে সুখের দিন হায় আর কি হবে?

শিশুর শুদ্ধ সরল মুখশ্রী কাহার না ভাল লাগে? কিন্তু যৌবনের পবিত্র মাধুরী কি আরও সুন্দর নয়? আমার মনে হয় সমস্ত জীবন শুদ্ধতা এবং প্রেমে অতিবাহিত বার্দ্ধক্যের শান্তি এবং সৌন্দর্য্য তদপেক্ষাও মনোরম। তাই ভাবি আমাদের সেই মুক্তভাব, সেই সম্পূর্ণ সংসারচিন্তাবিরহিত পবিত্র আশ্রম-জীবন অত্যন্ত সুখের হইলেও মঙ্গলময়ের বিধানকে বাঞ্ছনীয় বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। বাস্তবিক যখন জীবনের ভিতর প্রবেশ করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া দেখি, তখন বুঝিতে পারি শত ঝড় তুফান অতিক্রম করিয়া জীবনতরী গম্যস্থানের দিকেই অগ্রসর হইতেছে। এখন কি আর এতটা পশ্চাতে ফিরিতে ইচ্ছা হয়?

একদিন সৎপ্রসঙ্গের পর (তোমাদের সঙ্গে নয়) স্থির হইয়াছিল, প্রত্যেকে নিজের নিজের দোষ কাগজে লিখিয়া দিবে। যাঁহাদের সহিত একত্রে বাস করিতাম, সকলকে জিজ্ঞাসা করিলাম কি দোষ তাঁহারা দেখিয়াছেন। সকলেই বলিলেন "তোমার কোনও দোষ দেখিনি;" কেবল একজন বলিলেন "তুমি বড় সেবা নেও।" তাঁহার সে কথায় তখন কিছুই মূল্য বুঝি নাই। মনে করিলাম "সে আবার দোষ কি? সেবা পাইলে কে না গ্রহণ করে?" এতদিন পরে বুঝিতে পারিলাম তিনি সত্য কথাই বলিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতে অনেক আদর যত্ন, স্নেহ ভালবাসা শ্রদ্ধা সম্মানলাভ করিয়াছি। পিতার অতুল স্নেহ, জ্যেষ্ঠভ্রাতার অপরিমেয় ভালবাসা, আত্মপর সকলের নিকটেই অনেক পাইয়াছি। কিন্তু দিয়াছি কি? কিছুই না। দানের ঘরে একেবারে শূন্য পড়িয়াছে। তাই কি কৃতজ্ঞতাভরে অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়াছি? না। সিংহাসনারূঢ়া রাণীর ন্যায় আপনার প্রাপ্য বস্তু জানিয়া অবহেলাভরে সম্ভোগ করিয়াছি। উঃ কি ভয়ানক অপরাধ! তারপর? তারপর যখন সেবা করিতে চাহিলাম তখন দেখি সেবার মহান্ অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। এ অকিঞ্চিৎকর জীবনের সেবা আর কেহ গ্রহণ করিতে চায় না। ছিন্ন তার বীণার ন্যায় পড়িয়া আছে। কে আর তাহাকে তুলিয়া লইবে? মধুর ললিত তানে মানব মন মুগ্ধ করিবার শক্তি যে সে হারাইয়াছে।

পিতৃপ্রমুখ গুরুজনগণের স্নেহ গৌরবে আমার আত্মপরিচয় হয় নাই। সর্ব্বত্র আদর সম্মান লাভ করিয়া মনে করিতাম জয়লাভই কপালে লেখা আছে। পরাজয় যে হইতে পারে, সম্মুখে যে বাধা থাকিতে পারে তাহা কখন মনেই আসে নাই। অকস্মাৎ এমন বিষম বাধা পাইলাম যাহার প্রচণ্ড আঘাতে মস্তক ঘুরিতে লাগিল, চারিদিক অন্ধকার হইয়া গেল। চৈতন্য

হইলে দেখিলাম, অকূল ভবসাগরে একাকী ভাসিতেছি, সহায় সম্বল কিছুই নাই। তখন নিরুপায়ের উপায় ভবকাণ্ডারী শ্রীহরিকে প্রাণপণে ডাকিতে লাগিলাম। সেই ডাকের নিকটে সমস্ত জীবনের সাধন ভজন অতি তুচ্ছ। আহা! ভক্তগণ যে যুগে যুগে সাক্ষ্য দিয়া গেলেন ডাক্‌লেই তিনি দেখা দেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। মুহূর্ত্তে পর্ব্বত সমান দুঃখ কোথায় চলিয়া গেল। সেই অপূর্ব্ব সুখের সময় প্রাণ বলিতে লাগিল "প্রভু, এত সুখ দেবে বলেই কি আমাকে এতদিন জীবিত রেখেছিলে? আমি যে কতবার চক্ষের জলে তোমার চরণ ধুইয়ে দিয়ে বলেছি দয়াময়, বসুন্ধরাত কেবল রত্নই ধারণ করেন, তবে এহেন জঞ্জাল সেখানে কেন রেখেছ? তাই বুঝি এত বড় তুফান তুলে আমার আমিত্ব জঞ্জাল ধুয়ে নিলে? ধন্য তোমার করুণা।

ভগ্নীগণ তোমরা কি ভাবে জীবনপথে অগ্রসর হইতেছ তাহা জানি না, কিন্তু জানিবার বাসনা রাখি। অনেক দিনের কথা, বোধ হয় ১৫।১৬ বৎসর হইবে; একটী বন্ধু একখানি কাগজে মুড়িয়া কি দিয়াছিলেন। জিনিষটী লইয়া কাগজখানি ফেলিয়া দিতে গিয়া দেখি, তাহাতে এই সুন্দর কথাগুলি লেখা আছে;—

Teach me, Everlasting God, to be faithful and affectionate in my heart to all those whom Thou hast brought to me and linked to my soul, as friends and as workers in Thy Kingdom.

বোধ হয় শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের কথা। কথাগুলি আমার প্রাণ-তন্ত্রীকে আঘাত করিল। বার বার পড়িতে পড়িতে কণ্ঠস্থ হইয়া গেল। তবু কাগজ-খানি অতি যত্নের সহিত বাক্সে তুলিয়া রাখিলাম। কাগজে কি জিনিষ মোড়া ছিল তাহা মনেও নাই, কিন্তু অমূল্য রত্ন কথা কয়টী আজও আমার বাক্সে সযত্নে রক্ষিত রহিয়াছে।

ভগ্নীগণ, তোমরা পুষ্পবনের ভিতর দিয়া কিম্বা কণ্টকবহুল পথে চলিয়াছ তাহা জানি না। সুখই অবশ্য জীবনের লক্ষ্য। করুণাময় পরমেশ্বর নিশ্চয়ই আমাদিগকে দুঃখ কণ্টক বনে ফেলিয়া রাখিতে চান না। ভক্ত বলিলেন, "আনন্দ-রূপমমৃতম্ যদ্বিভাতি।" কিন্তু সকল জীবনে কি তাহা সম্ভব? কি জানি। এ জীবনেত দেখিলাম দুঃখ বিনা সে পরম সুখ লাভ হয় না। আজ এই।

সন্ধ্যাপ্রসঙ্গ।

৪র্থ।

আবার আমরা প্রসঙ্গ করিতে আসি-লাম, সংসারের নিকট এক ঘণ্টার জন্য ছুটী লইলাম। আশা করি তোমরাও এইরূপ একটু খানি সময় করিয়া এখানে আসিয়া বসিবে? মনে করিতেছি আমরা সকলে একত্র বসিয়াছি। এবার কি প্রসঙ্গ হইবে? সংসারের ব্যস্ততার মধ্যে

সময়ে সময়ে প্রাণের ভিতর হইতে কি যেন এক হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হয়; মনে হয় বুঝি এ জীবন বৃথাই কাটিয়া গেল। এ জীবন দ্বারা পৃথিবীর কোনও কাজই হইল না। কাল গভীর রাত্রে নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং বর্ষশেষের সেই স্বপ্নের কথা মনে হইল। ধূ ধূ করিতেছে রৌদ্রতপ্ত প্রান্তর, তাহার উপর দিয়া অত্যন্ত শীর্ণদেহ একটী রমণী তাঁহার দুটী শিশুসন্তান লইয়া চলিতেছেন। সন্তানদের পাছে কষ্ট হয় সেজন্য তিনি যত্নে নিজ অঞ্চলে তাহাদের আতপতাপ নিবারণ করিতেছেন। কখনও বা পথের কণ্টকে তাঁহার চরণ বিদ্ধ হইয়া রক্তাক্ত হইতেছে। কিন্তু সন্তান যুগল যাহাতে কষ্ট না পায় তাঁহার দৃষ্টি সেইদিকে; তিনি স্বীয় বেদনা বিস্মৃত হইয়া তাহাদিগকে কোলে তুলিয়া লইতেছেন। সেই নারীর দুইদিকে দুইজন স্বর্গের দূত। তাঁহাদের হস্তে এক এক খানি পুস্তক। তাঁহারা সেই মহিলার প্রতি কার্য্য অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। যখনই তিনি ঐরূপ আত্মসুখ অগ্রাহ্য করিয়া সন্তানদের দুঃখ-মোচনে ব্যাপৃত তখনই তাঁহার পশ্চাতের একজন দূত হস্তস্থিত সুন্দর উজ্জ্বল পুস্তকে সোণার অক্ষরে তাহা লিখিয়া লইতেছেন। আর যে সময় তিনি তাঁহার সেই শুষ্ক মুখখানি তুলিয়া প্রান্তরের সীমা অনেকদূরে দেখিয়া হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িতেছেন অথবা পথশ্রমে কাতর হইয়া সন্তানদের প্রতি শিথিল যত্ন হইতেছেন তখন সেই দূতের সুন্দর মুখ ম্লান হইতেছে এবং অন্য পার্শ্বের দূত তাঁহার কৃষ্ণবর্ণের পুস্তকে ঘন কাল অক্ষরে তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছেন। রমণী এইরূপে অনেক পথ অতিক্রম করিয়া চলিলেন। আমিও অবাক্ হইয়া এই আশ্চর্য্য ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। সহসা নিদ্রাভঙ্গ হইল। শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিলাম কে এই নারী? তখন চৈতন্য হইল, সেত আর কেহ নয় আমি নিজেই, আমাকে চেতনাদানের জন্য এই স্বপ্ন। এই যে আমি পিঞ্জরে বসিয়া মুদিত নয়নে কেবলই ভাবিতেছি কবে সেই শুভদিন আসিবে যে দিন কোন্ এক মাহেন্দ্রক্ষণে মহা শুভযোগে আমার এই জীবন ধন্য হইয়া যাইবে। তাহার সমুদায় গ্রন্থি ছিন্ন হইবে, সে স্বাধীন হইবে এবং কি এক মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়া আনন্দে বিজয়ভেরী বাজাইতে বাজাইতে আপনি বিভোর হইয়া এবং জগৎকে মাতাইয়া এখান হইতে সিদ্ধমনোরথ হইয়া প্রস্থান করিবে। ভগ্নীগণ, তোমাদের কি এ রকম মনে হয়? তাহা হইলে হয়তঃ কোনও মাহেন্দ্রক্ষণ না আসিয়া একেবারে সেই শেষের দিন আসিয়া উপস্থিত হইবে। বিধাতা যেখানে তোমাকে রাখিয়াছেন সেইখানেই তোমার কার্য্য; তুমি কোথায় পলায়ন করিতে চাও? এখানকার কার্য্যে অবহেলা করিলে কোনও অসাধারণ মহৎ কার্য্য তোমাকে পরিত্রাণ দিতে পারিবে না। এই নির্জ্জন, গভীর অন্ধকার সংসার কারাগৃহে লোকচক্ষুর অন্তরালে সেই চিন্ময় মহাচক্ষু সমস্তই দর্শন করিতেছেন। এখানে তুমি যে যথার্থ নিঃস্বার্থ ভাবে প্রাণ

দান করিতেছ, তাহা কি তাঁহার নিকটে তুচ্ছ? কখনই নয়। তুমি যে তোমার স্বামী, সন্তান অথবা গৃহের অন্য কাহারও আরামের জন্য, উন্নতির জন্য শিক্ষার জন্য নিজের সুখ শান্তি বিসর্জ্জন দিতেছ, মনে করিও না তোমার এই জীবনদান কেহ গ্রাহ্য করিল না, কেহ দেখিল না, সুতরাং সকলই বৃথা হইল। যিনি অন্ধকারেও দর্শন করেন, যিনি তোমার প্রতি পদক্ষেপ পর্য্যন্ত গণনা করেন তাঁহার নিকটে তোমার প্রত্যেক কার্য্যের হিসাব রহিয়াছে। তিনি কেবল প্রাণ দেখিয়া ছোট বড় বিচার করেন। একবার ঐদিকে তাকাইয়া দেখ তোমার প্রত্যেক নিঃস্বার্থ কার্য্য তোমার জীবন পুস্তকে কি সুন্দর উজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। আর অন্যদিকে? অন্য দিকে কি গভীর মসীবর্ণ। আহাহা! বইখানি যে একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এমন কেন হইল? মনে করিয়া দেখ, কত জড়তা, আলস্য, আসক্তি, নিরাশা, স্বার্থপরতা এবং অহঙ্কার তোমাকে কতবার কর্ত্তব্য হইতে বিচলিত করিয়াছে। তখন বুঝিতে পার নাই যে ইহার প্রত্যেকটী আর এক জায়গায় গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে, আর মুছিবার উপায় নাই। এখন হায়! হায়! করিলে আর কি হইবে? যে কয় পাতা বাকী আছে তাহাতে যেন আর এক বিন্দুও কালদাগ না লাগে, সেজন্য প্রাণপণে চেষ্টা কর। বৎসর শেষ হইল। ভগ্নীগণ নববর্ষে কি নূতন ব্রতগ্রহণ করিবে? ব্রত লইতে বড় ভয় হয়; কি জানি বা ভঙ্গ করি? কিন্তু এই জীবনই ত পরমব্রত। কতবার যে আমরা তাহা ভঙ্গ করিয়া মহাপাপ করিতেছি সে বিষয়ে কি চিন্তা করি? কিন্তু আর নয়। এবার সকল আলস্য এবং আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল ইচ্ছাময়ের দিকে তাকাইয়া ব্রতপালনে অগ্রসর হই। বিধাতা যেস্থানে রাখিয়াছেন তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিব, সে কার্য্য পূর্ণ করিব, না পারি প্রাণ দেব। সংগ্রামে যিনি প্রাণ দেন জয়ী না হইলেও বীরগণ তাঁহার বিজয় ঘোষণা করেন। তবে এস ভগ্নীগণ, মন্ত্রের সাধন কি শরীর পতন এই মন্ত্রে দীক্ষিত হই। সর্ব্বশক্তিমান প্রেমময় ঈশ্বর আমাদের সহায়। আজ আসি।

অন্বেষণ।

আঘাতের পর আঘাত দাও
আনিতে চেতনা;
জানি তাহা, তবু কেন
অন্তরে বেদনা?
তুমি যাহা কর তাহা
মঙ্গলের তরে;
জানি মনে মুখে বলি,
তবু আঁখি ধারে।
কবে প্রাণের দুর্ব্বলতা
যাবে সব ঘুচে;
তোমার এ দান পারব নিতে
আঁখি জল মুছে।
রুদ্ধ রহি অন্ধকারে
আলোক পানে ধাই;

দীন আমি হয়ে পড়ি
আরো কত দীন।
এই করগো এমন তর
হয় না যেন প্রাণ,
তোমার শুভ আশীষ ধারা
কর আমায় দান।
তোমার কথায় রচি গাথা
অর্পিব তোমায়,
ভরে যেন উঠে না প্রাণ
কোনও বেদনায়।
সকল কাজে হৃদয় মাঝে
থাক দেব তুমি,
ঘুরে সারা দিশে হারা
হব না আর আমি।

শ্রীমতী কৃপাদেবী।

সকল আমার সমান হয়
দেখা যদি পাই।
তুমি তো দেব সারাক্ষণ
আছ কাছে কাছে,
আমি যে শুধু ঘুরে মরি
প্রহেলিকার মাঝে।
কবে, সকল চিন্তা সকল ব্যথা
যাবে দূরে সবে,
তোমার পুণ্য আলোক ধারার
পরাণ উঠবে ভরে।
কবে হবে এমন দিবস
খুলিয়ে অন্তর,
তোমার পূজা করতে পাব
শুভ অবসর।

শ্রীমতী কৃপাদেবী

আহ্বান।

দিনের মাঝে সকল কাজে
করি সমাপন,
করতে তোমার পূজা যখন
আসি হে রাজন!
কোথা হতে লাগে এসে
সংসারের বায়,
চিত্ত মাঝে তাহাতে যে
হৃদয় দোলায়।
এমন করে পরাণ জুড়ে
যদি অনুক্ষণ,
দুঃখ আর বেদনাতে
ভরে থাকে মন।
সরস কিছু রহে না যে
সকলি মলিন,

বন্নুপথ (বালুকামার্গ) জাতক।

[ভগবান শ্রাবন্তীনগরে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন।]

জেতবনে শাস্তার নিকট ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া শ্রাবন্তীবাসী জনৈক সম্ভ্রান্ত বংশীয় কুমারের প্রতীতি জন্মে যে, কামাদি রিপুই দুঃখের নিদান। অতএব সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিল এবং পূর্ণ দীক্ষা লাভের জন্য পাঁচ বৎসর কাল অক্লান্ত পরিশ্রমে দুইখানি শাস্ত্র-সারসংগ্রহ অধ্যয়ন করিল, কিরূপে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিতে হয়, তাহা শুনিল এবং শাস্তার নিকট হইতে ইচ্ছানুরূপ কর্ম্মস্থান গ্রহণ পূর্ব্বক ধ্যানার্থ বর্ষাকাল অতিবাহিত করিবার অভিপ্রায়ে অরণ্যে প্রস্থান করিল। কিন্তু সেখানে সে তিন মাস চেষ্টা করিয়াও

তত্ত্বজ্ঞানের আভাসমাত্র লাভ করিতে পারিল না। তখন সে ভাবিতে লাগিল, "শাস্তা বলিয়াছেন, পৃথিবীতে চারি শ্রেণীর মনুষ্য আছে; আমি বোধ হয় তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নশ্রেণীভুক্ত; মার্গপ্রাপ্তি বা ফলপ্রাপ্তি কিছুই বোধ হয় এ জন্মে আমার তজ্জন্য ঘটিয়া উঠিবে না। অতএব আর বনে থাকিয়া কি লাভ? শাস্তার নিকট ফিরিয়া যাই; সেখানে তাঁহার প্রভাময় সান্নিধ্য অনুভব করিয়া জীবন সার্থক করিব, মধুর উপদেশ শুনিয়া কর্ণ পরিতৃপ্ত হইবে।" এই স্থির করিয়া সে জেতবনে ফিরিয়া গেল। তাহার সহচরেরা বলিল "তুমি ত শাস্তার নিকট হইতে কর্ম্মস্থান গ্রহণ করিয়া শ্রমণধর্ম্ম পালনার্থ বনে গিয়াছিলে। এখন দেখিতেছি, প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আমাদিগের সহিত সুখে বাস করিতেছ। তুমি কি প্রব্রজ্যার চরমফল লাভ করিয়া পুনর্জ্জন্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছ?" সে বলিল, "বন্ধুগণ, আমি মার্গ বা ফল কিছুই লাভ করিতে পারি নাই; আমার বিশ্বাস হইল, আমার ভাগ্যে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। সেই জন্য ভগ্নোদ্যম হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি।" তাহারা বলিল, "তুমি যখন দৃঢ়বীর্য্য শাস্তার শাসনে প্রবেশ করিয়াছ, তখন নিজে নির্ব্বীর্য্য হইয়া ভাল কর নাই। চল, তোমাকে শাস্তার নিকটে লইয়া যাই।" অনন্তর তাহারা ঐ নিরুৎসাহ ভিক্ষুকে শাস্তার নিকট লইয়া গেল।

তাহাদিগকে দেখিয়া শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "তোমরা কি এই ভিক্ষুকে ইহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আনয়ন করিয়াছ? এ কি করিয়াছ?"

তাহারা বলিল, "ভগবন্, এই ব্যক্তি নির্ব্বাণপ্রদ শাসনে প্রবিষ্ট হইয়াও শ্রমণধর্ম্ম পালনে ভগ্নোৎসাহ হইয়াছেন এবং সিদ্ধিলাভ না করিয়াই অরণ্য হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।" "কেমন হে ভিক্ষু, ইহারা যাহা বলিতেছে, তাহা সত্য কি?" "হাঁ ভগবন্।" "বড় আশ্চর্য্যের কথা! বুদ্ধশাসনে প্রব্রজ্যা লাভ করিয়া কোথায় তুমি নিস্পৃহ, সন্তুষ্ট ও স্থিরবীর্য্য হইবে; তাহা না হইয়া তুমি আত্মবিস্মৃত হইয়াছ এবং উৎসাহ ত্যাগ করিয়াছ? পূর্ব্বজন্মে তুমি না সাতিশয় উৎসাহবান্ ছিলে? তখন পঞ্চশত গো ও মনুষ্যগণ কেবল তোমারই উৎসাহের প্রভাবে ভীষণ মরুকান্তারে প্রচুর পানীয় পাইয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিল। তবে এখন তুমি নিরুৎসাহ হইলে কেন?"

ভগবানের এই কথা শুনিয়া সেই নিরুৎসাহ ভিক্ষুর হৃদয়ে আবার উৎসাহের সঞ্চার হইল। অনন্তর অপর ভিক্ষুগণ নিবেদন করিল, "ভগবন্, এই ব্যক্তি যে বর্ত্তমান জীবনে হীনবীর্য্য হইয়াছিলেন, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি; কিন্তু অতীত জীবনে ইনি একাকী বীর্য্যপ্রয়োগ করিয়া কিরূপে মরুকান্তারে গো ও মনুষ্যদিগের পানার্থ পানীয় জল সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহা আমাদের জ্ঞানের অগোচর। আপনি সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া তাহা কেবল আপনারই পরিজ্ঞাত আছে। অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগকে সেই বৃত্তান্ত বলুন।"

ভগবান বলিলেন, "বলিতেছি শুন।"

এইরূপে ভিক্ষুদিগের কৌতূহল উদ্দীপিত করিয়া তিনি নিম্নলিখিত কথায় ভাবান্তর-প্রতিচ্ছন্ন সেই অতীতবৃত্তান্ত প্রকটিত করিলেন :—]

[পুরাকালে বারাণসীনগরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়ে বোধিসত্ত্ব এক বণিকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। বোধিসত্ত্ব বয়ঃপ্রাপ্তির পর পঞ্চশত শকট লইয়া নানা স্থানে বাণিজ্য করিয়া বেড়াইতেন।)

একদা বোধিসত্ত্ব ষষ্টি যোজন বিস্তীর্ণ এক মরুকান্তারে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সেখানকার বালুকা এত সূক্ষ্ম ছিল যে, মুষ্টি মধ্যে রাখিতে চেষ্টা করিলে তাহা অঙ্গুলের ফাঁক দিয়া পড়িয়া যাইত। সূর্য্যোদয়ের পর এই বালুকারাশি প্রজ্বলিত অঙ্গারের ন্যায় উত্তপ্ত হইয়া উঠিত। তখন কাহার সাধ্য উহার উপর দিয়া যাতায়াত করে? এই ভীষণ মরুদেশ অতিক্রম করিবার সময় পথিকেরা রাত্রিকালে পথ চলিত, দিবাভাগে বিশ্রাম করিত। তাহারা জল, তেল, চাউল ও জ্বালাইবার কাঠ প্রভৃতি উপকরণ সঙ্গে লইয়া যাইত। যখন সূর্য্যাস্ত হইত, তখন তাহারা বলদগুলি খুলিয়া দিত; গাড়ীগুলি মণ্ডলাকারে রাখিয়া মধ্যভাগে সামিয়ানা খাটাইত এবং সকাল সকাল আহার শেষ করিয়া ছায়ায় থাকিয়া দিবামান কাটাইত। অনন্তর যখন সূর্য্যাস্ত হইত, তখন শীঘ্র শীঘ্র আবার আহার করিয়া ভূতল শীতল হইবামাত্র পথ চলিতে আরম্ভ করিত। নাবিকেরা যেমন সমুদ্রগমনকালে নক্ষত্র দেখিয়া দিঙ্নির্ণয় করে, এই মরুভূমিতেও সেইরূপ পথিকদিগকে নক্ষত্র দেখিয়া দিঙ্নির্দ্ধারণ করিতে হইত। তাহাদিগের সঙ্গে এক এক জন "স্থল-নিয়ামক" থাকিত। উহারা নক্ষত্র দেখিয়া গন্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিত।

বোধিসত্ত্ব যে দিন উক্ত কান্তারের উনষাট যোজন অতিক্রম করিয়া গেলেন সেই দিন মনে করিলেন, "আজকার রাত্রিতেই আমরা মরুভূমির বাহিরে গিয়া পৌঁছিব।" ইহা ভাবিয়া তিনি সায়মাশের (সায়াহ্ন ভোজনের) পর জল, কাঠ প্রভৃতি অনেক দ্রব্য অনাবশ্যক বোধে ফেলিয়া দিতে বলিলেন এবং এইরূপে বোঝা কমাইয়া গন্তব্য স্থানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যে গাড়ীখানি সর্ব্বাগ্রে চলিল, 'স্থলনিয়ামক' তাহাতে আসন গ্রহণ করিল এবং কোন্ পথে গাড়ী চালাইতে হইবে, নক্ষত্র দেখিয়া বলিয়া দিতে লাগিল।

"নিয়ামক"টী দীর্ঘকাল সুনিদ্রা ভোগ করে নাই। আজ কিয়দ্দূর চলিবার পর সে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল, কাজেই বলদেরা যখন বিপরীত মুখে চলিতে আরম্ভ করিল, তখন তাহা লক্ষ্য করিতে পারিল না। গাড়ীগুলি সারারাত এইরূপে উল্টা পথে চলিল। অনন্তর অরুণোদয়ের প্রাক্কালে নিয়ামকের নিদ্রাভঙ্গ হইলে সে নক্ষত্র দেখিয়া "গাড়ী ফিরাও," "গাড়ী ফিরাও" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু সমস্ত গাড়ী ফিরাইয়া পুনর্ব্বার শ্রেণীবদ্ধ করিতে না করিতেই সূর্য্য দেখা দিলেন; সকলে সভয়ে দেখিল, তাহারা

সায়ংকালে যে স্থান হইতে যাত্রা করিয়াছিল, ঠিক সেই স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তখন "হায়, সর্ব্বনাশ হইল; আমাদের সঙ্গে জল নাই, কাঠ নাই, আজ কি উপায়ে জীবন ধারণ করিব?" এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে তাহারা বলদগুলি খুলিয়া দিল এবং নিতান্ত হতাশ হইয়া যে যাহার গাড়ীর তলে শুইয়া পড়িল।

বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, আমি নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে ইহাদের এক প্রাণীরও জীবন রক্ষা হইবে না। ভোরের সময় ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় একবার চারিদিকে ঘুরিয়া দেখি, কোথাও জল পাওয়া যায় কি না।" অনন্তর তিনি ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে একস্থানে একগুচ্ছ কুশ দেখিতে পাইলেন। ইহাতে তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন, ঐ স্থানের নিম্নে নিশ্চয় জল আছে; নচেৎ মরুক্ষেত্রে কখনও কুশ জন্মিতে পারিত না। তখন তিনি অনুচরদিগকে কোদাল দিয়া ঐ স্থান খনন করিতে বলিলেন। তাহারা খনন করিতে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু যখন ষাট্ হাত নিম্নেও জল পাওয়া গেল না, অপিচ পাষাণে কোদাল লাগিয়া ঠং ঠং করিয়া উঠিল, তখন তাহারা নিতান্ত নিরুদ্যম হইয়া পড়িল। কিন্তু বোধিসত্ত্ব আশা ছাড়িলেন না। তিনি কূপমধ্যে অবতরণ করিয়া পাষাণের উপর কাণ পাতিলেন এবং নিম্নে জলপ্রবাহের শব্দ শুনিতে পাইলেন। তখন তিনি উপরে উঠিয়া নিজের বালক ভৃত্যকে * বলিলেন, তুমি নিরুদ্যম হইলে সকলেই মারা যাইবে। তুমি সাহসে ভর করিয়া এই বড় হাতুরিটা লইয়া নীচে নাম এবং পাথরে ঘা মার।

বালক ভৃত্যটী বিলক্ষণ উৎসাহবান্ ছিল। অন্য সকলে উদ্যমহীন হইয়াছে দেখিয়াও সে নিরুদ্যম হইল না। সে দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রভুর আদেশ পালন করিল এবং যেমন হাতুড়ি দিয়া আঘাত করিল, অমনি পাষাণ বিদীর্ণ হইয়া গেল। তখন অবরুদ্ধ জলরাশি তাল প্রমাণ স্তম্ভাকারে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল এবং সকলে মহানন্দে স্নান করিতে লাগিল। সঙ্গে যে সকল প্রয়োজনাতিরিক্ত ধূরা যোয়াল প্রভৃতি ছিল, সেইগুলি চিরিয়া তাহারা জ্বালানি কাঠের জোগাড় করিয়া লইল এবং ভাত রান্ধিয়া খাইল। শেষে গরুগুলিকে খাওয়াইয়া এবং কূপপার্শ্বে একটা ধ্বজা তুলিয়া তাহারা সন্ধ্যার পর অভীষ্ট দেশাভিমুখে যাত্রা করিল। সেখানে তাহারা দ্বিগুণ, চতুর্গুণ মূল্যে পণ্য বিক্রয় করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেল এবং আয়ুঃশেষ হইলে স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগার্থ দেহত্যাগ করিল। বোধিসত্ত্বও দানাদি পুণ্য কর্ম্মে জীবন যাপন করিয়া দেহত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্মানুরূপ ফলভোগ করিতে গেলেন।

[কথা শেষ হইলে সম্যক্ সম্বুদ্ধ স্বয়ং এই গাথা পাঠ করিলেন :—

সুগভীর কূপ করিল খনন
অক্লান্ত বণিক্‌দল,
তাই তারা পেল, ভীম মরুস্থলে
প্রচুর শীতল জল।

* মূলে "অয়কূট" এই শব্দ আছে।

সেইরূপ জেন, জ্ঞানিজন যত
বিচরেণ ভূমণ্ডলে,
হৃদয়ের শান্তি লভেন তাঁহারা
অধ্যবসায়ের বলে।

অনন্তর শাস্তা আর্য্য সত্য চতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন। তচ্ছ্রবণে সেই হীন-বীর্য্য ভিক্ষু চরমফল অর্থাৎ অর্হত্ব লাভ করিল।

সমাধান—তখন এই হীনবীর্য্য ভিক্ষু ছিল সেই বালক-ভৃত্য, যে প্রস্তর বিদীর্ণ করিয়া সঙ্গীদিগের পানার্থ জল উত্তোলন করিয়াছিল, তখন বুদ্ধ শিষ্যেরা ছিল সেই স্বার্থবাহের অনুচরগণ এবং আমি ছিলাম সেই স্বার্থবাহ।]

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ।
(নব্য ভারত)

সাময়িক প্রসঙ্গ।

আমাদের গরিব দেশে প্লেগ প্রভৃতি সংক্রামক রোগ আসিয়া যেমন দুর্দ্দিন উপস্থিত করে, তেমনই রাজনীতি বিষয়ে কতকগুলি কুমত ও ভ্রান্তি যুবকগণের অন্তরে প্রবেশ করিয়া নানারূপ দুঃখজনক দুর্ঘটনা ঘটাইতেছে। ইউরোপে ও আমেরিকাতে উচ্চ সভ্যতা ও ধনের মধ্যে থাকিয়া যে সকল লোক মানসিক উচ্চতা ও ধনের স্বচ্ছলতা লাভ করিতে পারে না তাহারা সমাজের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া ও আপনাদের উন্নতির বিষয় নিরাশ হইয়া পদস্থ লোকদিগকে হত্যা করিতে আরম্ভ করে। তাহারা সমাজ ও দেশের সকল দুঃখ কেবল উচ্চপদস্থ লোকদিগকে হত্যা করিয়া দূর করিবে ইহাই তাহাদের ভ্রান্তি। এই সকল ভাবাপন্ন লোকেরা ইউরোপে ও আমেরিকায় সময় সময় অতি দেবতুল্য লোককেও হত্যা করিয়াছে। কয়েক বৎসর হইল আমাদের দেশে এই রোগ প্রবেশ করিয়া অনেক অনিষ্ট করিয়াছে। মহিলাতে আমরা মধ্যে মধ্যে তাহার আলোচনা করিয়া থাকি, তাহার কারণ এই যে জননী ও ভগিনীগণ যদি আমাদের যুবকদের এইরূপ ভ্রান্তির সম্ভাবনা জানিয়া তাহাদিগকে সকল প্রকার দুষ্কার্য্য হইতে বিশেষত মানুষ হত্যা হইতে দূরে থাকিতে শিক্ষা দেন এবং যদি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখেন যে তাঁহাদের গৃহের যুবকগণের অন্তরে এরূপ সাংঘাতিক ভ্রান্তি স্থান না পায় তাহা হইলে এই মহা দুষ্কার্য্য আমাদের সমাজ ও দেশ হইতে অচিরে চলিয়া যাইতে পারে। ফলে চিরদিনের প্রচলিত কথা আছে যে মানুষ আপনার মাতা ও ভগ্নীর নিকট যেরূপ শিক্ষা করে সেইরূপ হয়। যে বালক ও যুবক চিরদিন গৃহে পরিবারে, সত্যের, প্রেমের, ক্ষমার ও শুদ্ধতার প্রশংসা শুনিয়াছে, যে ঈশ্বরকে জগতের প্রভু ও মঙ্গল বিধাতা বলিয়া বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছে সে কখনও নরহত্যা আদি ভয়ঙ্কর পাপে পতিত হইতে পারে না। কোন একটা অত্যাচার বা অবিচার হইল মনে করিয়াই যে হত্যা করিতে প্রস্তুত হওয়া ইহা কুশিক্ষা ও অগঠিত চরিত্রই প্রকাশ করে।

সম্প্রতি পুনরায় কলিকাতাতে এইরূপ ভীষণ হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। গত ৬ই মাঘ ১৯শে জানুয়ারী, সায়ংকালে ডিটেক্‌টিভ পুলিশের ইনস্পেক্টর নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ শোভাবাজারের নিকট পিস্তলের গুলিতে প্রাণ হারাইয়াছেন। আমরা সংবাদ পত্রে শুনিতে পাইতেছি নির্ম্মলকান্ত রায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ট্রামে চড়িয়া গিয়াছে এবং যখন তিনি ট্রাম হইতে নামিয়াছেন অমনই তাঁহার অত্যন্ত নিকটে যাইয়া গুলি করিয়াছে। গুলি মাথায় লাগিয়াছিল এজন্য মৃত্যু সম্ভবতঃ তৎক্ষণাৎ হইয়াছে। ইহার পরই এই ইন্‌স্পেক্টরের আরদালী ও অন্য লোক নির্ম্মলকে ধরিতে যায়, সে তাহাদিগের প্রতি গুলি চালায়, গুলি একটি পথের যুবকের মাথায় লাগে, যুবকটিও হাঁসপাতালে সেই রাত্রিতেই প্রাণত্যাগ করে। আরও একজনের গায় একটা গুলি লাগে। শুনিতে পাই সে লোকটি ভাল হইয়া উঠিতেছে। নির্ম্মল ক্রমাগত দৌড়াইতে থাকে ও পাহারাওয়ালা ও অন্যান্য লোক তাহার পশ্চাৎ দৌড়াইতে থাকে। ইহার মধ্যে নির্ম্মল পড়িয়া যায় ও ধরা পড়ে। এই নূতন হত্যাকাণ্ডে কলিকাতার সহর পুনরায় শিহরিয়া উঠিয়াছে। তবে কি সত্যই বিকৃত মস্তিষ্ক যুবকগণ দল বাঁধিয়া এই হত্যাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে? তবে যে আমাদের দেশের পক্ষে মহা অনিষ্ট হইবে এবং রাজদণ্ড ও সকল সভ্য জগতের ঘৃণা ও নিন্দা অপরাধী নিরপরাধী সকলের উপর আসিয়া পড়িবে। কতকগুলি যুবক নীতিধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করিয়া আপনাদিগের কল্পিত অভিপ্রায় সাধনের জন্য কি ভয়ানক পথ অবলম্বন করিয়াছে মনে করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। সহস্র সহস্র বঙ্গীয় যুবকগণ সুশিক্ষা ও সুনীতি লাভ করিয়া দেশের উন্নতি সাধন করিতে যত্ন করিতেছেন, তাহাতে দেশের মঙ্গল অবশ্য হইবে, কিন্তু ভ্রান্তমতি বিকৃত-মস্তিষ্ক যুবকগণ যাহাতে ধর্ম্মপথে ও সুনীতির রাজ্যে বিচরণ করিতে শিক্ষা করেন এজন্য দেশের সকল লোকের যত্নবান্ হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। ফলে আমাদের দেশের উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীর লোক শান্তিপ্রিয় এবং রাজভক্ত। এদেশের লোক যেমন হত্যা করে না তেমনই অন্যে হত্যা করে তাহাও সহ্য করে না, অপরাধীকে ধরিয়া দিতেও তাহারা কুণ্ঠিত নহে। যদি সরকার বাহাদুর দেশের প্রধান প্রধান লোককে আপনাদের সঙ্গে সাহায্যকারিরূপে লইয়া এই শ্রেণীর বিকৃত মস্তিষ্ক যুবকগণের মনের ভয়ানক অবস্থা দূর করিতে চেষ্টা করেন তবে আশা হয় এই পাশ্চাত্য মহা অনিষ্টকারী রোগ শীঘ্রই এদেশ হইতে চলিয়া যাইবে।

ভিক্টোরিয়া মহিলা বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এখন ইহার উন্নতিসাধনে অনেক কৃতকার্য্য হইয়াছেন এবং যে সকল অভাব এখনও আছে তাহাও শীঘ্র দূর হইবে আশা করা যায়। সরকারী সাহায্য মাসিক ৬৩০৲ টাকা মঞ্জুর হইয়াছে, কুচবিহারের রাজমাতা, কুচবিহারের মহারাজা, ময়ুরভঞ্জের মহারাণী, কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্র

চন্দ্র নন্দী, বামরার রাজা, সার্ রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সী, আই, ই, লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল ডাক্তার আর, এল, দত্ত প্রভৃতি মহাশয়গণের সাহায্য পাওয়া যাইতেছে। এখন স্কুলের মাসিক আয় ও ব্যয় তের শত টাকা। সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের বাড়ীর জন্য ৬০০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন, এখন দেশের নারীকুলহিতৈষী সদাশয় ধনিগণ আর ৬০০০০৲ টাকা দান করিলে বিদ্যালয়ের প্রধান অভাবটি চিরদিনের জন্য দূর হয়।

গত ৮ই মাঘ, বুধবার অপরাহ্নে বিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ও মহিলা-সমিতি (Ladies committee) কুচবিহারের বর্ত্তমান মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর ও মহারাণী ইন্দ্রিরা দেবীকে স্কুলগৃহে আহ্বান করিয়া সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। স্কুলের পক্ষ হইতে মহারাজা ও মহারাণীকে যে অভিনন্দন পত্র দেওয়া হইয়াছে আমরা পাঠিকাগণকে তাহা উপহার দিতেছি। মহারাজা এই অভিনন্দনের উত্তরে স্কুলের প্রতি বিশেষ প্রসন্নতা প্রকাশ করিয়া একটি বক্তৃতা করিলেন। মহারাজা ও মহারাণী তৎপর উপস্থিত মহোদয় ও মহিলাগণের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ও সামান্য জলযোগ করিয়া সকলকে সুখী করিয়া চলিয়া গেলেন।

শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের নাম আমাদের পাঠিকাগণ অনেকেই অবগত আছেন। ইনি অনেক অসহায় বালক বালিকা বিধবা প্রভৃতিকে আশ্রয় দিয়া মহা উপকার করিয়াছেন। ইঁহার জীবনের এই সেবার কার্য্যে—ইঁহার পত্নী স্বর্গীয়া কমলেকামিনী দেবী ইঁহার সঙ্গিনী এবং সহায় ছিলেন। কমলেকামিনী দেবীর মিষ্ট স্বভাব, অমায়িক ব্যবহার ও চিরপ্রসন্ন ভাব বড়ই মধুর ছিল। গৃহে যথেষ্ট বিলাসোপযোগী ধনজনসামগ্রী সত্ত্বেও ইনি বসন ভূষণ চালচলন বিষয়ে একান্ত "সাদাসিদে" ছিলেন, ইহাতে একালের একান্ত প্রয়োজনীয় উদার মনের সহিত সেকালের মোটা ভাত কাপড়ে তুষ্ট প্রকৃতি মিলিয়া ছিল। কোন কোন স্থলে আমরা দেখিতে পাই স্বামী আর্ত্তজনের সেবা করিয়া প্রেমসাধন করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু স্ত্রী আপনার স্বার্থপরতা, আলস্য বা অভিমানে মত্ত থাকিয়া তাহা করিতে দেন না। দেবী বাবু ভগবানের বিশেষ আশীর্ব্বাদরূপ এই স্ত্রীরত্নকে তাঁহার জীবনের সঙ্গিনীরূপে পাইয়া ছিলেন। কমলেকামিনী দেবী আপনার জীবনের কার্য্য সাঙ্গ করিয়া স্বামী পুত্র কন্যা প্রভৃতিকে রাখিয়া গত ৩০শে কার্ত্তিক (১৩২০ সাল) রবিবার পুরীস্থিত নীলিমা নামক নিজগৃহে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ভগবান্ তাঁহার সাধ্বী পুণ্যশীলা কন্যাকে স্বর্গে সুখে রাখুন। এই দৃষ্টান্তে নারী চরিত্র আমাদের দেশে ঘরে ঘরে গঠিত হউক, ইহাই আমরা তাঁহার চরণে প্রার্থনা করি।

TO THEIR HIGHNESSES
MAHARAJAH
JITENDRA NARAYAN BHUP
BAHADUR AND MAHARANI
INDIRA DEVI
OF COOCH BEHAR.

May it please your Highnesses,

On behalf of the Victoria Institution, we beg to offer you a hearty welcome and express onr grateful appreciation of the honour you have done us by your presence.

We recall with pride the fact that the Victoria Institution was founded by the late Keshub Chunder Sen, your illustrious grandfather, over forty years ago. The object of the Institution, as set forth in the original prospectus, was to organise a scheme of education specially adapted to the requirements of the female mind and calculated to fit woman for her position in society. This lofty ideal has always been a cherished possession with those who havet aken part part in its management.

We recall also with gratitude the generous patronage always extended to the institution by the Cooch Behar Raj, while the deep personal interest which your revered mother has always taken in it, latterly as President of the Ladies' committee has been a source of strength to the cause which the Institution represents.

We look forward with hope and confidence to continued patronage at your hands, and trust that in view of the importance of the work of the Institution in the cause of national well-being, and the increasing practical difficulties it will have to face, as time goes on, we shall have your active co-operation and sympathy.

Your Highness the Maharani has inherited an abiding interest in public good. Your culture fits you in a special measure to take an active part in all that pertains to the welfare of your sex. We take this opportunity of according you a hearty welcome to this Institution, and we look up to you for constant help and support in our endeavours to make it worthy of its ideal.

May God grant you long life, health, happiness and prosperity, and enable you to fulfil the great trust to which you have been called in the dispensation of Providence.

Members of the Executive
and the Ladies'
Committee of
The Victoria Institution.

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"
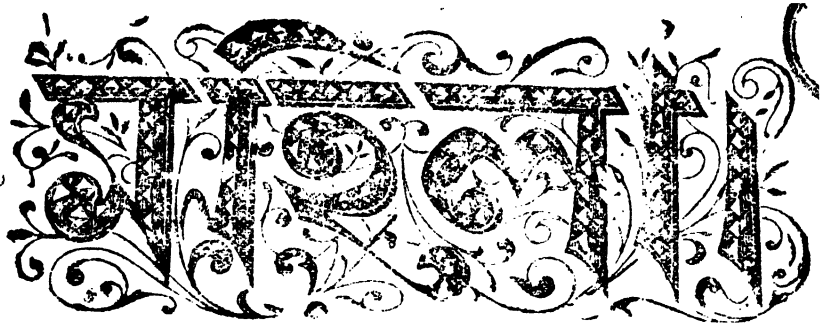
১৯শ ভাগ] মাঘ, ১৩২০। ফেব্রুয়ারী, ১৯১৪। [৭ম সংখ্যা।

প্রার্থনা।

হে দীনবন্ধু, তুমি আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা ও শেষে তুমিই আমাদের মুক্তি-দাতা। তোমার সৃষ্ট কোটি কোটি জীব-জন্ম লাভ করিয়া জীবন যাপন করিয়া চলিয়া যাইতেছে। তুমি তাহাদিগকে যতদূর অভাববোধ দিয়াছ তাহা পূর্ণ করিবার ব্যবস্থা তুমিই করিয়া দিয়াছ। ইহার মধ্যে, মানুষ তোমার এক অদ্ভুত সৃষ্টি—তাহাকে তুমি লক্ষ লক্ষ অভাব অনুভব করিতে দিয়াছ ও তাহা পূর্ণ করিবার উপায় তাহার হাতেই দিয়াছ, কিন্তু এত ধনে ধনী করিয়াও তাহাকে দীন দরিদ্র করিয়াছ। তোমার আশ্চর্য্য লীলাতে সৃষ্টির ভূষণ, পৃথিবীর রাজা, মানুষ অতি দীন, মহা অভাবগ্রস্ত—সমস্ত পৃথিবীর ধন রত্ন পাইলেও তাহার অভাব পূর্ণ হইবে না। নরনারী যে অমৃত ও আনন্দ লাভ করিতে ব্যাকুল তাহা পৃথিবীতে নাই—যে রাজ্যে সে বাস করিতে চায় সে রাজ্য স্বর্গে ভিন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহা তোমারই কৌশল যে তুমি মানুষকে কেবল পৃথিবীর জন্য সৃষ্টি কর নাই; তাই তোমারই ইঙ্গিতে তোমার চরণে প্রার্থনা করি তুমি আমাদিগকে তোমার স্বর্গ-রাজ্যের দিকে লইয়া চল। কৃপা করিয়া আমাদের দৃষ্টি খুলিয়া দেও যে, আমরা বুঝিতে পারি যে আমাদের দীনতাই মহত্ত্বের সোপান এবং ক্রমোন্নতিই তোমার অভিপ্রায়। দয়া করিয়া আমাদিগকে আমাদের দীনতা বুঝিতে দাও এবং প্রার্থনা ও প্রযত্নবলে তোমার দিকে লইয়া চল। তোমার চরণে এই প্রার্থনা করিয়া বার বার প্রণাম করি।

দরিদ্রতা।

আমাদের দেশের এক সাংঘাতিক রোগ দরিদ্রতা। সমাজের যে দিকে দৃষ্টি

করি অর্থের অভাব, অন্ন বস্ত্রের জন্য মহা চিন্তা, আমাদিগের সকল উচ্চ ভাব, আশা ও কল্পনাকে মন হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দেয়। আমাদের দেশহিতৈষিগণ দেশের লোকের দরিদ্রতা দেখিয়া সকল প্রকার উন্নতির চেষ্টা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। যে দেশের লক্ষ লক্ষ লোক উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিতে পারে না সে দেশের লোকের জ্ঞান, নীতি, পরস্পরের সেবা, ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়ে উন্নতি সাধনের কথাই উপস্থিত হইতে পারে না। ফলে আমাদের দেশের সকল ধনী ও দরিদ্র, পণ্ডিত চিন্তাশীল ব্যক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া অশিক্ষিত শ্রমজীবী ও কৃষকগণ সকলেই এক দরিদ্রতার ভারে একান্ত ভারাক্রান্ত হইয়া ত্রাহি ত্রাহি করিতেছেন। যেমন রজ্জুকে সর্প ভ্রম করিয়া মানুষ প্রাণ-ভয়ে পলায়ন করে, তেমনই এই দারিদ্র্যকে মহাশত্রু মনে করিয়া ভয়ে আমাদের বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। এ বিষয় একটু গভীররূপে আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন।

পৃথিবীতে যেমন কোটি কোটি নর নারী বাস করে, তেমনই শত সহস্র কোটি অন্যান্য জীব এখানে জীবন ধারণ করে। যত জীবের জন্ম হয় সকলেই সময়ে মরিয়া যায়, ইহাতে কিছু বলিবার বিষয় নাই। কার্ত্তিক মাসে দেওয়ালী পোকা নামে কোটি কোটি পোকা আলোক বা অগ্নি দেখিয়া উড়িয়া আসিয়া মরে, তাহাদিগের মৃত্যুতে কেহ মনে কষ্ট পায় না বা তাহাদের মৃত্যু নিবারণের উপায় কেহ উদ্ভাবন করে না। বর্ষার সময় কত জাতীয় অসংখ্য অসংখ্য পোকা জন্মে ও অচিরে মরিয়া যায় কে তাহার সন্ধান লয়? এক বৎসরে পৃথিবীতে কত জাতীয় জীবের মৃত্যু হয় তাহা কে গণনা করিতে পারে? আমরাই কত জীবের প্রাণনাশ করি তাহা কি আমরা ভাবিয়া দেখি? কিন্তু যদি দুর্ভিক্ষে বা মহামারীতে কতকগুলি মানুষ মরে আমরা স্বভাবতই অধীর হইয়া উঠি। আমরা স্বজাতির ক্লেশ দেখিতে পারি না ইহা সত্য, দেখা যায় ইতর জন্তুর মধ্যেও এরূপ আত্মীয়তাবোধ আছে।

এখন দেখিতে হয় যে যদি এমন দিন আজই উপস্থিত হয় যে আমাদের প্রতিবাসী সকলের যথেষ্ট অন্ন বস্ত্র ও গৃহের সুব্যবস্থা হয় তাহা হইলেই কি মানুষের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে? যাহার যখন ক্ষুধা বা পিপাসা হইল অমনই ইচ্ছামত অন্ন বা জল পাইল, কাহারও অন্নকষ্ট থাকিল না, তাহাতে মানুষের অবস্থা ইতর জন্তু অপেক্ষা কিছু উচ্চ হইলে, কিছুতেই ত মনে হয় না। কলিকাতার মাংসের দোকানের নিকটে কতকগুলি কুকুর থাকে, তাহারা সুস্থ সবল কোমলাঙ্গ, অধিকাংশ সময়ই শয়ন করিয়া কাটায়, তাহাদের কোনরূপ কষ্ট করিতে হয় না। অক্লেশে জীবন যাপন করিবার ইহা চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। সম্ভবতঃ সকল মানুষের অন্ন বস্ত্রের অভাব দূর হইলে জনসমাজের অবস্থা যে ঐরূপ কুকুরের অবস্থা হইতেও হীন হইবে তাহা সহজেই মনে হয়। ফলে মানুষ যদি ইতর জন্তুর মত কেবল আপনার পান ভোজনের অভাব

দূর করিয়াই সন্তুষ্ট হয় তাহা হইলে সে মানুষের জন্য অধিক কিছু ভাবিবার ও করিবার নাই। চেষ্টা বা উদ্যম উৎসাহ-হীন কোটি কোটি নরনারী পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছে ইহা মনে করিতেও বিরক্তি উপস্থিত হয়। নিশ্চয়ই এরূপ ঘৃণিত জীবন যাপন করিতে মনুষ্য পৃথিবীতে আসে নাই।

আমরা একটু গভীররূপে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারি যে মানুষ এখানে কেবল পান ভোজনের রাজ্য স্থাপন করিতে আসে নাই, প্রেমরাজ্য স্থাপন করিতে আসিয়াছে। তাহার অন্তরে আপনার শক্তিতে বিশ্বাস আছে, সৃষ্টিকর্ত্তার মঙ্গল অভিপ্রায়ে বিশ্বাস আছে, এবং জগতে যে স্বর্গরাজ্য স্থাপনের উপাদান আছে তাহাতে বিশ্বাস আছে। এই বিশ্বাস লইয়া সে আপনার চারিদিকে অবলোকন করিতেছে এবং সকল প্রকার অভাব দুঃখ কষ্ট দেখিয়া তাহা দূর করিতে আপনাকে নির্ব্বন্ধ সহকারে নিযুক্ত করিতেছে। এই অভাব দর্শন ও তাহা দূর করিবার প্রযত্নের মধ্যে দিব্য জ্ঞান ও দৈবীশক্তি লুক্কায়িত রহিয়াছে। ফলে ইহার মধ্যে বিশ্বনিয়ন্তার মহাকৌশল লুক্কায়িত রহিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে দীন দরিদ্রের অভাব দূর করিতে যে মহা আন্দোলন হইতেছে তাহা শুধু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের চেষ্টা নহে, তাহা স্বর্গের পিতা মঙ্গলময় পরমেশ্বরের মানস পুত্রের পবিত্র প্রকাশ। বর্ত্তমান সময়ের সমাজ বিজ্ঞান নূতন প্রকারের ধর্ম্মশাস্ত্র। কোন প্রদেশের দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন বা মহামারী ঘটিত ক্লেশ দূর করিতে যে যত্ন করা হয় তাহা প্রেমরাজ্য স্থাপনের, চেষ্টা মাত্র। যাঁহারা দীনজনকে উদরের অন্ন বা পরিধানের বস্ত্র দান করিয়াই প্রেম সাধনের উদ্‌যাপন করিলেন তাঁহারা প্রেমের মূল তত্ত্বই অবগত হইলেন না। যদি দান করিয়া মানুষের আত্মাকে অসাড় মৃতবৎ করিয়া রাখা হয় তাহা হইলে তাহার প্রতি সদয় ব্যবহার না করিয়া দুর্ব্ব্যবহার করা হইল। যখন কোন নর বা নারী হীন অবস্থায় পড়িয়া আপনার উচ্চবংশ বা দেবাংশ ভুলিয়া যায় তখনই সে সত্য সত্য দুরবস্থায় পতিত হয়। যাঁহারা দারিদ্রতা দূর করিতে অর্থ ব্যয় করেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রথম এই বিষয়টির গুরুত্ব অনুভব করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন। দীন দরিদ্র সকল মানুষ স্বর্গের রাজার সন্তান, তাহার ভিতরে দেবত্ব লুকাইয়া আছে, তাহার অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে তাহার মনকে আগে জাগাইতে হইবে। তাহার ভিতর হইতে নূতন মানুষ বাহির হইলে সে সাহায্যকারীর সহকারী হইয়া কার্য্য করিবে—একগুণ কার্য্য দশগুণ হইবে। এই ভাবে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে বর্ত্তমান সময়ে জনসমাজের যে সকল অঙ্গের হীন অবস্থা দেখিয়া আমরা দুঃখ করি তাহা হইতে অত্যন্ত অধিক অংশে মহা দরিদ্রতা রহিয়াছে।

আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী উদরান্নের অভাবে বারমাস ক্লেশ পান। তাঁহারা ধনিগণের নিকট অন্ন বস্ত্র ভিক্ষা

আর কিছু প্রার্থনা করিতেও জানেন না, তাহা আমরা বিলক্ষণ অবগত আছি। ইহাও আমরা সকলেই জানি যে যতক্ষণ শরীরের অভাব দূর না হইবে---যতক্ষণ ক্ষুধাতে কাতর—অন্নের সংস্থানের অভাবে মানুষ অন্ধকার দেখিতেছে, তখন তাহার নিকট মিতব্যয়িতা, নীতি বা ধর্ম্ম ইত্যাদির কোন অর্থ নাই। সর্ব্বপ্রথমে তাহার উপস্থিত অভাব দূর কর—তাহাকে ভবিষ্যতের বিষয়ে কিছু আশা দেও—তাহাকে চিন্তা ও কার্য্যের একটু স্বাধীনতা দেও—তাহার পর যদি তোমার জীবনের নীতির শ্রেষ্ঠতা ও ধর্ম্মের সুখশান্তির আস্বাদন তাহার অন্তরে মুদ্রিত করিয়া দিতে পার, তখন সে হয়ত বুঝিতে আরম্ভ করিবে যে সে কেবল অন্নজল গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হইবার জীব নয়, তাহার উচ্চ জীবনে অধিকার আছে। আমাদের দেশের চারিদিকে যে ভয়ানক দারিদ্র্য, অজ্ঞানতা ও দুর্নীতি রহিয়াছে তাহা দূর করিতে আজকাল অনেকে যত্নবান হইতেছেন। বিপদের সময় সাহায্য করিয়া মানুষকে রক্ষা করিতে অনেকে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন ইহা অত্যন্ত শুভ লক্ষণ, কিন্তু আমরা সকলকে মনে করাইয়া দিতে ইচ্ছা করি যে, ইতর জন্তুকে তাহার আহারীয় সামগ্রী দিয়া উপযুক্তরূপ রক্ষা করা যায়, কিন্তু মানুষকে শুধু অন্ন বস্ত্র দান করিয়া মানুষ করা যায় না—অর্থাৎ তাহার মনুষ্যত্ব রক্ষা করা যায় না।

দেশে দারিদ্র্য আছে ইহা অত্যন্ত সত্য এবং এই দরিদ্রতা দূর করিতে যত্ন করাই এখনকার সময়ের ধর্ম্মকার্য্য। কিন্তু দরিদ্রতা দূর করিতে হইলে যে উপায়ে হউক মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্ব তাহাকে দেখাইয়া দিতে হইবে।

ঢাকার মহিলাবিদ্যালয়।

বাংলাদেশের নূতন ব্যবস্থার একটী ফল ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয়। কতকটা পূর্ব্ববঙ্গবাসীর মনস্তুষ্টির জন্য, কতকটা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ করিবার জন্য এবং কতকটা দেশের শিক্ষা অধিকতর করায়ত্ত করিবার জন্য আমাদের শাসনকর্ত্তাগণ ঢাকায় একটী নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ করিয়াছেন। ইহাতে অবশ্য বিশেষ কোনও ক্ষতি নাই, কারণ ইহাতে পূর্ব্ববঙ্গে শিক্ষার প্রসারণ সহজ হইবে, বিশেষতঃ উচ্চশিক্ষার একটী উন্নত আদর্শ নিকটে থাকার যে উপকারিতা তাহাতে দেশের কল্যাণ হইবে সন্দেহ নাই। অধিকন্তু নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রণালী এ দেশের পক্ষে কিছু অভিনব হওয়াতে ইহা স্থাপনের একটী অন্ততঃ যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে।

প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রিম বিবরণী পাঠ করিলে একটী বিশেষ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। স্ত্রীশিক্ষা লইয়া এদেশে নানা প্রকার আন্দোলন অনেক দিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু ইহার প্রকৃত আদর্শ বিষয়ে এখনও যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে। এ সকল মতভেদ সত্ত্বেও ক্রমে ক্রমে স্ত্রীশিক্ষা যে বঙ্গদেশে প্রসারিত হইতেছে ইহা নিশ্চয়

করিয়া বলা যাইতে পারে। বালিকা-দিগকে একেবারে নিরক্ষর করিয়া রাখিবার পক্ষপাতী এখন কেহ আছেন কি না বলিতে পারা যায় না। ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দিবার বিষয়ে সকলেই একমত, কেবল মাত্রা এবং প্রণালী লইয়া মতভেদ; অর্থাৎ কেহ অধিক মাত্রায় শিক্ষা দিতে চান, কেহ বা অল্পেতেই সন্তুষ্ট, এবং কেহ বা কোনও একটী বিশেষ প্রণালী উৎকৃষ্ট মনে করেন, অন্যে তাহা মনে করেন না। এ সকল মতভেদের কারণ আদর্শের পার্থক্য। নারীর জীবন, কর্ত্তব্য এবং সমাজে স্থান বিষয়ে যেখানে মতভেদ সেইখানেই নারীশিক্ষার আদর্শে মতভেদ হইবে।

এ বিষয়ে সাধারণতঃ দেখা যায় যে দুই প্রকার মতের প্রচলন আছে। এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা বলেন যে নারীর জীবনের উদ্দেশ্য পুরুষের জীবন হইতে পৃথক, সুতরাং শিক্ষাপ্রণালীও পৃথক হওয়া প্রয়োজন, আর এক শ্রেণীর লোক বলেন যে সম্পূর্ণ পৃথক নয় সুতরাং শিক্ষাপ্রণালী বিভিন্ন প্রকারের হওয়ার কোনও প্রয়োজন নাই। নিম্নশিক্ষা লইয়া বিশেষ কোনও অসুবিধা নাই, কারণ ইহাতে পার্থক্য সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন কাহারও বোধ হয় না, কিন্তু উচ্চশিক্ষা বিষয়ে এই সকল প্রশ্ন আসে। স্ত্রীলোকদিগের উচ্চশিক্ষা বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও বিশ্ববিদ্যালয় ভিন্ন সে শিক্ষার আর কোনও উপায় নাই বলিয়া সকলকেই ঐ পথে যাইতে হইতেছে। ভারতের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এ পর্য্যন্ত কেবল একই প্রকার শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে, বালিকাদিগের জন্য কোনও পৃথক পদ্ধতি আরম্ভ করিবার কোনও চেষ্টা করা হয় নাই। এই বিষয়ে দেখা যাইতেছে যে ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয় নূতন পথ প্রদর্শন করিতেছেন, এবং ইহাই বিশেষ দ্রষ্টব্য বলিয়া আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। কি আদর্শে এবং কি প্রণালীতে এই নূতন মহিলাবিদ্যালয় পরিচালিত হইবে সেই বিষয়ে কিছু বলিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

প্রথমতঃ, একটী কথা আজকাল ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হইতেছে যে স্ত্রীলোক এবং পুরুষের শিক্ষার আদর্শ এবং প্রণালী বিভিন্ন করিবার মতই সকলে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কেবল এদেশে নয়, ইউরোপেও এখন এই দিকেই স্রোত চলিয়াছে। আমাদের দেশেও দেখা যায় যে গভর্ণমেণ্ট স্পষ্টাক্ষরে এই মত সমর্থন করিতেছেন। সম্প্রতি শিক্ষাবিষয়ে গভর্ণমেণ্ট একটী ক্ষুদ্র পুস্তিকা বাহির করিয়াছেন, তাহাতে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে অন্যান্য কথার সহিত এই কথা আছে;—

"(ক) সামাজিক জীবনে বালিকাগণ যে স্থান অধিকার করিবে সেই স্থানের উপযোগী শিক্ষা তাহাদিগকে দেওয়া উচিত।

(খ) বালিকাদিগের শিক্ষাপ্রণালী কেবল বালকদিগের উপযুক্ত শিক্ষাপ্রণালীর অনুকরণ করিবে না এবং পরীক্ষা বহুল হইবে না।" *

* (a) The education of girls

স্ত্রীশিক্ষার যে আদর্শ গভর্ণমেণ্টের চক্ষে উচিত মনে হইয়াছে তাহা এই ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গস্বরূপ নারীদিগের জন্য যে উচ্চবিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে তাহাতেও দেখা যায় যে মূলে গভর্ণমেণ্টের মতের সহিত ঐক্য আছে। ঢাকা মহিলা-বিদ্যালয়ের আদর্শ বিষয়ে যাহা বলা হইয়াছে তাহা আমরা উদ্ধৃত করিলাম ;—

"নারীশিক্ষাসমিতি ইচ্ছা করেন যে ঢাকায় মহিলাদিগের জন্য এমন একটী কলেজ করা হউক যাহাতে অন্যান্য কলেজ হইতে ভিন্ন অভিনব প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইবে। সমিতি মনে করেন যে নারীদিগের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ এরূপ হওয়া উচিত যে ছাত্রীগণ নিজসম্বন্ধীয় এবং জীবনের কর্ত্তব্যসম্বন্ধীয় জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, যে সকল বিষয় তাঁহাদের অবসর সময় গুলিকে লাভজনক ও আনন্দদায়ক করিতে পারিবে সেই সকল বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়া, এবং তাহাদের স্বামী, পুত্র এবং ভ্রাতাদিগের কাজকর্ম্ম ব্যবসায় বাণিজ্যাদি বুঝিতে সক্ষম হইয়া সমাজের উপযুক্ত অঙ্গস্বরূপ স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইবে।"

ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে যদিও এপর্য্যন্ত উচ্চশিক্ষা বিষয়ে পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের জন্য বিভিন্ন পথ অবলম্বন করা হয় নাই এখন ক্রমশঃ তাহা হইবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাতে বালিকাদিগের জন্য বিশেষ যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে তাহাতে গৃহনীতি, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, শুশ্রূষাবিদ্যা ও সন্তানশিক্ষা, এই কয়েকটী নূতন বিষয় পাঠ্যের মধ্যে লওয়া হইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য বিধিবিষয়ে ছাত্রদিগের জন্য যে সকল নিয়ম করা হইয়াছে ছাত্রীদিগের পক্ষেও সেই নিয়মই থাকিবে, যথা কলেজে অধ্যয়নকাল; পাঠ্য-বিষয়ের সংখ্যা ইত্যাদি। মহিলাবিদ্যালয়ে ইণ্টারমিডিয়েট্ পর্য্যন্ত বিজ্ঞান এবং বি, এ, পর্য্যন্ত অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে। ইহার অধিক যাঁহারা শিক্ষা করিতে চান তাঁহাদিগকে ছাত্রদের সহিত পড়িতে হইবে।

ম্যাট্রিকুলেশন উত্তীর্ণ হইয়া ছাত্রীগণ কলেজে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে পাঁচটী পাঠ্য স্থির করিতে পারিবেন :—

১। ইংরাজী।

২। বাঙ্গলা (কিম্বা উর্দ্দু)।

৩। গৃহসম্বন্ধীয়।

৪, ৫। ইহাদের মধ্যে যে কোনও দুইটী বিষয় :—(ক) ইতিহাস, (খ) অঙ্ক, (গ) সংস্কৃত, (ঘ) পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা কিম্বা প্রাণিবিদ্যা।

এই পাঁচটী বিষয় দুই বৎসর শিক্ষা করিতে হইবে, এবং তাহার পর পরীক্ষা

should be practical with reference to the position which they will fill in social life ;

(b) It should not seek to imitate the education suitable for boys nor should it be dominated by examinations.

—Indian Educational Policy, 1913.

দিতে হইবে। যাঁহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন এবং আর পাঠ করিতে ইচ্ছুক হইবেন না তাঁহাদিগকে একটী ডিপ্লোমা দেওয়া হইবে, তাহার নাম Women' Junior Diploma।

উপরে যে কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার মধ্যে তৃতীয় বিষয়টীর বিশেষ বিবরণ এস্থলে দেওয়া প্রয়োজনীয়, তাহা হইলেই বুঝা যাইবে যে ঢাকা মহিলাবিদ্যালয়ের বিশেষত্ব কি। বলা বাহুল্য যে গৃহসম্বন্ধীয় বিষয়ে পাঠ্য নির্ণয় করা এবং ঐ পাঠ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার অঙ্গীভূত করা এদেশের পক্ষে একটী সম্পূর্ণ নূতন ব্যাপার। গৃহসম্বন্ধীয় বিষয়গুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, (ক) গার্হস্থ্য স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, (খ) সংসার পরিচালন। স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় শিক্ষা নিম্নলিখিতভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে :—

১ম—শরীর-বিজ্ঞান বিষয়ে আঠারটী পাঠ।

২য়—স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে ছয়টী;

৩য়—বাসগৃহ বিষয়ে তিনটী;

৪র্থ—রোগীর শুশ্রূষা সম্বন্ধে ছয়টী;

৫ম—সন্তানপালন সম্বন্ধে ছয়টী পাঠ।

৪র্থ এবং ৫মের বিবরণ আরও পরিষ্কার ভাবে দেওয়া গেল :—

৪র্থ—(ক) রোগীর গৃহ।

(খ) শুশ্রূষাকারিণী।

(গ) শুশ্রূষার বিস্তৃত বিবরণ।

(ঘ) সাধারণ রোগসমূহের নিবারণ এবং চিকিৎসা।

(চ) দৈব দুর্ঘটনা ইত্যাদি।

(ছ) কঠিন পীড়া।

৫ম—ক, নবজাত শিশুর আহার, স্নান, পরিধান ও তত্ত্বাবধান।

(খ) অপেক্ষাকৃত বয়স্ক শিশুর আহার ইত্যাদি।

(গ) বয়স্ক শিশুর সাধারণ তত্ত্বাবধান।

(ঘ) নবজাত শিশুর পীড়া।

(চ) অপেক্ষাকৃত বয়স্ক শিশুর পীড়া।

(ছ) বয়স্ক শিশুর পীড়া।

উপরে যে বিবরণ দেওয়া হইল ইহাতে নারীদিগের শিক্ষাসম্বন্ধে স্রোত কোন দিকে চলিয়াছে ইহা বেশ বুঝা যায়। এখন সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে গার্হস্থ্য-জীবনের সহিত সম্পর্করহিত যে উচ্চশিক্ষা এতদিন কন্যাদিগকে দেওয়া হইয়াছে তাহা নারীজীবনের অনুপযুক্ত; সে শিক্ষা তাহাদিগকে উপযুক্ততর মাতা এবং সুগৃহিণী করে না। সেইজন্যই শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া এই নূতন পন্থা অবলম্বনের চেষ্টা হইতেছে। রোগীর শুশ্রূষা এবং সন্তানের লালন পালন যে গৃহকর্ত্রীর প্রধান কর্ত্তব্য এ কথা কেহ অস্বীকার করিবেন না, এবং সে বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যে অতি সুবিবেচনার কাজ ইহাও সকলে বুঝিতেছেন। কিন্তু ইহাই কেবল গৃহকর্ত্রীর কর্ত্তব্যের সীমা নয়, সংসার পরিচালনের ভারও তাঁহার উপরে; রন্ধন, সংসারের আয় ব্যয় ইত্যাদি বিষয়েও তাঁহার শিক্ষা প্রয়োজন। এই সকল বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা

গৃহসম্বন্ধীয় পাঠ্যের দ্বিতীয় অংশের বিবরণ দিলে বুঝা যাইবে।

(খ) সংসার পরিচালন।

(১) গৃহনীতি সম্বন্ধীয় প্রাথমিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে বারটী পাঠ।

(২) দেশীয় খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষার জন্য ১২টী পাঠ। ইহাতে ছাত্রীগণ নিজহস্তে সমস্ত করিবে।

(৩) বিদেশীয় নিরামিষ রন্ধন বিষয়ে ১২টী পাঠ।

(৪) বিদেশীয় আমিষ রন্ধন বিষয়ে ১২টী পাঠ।

বাঙ্গালী ছাত্রীগণ (২ এবং (৩) সংখ্যক পাঠ লইতে পারেন। সপ্তাহে অন্ততঃ একবার রন্ধনাদি করিতে হইবে। রন্ধনশালা দুইটী করা যাইতে পারে, একটীতে দেশীয় প্রথায় রন্ধনের ব্যবস্থা এবং সরঞ্জাম থাকিবে, অন্যটীতে বিদেশীয় থাকিবে। তরকারী কুটা, ধোয়া ইত্যাদি রন্ধন সম্পর্কিত সমস্ত কাজ ছাত্রীগণকে নিজহস্তে করিতে হইবে।

(৫) দ্রব্যাদি ক্রয়ের "হাতে কলমে" শিক্ষা দেওয়া হইবে। সকল আহার্য্য দ্রব্যের মূল্য এবং গুণাগুণ শিক্ষা করিতে হইবে।

(৬) গৃহের হিসাব পত্র—এবিষয়ে "হাতে কলমে" শিক্ষা দেওয়া হইবে। প্রত্যেক ছাত্রীকে নিজ আয় ব্যয়ের হিসাব শিখান হইবে এবং রাখিতে হইবে। ছাত্রী-নিবাসের হিসাবপত্রের ভার পালাক্রমে ছাত্রীগণকে দেওয়া যাইতে পারে।

(৭) কাপড় কাচিবার একটী ছোট কল রাখিয়া অল্লায়াসসাধ্য কাজ শিখান হইবে।

এতদ্ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যের অঙ্গীভূত না হইলেও প্রতি ছাত্রীকে ছাত্রীনিবাসের বিশেষ বিশেষ কার্য্যের ভার দিয়া গৃহকর্ম্ম শিখান হইবে। পূর্ব্বে যে সকল পাঠের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা-দের প্রত্যেকটীর জন্য "নম্বর" দেওয়া হইবে, এবং যাহাতে সকল গৃহকর্ম্ম খুব উৎকৃষ্ট হয় তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

সংসার পরিচালন সম্বন্ধে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করা হইল ইহাতেই দেখা যায় যে কন্যাদিগকে সুগৃহিণী হইতে হইবে একথা নূতন বিশ্ববিদ্যালয় ভুলিয়া যায় নাই। একথা বলা যাইতে পারে না যে এই ব্যবস্থা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে, এবং কার্য্যতঃ কতটা সফল হইবে তাহাও ক্রমে জানা যাইবে, কিন্তু এই নূতন পন্থা অবলম্বন যে একটী অতি শুভলক্ষণ তাহা না মনে করিয়া আমরা থাকিতে পারিতেছি না। এ পর্য্যন্ত যে বিবরণ দেওয়া হইল ইহা কলেজে অধ্যয়নের প্রথম দুই বৎসরে শিক্ষণীয়, কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে এত অধিক শিখান অত্যন্ত অসম্পূর্ণ হইবে মনে হয়। যেরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে ব্যবস্থাকারগণ ধরিয়া লইয়াছেন যে অধিকাংশ ছাত্রী ইহার অধিক অগ্রসর হইবেন না, এবং কার্য্যতঃ ইহা সত্য। এইজন্যই এত অধিক বিষয় অল্পসময়ের মধ্যে শিখাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই অসুবিধা একটী উপায়ে দূর হইতে

পারে, তাহা এই, যে এই সকল পাঠ্যের কতক সহজ অংশ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার শিক্ষণীয় করিলে সময় অধিক পাওয়া যায় এবং ছাত্রীগণ ভাল করিয়া সমস্ত শিক্ষা করিতে পারে। ক্রমে এরূপ ব্যবস্থা হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নহে।

সে যাহা হউক, ইহার পরে আরও উচ্চশ্রেণীর ছাত্রীগণের জন্য যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহার কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইহার বিশেষ দ্রষ্টব্য শিশুজীবন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা। ইহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে :—

(ক) শিশুর শারীরিক বিকাশ এবং সুস্থতায় ও রোগে শিশুর পরিচর্য্যা।

(খ) শিশুর মানসিক এবং নৈতিক বৃত্তিসমূহের বিকাশ ; প্রকৃতিনিহিত বৃত্তি এবং অভ্যাস ; মনের ভাব প্রকাশের নানা আকার, স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক শিশুর লক্ষণ।

(গ) বালকের শিক্ষা।

ম্যাট্রিকুলেশনের পর দুই বৎসর গৃহকর্ম্মের সকল বিষয় সাধারণতঃ শিক্ষা করিয়া, ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যাহারা বি, এ, পড়িতে ইচ্ছা করিবে তাহাদের শিশুজীবন বিষয়ে বিশেষ ভাবে শিক্ষা দেওয়ার এই ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহা স্বাভাবিক এবং উচ্চশিক্ষার উপযোগী ব্যবস্থা।

আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আমরা এই প্রবন্ধ শেষ করিব। চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নে যাহাতে নারীগণ আরও অধিক অগ্রসর হন ইহার প্রতি গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। আমাদের পাঠিকাগণ বোধ হয় জানেন যে দিল্লী নগরীতে স্ত্রীলোকদিগকে চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য একটী কলেজ খোলা হইবে। ইহাতে যে দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হইবে সন্দেহ নাই। যাহাতে বঙ্গদেশীয়া স্ত্রীলোকেরাও ইচ্ছা করিলে কলিকাতার কিংবা দিল্লীর মেডিকেল কলেজে পাঠ করিতে পারেন, সে জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাবিদ্যা প্রার্থেচ্ছু ছাত্রীগণের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই ছাত্রীগণ ইণ্টারমিডিয়েটের পূর্ব্বোল্লিখিত সাধারণ ছাত্রীগণের পাঠ্য বিষয় সমূহের পরিবর্ত্তে কেবল ইংরাজি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা এবং প্রাণীবিদ্যা এই পাঁচটি বিষয়ে শিক্ষালাভ করিবেন। এই বিষয়গুলি পড়িলে তাঁহারা মেডিকেল কলেজে যাইবার উপযুক্ত হইবেন।

সর্ব্বশেষে ছাত্রীগণের ব্যায়ামের যে আয়োজন করা হইবে তাহাও বলা উচিত। ছাত্রীগণ কলেজে ভুক্ত হইলেই তাহাদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে, এবং প্রত্যেককে স্বাস্থ্যানুরূপ ব্যায়াম করিতে দেওয়া হইবে। সপ্তাহে অন্তত তিন ঘণ্টা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সকলের ব্যায়াম করিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন টেনিস্, ব্যাডমিণ্টন ইত্যাদি ক্রীড়ারও আয়োজন থাকিবে। যে সকল ছাত্রীর স্বাস্থ্য ভাল দেখা যাইবে না তাহাদিগকে উপযুক্ত চিকিৎসাধীনে রাখিবার ব্যবস্থা কলেজ হইতেই করা হইবে। এই সমস্ত নিয়ম

দেখিয়াই সকলে বুঝিতে পারিতেছেন যে সাধারণতঃ সকল ছাত্রীকেই কলেজের ছাত্রীনিবাসে থাকিতে হইবে। এই ছাত্রীনিবাসের অতি সুচারু আয়োজন হইয়াছে। প্রথমতঃ ৪০ জন ছাত্রীর স্থান করা হইবে। বলা বাহুল্য যে কলেজের সমস্ত শিক্ষাই শিক্ষয়িত্রীগণ দিবেন।

সংক্ষিপ্ত ভাবে এই অভিনব উচ্চ-বিদ্যালয়ের বিবরণ আমরা পাঠিকাদিগকে জানাইলাম। এ কথা আমরা বলিতে পারি না যে আমরা ঠিক যাহা চাই তাহা ইহাতে আছে, কিন্তু এ কথাও স্বীকার করা উচিত যে ইহাও আশাতীত হইয়াছে। কতদিনে এই বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইবে তাহা এখনও সঠিক বলা যায় না, কিন্তু ইহার পরিচালন এবং ফলাফল জানিবার জন্য অনেকেই যে উৎসুক থাকিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্বর্গীয় আত্মার উদ্দেশে।

সে তো আর আসিবেনা ফিরে,
কেন কর হাহাকার ভাস আঁখি নীরে ?
যে পেয়েছে অমৃতের বারেক আস্বাদ,
তার কি এ ধরা মাঝে আছে কোন সাধ ?
ধরণীর তুচ্ছ সুখ দুদিনের তরে,
সে বুঝেছে তত্ত্ব এর বড় ভাল করে ;
তাই চলে গেছে ছাড়ি মায়ার বন্ধন,
দেবের নির্ম্মাল্য করে দেব আরাধন।
স্নেহ ভালবাসা সে তো কিছু ত্যেজে নাই,
আসক্তি-বিহীন শুধু দেখিবারে পাই ;
যদি সব ভুলে যেতো, তাহলে কি আর—
বিপুল বেদনা করে অন্তরে ঝঙ্কার ?
স্নেহ প্রীতি ভালবাসা সব বুক ভরে—
অনিমেষে চেয়ে আছে প্রিয়জন পরে ;
তোমরা এ লোকে আছ ও ধারে সে আছে,
উভয়ের যোগ যে গো অনন্তের মাঝে।
সে পেয়েছে দিব্য দেহ চিন্ময় আকার,
হেথায় আসিতে তার নাহি অধিকার ;
আশা করে থাক তুমি যাইতে ওধারে—
চির শান্তিময় ওই অমৃতের দ্বারে।
পাইবে সেখানে গিয়ে প্রাণের সান্ত্বনা,
ঘুচে যাবে চির তরে সকল যাতনা ;
পাবে দেখা পাবে তার, আর পাবে কাছে,
মহাযোগে মগ্ন হয়ে অনন্তের মাঝে॥

শ্রীমতী কৃপাদেবী।

সেবিকা এবং তাঁহার স্বাস্থ্য।

'Indian Home Nursing'
অবলম্বনে লিখিত।

একটি প্রচলিত কথা আছে যে, প্রত্যেক নারী সেবিকারূপে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রত্যেক নারীকে কোনও না কোনও সময় পীড়িত ব্যক্তির সেবা করিতে হয়, সেজন্য প্রত্যেকের বিশেষতঃ ভারতবর্ষের নারীদের কিছু কিছু সেবার বিষয়ে শিক্ষা করা উচিত।

এই বিষয়ে শিক্ষা করিলে রোগীর কষ্টের লাঘব হয় এবং শীঘ্র রোগ হইতে মুক্ত হয়। ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, নারী সেবাতে যতই পটু হউন না কেন

তিনি সকল সময়ই ডাক্তারদের সাহায্যকারিণী এবং যতক্ষণ না ডাক্তার আসেন ততক্ষণ তিনি নিজের ইচ্ছামত কাজ করিতে পারেন না।

সেবিকা—যিনি ডাক্তার এবং রোগীর সাহায্য ও সেবা করেন, তিনি।

(১) ডাক্তারের অনুপস্থিত কালে যাহা ঘটে তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ দিতে সক্ষম হইবেন।

(২) সাদাসিদে dressings প্রস্তুত রাখিবেন এবং তাহা কাজে লাগাইবেন।

(৩) কি করিলে রোগের প্রতীকার হইবে তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

(৪) রুগ্ন ব্যক্তির পথ্যাবিষয়ের সাদাসিদে জিনিষ প্রস্তুত করিবেন।

(৫) ডাক্তার যাহা আদেশ করেন তাহা মনে রাখিবেন এবং অনুরাগ সহকারে তাহা পালন করিবেন।

রোগী যে রোগে ভুগিতেছে ডাক্তার তাহাকে সেই অবস্থায় কি ভাবে চিকিৎসা করিবেন এবং রোগ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ মতামত, যিনি সেবিকারূপে সেখানে উপস্থিত থাকিবেন, অনেক সময়ে তাঁহাকে না বলিতেও পারেন। একবার তিনি যদি ডাক্তারের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে সক্ষম হয়েন এবং বিশ্বস্ততা দেখাইতে পারেন তাহা হইলে ডাক্তার তাঁহার সাহায্য পাইতে ইচ্ছুক হইবেন এবং তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করিবেন।

যাঁহারা সত্য সত্য ভাল সেবিকা হইবার উপযুক্ত, তাঁহাদের ভাল মেজাজ, আনন্দচিত্ত, অসীম ধৈর্য্য এবং অবিশ্রান্ত উদ্যম থাকা চাই।

রোগীর শারীরিক এবং সময় সময় মানসিক বল, রোগের সময় শান্তিতে থাকা এবং সময় সময় তাহা হইতে মুক্ত হওয়া সেবিকার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে।

রোগীর শারীরিক এবং মানসিক কষ্ট সেবিকার যত্নে দূর হইতে পারে এবং সময় সময় আবার তাঁহার বদ্‌মেজাজ এবং অযত্নে রোগ বাড়িতেও পারে।

এইখানে সেবিকার কাজ সংক্ষেপে বলা হইতেছে ঃ—

(১) ডাক্তারের আদেশ পালন করা।

(২) তিনি যখন রোগীর ঘরে থাকিবেন তখন রোগীর অবস্থা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিবেন, যাহাতে ডাক্তারকে রোগীর অবস্থার কথা সম্পূর্ণ ঠিক করিয়া বলিতে সক্ষম হয়েন।

(৩) রোগীর অভাব পূর্ণ করা।

(৪) তাঁহার যত্ন এবং স্নেহশীলতা দ্বারা রোগীকে সন্তুষ্ট রাখা।

যে সেবিকারা ডাক্তারদের অনুগত এবং যিনি রোগ সম্বন্ধে রোগীর সহিত কথা না বলিয়া (কারণ রোগীকে তার রোগের কথা বলিলে অনেক সময়ে রোগী ভয় পায়) ডাক্তারের সহিত বলেন, তাঁহাদেরই নিযুক্ত করিতে ডাক্তারেরা বিশেষ যত্নবান্ হয়েন।

যে সেবিকা ডাক্তারের অসাক্ষাতে তাঁহার বিষয়ে আলোচনা করেন বা রোগ সম্বন্ধে রোগীর সহিত কথা বলেন, তাঁহাকে কার্য্যে পুনরায় নিযুক্ত করা হয় না।

সেবা করিতে হইলে ছয়টি গুণের

প্রয়োজন। অধিকাংশ নারীদের সেইগুলি থাকা কর্ত্তব্য। এইগুলি ভাল করিয়া শিক্ষা করিলে ভাল সেবিকা হওয়া যায়। এইগুলি যাঁর নাই তাঁর উপাধি কোনও কাজে আইসে না।

উপস্থিত বুদ্ধি।

হঠাৎ কোনও ঘটনা ঘটিলে তখন কি করিতে হইবে তাহা এইটির সাহায্যে করা যায়।

নম্রতা।

যে সেবিকার নম্রতা আছে তিনি এমন কোনও কথা বলেন না যাহাতে রোগীর মনে আঘাত লাগে এবং যখন তিনি কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন তখন খুব বুদ্ধিমতি এবং বিবেচকের মত তাহা সম্পন্ন করেন।

ভবিষ্যদ্ভাবনা।

রোগী তাহার অভাবের কথা জানাবার আগে এবং কোনও জিনিষ চাইবার আগে তাহা পূর্ণ করেন।

স্মরণশক্তি।

সেবা করিতে হইলে স্মরণশক্তি থাকা নিতান্ত প্রয়োজন, কিন্তু যতই কাহারও স্মরণশক্তি তীক্ষ্ণ হউক না কেন কেহ ইহার উপরে নির্ভর করিয়া থাকিবেন না। ডাক্তারের সমস্ত আদেশ লিখিয়া রাখিবেন এবং সেই মত কাজ করিবেন।

পর্য্যবেক্ষণ।

যিনি সেবিকারূপে রোগীর কাছে থাকিবেন, তিনি রোগীর অবস্থা কোন সময়ে কি ভাবে ছিল সেইটা লিখিয়া রাখিবেন; কারণ অনেক সময়ে ডাক্তার, তাঁহার অনুপস্থিত কালে রোগী কতক্ষণ ঘুমাইয়াছে, কতক্ষণ তার অবস্থা ভাল ছিল ইত্যাদি এই সব জানিতে চাহেন।

যাথার্থ্য।

সেবিকা রোগ সম্বন্ধে ডাক্তারের কাছে যাহা বর্ণনা করিবেন তাহা যেন সম্পূর্ণ ভ্রম-শূন্য হয়; কারণ অনেক সময়ে সেবিকাদের বর্ণনার উপরে রোগের চিকিৎসা এবং রোগীর জীবন নির্ভর করে। তিনি এমন একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন যাহা তিনি ডাক্তারকে দেখাইতে পারেন। তিনি ঘরের ভিতর নিঃশব্দে হাঁটিবেন, কিন্তু এমন ভাবে হাঁটিবেন না যাহাতে রোগী চম্‌কাইয়া উঠে।

সেবিকার স্বাস্থ্য।

সেবিকা তাঁহার স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, কারণ তাঁহার এবং রোগীর পক্ষে ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

শারীরিক এবং মানসিক পরিশ্রম এত বেশী হইয়া পড়ে যে তার জন্য অনেক সময়ে কষ্টভোগ করিতে হয়। অনেক সময়ে সেবিকাদের এমন এমন কাজ করিতে হয়, যে কাজ তাঁহাদের পক্ষে সঙ্গত নহে এবং সেজন্য সময় সময় তাঁহাদের শরীর ভাঙ্গিয়া যাইবার খুব ভয় থাকে।

তিনি যখন নিজের কোনও নিকটস্থ আত্মীয়ের সেবা করেন, তখন রোগী ভাল হইয়া যাইবার পরও অনেক সপ্তাহ অবধি তাঁহার শরীর খারাপ থাকে। কি করিলে তাঁহার শরীর ভাল থাকিবে ঐ বিষয়ে জানা ও মনে রাখা প্রয়োজন।

প্রতিদিন নিয়মিতরূপে খোলা জায়গায় ব্যায়াম করা নিতান্ত প্রয়োজন এবং সকাল

ও সন্ধ্যার সময় আধ ঘণ্টা করিয়া বেড়ান দরকার।

সেবিকার খাদ্য পুষ্টিকর এবং লঘু হইবে।

প্রতিদিন নিয়মিতরূপে আহার করিবেন এবং রোগীর ঘরে যেন কখনও আহার না করেন।

যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে সকলের সঙ্গে আহার করিবেন, কারণ এক সঙ্গে আহার করিলে যেমন আনন্দ হয়, একলা আহার করিলে হয় না।

পেট পরিষ্কার সম্বন্ধে খুব সাবধান থাকিবেন, কারণ জীবনের একঘেয়ে কাজে অনেক সময়ে কোষ্ঠবদ্ধতার Constipation উৎপত্তি হয়।

বেশী ভারী রকমের জোলাপ না লইয়া খুব হাল্‌কা ধরণের জোলাপ যেমন cascara বা compound aloin tablet (যা সচরাচর সব ঔষধালয়ে পাওয়া যায়) খাওয়া কর্ত্তব্য।

ব্যারাম ভারী রকমের হইলে অনেক সময়ে সেবিকাদের মধ্যে Sore throat হইতে দেখা যায়। Sore throat হইবামাত্র ডাক্তারকে জানান আবশ্যক।

সেবিকা কাজ করিবার মতন যদি নিজেকে শক্ত না মনে করেন এবং কোনও পুষ্টিকর ঔষধ Tonic ব্যতীত কাজ করিতে পারিবেন না মনে করেন, তাহা হইলে একদিনের জন্য ছুটি লওয়া অত্যন্ত কর্ত্তব্য।

সেবিকার পক্ষে প্রতিদিন স্নান করা আবশ্যক।

সকাল এবং সন্ধ্যায় দুই বেলা ভাল করিয়া চুল আঁচড়াইবেন এবং দু সপ্তাহ অন্তর মাথা ঘসিবেন।

প্রত্যেকবারে আহারের পর দাঁত পরিষ্কার করিবেন, যাহাতে রোগীকে তাহার মুখের গন্ধের জন্য বিরক্ত না হইতে হয়।

যে ঘরের ভিতর সহজে বায়ু যাতায়াত করিতে পারে সেই ঘরে সেবিকার শয়ন করা উচিত এবং রাত্রিতে যদি কখনও উঠিবার দরকার হয়, যতই দরকারী কাজ হউক না কেন, নিজেকে খুব ভাল করিয়া ঢাকিয়া বাহির হইবেন।

কোনও বিষাক্ত ঘায়ে ঔষধ লাগাইবার পূর্ব্বে নিজের হাতে যদি কোনও আঁচড় বা কাটা থাকে তাহা হইলে collodionএর দ্বারা বন্ধ করিয়া দিবেন। ক্ষতস্থানে ঔষধ (dress) লাগাইবার পরে কোনও খাইবার দ্রব্য বা শরীরের কোনও অংশ ছুঁইবার পূর্ব্বে নিজের হাত ধুইয়া লইবেন।

সেবিকা রোগীর বেশভূষা করিবার কোন সামগ্রী ভ্রমেও ব্যবহার করিবেন না।

ব্যথিতের আহ্বান।

বক্ষো মাঝে দুঃখ যখন
দারুণ চেপে ধরে,
ক্ষুব্ধ চিত্ত ব্যাকুল হয়ে
তোমারি নাম করে।
হে পিতা, হে দীনের বন্ধু,
কাছে তোমার থাকি,

সকলি তো কর পূর্ণ
রাখতে চাওনা বাকী।
হে প্রভু, হে কাঙাল শরণ,
দীন অভাজনে,
দয়া স্নেহে ঘেরিয়া তো
রেখেছ চরণে।
কেন তবু মেঘে ঘেরে
হৃদয়-আকাশ মোর,
হাহাকার আর মেটেনাকো
বহে নয়ন লোর।
প্রাণের কথা দুঃখের কথা
ফুরাতে না চায়,
যত যাই দূরে সরে
ছাড়তে নাহি চায়।
তাই আসি হে বারে বারে
শান্তি পাবার আশে,
বিমল তোমার প্রেমের জ্যোতি
ফুটুক হৃদাকাশে।
সব অশান্তি দূরে গিয়ে
শান্তি নিরমল—
পেয়ে পূজব ফুল্ল চিত্তে
তোমার পদতল।
সেই তো আমার জীর্ণ প্রাণের
অনন্ত আরাম,
তাছাড়া আর কোথায় পাব
সুখ-মোক্ষ-ধাম?

শ্রীমতী কৃপাদেবী।

আকবরের ধর্ম্মমত।

"দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা" আকবার শাহ ভারতের সার্ব্বভৌম নরপতি পদে আসীন হইয়া, সকল জাতিকে যে মিলনের মহামন্ত্রে দীক্ষিত করার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাস আলোচনা করিলে সুস্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারা যায়। আকবর যে কেবল রাজনীতির কঠিন শৃঙ্খলে সকলকে আবদ্ধ করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন, এমন নহে;—তিনি ধর্ম্মনীতির সূক্ষ্ম সূত্রে সকলের হৃদয়পুণ্ডরীককে গ্রথিত করারও চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজনীতির চর্চ্চার সহিত তিনি সর্ব্বদা ধর্ম্মনীতিরও আলোচনা করিতেন। মোগলের গৌরব-সূর্য্যকে চিরোজ্জ্বল রাখিবার জন্য যেমন তিনি সর্ব্বদাই ব্যাপৃত ছিলেন, লোকদিগকে নবধর্ম্মের মহিমায় আলোকিত করিতেও সেইরূপ সচেষ্ট হইতেন। তিনি আশৈশব সংযম ও ধর্ম্মালোচনাদ্বারা আপনার চরিত্রকে সুগঠিত করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রসম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও, তিনি যে একজন আদর্শচরিত্র মহাপুরুষ ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মুসল্‌মান ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে সেইরূপ ভাবেই চিত্রিত করিয়াছেন। রাজনীতির ও ধর্ম্মনীতির এরূপ অপূর্ব্ব-সংমিশ্রণ ভারতের আর কোন মুসল্‌মান সম্রাটের জীবনে দেখিতে পাওয়া যায় না! একদিকে সম্রাটের মুকুট, অপর দিকে ফকীরের বেশ,—ইহা আকবরকেই শোভা পাইয়াছিল। সর্ব্বধর্ম্ম আলোচনা করিয়া তিনি যে সার-সংগ্রহ করিয়াছিলেন, নিজে সর্ব্বদা তাহারই অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিতেন, এবং অনেকে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার পদতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িত; যদিও আকবর

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে আকবর সকল ধর্ম্মের আলোচনা করিয়া নিজ ধর্ম্মমতের গঠন করিয়াছিলেন। বাস্তবিক তিনি কোন ধর্ম্ম বা জাতিকে উপহাস বা নিন্দা করিতেন না। সকল ধর্ম্মবাদীর তর্ক বিতর্ক শ্রবণ ও তাঁহাদের সহিত কথোপকথন করিয়া তিনি জ্ঞান-সঞ্চারের চেষ্টা করিতেন। যদিও তাঁহার জীবনীলেখক আবুলফজেল লিখিয়াছেন যে, বহুকাল ধরিয়া জ্ঞান-তৃষ্ণা নিবারণের চেষ্টা করিলেও কোন ব্যক্তিতে তিনি আপনার অপেক্ষা বিচার শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব দেখিতে পান নাই। আবুলফজেলের কথা কতদূর সত্য তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে আমরা এ কথা বলিতে পারি যে, আকবর ধর্ম্মমতে বা রাজ্যশাসনে কোন ধর্ম্মবিশেষের বা ব্যক্তিবিশেষের মুখাপেক্ষা করিতেন না। তিনি আলোচনাদ্বারা যাহা ভাল বুঝিতেন, তাহারই অনুষ্ঠানে রত হইতেন। কিরূপভাবে তিনি ধর্ম্মা-লোচনা করিতেন, আমরা নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

আকবর শাহ রাজ্যমধ্যে শান্তিস্থাপন করিয়া 'ইবাদৎখানা' নামে এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তথায় তিনি সন্ন্যাসী, ফকীর ও ধর্ম্মশাস্ত্র বেত্তা-দিগকে লইয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেন এবং ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। তাহাতেই সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইত। শুক্রবারে নমাজাদির পর তিনি সেখ, উলেমা ও অন্যান্য ধার্ম্মিকলোকদিগকে লইয়া সভা করিতেন ও মুসলমানধর্ম্মবিষয়ের তর্কবিতর্ক সর্ব্বধর্ম্মের সার সংগ্রহ করিয়া নব-ধর্ম্মের গঠন করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার সেই ধর্ম্মমতে হিন্দুধর্ম্মেরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা নিম্নে তাহার যথাযথ আলোচনা করিতেছি :—

হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ইহুদি ও পারসিক ধর্ম্মের সহিত সংশয়বাদ আলোচনা করিয়া আকবর নিজ নব- ধর্ম্মমতের ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁহার ধর্ম্মমত আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি যুক্তিবাদকেই আপনার ধর্ম্মের মূলসূত্র করিয়াছিলেন। প্রত্যাদেশের প্রতি তাঁহার সেরূপ আস্থা ছিল না। তিনি সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া স্থির করিয়া-ছিলেন যে, সত্য কখনও কোন ধর্ম্মবিশেষে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। সত্যজ্ঞান সকল স্থান হইতেই সংগৃহীত হইতে পারে। সত্য ও যুক্তিবাদের উপর নির্ভর করিয়া তিনি বিশ্বমধ্যে ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করিতে আরম্ভ করেন ; বিশেষতঃ সূর্য্য ও অগ্নিতে তাঁহার সত্তা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয় বলিয়া তাঁহার ধারণা ছিল। তাঁহার ধর্ম্মমত একেশ্বরবাদেই পরিণত হয় এবং তাহা 'তৌহিদি ইলাহি' বা স্বর্গীয় একেশ্বরবাদ নামে অভিহিত হইত। তিনি ব্যক্তিগত ঈশ্বরের পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না, কারণ প্রত্যাদেশে তাঁহার বিশ্বাস ছিল না—একথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। আমরা তাঁহার ধর্ম্ম-মতের মূলসূত্র নির্দ্দেশ করিয়া এক্ষণে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, তিনি কিরূপ ভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন।

শুনিতেন। সেই সময়ে স্বফীবাদসম্বন্ধেও আলোচনা করা হইত। এইরূপে মুসল্‌মান ধর্ম্ম হইতে তিনি সত্যসংগ্রহের চেষ্টা করিতেন, কিন্তু মুসল্‌মানধর্ম্মের সকল বিষয়ে তাঁহার আস্থা ছিল না। আমরা পরে তাহার উল্লেখ করিব। খৃষ্টান পাদরীরা তাঁহার সহিত আলাপনে আপনাদের পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মারূপ ঈশ্বরের ত্রিত্বভাব ও যীশুখৃষ্টের ধর্ম্মমতের আলোচনা করিয়া অনেক কথা জানাইতেন। বলা বাহুল্য, সে সময়ে রোমান ক্যাথলিক্ জেস্থইট পাদ্‌রীরাই ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। আকবর স্বীয় পুত্র মোরাদকে তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিতে আদেশ দেন, এবং আবুলফজেল ঐ সমস্ত উপদেশের অনুবাদ করিতে আদিষ্ট হন। বাদশাহ ইহুদীদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রও আলোচনা করিতেন। পারসিকেরা গুজরাট প্রদেশ হইতে আহূত হইয়া তাঁহাদেরও ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করাইতেন, এবং তাঁহারা অগ্ন্যুপাসনাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রকাশ করিতেন। আকবর পারস্যরাজের ন্যায় স্বীয় ভবনে দিনরাত্রি অগ্নি-প্রজ্বালিত করিয়া রাখিতেন ও তাহাকে ঈশ্বরের অন্যতম নিদর্শন বলিয়া মনে করিতেন। আবুলফজেলের প্রতি সেই পবিত্রাগ্নি রক্ষার ভার অর্পিত হয়। এতদ্ব্যতীত প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সংশয়বাদীগণও তাঁহার সহিত নানা বিষয়ের তর্কবিতর্ক করিয়া যুক্তিবাদ স্থাপনের চেষ্টা করিতেন; তাহাতে তাঁহার মুসল্‌মান ধর্ম্মের দৈনিক নমাজ, রোজা, ভবিষ্যদ্বাণী প্রভৃতি যুক্তিবিরুদ্ধ বিষয়েরপ্রতি অনাস্থা হয়, এবং প্রত্যাদেশ অপেক্ষা যুক্তিই ধর্ম্মের মূলভিত্তি বলিয়া তাঁহার ধারণা হয়। এই যুক্তিবাদের উপরই তাঁহার নবধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। তিনি এই যুক্তিবাদের নিকষ-পাষাণে সকল ধর্ম্মমতকে কষিয়া আপনার ধর্ম্মের মূলসূত্র বাহির করিয়াছিলেন। সকল ধর্ম্মের কোন কোন অংশ তাঁহার ধর্ম্মমতে দৃষ্ট হইলেও হিন্দুধর্ম্মের যে অনেকাংশ তাহার যুক্তিবাদরূপ নিকষ-পাষাণে অঙ্কিত হইয়াছিল, এক্ষণে আমরা তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

অন্যান্য ধর্ম্মের আলোচনার সহিত আকবর হিন্দুধর্ম্ম বিশেষরূপেই আলোচনা করিতেন। হিন্দুর অনেক শাস্ত্র তিনি অনুবাদ করাইয়াছিলেন। তাঁহার আদেশানুসারে আবুলফজেল 'আইন আকবরী'তে, হিন্দুদর্শন ও অন্যান্য শাস্ত্রের মত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বদাই গোপনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। তাঁহারা অন্যান্য ধর্ম্মবাদী অপেক্ষা জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া ও তাঁহারা যুক্তিসহকারে আপনাদের মতস্থাপনের ও অন্য ধর্ম্মের দোষ দর্শনের চেষ্টা করিতেন বলিয়া আকবর তাঁহাদিগকে যারপরনাই শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহাদের সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার মুসল্‌মান ধর্ম্মের প্রত্যাদেশ, পুনরুত্থান, বিচার-দিবস প্রভৃতির প্রতি অনাস্থা হয়। এতদ্ভিন্ন বীরবল তাঁহার প্রধান মন্ত্রী থাকায়, তিনি তাঁহার সহিত সর্ব্বদা হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা

করিতেন। এইরূপ কথিত আছে যে, তিনি তাঁহারই উপদেশানুসারে সূর্য্যোপাসনায় প্রবৃত্ত হ'ন। সূর্য্য জগতের প্রকাশ স্বরূপ, তিনি সকলকে আলোক প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহার দ্বারা জগতের ফলশস্য পরিপক্ক এবং মনুষ্যের জীবন ধারণ হয়,—সূর্য্য জগতের জ্যোতিরিন্দ্র ও বিশ্ববাসীর একমাত্র উপকারক, এবং রাজগণের বন্ধু স্বরূপ। তজ্জন্য তাঁহারই গতি অনুসারে অব্দাদি নির্ণয় হওয়া কর্ত্তব্য। সূর্য্যের উদয়াস্ত প্রভৃতি ঈশ্বরেরই মহিমা-সূচক; সুতরাং যাঁহাতে ঈশ্বরের মহিমা ও উপকারিতা প্রকাশ পায়, তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে আরাধনা করা কর্ত্তব্য। সেই জন্য আকবর প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে ও মধ্যরাত্রিতে সূর্য্যের উপাসনা করিতেন। তিনি গ্রহগণের বর্ণানুযায়ী পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন। এতদ্ভিন্ন অগ্নি, জল, প্রস্তর, বৃক্ষ প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থের পূজা, গো-পূজা ও মনুষ্যের কর্ত্তব্য বলিয়া আলোচিত হইত। তিনি কখনও গোহত্যা বা গোমাংস গ্রহণ করিতেন না এবং রাজ্যমধ্যে গোহত্যা নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুদিগের ন্যায় হোম করিতেন এবং তাঁহার হিন্দুমহিষীগণের অনুরোধে তাহা সম্পন্ন হইত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন তিনি কতকগুলি হিন্দু আচার-ব্যবহারও পালন করিতেন। হিন্দুদিগের ন্যায় তাঁহার জন্মান্তরেও বিশ্বাস ছিল। হিন্দু সন্ন্যাসী ও যোগীদিগকে মুসলমান ফকীরদের ন্যায় ভোজন করাইতেন। তদ্ভিন্ন মাংস-ভক্ষণে তাঁহার স্পৃহা ছিল না, এবং তিনি ইন্দ্রিয়-নিগ্রহেরও চেষ্টা করিতেন। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত তাঁহার ধর্ম্মমতে ও আচার-ব্যবহারে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

এইরূপে সমস্ত ধর্ম্মমত আলোচনা করিয়া তাঁহার নবধর্ম্মমত গঠিত হয়। যুক্তির নিকষ-পাষাণে যে ধর্ম্মমতের যে দাগটি অঙ্কিত হইত, তিনি তাহাই গ্রহণ করিতেন এবং আলোচনাদ্বারা বুঝিতে পারা যায়, হিন্দুধর্ম্মের অধিকাংশ দাগই সেই নিকষ-পাষাণে অঙ্কিত হইয়াছিল। আকবরের ধর্ম্মমতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি বিশ্বমধ্যে ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করিতে আরম্ভ করেন, এবং সূর্য্য ও অগ্নিতে তাহা সুস্পষ্টরূপে অনুভূত হয় বলিয়া তিনি সূর্য্য ও অগ্নির উপাসনা করিতেন। তদ্ভিন্ন অন্যান্য প্রাকৃতিক পদার্থেও তিনি ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করিতে চেষ্টা করেন। বিশ্বমধ্যে ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করা যে হিন্দু-দার্শনিকমত তাহা বোধ হয় নূতন করিয়া বলিতে হইবে না এবং তাহাই যে প্রকৃত বৈদিকধর্ম্ম তাহাও বোধ হয় বলিবার প্রয়োজন নাই। জগতের যত ধর্ম্ম আলোচিত হউক না কেন, হিন্দুধর্ম্মের মূলসূত্র যে সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ দেখাইয়াছেন যে, হিন্দু সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণেরা জ্ঞান, বিজ্ঞানে ও আধ্যাত্মিকতায় শ্রেষ্ঠ হওয়ায় আকবরের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, আকবরের ধর্ম্মমত আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, তাহার অধিকাংশই হিন্দুধর্ম্ম

হইতে গৃহীত হইয়াছিল; এবং হিন্দু আচার-ব্যবহারের অনুষ্ঠান করিয়া তিনি সেই ধর্ম্মভাবকে সর্ব্বদা আপনার অন্তঃকরণে জাগরূক রাখিতে চেষ্টা করিতেন। সেই জন্য দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি সংযম অভ্যাস করিয়া আপনার চরিত্র-গঠনের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বিশ্বমধ্যে ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করিয়া —বিশেষতঃ সূর্য্য ও অগ্নিতে তাঁহার বিশেষ বিকাশ দেখিয়া—আকবর একেশ্বরবাদী হইয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহার ধর্ম্মমত 'তৌহিদি ইলাহি' বা স্বর্গীয় একেশ্বরবাদ নামে অভিহিত হইত। এই গভীর তত্ত্ব স্থির করিয়া তিনি ঐশ মহিমার গুণগান করিতেন ও সর্ব্বদাই ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। সপ্তরাত্রি সেই চিন্তায় অতিবাহিত হইয়া যাইত। এইরূপে ঈশ্বরতত্ত্ব অনুভব করিয়া আকবর স্বীয় ধর্ম্মমত প্রচারে সচেষ্ট হন। যাহারা জ্ঞান-পিপাসা-শান্তির জন্য অন্যান্য ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া তৃপ্ত হইতে পারিত না, তাহারা তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িত, তাঁহার জীবনীলেখক এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে যে জগতের লোকদিগকে নবধর্ম্মের আলোকে আলোকিত করিয়াছিলেন, তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন বাল্য-কাল হইতে তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা-প্রকাশের কথাও শুনাইয়াছেন। সে যাহা হউক, আকবরশাহ যে নবধর্ম্ম প্রচারের জন্য লোকদিগকে আহ্বান করিতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; এবং অনেকে যে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিত, তাহারও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহারা "আল্লা-হু-আকবর" (ঈশ্বরই শ্রেষ্ঠ) "জিনেল্লা-হ" (শক্তিমানই ঈশ্বর) প্রভৃতি উচ্চারণ করিয়া, এবং নিবৃত্তি ও সংযমের অনুসরণ করিয়া 'তৌহিদি ইলাহি'র গৌরব রক্ষায় সচেষ্ট হইত। এই স্বর্গীয় ধর্ম্মমত গ্রহণের সময় তাহারা ধন, জীবন, সম্মান ও ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইত। মুসল্‌মানেরা ইস্‌লামধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেন। আকবরের ধর্ম্মমতে অন্য যাহা কিছু থাকুক্ না কেন, ঐশী সত্তার অনুভব ও ঈশ্বরানুরূপ যে তাহার মূলসূত্র ছিল তাহা অবশ্যই বলিতে হইবে। আর একথাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে, যুক্তিবাদ যখন তাঁহার ধর্ম্মের মূলভিত্তি, তখন তিনি কখনও নাস্তিক্যের প্রশ্রয় প্রদান করেন নাই।

এইরূপে আকবর শাহ স্বীয় নবধর্ম্মের প্রচার করিয়া ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে একতাসূত্রে বদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন। তিনি যদিও রাজনীতির শৃঙ্খলে সকলকে বদ্ধ করিয়াছিলেন, তথাপি ধর্ম্মনীতিসূত্রে তাহাদিগকে গ্রথিত করিতে না পারিলে যে তাহা স্থায়ী হইবে না, ইহা তিনি সুস্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারেন। সেইজন্য তাঁহার 'তৌহিদি ইলাহি'র প্রচার। সকল ধর্ম্মমত আলোচনা করিয়া তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, একেশ্বরবাদই সর্ব্বধর্ম্মের মূলসূত্র, এবং তিনি তজ্জন্য সেই মূলসূত্রটিকেই অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেই মূলসূত্রটি অবলম্বন করিতে হইলে, অনেক

সময়ে প্রাচীন ধর্ম্মমতগুলির কোন কোন অংশের সহিত গোলযোগ ঘটিবার সম্ভব; সেইজন্য আকবর অনেক প্রাচীন অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। মুসলমান ধর্ম্মের অনেক বিষয়ে তাঁহার আস্থা ছিল না, সেকথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। তদ্ব্যতীত তিনি খৃষ্ট পারসিক হিন্দু ধর্ম্মমতের সারাংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুসলমান ধর্ম্মমতের সকলাংশে তাহার আস্থা না থাকিলেও, তিনি ইহাকে কখনও অবজ্ঞা করেন নাই, কারণ তিনি কোনও ধর্ম্মকেই অবজ্ঞা করিতেন না। তবে আনুষ্ঠানিক মুসলমানেরা তাঁহার প্রতি তাদৃশ সন্তুষ্ট ছিলেন না। এমন কি অনেকে তাঁহার শত্রুও হইয়া উঠেন। আকবরের সমসাময়িক গ্রন্থকার বদৌনি প্রভৃতি তাঁহার মৃত্যুর পর আকবরের প্রতি শ্লেষোক্তি করিতেও ক্ষান্ত হন নাই; কিন্তু হিন্দুরা তাঁহাকে শ্রদ্ধার চক্ষেই দেখিতেন। হিন্দুদের ধর্ম্মমতের সর্ব্বাংশের সহিত তাহার ধর্ম্মমতের ঐক্য না থাকিলেও, তাহা যে অনেক পরিমাণে হিন্দুধর্ম্মের মূল ভিত্তিতে গঠিত, ইহা হিন্দুসাধারণে বুঝিতে পারিয়াছিল। সেই জন্যই তাহাদের বিশ্বাস হইয়াছিল যে, তাহাদের প্রয়াগের তপস্বী মহাপুরুষ মুকুন্দ ব্রহ্মচারী আকবররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ।

ভারতের নারী।

ইংলণ্ডের অনেকেরই ভারতের নারীজাতি সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান নাই, এবং দুঃখের বিষয় অনেক সময় কেহ কেহ ভারতীয় নারীজাতির সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত ও ভুল মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। যে দেশে প্রায় ৩০ কোটী লোকের বাস সেখানে যে জায়গায় জায়গায় নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার আছে ইহা সত্য। কিন্তু সেই অবস্থা যদি ভারতীয় সংসারের ছবি ধরা হয় তাহা হইলে ইংলণ্ডের ইতরপাড়ার সাংসারিক দৃশ্য খ্রীষ্টীয় সমাজের সংসারের ছবি বলিয়া ধরিতে হইবে।

প্রাচীন ভারতে যখন বিদেশীয়দের আক্রমণ ও আংশিক পরাভব সামাজিক শাসনের ভিতর বিচ্ছিন্নতা ও বিকৃত ভাব আনয়ন করে নাই, তখন হিন্দুরমণী স্বাধীন সম্মানান্বিত সামাজিক জীবনের অধিকারী ছিলেন। তাঁহাদিগের জন্য দুটী পথ উন্মুক্ত ছিল—গৃহস্থালী এবং ছাত্রীজীবন—এই উভয় কার্য্যেই তাঁহাদিগকে যথেষ্ট মান্য করা হইত। অধিকাংশ রমণী বিবাহ করিয়া সংসার ধর্ম্ম পালন করিতেন, গৃহের দেবীস্বরূপা হইয়া থাকিতেন। গৃহস্থের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সকল অনুষ্ঠানের ভিতর গৃহকর্ত্তার পার্শ্বে গৃহকর্ত্রী বিরাজ করিতেন। আপন গৃহে কোন পুরুষ পুরোহিতের পদ গ্রহণ করিতে পারিতেন না যতক্ষণ না তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে পুরোহিতার পদ দেওয়া হইত—কেননা স্বামী ও স্ত্রী দুটী ভিন্ন বলিয়া গৃহীত হইত না, শাস্ত্রমত পরস্পর পরস্পরের অপূর্ণতাকে পূর্ণ করিবার জন্যই সৃজিত। যদিও স্ত্রীর এত সম্মান ছিল তথাপি স্ত্রী হওয়াই রমণীর শ্রেষ্ঠ আদর্শ ছিল না, সন্তান ক্রোড়ে মাতৃ-

মূর্ত্তিই রমণীর শ্রেষ্ঠ আদর্শ ছিল। খ্রীষ্টীয় জগতে Madonnaর (মেরীর কোলে যিশু) যেমন সম্মান সেইরূপ ভারতের প্রতি পরিবারে রমণীর মাতৃমূর্ত্তিই শ্রেষ্ঠ আদর্শ-রূপে গৃহীত হইয়া আসিতেছেন।

যেমন মা হওয়া খুব সম্মানের পদ ছিল, সেইরূপ যাঁহারা স্ব ইচ্ছায় কুমারী থাকিয়া তাবৎ বিষয় জ্ঞানলাভে জীবনযাপন করিতেন তাঁহাদিগকেও জনসাধারণ খুব সম্মানের সহিত দেখিতেন। এইরূপ কুমারীরা সময়ে সময়ে রাজ-দরবারে উপস্থিত হইতেন এবং সকলে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদিগের কথা শুনিতেন, কখনও বা বড় বড় দার্শনিকদিগের সহিত ইঁহাদিগকে আলোচনা করিতে দেখা যাইত, যাঁহারা তর্কশাস্ত্রে পারীদর্শী ছিলেন এবং বেদমন্ত্র গান করিতেন। এই রকম উচ্চ প্রকৃতির রমণীর ছবি আমরা প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে পাইয়া থাকি।

কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে আবার দেখি হিন্দুরমণী তাঁর বীর পুত্রের পার্শ্বে বীরমাতা হইয়া তাহাকে উৎসাহিত করিতেছেন ও সকল কার্য্যে পরামর্শ দিতেছেন। আবার এই সব প্রাচীনকালের কথা ছাড়িয়া যখন বিদেশীয় সৈন্যের আক্রমণ ও পরস্পর বিনাশকারী যুদ্ধ হইতে আরম্ভ হইল, তখনকার বিষয় আলোচনা করিয়া দেখি যে, কোথাও মা নাবালক শিশুর প্রতিনিধি স্বরূপ রাজ্যশাসন করিতেছেন, কোথাও আত্মসম্মান রক্ষার জন্য তাঁহাদিগের বীর-স্বামী ও বীর-পুত্রদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুমুখে অগ্রসর করাইয়া নিজেরা দল বাঁধিয়া জ্বলন্ত চিতায় প্রাণসমর্পণ করিতেছেন।

কিন্তু ভারতে যেমন কাটাকাটি মারামারি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং লোকদিগের অবনতি হইতে লাগিল, স্ত্রীজাতি বহির্জগতের কর্ম্মক্ষেত্র হইতে ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতে লাগিলেন। আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক গবেষণা তো অনেকদিন আগেই ছাড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এইরূপে নারীজাতি নিজেদের সামাজিক পদমর্য্যাদা ভুলিয়া গেলেন।

ক্রমশঃ হিন্দুরমণীর ধর্ম্ম মানসিক উত্তেজনার জন্য ও মনের সান্ত্বনার স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে লাগিল। যে পশুবদ্ব্যবহার ও অশিষ্টতার জন্য ইউরোপের ব্রহ্মচারিণীরা মঠের ভিতর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, সেইরূপ অত্যাচারের জন্য ভারতে পরদার সৃষ্টি হইল। এখনও ভারতের যে যে অংশে পরদা প্রথা প্রচলিত আছে সেখানকার পরদানশীন মহিলাদিগের সহিত ইউরোপীয় বদ্ধ nuns দিগের অনেক সাদৃশ্য আছে। তাঁহাদের কেহ hot house এর ভিতর আবদ্ধ প্রস্ফুটিত কুঁড়ির মত, কেহ কেহ বা নিতান্ত শিশুপ্রকৃতি নিজের-টাই লইয়া ব্যস্ত, অন্যের বিষয় ভাবিবার শক্তিও নাই এবং মনের গভীরতাও নাই।

রমণী যেরূপই হউন না কেন, ভারতে রমণী গৃহের রাণী এবং তাঁহার কথা সকলেই শিরোধার্য্য করিয়া থাকেন, বৃদ্ধ পুত্রও মার কথামত চলিয়া থাকেন। ভারতে পরিবারে পরিবারে বাড়ীর মেয়েদের পুরুষদিগের উপর যে একটা আধিপত্য

আছে তাহা ইউরোপ জগতে একেবারেই নাই।

বিদেশীয় ইতিহাস লেখক এইরূপে ভারতীয় নারীর আলোচনা করিয়াছেন। গৃহস্থের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সকল অনুষ্ঠানে গৃহ-কর্ত্তার পার্শ্বে গৃহকর্ত্রী বিরাজ করিতেন। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ কি নারীরাই নামে বজায় রাখেন নাই? দুই মিলিয়া যে এক, সে আদর্শ কতটা আছে? ব্রাহ্মসমাজেও পুরুষেরা যে সব ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন সেখানে কি সহধর্ম্মিনীরা চেষ্টা করিয়া সপরিবারে মিলিতে চেষ্টা করেন? ইহা মাঘোৎসবের প্রশ্ন। হুড়োহুড়ি করিয়া একমাস মাঘোৎসব করাতেই কি আমাদের কর্ত্তব্য পূর্ণ হইল? খ্রীষ্টীয় জগতের কাছে সভ্যতা লইতে আমরা খুব ব্যস্ত, কিন্তু তাঁহাদের সপরিবারে উপাসনালয়ে যোগ দিবার নিষ্ঠা কি শিখিবার বিষয় নহে? গাড়ী ভাড়া নাই ইহা অধিকাংশ স্থলে একেবারে মিথ্যা ওজর, গয়না গড়াইবার জন্য আমরা মাথা ঘামাইয়া ভাবিতে পারি, থিয়েটার সারকাস্ দেখিবার সময়ও পয়সা ও সময় আটকায় না, কেবল এই সময় যত অসুবিধা পর্ব্বতাকার হইয়া উপস্থিত হয়! প্রতি গৃহস্থের কর্ত্তব্য কি, তাহা তাঁহাদিগের ভাবিবার কথা।

EQUALITY AND RIGHTS.

(প্রেরিত।)

যখন নববিধানের বাঁশী আবার নূতন প্রাণ নিয়ে মধুরস্বরে বেজে উঠেছে তখন তার সব সুরগুলো ভাল করে শুনতে ইচ্ছে করে নাকি? এখনও কি আমাদের বিধান-বাহকের উপর সন্দেহ আছে? কিম্বা এখনও বিধানবাহক 'এ চান নি, এই চেয়েছিলেন' বলিয়া একটা ভুল ধারণা লইয়াই ব্যস্ত থাকিব?

আমরা অনেকে সত্যই বিশ্বাস করি 'বিধানবাহক' নারীজাতির উচ্চশিক্ষার বিরুদ্ধে ছিলেন, Equalityর বিরুদ্ধে ছিলেন, Equal Rights দিবার বিরুদ্ধে ছিলেন। আমরা যাঁহাদের গালাগাল দিতেছি তাঁহা-দিগের যে খুব দোষ তাহা নহে, কারণ আমরা যতটুকু অন্যের নিকট হইতে বুঝি-য়াছি এবং দেখিয়া শুনিয়া যা অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছি হয়তো তাহাই বলিতেছি।

বাহিরের লোকের বিশ্বাস, নববিধান সমাজ মেয়েদের পরদার ভিতর আঁটিতে চাহেন, পরাধীন রাখিতে চাহেন; তাই সাধারণ সমাজ এই পরাধীনতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য, স্বাধীনতা দিবার জন্যই গঠিত হইল, সমাজের পার্থক্য বুঝাইতে গিয়া এই বিশেষ পার্থক্যের কথা বোধ হয় তাঁহাদের খুব বেশী করিয়া বুঝাইতে হয়। ভিতরের লোকদিগের কাহারও কাহারও বিশ্বাস, নববিধানবাহক উচ্চশিক্ষার বিরোধী ছিলেন, তাই Victoria Institution খুলিলেন, তিনি মেয়েদের প্রকাশ্যে বসা ভালবাসিতেন না বলিয়া মন্দিরে পরদার ব্যবস্থা করিলেন ইত্যাদি।

হয়তো আমরা যাহা আলোচনা করিতেছি তাহা করিবার আমাদের কোন অধিকার নাই, কেননা এসব ঘটনা আমরা কিছুই দেখি নাই, এবং ব্রাহ্মসমাজের

ইতিহাসও আমরা পাঠ করি নাই। কিন্তু 'অধিকার' ও 'সহজ ভাব' দুটী সম্পূর্ণ পৃথক্ জিনিষ, তাই অধিকার না থাকিলেও আমরা সহজ ভাবে সব রকম Criticism শুনিতে ও বুঝিতে চেষ্টা করি।

অভিযোগ গুলি এক এক করিয়া আলোচনা করাই ভাল। "তিনি স্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন, পরদার পক্ষপাতী ছিলেন।" জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় প্রকাশ্য সভাতে সহধর্ম্মিণীকে সঙ্গে লইয়া যাইতে কোন Non-Christian প্রথমে সাহস করিয়াছিলেন? মন্দিরে প্রকাশ্যে বসা লইয়া যে এত গালাগালি ও এত সন্দেহ সে অধিকার দিতে কি বিধানবাহক চেষ্টা করেন নাই? পিতৃস্থানীয়দিগের নিকট গল্প শুনিয়াছি মেয়েদের বাহিরে বসিবার বন্দোবস্ত হইল, কিন্তু সমাজ তখনও মাতৃজাতিকে সম্মান করিতে শেখেন নাই বলিয়া সৈনিক অমৃত মাঝখানে পায়চারী করিয়া পাহারা দিতেন। এইরূপ করিয়া স্বাধীনতা দিতে অগ্রসর হইয়া ছাড়িয়া দিলেন কেন? তিনি কি তবে ভীরু ছিলেন? যিনি জীবনে ভয় কাকে বলে জানেন না, যাঁর মন্ত্র 'এগিয়ে যাও' তাঁকে ভীরু বলিয়া গালাগাল দিলে কিছু আসে যায় না। তবে কেন আরম্ভ করিয়া ছাড়িয়া দিলেন? ইহা কি কেহ বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ইহা স্ত্রীলোকের স্বভাবের বিরুদ্ধ বলিয়া ছাড়িয়া দিলেন? যখন সহধর্ম্মিণী হঠাৎ পরদার বাহিরে আসিয়া মূর্চ্ছা গেলেন, যখন পাহারা নিযুক্ত না করিলে উপাসনালয়ে উপাসনার ব্যাঘাত হয়, মাতৃজাতির সম্মান রক্ষা হয় না, এবং মাতৃজাতিও এক সঙ্গে নিঃসঙ্কোচ ভাবে উপাসনায় যোগ দিতে পারেন না, তখন তিনি আর জোর জবরদস্তি করিলেন না। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা সামাজিক স্বাধীনতা বাহির হইতে ঠেলিয়া দিবার জিনিষ নহে, ইহা প্রত্যেকের ও সমাজের নিজস্ব ধন; প্রকৃত স্বাধীনতা এমন জিনিষ যে তাহা যা করে সব সহজ ভাবে করে, কোন জিনিষ জোর করিয়া দিলে স্বাধীনতা দেওয়া হয় না, পরাধীন করা হয়। যাঁহাকে Autocrat উপাধি দেওয়া হয় তিনি যে কাহারও সহজ ভাবের উপর হস্তক্ষেপ করিতেন না ইহা আমাদিগের সহজ বুদ্ধিতে ঢোকে না। তিনি কি বুঝিতে পারেন নাই, যখন মেয়েরা জিনিষটা কি নিজেরা বুঝিবেন ও দেখাইবেন, তখন স্বাধীনতা পাইতে বিলম্ব হইবে না। তাঁহারা দল বাঁধিয়া স্বাধীনতা লইতে নিজেরাই অগ্রসর হইবেন। সামাজিক নিয়ম সমাজের উপর নির্ভর করে। তখন যাহা নিয়ম হইয়াছিল খুব মঙ্গলের জন্যই হইয়াছিল। কিন্তু দেশের অবস্থা কি এখনও তাই? এখনও কি ভাই ভগ্নীরা সবাই মিলিয়া প্রাণ খুলিয়া ভগবানের নাম করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন, এবং তাহার ভিতর অন্য ভাব মনে আনিতেও সাহস করেন? বুঝি সঙ্কোচের দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে, ভয়ের দিন চলিয়া যাইতেছে। মায়ের আহ্বান সমাজে নূতন প্রাণ ঢালিয়াছে, সমাজও কি এবার নূতন প্রাণে জেগে উঠবে না? যে স্বাধীনতা ও অধীনতা বিধানবাহক জীবনে দেখিয়ে গিয়েছেন সেই

spirit নিয়ে স্বাধীনতা নিতে ও দিতে কি আমাদের সাহস হবে না? প্রত্যেকে প্রত্যেকের নিকট হইতে বল নিয়ে কি একটু এগিয়ে যাব না?

(ক্রমশঃ)

স্নেহলতা।

স্নেহলতা বাপের আদরের কন্যা। তাহার পিতা শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নিবাস ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত পালং থানার অধীন কাগদি গ্রামে। হরেন্দ্র বাবুর এক ভ্রাতা বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ময়মনসিংহে ডাক্তারী করেন, আর এক ভ্রাতা বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুক্তাগাছার রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য বাহাদুরের নায়েব। হরেন্দ্র বাবু স্বয়ং কলিকাতার অন্তর্গত রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীটের ৪৩।১ সংখ্যক ভবনে বাস করিয়া দালালি করেন। কিন্তু তাঁহার অবস্থা ভাল নহে। তিনি সপরিবারে ৩ বৎসর হইল, কলিকাতায় বাস করিতেছেন, কন্যা স্নেহলতার বয়স ১৪ বৎসর হইয়াছে—সুতরাং বিবাহের জন্য তিনি ব্যস্ত হন। অনেক অনুসন্ধানের পর বি, এল শ্রেণীর একটী যুবকের সহিত বিবাহের সম্বন্ধ হয়, কিন্তু পাত্রপক্ষ নগদ ৮০০ ও অলঙ্কারে ১২০০৲ টাকা না পাইলে কন্যা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। দুই হাজার টাকা ব্যয় করিতে পারেন, হরেন্দ্র বাবুর তেমন অবস্থা নয়। কিন্তু কন্যার বিবাহ না দিলেও নয়, সুতরাং বাড়ী ঘর বন্ধক রাখিয়া তিনি দুই হাজার টাকা ধার করিবার উদ্যোগ করিলেন। ১৪ই ফাল্গুন বিবাহের দিন ধার্য্য হইল।

স্নেহলতার মাতা রুগ্না, সে নিজেই পিতার সংসারের সমস্ত ভার বহন করিত। সে হাস্যমুখে গৃহের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া পিতা মাতাকে সংসারের ক্লেশ বুঝিতে দিত না। সে যখন শুনিল, তাহার বিবাহের জন্য পিতা সর্ব্বস্বান্ত হইতে চাহিতেছেন, তখন তাহার মনে শেল বিদ্ধ হইল। সে গেলেই যদি পিতার মাথা রাখিবার বাড়ী খানি রক্ষা পায়, তবে সে তাহা করিবে না কেন? এই চিন্তা তাহার মনে প্রবল হইয়া উঠিল। পিতাকে রক্ষা করাই তাহার জীবনের জপ তপ হইল। স্নেহলতা সঙ্কল্প করিল, সে আত্মবিসর্জ্জন করিবে। কিন্তু কাহাকেও সে অমোঘ সঙ্কল্পের কথা জানাইল না।

মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে তাহার ফটোগ্রাফ তোলা হইল। কেমন সহাস্য বদন! তাহার মনে যে আত্মবিলোপের দুর্জ্জয় আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, সে মুখ দেখিয়া কেহ কি তাহা কল্পনা করিতে পারে?

গত ১৬ই মাঘ প্রাতঃকালে স্নেহলতা আনন্দমনে গৃহকার্য্য সমাধা করিল। তাহার মনে পিতাকে বাঁচাইবার জন্য যে প্রবল প্রতিজ্ঞা জাগিয়াছিল, তাহার স্বভাব সুলভ প্রফুল্ল মুখশ্রী অবলোকন করিয়া কেহ তাহা বুঝিতে পারিল না।

বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল, বাড়ীর ছেলেরা উঠানে খেলা করিতে লাগিল। স্নেহলতা বরপণ রূপ হাড়িকাঠে

পিতাকে বধ না করিয়া আপনাকে বলি দিতে প্রস্তুত হইল।

সে এক খানি ধোওয়া ধুতি পরিল, পদযুগল আলতায় অলঙ্কৃত করিল, এক বোতল কেরোসিন তৈল ও একটী দিয়াশলাইর বাক্স লইয়া গৃহের ছাদে উঠিল। বেলা তখন ১॥টা। স্নেহলতা কেরোসিন তৈলে সাড়ী খানি সিক্ত করিয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া দিল। অগ্নি লোল জিহ্বা বিস্তার করিয়া তাহাকে গ্রাস করিবার জন্য জ্বলিয়া উঠিল। পার্শ্বস্থ কালীবাড়ীর পুরোহিত আশুতোষ চক্রবর্ত্তী অগ্নিশিখা দেখিয়া দৌড়িয়া আসিয়া খবর দিল, বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে। বাটীর লোক জনের সহিত আশুতোষ ছাদে যাইয়া দেখিল, স্নেহলতার স্কন্ধদেশ হইতে জানু পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইয়াছে। তাহার মুখ ও হস্ত পদে আগুন স্পর্শ করে নাই। স্নেহলতাকে তৎক্ষণাৎ মেডিকেল কলেজে প্রেরণ করা হইল। মানুষের যাহা সাধ্য, তাহার ত্রুটী হইল না; পিতা কন্যার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন—সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে স্নেহলতা এই পাপ কলঙ্কিত সমাজ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। বঙ্গদেশে মহা বলি হইল।

সমাজ যদি জীবিত থাকিত, তবে আজ প্রলয়কারী গভীর গর্জ্জন শুনিতে পাইতাম। আজ এক পক্ষ কাল হইল, বালিকা বলি হইয়াছে, ইহার মধ্যে জন সমুদ্র সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিত—বঙ্গদেশের ৪ কোটি নরনারী ক্ষিপ্ত হইয়া বলিত "আজ হইতে বরপণ উঠিয়া গেল।" স্নেহলতার মূর্ত্তি স্কন্ধে লইয়া যুবক বীরগণ ধরাতল কম্পিত করিয়া বলিত, "আজ অরাম কি অরাবণ হইবে। আজ হয় দেশ হইতে মহাপাপ বরপণ উঠাইয়া দিব, না হয় এই বিষম যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন করিব।"

এস এস আত্মত্যাগী যুবক বীরগণ, এস, এস, বঙ্গের সুসন্তানগণ, আজ মেদিনী ব্যোম কম্পিত করিয়া বল, এদেশে আর এক মুহূর্ত্তও বরপণ থাকিতে দিব না। তোমাদের ভৈরব হুঙ্কার শুনিয়া পাপীর প্রাণ সন্ত্রস্ত হউক। সে বড় হউক, ছোট হউক; সে ধনী হউক, নির্ধন হউক; সে বিদ্বান হউক কি মূর্খ হউক; সে রাজা হউক কি প্রজা হউক, তোমার প্রলয় হুঙ্কারে তাহার প্রাণের পাপ-তৃষ্ণা চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হউক।" সঞ্জীবনী।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

স্নেহলতার আত্মবলিদানে আমাদের দেশের চক্ষু খুলিয়াছে—চারিদিকে বরপণ নিবারণের মহা উদ্যম আরম্ভ হইয়াছে। মহিলার পাঠিকাগণের এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য আছে তাহা কি বলিয়া দিতে হইবে? গৃহের মহিলাগণই গৃহের রাণী, মাতা, ভগিনী ও পত্নীগণ যদি এই মাংস ক্রয়বিক্রয় ব্যবসায় ত্যাগ করেন তাহা হইলে এক দিনেই এই কুরীতিরূপ দৈত্যের মৃত্যু হয়।

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী শনিবার ভিক্টোরিয়া মহিলাবিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। সরকারের কৃপাদৃষ্টি ও সাধারণের সহানুভূতি এবং উভয়ের সাহায্যে স্কুলের অবস্থা এখন ভাল হইয়াছে। আশা করা যায় এখন ইহার অধ্যক্ষগণ আপনাদিগের উচ্চ আদর্শ অনুসারে শিক্ষা দান করিয়া দেশকে এ বিষয়ে সদৃষ্টান্ত দেখাইতে সক্ষম হইবেন।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৯শ ভাগ] ফাল্গুন, ১৩২০। মার্চ্চ, ১৯১৪। [৮ম সংখ্যা।

প্রার্থনা।

হে মঙ্গলময় পরমেশ্বর, তুমি আমাদিগের মঙ্গল করিবে বলিয়াই আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছ। যে সকল ঘটনা বা অবস্থার ভিতরে আমরা মঙ্গল দেখিতে পাই না, তাহার ভিতরেও প্রচ্ছন্ন মঙ্গল রহিয়াছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধ কিছু হইলেই আমরা বলি অমঙ্গল হইল। সুখ দুঃখ দুই তুমি দেও, আমরা সুখ পাইলে আহ্লাদ করিয়া লই, দুঃখ আসিলে বলি তুমি অন্যায় করিলে বা নির্দ্দয় হইলে—তুমি যে নির্দ্দয় হইতে পার না, অমঙ্গল করা তোমার স্বভাব নয়, তাহা আমরা ভুলিয়া যাই, তাহাতেই এত দুঃখ পাই। তাই তোমার চরণে প্রার্থনা করি, দেবতা, তুমি আমাদিগকে বিশ্বাস দেও যে, আমরা সকল অবস্থায় তোমাকে মঙ্গলময় জানিয়া সুখে দুঃখে সমভাবে তোমার উপর নির্ভর করিয়া আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে পারি। তোমার আশীর্ব্বাদে আমরা তোমাকে নিত্য মঙ্গলময় জানিয়া যেন মঙ্গল সাধন ও মঙ্গলে বাস করিতে পারি এই প্রার্থনা করিয়া তোমার পাদপদ্মে বার বার প্রণাম করি।

দুঃখের উপকারিতা।

দিন হইলেই বুঝিতে হইবে ইহার পর রাত্রি আসিবে, একথা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। বসন্ত আসিল অধিক দিন থাকিল না, গ্রীষ্ম আসিয়া পড়িল, ইহাতে কেহ অন্ধকার দেখে না। যৌবন চিরস্থায়ী হইল না, বার্দ্ধক্য আসিয়া পড়িল, ইহাতে কেহ অন্ধকার দেখে না। সকলেই জানে সুখও চিরদিন থাকে না, দুঃখও চিরদিন থাকে না। যেমন দিনের সঙ্গে রাত্রি গ্রথিত, যেমন বসন্তের পর গ্রীষ্ম স্বভাবতই আসিয়া থাকে, তেমনই

সুখের পরে দুঃখ আসিয়া থাকে—ইহা সৃষ্টির নিয়ম, বিধাতার বিধান—অর্থাৎ ইহা আমাদিগের মঙ্গলের জন্য প্রয়োজন। এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে কিছুই স্থির হইয়া থাকে না, প্রত্যেক নরনারী একটা গতির অবস্থায় রহিয়াছে। গতিই জগতের নিয়ম, গতিই জীবন। আমরা যদি এই গতির নিয়মটা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতাম তাহা হইলে আমাদের অবস্থা ভিন্নরূপ হইত। বৎসরের মধ্যে কখনও দিন দীর্ঘ হয়, কখনও রাত্রি দীর্ঘ হয়, মানুষ পূর্ব্ব হইতে তাহা জানিয়া রাখে। কতক্ষণে দীর্ঘ রাত্রি শেষ হইবে তাহা জানা থাকে এজন্য রাত্রির অন্ধকার দেখিয়া ভয় বা নিরাশা উপস্থিত হয় না, কিন্তু আমাদের জীবনের সুখ দুঃখের স্থিতির কোন কাল নিরূপণ করা যায় না এই জন্যই দুঃখের রাত্রি অত্যন্ত দীর্ঘ মনে হয়, এমন কি নিরাশা আসিয়া ডুবাইয়া মারিতে প্রস্তুত হয়।

জগতের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে এই দুঃখের নিশা এক এক জাতিতে অত্যন্ত দীর্ঘ হয়, এমন কি শতাধিক বৎসর বা ততোধিক কাল রাত্রিই চলিতে থাকে। অপর দিকে এক এক ব্যক্তির জীবন দেখিলে মনে হয় যে বাল্যকাল হইতে দুঃখের রাত্রিই চলিতে থাকে, শুভদিনের প্রাতঃসূর্য্য হয়ত এক দিনও দেখা যায় না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মানুষ সুখ দুঃখের পর্য্যায়ক্রমে গমনাগমনের নিয়মকে অখণ্ড নিয়ম বলিতে চাহে না। শেষে এই দাঁড়ায় যে, সুখ যে ক্ষত লইতে পারে তাহাই ভাল এবং দুঃখ যত অল্প পরিমাণে সম্ভব সহ্য করাই সুচতুরের কার্য্য। সকলেই সুখপ্রয়াসী, সকলেরই দৃষ্টি আছে যাহাতে কেবল সুখই লাভ হয়, দুঃখ কোনরূপে না আসিতে পারে। মনুষ্য প্রকৃতির ভিতরে যে এই ভাবটি আছে, তাহার সন্দেহ নাই, এবং অনেকে মনে করেন যে এইরূপ স্বার্থপরতার উপরই বুঝি মনুষ্যজাতির সকল প্রকার শ্রেষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু একটু বিশেষরূপে দৃষ্টি করিলেই দেখা যায় যে মানুষের অন্তরে যদিও সুখস্পৃহা আছে মানুষ কেবল আপনাকে লইয়াই সুখী হইতে পারে না। প্রত্যেক নরনারী স্বাভাবিক নিয়মে অপর কতকগুলি নর-নারীকে এরূপ ভাবে আপনার মনে করে যে তাহাদিগের দুঃখ দেখিলে সে দুঃখিত হয় ও তাহাদের সুখে সুখী হয়। মাতার অন্তরে অতি গভীর ভাবে আত্মরক্ষা ও আত্মসুখের চেষ্টা রহিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু মাতা আপনার শিশুসন্তানের সুখের বা রক্ষার জন্য কোন দুঃখ না সহ্য করিবেন, কোন বিপদে পড়িতে প্রস্তুত না হইবেন? এইরূপে পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, বন্ধু প্রভৃতি সম্পর্কে যাঁহারা জনসমাজের সহিত আবদ্ধ তাঁহাদিগের পক্ষে প্রিয় আত্মীয়গণকে ত্যাগ করিয়া বা দুঃখে পতিত দর্শন করিয়া সুখ-সম্ভোগ করা সম্ভব নয়। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যায় যে জনসমাজ স্বার্থপরতার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, প্রেম অর্থাৎ পরার্থপরতার উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষ এক দিকে স্বার্থ-পর, আত্মসুখান্বেষী, অপর দিকে পরার্থপর,

অর্থাৎ তাহার আত্মীয় বন্ধুগণকে লইয়া তাহার স্বার্থ বা আত্মবোধ। তাহার দুঃখের অনুভূতি কেবল আপনার শরীর লইয়া নয়, তাহার মন লইয়া, এবং সেই মনের মধ্যে অনেকের স্থান রহিয়াছে। এই সকল প্রেমপূর্ণ মানুষ লইয়া সমাজ রচিত হয়।

যিনি মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাকে উন্নতির পথে যাইবার স্বভাব করিয়া দিয়াছেন তিনিই তাহাকে সুখেচ্ছা দিয়াছেন এবং তিনিই নিঃস্বার্থ ভালবাসা দ্বারা অল্লাধিক সংখ্যক নরনারীর সহিত আবদ্ধ করিয়াছেন। মনুষ্যকে এই স্বভাব দান করিয়া তাহাকে যে অবস্থায় স্থাপন করা হইয়াছে তাহাতে তাহাকে শত বিষয়ে দুঃখ বিপদে পড়িতে হয়। শীত-প্রধান দেশে মানুষ এত ভয়ঙ্কর রূপে অভাবগ্রস্ত যে এক রাত্রি গৃহে আশ্রয় না পাইলে, বা দু এক দিন বস্ত্রের অভাব হইলে তাহার প্রাণবিয়োগ হয়। আমাদিগের দেশে ও অন্যান্য দেশে বন্যজন্তু প্রভৃতি নরনারীর জীবন যখন তখন নষ্ট করে। তাহাদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে সর্ব্বদাই মানুষকে সাবধান থাকিতে হয়। মানুষের দুঃখ বিপদ চিরদিন মানুষের নিকট হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে উপস্থিত হয়। শত্রু, দস্যু, তস্করগণ সর্ব্বদা সর্ব্বস্ব হরণ করিতে বা প্রাণনাশ করিতে উদ্যত। শীত গ্রীষ্ম ঝড় বৃষ্টি প্রভৃতি প্রকৃতি, হিংস্র জন্তু ও অনিষ্টকারী মানুষ সকলের নিকট হইতেই মানুষের দুঃখ বিপদ আসিতেছে; এজন্য মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়স্থান আদিকাল হইতে অন্বেষণ করিতে হইয়াছে এবং এই দুঃখ ভয় হইতেই যত প্রকার ভয়-নিবারক ও আরামপ্রদ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে মানুষ বাধ্য হইয়াছে। যদি মানুষ এইরূপ অভাবগ্রস্ত ও বিপন্ন না হইত তাহা হইলে কখনও এত কষ্ট স্বীকার করিয়া ও মস্তিষ্ক সঞ্চালন করিয়া সুন্দর ও নিরাপদ গৃহ নির্ম্মাণ করিত না। এ কথা চিন্তা করিলে কি আমরা বলিব না যে ঈশ্বর দয়া করিয়া শীত গ্রীষ্ম, ঝটিকা বৃষ্টি, হিংস্র জন্তু ও দুষ্ট লোক দিয়াছিলেন, কারণ তাহাদিগের ভয়ে বা তাড়নাতে মানুষের এত বড় উপকার হইয়াছে।

শরীর থাকিলেই রোগ হয় এ কথা সকলেই জানে, কিন্তু মানুষ এই নিয়মকে বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহে। অবশ্য শরীরে রোগের সম্ভাবনা আছে, কখন রোগ হইয়া কষ্ট দিবে বা প্রাণনাশ করিবে তাহা মানুষ জানে না। এই অভাববোধ হইতে স্বাস্থ্যরক্ষার কত প্রকার চেষ্টা হইতেছে, এবং তাহা সত্ত্বেও রোগ হইলে রোগ দূর করিতে কত নূতন নূতন চিকিৎসা শুশ্রূষার ব্যবস্থা হইতেছে। যাহারা ধনী তাহারা এজন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়া আপনার ও আত্মীয় প্রিয়গণের স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগের উপশম করিতেছে। যাহারা দরিদ্র, তাহাদিগের স্বাস্থ্যরক্ষার কত উপায় করা হইতেছে ও তাহারা রোগগ্রস্ত হইলে তাহাদিগের চিকিৎসা শুশ্রূষার জন্য কত সুব্যবস্থা ও বহু অর্থব্যয় করা হইতেছে। স্বভাবের নিয়মে যাহারা দুর্ব্বল বা রুগ্ন শরীর বা মন লইয়া জন্মি-

তেছে তাহাদিগের জন্যই বা কতরূপ সুব্যবস্থা হইতেছে! স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগীর চিকিৎসা শুশ্রূষার জন্য মানুষ পৃথিবীতে যত প্রকার সুব্যবস্থা করিয়াছে ও এইজন্য চেষ্টা করিতে যাইয়া তাহার যে জ্ঞানলাভ ও প্রেমবৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে বলিতে হয় যে সৃষ্টিকর্ত্তা যদি মানুষকে রোগ না দিতেন তাহা হইলে মানুষের জ্ঞানের বিকাশ হইত না, আপনার শরীরের বিষয়ও কিছু বুঝিতে পারিত না এবং শরীরের সহিত এই পৃথিবীর কি ঘনিষ্ঠযোগ তাহাও বুঝিতে পারিত না।

মানুষের মনে জ্ঞান তৃষ্ণা নামক আর একটি প্রবল শক্তি আছে। ইহাতে মানুষকে যত অভাবগ্রস্ত করে, মনে হয় অন্য কোন বৃত্তি তাহাকে এরূপ ব্যস্ত করে না। জ্ঞানের অভাব মানুষের বড়ই দুঃখের কারণ, মানুষ সকলই নিঃশব্দে সহ্য করিতে পারে কেবল জ্ঞানকে চরিতার্থ করিতে চায়, কারণ জানিতে চায়, কারণ না জানিলে তাহার একগুণ দুঃখ অন্ধকার দশগুণ হয়। তাহাকে প্রাণে বধ কর তাহাও সে নীরবে সহ্য করে, কিন্তু কেন তাহার প্রাণনাশ করা হইতেছে তাহা তাহাকে বলিতে হইবে। এই অভাববোধে সে চিরকাল ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। প্রকাণ্ড জাহাজ অকস্মাৎ মহাসমুদ্রে ডুবিয়া গেল, কোটি মুদ্রা নষ্ট হইল, মানুষ সকলই সহ্য করিল, কিন্তু কেন এরূপ দুর্ঘটনা হইল তাহা না জানিলে তাহার প্রাণে শান্তি নাই। যাহা হউক না কেন, মানুষের জ্ঞান তাহার কারণ, স্বভাব বা নিয়ম না জানিয়া স্থির থাকিতে সম্মত নয়। একটি অপরিচিত মানুষ হউক, অন্য জীব হউক, কোন ঘটনা হউক তাহার বিষয় সংবাদ পাইলেই অমনই তাহাকে জ্ঞানের আয়ত্ত করিতে মানুষ ব্যস্ত। আকাশে একটি ধূমকেতু উপস্থিত হউক, নগরে একটি নূতন রোগ উপস্থিত হউক, মানুষ অমনই তাহার উপযুক্ত পরিচয় পাইতে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আমরা অন্য কোন জীবের কথা জানি না, যাহারা জ্ঞানের অভাবে এত দুঃখী হয়। মানুষ অল্প একটুকু জ্ঞান লইয়া সংসারে আসিয়া থাকে, আর চিরকাল এই জ্ঞান লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া জীবন ব্যয় করে। পক্ষান্তরে এই দুঃখবোধই মানুষের সকল শ্রেষ্ঠতার মূলকারণ। ইহার মধ্যে যে ব্যক্তি যত অল্প জ্ঞান লইয়া সন্তুষ্ট হইল সে তত হীন অবস্থায় পড়িয়া রহিল। অপর দিকে জ্ঞানের অভাব চরিতার্থ করিতে যাইয়াই আজ মানুষ পৃথিবীর শত সহস্র বস্তুর অল্পাধিক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জ্ঞান লাভ করিয়াছে এবং গভীর সমুদ্রগর্ভ, সম্পূর্ণ অগম্য ভূগর্ভ প্রভৃতির বিষয় কত জ্ঞানলাভ করিয়াছে এবং আকাশের সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র বিষয়েও কত জ্ঞানলাভ করিয়াছে! জ্ঞানলাভ ও জ্ঞানদান করিবার সুব্যবস্থা করিতে কত কত মহৎ প্রতিষ্ঠান সকল সভ্যজগতে দেখা যাইতেছে। কোন গূঢ় স্থানে জ্ঞানাভাবরূপ একটি অভাব, একটু দুঃখ ছিল যাহা হইতে আজ মানুষ এত উপকার লাভ করিয়াছে, এত বড় হইয়াছে।

দুঃখ হইতে সুখের উৎপত্তি হয়,

আমরা তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য—অভাববোধ হইতে অভাবপূর্ণ করিবার জন্য যত্ন হয় এবং তাহাতেই উন্নতি হয় একথা সত্য। অথচ মানুষ দুঃখ দেখিলেই প্রথমটা অন্ধকার দেখে—তার পর স্বভাব, শিক্ষা, শক্তি বিশ্বাস অনুসারে তাহার প্রতিকার করে বা অনন্যোপায় হইয়া তাহাকে সহ্য করিতে বাধ্য হয়। আমাদের দেশে দুঃখবোধ অন্য দেশ অপেক্ষা অধিক তাহা বলিতে পারি না। এদেশের লোক যতরূপ দুঃখ অনুভব করে, অন্য দেশের লোকেও তাহাই করিয়া থাকে কিন্তু অন্য দেশের লোক দুঃখের প্রতিকার করিতে যেমন তৎপর আমাদের দেশে সেইটি নাই, তাহাতেই দুঃখবোধ আছে কিন্তু দুঃখের উপকারটি লাভ হয় না। আমাদের এই কলিকাতা নগরে নানাদেশীয় লোক আছে। মিউনিসিপালিটির ব্যবস্থাতে বা ডাকঘরের কার্য্যে বা আদালতের কার্য্যে সময় সময় সকলেরই অসুবিধা, অবিচার বা কষ্টবোধ হয়। সাধারণতঃ সাহেবেরা যখন যে কষ্ট বা অসুবিধা হইল তাহা দূর করিতে তৎপর হন, উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে উপস্থিত করিয়া তাহার প্রতিকার করিয়া লন। আমাদের দেশের লোক সেইরূপ অসুবিধা হইলে হয়ত আপনার গৃহে বা বন্ধুবান্ধবের নিকট ক্রোধ বা বিরক্তি প্রকাশ করিয়া আপনি কষ্ট পাইলেন, ওদিকে উপযুক্ত স্থানে সেই অব্যবস্থার সংবাদটি না দেওয়াতে তাহার প্রতিকার হইল না। পুনঃ পুনঃ সেই অসুবিধা ভোগ করিতে লাগিলেন। আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই যে অঞ্চলে সাহেবেরা বাস করেন সে অঞ্চলে ব্যবস্থা ঠিক থাকে, অথচ বাঙ্গালীদিগের পাড়ায় অনেক অনিয়ম অব্যবস্থা হয়। এরূপ হইবার অন্য যে কারণ থাকে থাকুক কিন্তু প্রধান কারণ এই যে, আমাদের দুঃখ বোধ আছে, কিন্তু তাহা দূর করিবার যথেষ্ট যত্ন নাই। যাঁহারা রেলে ভ্রমণ করেন, তাঁহাদের অনেক সময়ে অনেক অসুবিধায় পড়িতে হয়। যাঁহারা কোন কষ্ট পাইয়া নীরবে তাহ সহ্য করিয়া যান তাঁহারা হয়ত মনে করেন যে পথে কষ্ট সহ্য করা একটা ধর্ম্ম, ভাল কাজ, কিন্তু একটু বিবেচনা করিলে সকলেই দেখিতে পাইবেন যে, রেল কোম্পানীর কোন নিয়মের দোষে অথবা কোন কর্ম্মচারির দোষে তিনি যে কষ্ট সহ্য করিলেন তাহা দূর করিতে তিনি যদি যথেষ্ট যত্ন করিয়া তাহার সংশোধন করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার কষ্ট দূর হউক না হউক ভবিষ্যতে বহুলোকের কষ্ট হওয়া বন্ধ হইয়া গেল তদ্দ্বারা ততটা মঙ্গলসাধন করা হইল। জড়ভাবে কষ্ট বা অবিচার সহ্য করিলে না হয় অন্যের হিত, না হয় আপনার কল্যাণ।

আমাদের দেশের লোকের একটা যেন সংস্কার আছে যে কষ্ট সহ্য করাতেই কিছু গুণ বা ফল আছে। ফলে তাহা কিছু নাই। কষ্ট দুঃখ হইলে অসহিষ্ণু হইয়া পড়িলে কোন লাভ নাই, কিন্তু তাহা নিবারণ করিতে যত্ন না করা অত্যন্ত লজ্জাকর নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য। মানুষ

ইচ্ছা করিলেই সকল দুঃখ দূর করিতে পারে না—কিন্তু অনেক প্রকারের দুঃখ আছে যাহার প্রতিকার প্রয়োজন। প্রতিকার করিতে হইবে বলিয়াই সে সকল দুঃখ কষ্ট উপস্থিত হয়। আলস্য করিয়া দুঃখ নিবারণ না করা আপনার ও জনসমাজের বিরুদ্ধে অপরাধ। পথে একটা কাঠ পড়িয়া আছে, যাহার পদে প্রথম লাগিল, সে যদি তখনই তাহা সরাইয়া ফেলিয়া দেয় অন্য কোন পথিকের আর কোন ক্লেশ হয় না, কিন্তু সে আলস্য করিয়া কোন উপায় করিল না, সহ্য করিয়া গেল, অন্য লোকেও সহ্য করিয়া গেল। এইরূপে বহু লোকের ক্লেশ হইল। এই জাতীয় অসভ্য ব্যবহার আমাদিগের মধ্যে অনেক হয়। প্রকৃতপক্ষে সভ্য ব্যবহার অথবা জ্ঞানসঙ্গত ব্যবহার না করিলে দুঃখ হইতে কেবল দুঃখই উৎপন্ন হয় এবং প্রত্যেক দুঃখ কষ্ট বা প্রতিকূল অবস্থার উপযুক্ত প্রতিকার করিলে তাহা হইতে মঙ্গলই হইয়া থাকে। মানুষ অতি প্রাচীন কাল হইতে ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল প্রকার প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াই সভ্যতাতে এত দূর উন্নতি লাভ করিয়াছে। যখন যে দেশে এইরূপ যুদ্ধ করা বন্ধ হইয়াছে তখনই জাতীয় উন্নতিও অবরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের দেশের উন্নতির সময় আসিয়াছে কি না তাহা এই এক লক্ষণ দেখিয়া সহজেই জানা যাইতে পারে। যখন যে ব্যক্তি কোনরূপ দুঃখ বিপদ বা প্রতিকূল অবস্থায় পড়ে তখনই যদি সে তাহার বিরুদ্ধে যথাশক্তি যুদ্ধ করে তবেই বুঝিতে হইবে সে দুঃখ হইতে সুখলাভ করিবে—সে ব্যক্তি উন্নতিশীল, জীবিত—দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে এইরূপ উন্নতিশীল ব্যক্তির পরিমাণ যত অধিক তত পরিমাণ জাতি জীবিত ও উন্নতিশীল।

আমরা সকলেই জানি অনেকগুলি দুঃখ আছে যাহার প্রতিকার নাই, যাহার সহিত যুদ্ধ হয় না, যাহার চিকিৎসা নাই—মানুষ সে অচিকিৎস্য ব্যাধিরও চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। যে সকল দুঃখের নিবৃত্তি সম্ভব তাহার নিবৃত্তি করিতে যাইয়া সংসারের বিষয় প্রভৃত জ্ঞানলাভ করিয়াছে, এবং যে সকল দুঃখের নিবৃত্তি এখানে সম্ভব নহে তাহার নিবৃত্তির অন্বেষণে সংসারের অতীত, সৃষ্টির অতীত—নিত্য সত্য সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের চরণাশ্রয় লাভ করিয়া স্বর্গীয় আনন্দ শান্তি পাইয়াছে। এইজন্য বলা যাইতে পারে যে প্রত্যেক দুঃখই সুখ ও উন্নতির দ্বারস্বরূপ হইয়া উপস্থিত হয়, যদি শরীর মনের পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দ্বারা দুঃখের নিবৃত্তি হয় তাহা হইলে জ্ঞানোন্নতি প্রভৃতি উপকার হয়, আর যদি দুঃখ এরূপ হয় পৃথিবীতে তাহার প্রতীকার সম্ভব নহে তাহা হইলে মানুষ একান্ত অসহায় হইয়া বিশ্বাসরূপ নূতন দৃষ্টি লাভ করে ও স্বর্গের ঈশ্বরকে লাভ করিয়া এক নূতন আনন্দপূর্ণ রাজ্য আবিষ্কার করে এবং মহোপকার লাভ করে।

আমাদের দেশের নারীগণ কোন নরনারী অপেক্ষা অল্প অভাব দুঃখ অনুভব করেন ইহা আমরা মনে করিতে পারি না। ক্ষুদ্র বৃহৎ, স্থায়ী অস্থায়ী, প্রকৃত বা

কাল্পনিক অনেক প্রকারের দুঃখ আমাদিগের মহিলাগণকে ভোগ করিতে হয়, কিন্তু দুঃখ হইতে উপকার অত্যন্তই অল্প লাভ হয়। বর্ত্তমান সময়ে এদেশের পুরুষ নারী সকলেই পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠতা দর্শন করিয়া তাহা গ্রহণ করিতেছেন, ইহা অতি স্বাভাবিকভাবে হইতেছে। কোন সুখকর অবস্থা দেখিলে সকল মানুষেরই মনে তাহা লাভ করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলমন্ত্র এই যে যখন যে দুঃখ বা কষ্ট উপস্থিত হইবে তাহা প্রতীকার করিতে যত্নশীল হইতে হইবে। যাহারা কষ্ট অসুবিধা অনুভব করে অথচ তাহা দূর করিতে যত্ন করে না তাহারা কখনও দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিবে না এবং মুক্তিলাভ করিতে যাইয়া যে উন্নতি লাভের সম্ভাবনা ছিল তাহাও তাহাদের লাভ হইবে না। যাঁহারা দুঃখকে কর্ম্মফল জানিয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া দুঃখ ভোগ করে তাহারা অতি ভ্রান্ত, কৃপাপাত্র। তাঁহারা আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠতাও জানিল না, সৃষ্টির উচ্চ অভিপ্রায়ও দেখিল না—একটা কুশিক্ষা ও কুসংস্কারকে জড়ভাবে স্বীকার করিয়া মনুষ্য জীবনের শ্রেষ্ঠ অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল। পক্ষান্তরে ইহাও দেখা যায় যে কোন মানুষ কর্ম্মফলে বিশ্বাস করিয়া দুঃখ দূর করিতে নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না কেবল তর্ক উপস্থিত হইলে কর্ম্মফলের কথা বলে। আমাদের পাঠিকাগণ কি চারিদিকে চাহিয়া দেখিবেন না যে পৃথিবীতে ছোট বড় সকল জাতিকেই ভয়ানক সংগ্রাম করিয়া আত্মরক্ষা ও উন্নতি সাধন করিতে হইতেছে। সকল দেশেই নানা আকারে দুঃখ আসিয়া উপকার করিতেছে আমরাই কি কেবল দুঃখ হইতে দুঃখই ভোগ করিব ও অসহায় নিশ্চেষ্ট হইয়া চিরদিন দুঃখ ভোগ করিতে থাকিব? আমরা আশা করি নূতন সময় আসিয়াছে এখন প্রত্যেক নরনারী সকল প্রকার অবিচার, অত্যাচার, কুসংস্কার, কুনীতি ও অন্যান্য সকল দুঃখের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাকে বধ করিবেন এবং ভবিষ্যতের উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া লইবেন। যখন যে দুঃখ উপস্থিত হয় তাহাই মঙ্গলের জন্য এই বিশ্বাস করিয়া অগ্রসর হইব।

মধুমক্ষিকা।

কীটপতঙ্গের সঙ্গে মানুষের সর্ব্বদাই দেখা হয়, কিন্তু এজাতীয় জীবকে সাধারণত অতি হীন ও নরজাতির শত্রু বলিয়াই জানা আছে; এক মধুমক্ষিকা এক অদ্ভুত জীব। ইহার দ্বারা মানুষ মধু লাভ করে, মোম পায়, ইহার অসাধারণ পরিশ্রমশক্তি, এই সকল কারণে চিরদিনই মানুষ মধুমক্ষিকার তত্ত্ব অতি আগ্রহের সহিত আলোচনা করিয়াছে এবং এপর্য্যন্তও এ বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত আছে। মধুমক্ষিকার শরীরতত্ত্ব, স্বভাব, অভ্যাস, আকৃতি প্রভৃতি শত বিষয়ে আজ পর্য্যন্ত শত জ্ঞানী পণ্ডিত বহু অনুসন্ধান করিয়া গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন তাহা নির্ণয় করা একরূপ অসম্ভব। কথিত আছে যে, প্রাচীনকালে গ্রীস দেশের পণ্ডিত আরিষ্টমেকস মধু-

মক্ষিকার বিষয় অনুসন্ধান করিতে ক্রমাগত ৬০ বৎসর নিযুক্ত ছিলেন; ফিলিস্কাস নামক গ্রীক পণ্ডিত বহুকাল নির্জ্জন অরণ্যে বাস করিয়া মধুমক্ষিকা বিষয়ক বিবিধ জ্ঞান সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

মধুমক্ষিকাদিগের তিনটি জাতি আছে। প্রথম পুংমক্ষিকা—ইহারা কোন কর্ম্ম করে না, ইহাদিগের শরীর অপেক্ষাকৃত স্থূল, আকারে অন্য সকল মক্ষিকা অপেক্ষা বৃহৎ, মস্তক গোলাকার, গঠন চেপটা, পেট স্থূল তাহাতে পুং জননেন্দ্রিয় সংযুক্ত আছে। এ শ্রেণীর বিশেষত্ব এই যে, ইহাদিগের দংশন করিবার যন্ত্র বা হুল নাই, ইহারা উড়িয়া যাইতে শব্দ হয়। দ্বিতীয় শ্রেণী—"রাণী মক্ষিকা" ইহারাই স্ত্রীজাতীয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এজাতীয় মক্ষিকা পুং-মক্ষিকা অপেক্ষা আকারে ক্ষুদ্র, কিন্তু অপর সকল মক্ষিকা হইতে বৃহৎ, ইহার একটি দংশনযন্ত্র বা হুল আছে ও দুইটি গর্ভধারণ কোষ আছে। ইহাদিগের উদর অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। তৃতীয় শ্রেণীর মক্ষিকার নাম শ্রম-জীবী-মক্ষিকা। ইহাদিগের আকার সর্ব্বা-পেক্ষা ক্ষুদ্র। ইহাদিগের একটি শুণ্ডা-কৃতি যন্ত্র আছে, তাহাদিগের উরু ও পাদ সকল এরূপ গঠিত যে তদ্দ্বারা ফল ফুল হইতে আহারীয় সংগ্রহ করিতে সাহায্য হয়। সাধারণ ভাবে দেখিলে ইহাদিগের কোনরূপ জননেন্দ্রিয় দেখা যায় না, কিন্তু অনুবীক্ষণ দ্বারা সাবধানে পরীক্ষা করিয়া পণ্ডিতগণ দেখিয়াছেন যে, ইহাদিগের উদরে গর্ভধারণ কোষের চিহ্ন আছে। কোন কোন বিশেষ অবস্থায় তাহাতে একরূপ ডিম্বও দেখা গিয়াছে। ইহা-দিগকে সাধারণত নপুংসক মক্ষিকা বলা হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর মক্ষিকা সকল প্রকার শ্রমসাধ্য কার্য্য করিয়া থাকে। ইহারাই মধুচক্র নির্ম্মাণ করে, বাসের কুঠরী সকল প্রস্তুত করে, আহারীয় ও অন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অন্বেষণ করে ও প্রাপ্ত হইলে আহরণ করে ও তাহার উপযুক্ত ব্যবহার করে, রাণীর সেবা করে, তাহার যাহা কিছু প্রয়োজন সকল যথা সময়ে যোগায়, মধুচক্রের প্রতি কেহ আক্রমণ করিতে আসিলে তাহার সহিত যুদ্ধ করে এবং মক্ষিকাজাতির সকলপ্রকার শত্রু হইতে মধুচক্রকে রক্ষা করে। রাণী মক্ষিকার জীবনের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য অণ্ড প্রসব করা। পুংমক্ষিকা নিজে কোন পরিশ্রম করে না—অন্য সকলের পরিশ্রম অলস থাকিয়া দর্শন করে ও তাহার ফল ভোগ করে, পুংজাতি মোম কি মধু কিছুই উৎপন্ন করে না। রাণী মক্ষিকার গর্ভ-সঞ্চারের জন্যই তাহার জন্ম, গর্ভসঞ্চার হইলেই তাহাদিগের জীবন শেষ হইয়া যায়।

সাধারণত প্রত্যেক মধুচক্রে একসময়ে একটি করিয়া পূর্ণাকৃতি রাণী থাকে এবং দেখা যায় যে, এই রাণীকে বিশেষ ভাল-বাসা ও সম্মানের সহিত ব্যবহার করা হয়। এক এক মধুচক্রে চারি পাঁচ সহস্র শ্রম-জীবী মধুমক্ষিকা থাকে, কিন্তু কোন কোন মধুচক্রে বিশ, চল্লিশ এমন কি পঞ্চাশ সহস্র শ্রমজীবী মক্ষিকাও দেখা যায়। পুং জাতীয় মক্ষিকা কখনও অধিক থাকে না,

মোট মক্ষিকা সংখ্যায় ত্রিশ ভাগ কি চল্লিশ ভাগের একভাগ মাত্র হইয়া থাকে। বৎসরের কোন সময়ে যখন রাণীমক্ষিকা গর্ভবতী হইয়াছে তখন একটি পুংমক্ষিকাও দেখিতে পাওয়া যায় না। মধুমক্ষিকা এত ক্ষুদ্র জীব যে ৫৩৭৬টা ওজন করিলে এক পাউণ্ড অর্থাৎ আধসের হয়।

বহুদিন পর্য্যন্ত এই মত প্রচলিত ছিল যে, মোম পুষ্পরেণুর রূপান্তর মাত্র এবং মধুমক্ষিকা পুষ্পরেণুকে পদদ্বারা দলিয়া মোমে পরিণত করে। কিন্তু পণ্ডিতগণের গবেষণার দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে মোম মধুমক্ষিকার পাকস্থলী হইতে এক প্রকার নিঃসৃত পদার্থ বিশেষ। মৌমাছি যে পরিমাণ মধু বা অন্য কোন প্রকার মিষ্ট রস পান করে তাহাই পাকস্থলী হইতে মোমের আকার ধারণ করিয়া বাহির্গত হয়। ইহার প্রমাণ স্বরূপ যদি আমরা কোন একটি মৌমাছিকে সচাগ্রের দ্বারা মধুচক্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব যে, যতই মৌমাছিটির শরীর টানে পড়িয়া লম্বা হইতে থাকিবে ততই তাহার পশ্চাদ্দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোমের খণ্ড সকল দৃষ্ট হইবে। পণ্ডিতবর হিউবর (Huber) অনেক পরীক্ষার দ্বারা দেখাইয়াছেন যে মধুমক্ষিকা যে পরিমাণ মধুপান করে ঠিক সেই পরিমাণই মোম তাহার শরীর হইতে নির্গত হয়। তিনি ইহাও দেখাইয়াছেন যে মধুমক্ষিকাকে যদি শর্করা জলে মিশ্রিত করিয়া পান করান হয় তাহা হইলে অনেক সময় মোমের পরিমাণ অধিক প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশ্রাম ও উষ্ণস্থানে বাস মোম নিঃসরণের বিশেষ সহায়তা করে। দেখা গিয়াছে যে সুমিষ্ট রসপান করিয়া মধুমক্ষিকা সকল কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া চুপ করিয়া বিশ্রাম করিলে পর তাহাদের উদরের তলদেশে ছোট ছোট মোমের খণ্ড-সমূহ দৃষ্ট হয়। মোম পদার্থটা এক প্রকার থলী বিশেষের মধ্যে রক্ষিত থাকে। যে সকল মৌমাছি কার্য্যনিরত কেবল তাহাদের শরীরেই এই থলী বিদ্যমান রহে—পুরুষ মৌমাছি বা রাণীর শরীরে এ প্রকার থলী দেখা যায় না।

মধুমক্ষিকার দেহ হইতে যত প্রকার পদার্থ নিঃসৃত হয় তন্মধ্যে ইহার হুলের বিষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বিষ ক্ষার দ্রব্য হইতে উৎপন্ন। পণ্ডিতেরা মধুমক্ষিকাকে উত্তেজিত করিয়া একটি কাচ খণ্ডের উপর তাহার বিষ নিঃসৃত করাইয়া অণুবীক্ষণের সাহায্যে দেখিয়াছেন যে বিষের তরলাংশটুকু শুকাইয়া যাইলে ক্ষার পদার্থটি দানা দানা হইয়া অবশিষ্ট থাকে। মৌমাছির হুলের অনেকটা নলের ন্যায় আকৃতি। ইহার উপরিভাগটা খোলা এবং ইহার শেষটা দুটি ছোট শৃঙ্গের আকার ধারণ করিয়াছে এবং তাহার প্রত্যেকটির উপর দশটি করিয়া করাতের ন্যায় দাঁত দেখা যায়। হুলের শিখরদেশে বিষের থলী অবস্থিতি করে। মধুমক্ষিকা শত্রুদেহে হুল প্রবেশ করিলে হুলের করাতের ন্যায় গঠন হওয়ায় সে আর তাহা বহির্গত করিতে সক্ষম হয় না; সুতরাং হুল ও মৌমাছির উদরের নাড়ীভুঁড়ির কিয়দংশ

শত্রুশরীরে রহিয়া যায় এবং শত্রুকে দংশনের সঙ্গে সঙ্গেই হতভাগ্য মধুমক্ষিকাকেও তাহার জীবলীলা সাঙ্গ করিতে হয়।

মধুমক্ষিকার শ্বাস প্রশ্বাস বিচিত্র প্রণালীতে সংগঠিত হইয়া থাকে। মধুমক্ষিকার দেহের গঠন এরূপ কৌশলপূর্ণ যে সে, সমস্ত শরীর দ্বারা নিঃশ্বাস গ্রহণ করিতে পারে। মানব-দেহে যে প্রকার শিরা ও স্নায়ু সকল সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে মৌমাছির শরীরেও নিশ্বাস গ্রহণের যন্ত্রসমূহ পরিব্যাপ্ত দেখা যায়। মধুচক্রে শত শত মধুমক্ষিকা সর্ব্বদা কার্য্যে রত রহিয়াছে। সমস্ত চাকটি মৌমাছিতে পূর্ণ, এক তিল স্থানও শূন্য নাই। চক্রের নিম্নদেশে বায়ু যাতায়াতের একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে বটে; কিন্তু সমস্ত চাকটিতে মৌমাছির এত ঘেঁসাঘেঁসি যে তাহা দেখিয়া অনেক সময় বিস্মিত হইতে হয় যে এত ঘেঁসাঘেসির মধ্যেও একটি মৌমাছিও বিশুদ্ধ বায়ুর অভাবে প্রাণত্যাগ করে না, কারণ উচ্চশ্রেণীর জীব জন্তুর ন্যায় মধুমক্ষিকাও বিশুদ্ধ বাতাসের অভাবে প্রাণধারণ করিতে সমর্থ হয় না। অথচ পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে মধুচক্রের বায়ু পার্শ্বস্থ বায়ু অপেক্ষা বিশুদ্ধতায় নিকৃষ্ট নহে। কি প্রকারে মধুচক্রের বায়ু বিশুদ্ধ রাখা হয় তাহার বিবরণ একটু কৌতূহলপূর্ণ। চক্রের বাতাস বিশুদ্ধ রাখিবার নিমিত্ত কয়েকটি মধুমক্ষিকা চক্রে দৃঢ়রূপে পদসংলগ্ন করিয়া সজোরে পক্ষ সঞ্চালন করিতে থাকে। এই বায়ু বিশুদ্ধিক্রিয়া চক্রের উপরিভাগে, দ্বারদেশে, অভ্যন্তরে ও সর্ব্বত্র পরিচালিত হয়। একদল মধুমক্ষিকা এই কার্য্যে শ্রান্ত হইয়া পড়িলে আর এক দল মধুমক্ষিকা তাহাদের স্থান গ্রহণ করে। মধুচক্রের নিকট দণ্ডায়মান হইলে যে এক প্রকার গুণ্‌গুণ্‌ শব্দ শ্রুত হওয়া যায় ইহা বায়ুবিশুদ্ধিকার্য্যনিরত মধুমক্ষিকার পক্ষ সঞ্চালন শব্দ ব্যতীত আর কিছুই নহে। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে মধুমক্ষিকার সমীপে কোন প্রকার দুর্গন্ধ পদার্থ রক্ষা করিলে মধুমক্ষিকা স্বভাবতঃ পাখা নাড়িয়া থাকে; সুতরাং মধুচক্রের বাতাস মলিন হইতে না হইতেই মধুমক্ষিকাগণ তাহাদের স্বভাবগুণেই পক্ষ সঞ্চালন করিতে প্রবৃত্ত হয়।

মহিলা-রাজ্য।

এতদিন মহিলারা পুরুষজাতির মধ্যে অস্তিত্ববিহীন হইয়া লুক্কায়িত ছিলেন। পৃথিবীর কোন কিছুতেই তাঁহাদের উচ্চবাচ্য ছিল না। ভারতের তো কথাই নাই, মহিলামহিমাময় ইউরোপেও পুরুষগণ নারীজাতির প্রতি সম্মাননা প্রদর্শন করিয়াই যথেষ্ট মনে করিতেন। ভারতবাসীরা যতই গর্ব্ব করুন—শাস্ত্রবাক্য দেখিয়া যতই বলুন—তাঁহারা মহিলাদিগকে শিক্ষাদান করিতেন, পূজা করিতেন—তাহাদের সে সামান্য চেষ্টা পুরুষদিগের ছায়াতলে। অধিকন্তু বলিতে হয় সে সকল কথা আকাশ-কুসুমের মত বাক্যেই ছিল, সমাজে কদাচিৎ দেখা যাইত। ভারতের মহিলারা প্রথমে পিতার, পরে স্বামীর এবং

তারপরে পুত্রের অধীনা ; তাঁহাদের অস্তিত্ব এইরূপে পুরুষের মধ্যেই অন্তর্লীন ছিল। কেবলমাত্র খাওয়া পরার কার্য্যেই তাঁহারা পুরুষদিগের কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিতেন। গার্গী মৈত্রেয়ী খণা প্রভৃতি কয়েকটী মহিলাকে বাদ দিলে ভারতের মহিলা-রাজ্য অন্ধকারময়। তাহাদের মধ্যেও কতজন বা কতখানি কল্পনার তুলিতে আঁকা তাহাও বলা যায় না। যা হউক, আমরা বলিতে চাই—জগতে মহিলা-রাজ্য নূতন এবং তাহাতে নূতন শক্তি সঞ্চারিত হইতেছে। অনেকে এই শক্তি দেখিয়া আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠেন, অনেকে কি হইল বলিয়া চিন্তিত হন, অনেকে সে শক্তি দমাইতে বদ্ধপরিকর। আবার অনেকে দেখিয়া উন্মত্ত, অনেকে সুখী, অনেকে তাহা সংযত করিয়া নিয়মিত করিতে অভিলাষী।

প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিভা ও প্রভাবময় সুদীর্ঘ রাজত্বকাল মহিলা-মহিমার নিশান উড়াইয়া এক নূতন যুগ কেবল প্রতীচ্যে নয় সমগ্র ভূমণ্ডলে ঘোষণা করিয়াছিল। সেই নিশানতলেই বিংশ শতাব্দী নূতন মহিলামণ্ডল গড়িয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। এতদিন কোন দেশেই মহিলারা কার্য্যক্ষেত্র পান নাই—কেবল পুরুষের কার্য্যেরই সামান্য একটুকু সাহায্য করিতেন মাত্র। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে মহিলাগণ কেবল লতিকা নন, কেবল বৃক্ষকে বেষ্টন করিয়া উঠাই তাঁহাদের নিয়তি নয় ; এই বিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহারা আপনা আপনি দাঁড়াইতে অভ্যাস করিতেছেন এবং ক্রমে যে দাঁড়াইবেন তাহারই পরিচয় প্রদান করিতেছেন। জগতের উন্নত মহিলামণ্ডল প্রসারিত মহিলা-রাজ্যকে আপনাদের কার্য্যক্ষেত্ররূপে নির্ব্বাচন করিয়াছেন। আমরা ইহার মধ্যে ভগবানেরই ইচ্ছা ও শক্তির অবতরণ দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছি। এখন পুরুষ-রাজ্যে পুরুষগণ এবং নারী-রাজ্যে নারীগণ কার্য্য করিবেন, এবং একে অন্যের কার্য্যের সহায় হইবেন। আমাদের ভারত-মহিলামণ্ডলেরও সেদিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। এখন যে সকল মহিলার মধ্যে শক্তি অবতীর্ণ হইবে তাহাদিগকেই আপন আপন ক্ষেত্রে নামিয়া কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে। মহিলাগণই মহিলা-রাজ্যে কার্য্য করিবার প্রকৃত অধিকারী। পুরুষদিগের আবশ্যক, তাঁহাদের হস্তে এতদিন যে ভার ন্যস্ত ছিল উপযুক্ত হস্তে ক্রমে সে ভার অর্পণ করিয়া মুক্তিলাভ করেন।

"মহিলা-রাজ্য" বিংশ শতাব্দীর নূতন আবিষ্কার—ইহা সম্পূর্ণরূপে পঞ্চদশ শতাব্দীর আবিষ্কৃত নূতন পৃথিবীর ন্যায় নূতন। মানব-রাজ্যই দুই খণ্ড হইয়া একটী নর-রাজ্য ও আর একটী মহিলা-রাজ্য হইবে ইহা ঊনবিংশ শতাব্দীতে লোকের চিন্তায়ও উদ্ভাসিত হইয়া উঠে নাই। ক্রমে মনস্বিনী মহিলাগণ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণা হওয়ায় এখন সকলের সে ধারণা দূর হইয়াছে, আমরা পরিস্ফুটরূপে দেখিতেছি—পুরুষ-রাজ্যে পুরুষগণ নেতৃত্ব লইয়া এবং মহিলা-রাজ্যে নারীগণ নেত্রী হইয়া অন্ততঃ কিছুকাল কার্য্য করিবেন। মানব-রাজ্যে পুরুষগণ

মহিলাদের উন্নতির জন্য অনেক করিয়াছেন আরো করিবেন; কিন্তু তাহাতে মহিলা-ভাব ও মহিলা-শক্তি সম্যক্ ফুটিয়া উঠিবে না। মহিলা-শক্তি সম্যক্ পরিস্ফুট করিবার জন্য মহিলাদিগের স্বতন্ত্ররূপে কার্য্য করা আবশ্যক। এইজন্যই দুটী রাজ্য আপাততঃ পৃথক্ হইতেছে—মহিলাদের জন্য এখন মহিলারাই যথাসাধ্য আত্মশক্তি প্রয়োগ করিবেন; পুরুষগণ তাঁহাদের সহায় হইবেন মাত্র।

মহিলারা মহিলাদের জন্য কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করাতেই এই রাজ্যের সীমারেখা ভাসিয়া উঠিয়াছে; নচেৎ আরো বহুকাল কালগর্ভেই লুক্কায়িত থাকিত। আমরা কয়েকটী উদাহরণ দিয়া আমাদের বক্তব্য আরো পরিস্ফুট করিতে প্রয়াস করিতেছি। লর্ড হার্ডিং আমাদের রাজপ্রতিনিধি এবং ভারতীয় প্রজাগণের কল্যাণ সাধনের ভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত। সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখিতেছি লেডি হার্ডিং ভারতীয় মহিলাদিগের কল্যাণার্থ নানা কার্য্যানুষ্ঠান করিতেছেন। লর্ড ডাফরিণের সময় হইতেই দেখিতে পাই, বড়লাটের পত্নীও ভারতীয় মহিলাগণের জন্য কোন কোন কার্য্য করিতেছেন। কিন্তু এখন হইতে যিনিই বড়লাট, লাট বা ছোটলাট হইবেন, তাঁহাদের পত্নীদের ও পতিদের স্ব স্ব সীমায় মহিলাদের কল্যাণার্থ কার্য্য করা গুরুতর কর্ত্তব্যের মধ্যে গণিত হইবে। লাটপত্নীগণ এখনও ইচ্ছা করিয়া কার্য্য করিতেছেন কিন্তু ক্রমেই উহা কর্ত্তব্যের আকার ধারণ করিতেছে। অনতিকাল মধ্যেই লাট নিয়োগের সঙ্গে লাট পত্নীর যোগ্যতাও বিবেচনার বিষয় হইবে। আমাদের সম্রাট্ পত্নী যখন এদেশে আসিয়াছিলেন তখন তিনিও ভারতীয় মহিলাদের সঙ্গে মিলিয়া যথাসম্ভব তাঁহাদের চিত্তবিকাশের চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলও মহিলাদিগের মধ্যে আপন কার্য্যক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

ভারতের বালিকা বিদ্যালয়সমূহে কেবল মহিলা শিক্ষয়িত্রী নিয়োগও মহিলা-রাজ্যেরই পরিচয় দান করিতেছে। এইরূপ কেবল ভারতবর্ষে নয়, সমগ্র পৃথিবী জুড়িয়া এক অভিনব মহিলা-রাজ্যের পত্তন হইয়াছে। এখানে মহিলা ভাব ও শক্তি সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট করিবার জন্য মহিলারাই কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়াছেন।

এখন যদি আমরা বলি প্রত্যেক নারী স্বামীর সঙ্গিনী হইয়া মহিলা-রাজ্যে আপন আপন কার্য্যক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিবেন, তাহা হইলে যে গুরুতর চিন্তার বিষয় কিছু বলিলাম তাহা মনে করি না। আজকালের দিনে আমাদের চিন্তাস্রোত সহজেই সেদিকে প্রবাহিত হয়। "পত্নীরা স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী" ইহা নূতন কথা নয়—পুরাতন শাস্ত্রের পুরাতন কথা। এখন যদি পত্নীরা বিধাতা প্রদত্ত স্ব স্ব কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া কার্য্যতঃ তাহা প্রদর্শন করেন এবং প্রতি মহিলামণ্ডলে প্রত্যেকে আপন স্থান দেখিয়া কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্তা হন তাহা হইলেই শাস্ত্রবাক্য প্রতিপন্ন হইবে। আমরা আশা করি এই পৃথিবীব্যাপ্ত মহিলা-রাজ্যের

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে আমাদের শিক্ষিতা মহিলা-দিগের কাহার কি কাজ তাহা সত্বর নির্ব্বাচন করিয়া কার্য্যারম্ভ করিবেন। "শুভস্য শীঘ্রম্" এই মহামন্ত্র আজকাল করিয়া কেহ পণ্ড করিবেন না।

আমরা পাঠিকাদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা এই মহিলা-রাজ্যের কথা আপন আপন হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া একবার ভাবুন। তাহা হইলে সেই রাজ্যে আপনার ক্ষুদ্র স্থানটুকু দেখিতে পাইবেন। তৎসঙ্গে সঙ্গে একটা নূতন আলোক তাঁহাকে একটা নূতন পথ প্রদর্শন করিবে। সেই পথে তিনি চলিতে আরম্ভ করুন। অনেক করিবার বিষয় পাইবেন, অনেক শক্তি পাইবেন, অনেক সঙ্গিনী পাইবেন, অনেক সাহায্য পাইবেন, এবং ভগবানের প্রসাদে অনেক আনন্দ ও শান্তি পাইবেন।

গিরিডী ব্রহ্মোৎসব।

আজ আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি কেন? সকলেই জানেন উৎসব উপলক্ষে। উৎসব কেন, কিসের উৎসব, এ প্রশ্ন মনে উদিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে। আশ্বিন মাসের স্নিগ্ধ দিনগুলিতে যখন বৃক্ষ লতা পাতার সম্পদে পরিপূর্ণ থাকে, যখন ক্ষেতে ক্ষেতে সোণার বর্ণ ফুটিয়া ওঠে, নদ নদী যখন শান্তভাব ধারণ করে, সেই সময় একদিন বঙ্গবাসীর ঘরে ঘরে মহা আড়ম্বরে মাতৃপূজার আয়োজন আরম্ভ হয়, জননী ভগবতীকে মূর্ত্তিদান করিয়া তাহার পূজায় গৃহস্থ আপনাকে নিয়োজিত করেন। আবার ধান দুর্ব্বার সম্ভারে একদিন শ্রী ও সম্পদের দেবী কমলার পূজার উৎসবে গৃহীর গৃহ মুখরিত হইয়া ওঠে। এইরূপে কখনো জগদ্ধাত্রী, কখনো দেবী সরস্বতী, কখনো বা তারার উপাসনায় নানা উপযুক্ত উৎসবের আয়োজন হয়। কিন্তু বৎসরের মধ্যে একবার আমাদের এই উৎসব কিসের জন্য? কাহার পূজার উৎসব? এ উৎসবও সেই জননী ভগবতী, জ্ঞান ও চেতনারূপিণী সরস্বতী, শ্রী ও সম্পদরূপিণী লক্ষ্মী, প্রলয় ও রুদ্ররূপিণী তারা--আরো কত নাম করিব?—ইঁহাদেরই উপাসনার উৎসব। এ সকল তো ভিন্ন দেবতা নয়, সকল রূপ যে সেই এক জনেরই। সকল রূপকে এক করিয়া দেখিতে শিখিয়াছি, তাই আমাদের একবারের এই আয়োজন। তাই এই প্রাতঃসন্ধ্যা সমবেত হইয়া হরিনাম গান, এই ব্রহ্মস্বরূপের আরাধনা, করুণাময়ের নিকট প্রার্থনা, এই নিজ নিজ অভিজ্ঞতার ফলবর্ণন এবং পরস্পরের মধ্যে প্রীতির আদান প্রদান।

উৎসবের অর্থ আনন্দ; উৎসবের অর্থ সম্ভোগ। কিন্তু এই উৎসবের সার্থকতা কোথায়? এই সম্ভোগের পরিপূর্ণতা কিসে? মাতৃস্থানীয়াগণ, ভগিনীগণ, আপনারা অনেকেই সাক্ষ্য দিতে পারেন উৎসবের সময় ব্রহ্মমন্দিরে বসিয়া নামগান শ্রবণে আপনাদের চিত্ত পুলকে পূর্ণ হয়, আরাধনার গম্ভীর ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র শরীর রোমাঞ্চিত হয়, বিহ্বল প্রার্থনায় মগ্ন হইয়া আপনারা গভীর তৃপ্তি লাভ করেন; কিন্তু বলিতে পারেন কি

তাহাতেই উৎসব করা সফল হইল? আমার মনে হয় অনেক পরিমাণে হইতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে হয় না। তবে সম্পূর্ণরূপে হয় কিসে? লব্ধ বস্তুর দানে, প্রাপ্ত সম্পদ সকলের সহিত এক হইয়া ভোগ করায়, সকলকে অংশী করায়। কোন জননী বা কোন্ ভগিনী এমন আছেন যিনি বৎসরের অসময়ে একটী আম পাইলে গৃহে যতগুলি প্রিয়জন আছেন ততটী ভাগ না করিয়া আপনার মুখে সবটা তুলিতে পারেন? শুধু তাই নয়, যদি কাহারও সন্তান বা স্বামী বিদেশে থাকেন তিনি হয়তো নিজেকে একেবারেই বঞ্চিত করেন। আবার কাহারও নূতন গৃহ হইলে তিনি পরিজনবর্গ যে যেখানে আছেন সকলকেই বলিয়া থাকেন 'তোমরা একবার এস, ভগবানের কৃপায় আমার নূতন গৃহ হইয়াছে, একবার পদধূলি দিয়া যাও, এস একবার সকলে মিলিয়া ভোগ করি।' আহার পরিচ্ছদ একা ভোগ করিয়া কেহ সুখী হয় না, গৃহ সম্পদ একাকী ভোগ করিয়া সুখী হয় না, তবে উৎসব—ব্রহ্ম-সম্পদ—একা ভোগ করিয়া সুখী হইবে কিরূপে, সে ভোগ সম্পূর্ণ হইবেই বা কি করিয়া? প্রকৃতির মধ্যে ব্রহ্মকে দর্শন করি, জীবের মধ্যে ব্রহ্মকে দর্শন করি; গৃহের বাহির হইয়া যখন জননী প্রকৃতির সঙ্গে যোগসাধনের চেষ্টা করি অসংখ্য তারা ও সূর্য্য চন্দ্র সমন্বিত অনন্ত আকাশের দিকে চাহিয়া বাক্যরহিত হই; স্নিগ্ধ শীতল বাতাস যখন শরীরে আসিয়া লাগে ও সকল দেহতাপের অবসান করে তখন হরিনামে অন্তরের জ্বালাও দূর করিবার প্রয়াস পাই; শালবনের গভীর গাম্ভীর্য্য অবলোকন করি, তখন তাহাতে সেই অসীম গম্ভীরের আভাস পাইয়া চিত্ত স্তম্ভিত হয়; গিরিনদীর শান্তস্রোত ও মৃদুধ্বনি শুনিলে তাঁহারই শান্তি আসিয়া মনকে অধিকার করে; উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে মহিমাময় চিরতুষারের শোভা দেখিয়া আকুল আনন্দে আবিষ্ট হই; আবার লোকালয়ে আসিয়া মানুষের মধ্যে ব্রহ্মের আরও বিচিত্র প্রকাশ দেখিতে পাই; ভাই ভগ্নীর নিঃস্বার্থ অহৈতুক ভালবাসা, অসহায় সন্তানের জন্য মাতৃহৃদয়ের অপূর্ব্ব করুণা, দুঃখী ও কাঙ্গালের জন্য দয়াবানের বিগলিত স্নেহধারা, আবার দীনের জন্য দীনেরই নিঃস্বার্থ ত্যাগ এসব দেখিলেও সেই এক জনেরই কথা মনে পড়ে! কিন্তু এই রস প্রাপ্তি ও আনন্দ একা ভোগ করিয়া তৃপ্ত হওয়া যায় না। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই একটা আক্ষেপ আসিয়া উপস্থিত হয় 'আহা এই দৃশ্যটী আমি দেখিতেছি, কবে আমার পিতা মাতাকে আনিয়া দেখাইতে পারিব; এই জিনিষটীর ভিতরে ভগবানের প্রকাশ এমন স্পষ্টরূপে বুঝিতেছি, কবে আমার ভাই বোনকে আনিয়া বুঝাইতে পারিব; এই লোকটীর ভিতরে ঈশ্বরের এমন পরিচয় পাইয়া সুখী হইতেছি কবে আমার অমুককে আনিয়া ইঁহাকে দেখাইতে পারিব।' এই অন্তরগত আক্ষেপ দ্বারা চালিত হইয়া যখন মানুষ আপনার লব্ধ বস্তু ও ভোগ্য সম্পদ আরও পাঁচজনের সঙ্গে ভোগ করিতে প্রস্তুত হয়, এবং সেই

'পাঁচজন' যখন পরিবার পরিজনের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া দেশবাসীতে ও বিশ্ব-মানবে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে তখনই উৎসব সার্থক হয়, এবং সম্ভোগ পরিপূর্ণতা লাভ করে। তবে কি এখন আমাদের নিজ নিজ ব্যক্তিগত সম্পদের দিকে চাহিয়া আরও কয়জনকে সে সম্পদে অধিকার দিয়াছি তাহা দেখিবার সময় হয় নাই? ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া উপাসনা সঙ্গীতে তৃপ্ত হই, আরও কয়জনকে সে তৃপ্তির অধিকারী করিবার জন্য এখানে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছি? একদিন হরিকে ডাকিয়া বিপদে ত্রাণ পাইয়াছি, কয়জনকে সেই ত্রাণের উপায় জানাইবার জন্য হরির সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিতে ব্যস্ত হইয়াছি? একদিন মহা দুঃখের দিনে দয়াময়কে ডাকিয়া প্রাণ শীতল ও শান্ত হইয়াছে, তেমন দুঃখে প্রতিনিয়ত কত মানুষই পড়িতেছে কিন্তু কয়জনকে সেই শান্তির পথ বলিয়া দিতে দয়াময়ের নাম চিনাইয়াছি? সংসারে এমন দুর্ভাগা অনেক আছে যারা সে নাম পর্য্যন্ত লইতে শেখে নাই; আমাদের এমন কোন পুণ্যফল আছে যাহার বলে আমরা আর কিছু পারি আর না পারি হরির নাম লইতে শিখিয়াছি? আমাদের কোন গুণে নয়, কিন্তু ভগবান্ নিজ কৃপাগুণেই আমাদের এতটা সৌভাগ্যবান করিয়াছেন। তবে জগতের ভাই বোনকে তাহাতে ভাগ না দিয়া একা ভোগ করিব কিরূপে? বাইবেলে একটী আখ্যান আছে—এক প্রভু বিদেশে যাইবার সময় তাঁহার দুইটী ভৃত্যের একজনকে একটী মুদ্রা ও অপর জনকে দশটী মুদ্রা দিয়া গেলেন। যাহাকে একটী মুদ্রা দিলেন সে ব্যক্তি তাহা প্রভু না ফেরা পর্য্যন্ত নিরাপদ করিয়া রাখিবার জন্য মাটির ভিতরে পুঁতিয়া রাখিল। আর যাহাকে দশটী মুদ্রা দিয়া গেলেন সে তাহা নানা উপায়ে খাটাইয়া বিশ মুদ্রা করিল। তারপর যখন প্রভু বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিলেন এবং ভৃত্যদ্বয়কে সম্মুখে ডাকিলেন তখন শেষোক্ত ব্যক্তি বলিল, প্রভু আপনি আমাকে দশটী মুদ্রা দিয়া গিয়াছিলেন আমি তাহা নানারূপে খাটাইয়া বিশ মুদ্রায় পরিণত করিয়াছি। ইহা শুনিয়া প্রভু বলিলেন, হাঁ তুমি যোগ্যব্যক্তি বটে; অতএব এ বিশ মুদ্রা তোমারই রহিল; আমি আর ইহা ফিরিয়া লইব না। আর প্রথমোক্ত ব্যক্তি বলিল, প্রভু 'আপনি আমায় এই এক মুদ্রা দিয়া গিয়াছিলেন; আপনি চলিয়া যাইবার পর আমি ইহা মাটিতে পুঁতিয়া রাখিয়াছিলাম, কি জানি যদি ইহা কোনরূপে নষ্ট হইয়া যায় বা অপহৃত হয়। এই দেখুন ইহা কেমন নিরাপদে আছে।' এই কথা শুনিয়া প্রভু তাহার উপর বিরক্ত হইলেন এবং অযোগ্য দেখিয়া সে মুদ্রাটীও ফিরিয়া লইলেন। কে বলিতে পারে, আমাদের প্রভু যিনি এমন করিয়া দুই হাতে আমাদিগকে সম্পদ ঢালিয়া দিয়াছেন, তিনিও বানরের গলায় মুক্তাহারের ন্যায় অযোগ্যতা দেখিয়া আবার তাহা ফিরাইয়া লইবেন না? তবে আসুন আমরাও এ সম্পদের উপযুক্ত হই; ক্ষুদ্র বৃহৎ, যোগ্য অযোগ্য সকলেই চেষ্টা করি প্রাপ্ত সম্পদ সকলের সহিত এক হইয়া

ভোগ করিতে. জননীর হাতের অন্ন সকলকে দিয়া খাইতে।

"যে শুনেছে নিজকর্ণে বিধাতার ডাক,
সে কি বলে অন্ধগুলা পথে পড়ে থাক?
প্রত্যেক অঙ্গুলী দিয়া প্রতি অঙ্গ তার,
কতবার পিছে চাহে থামে কতবার;
পথিনিদ্রা, মিছে খেলা সম্ভবে কি তায়?
সুপ্তজনে না জাগায়ে সে কি আগে যায়?
বিতরিয়া সাথীদের চলে ধীরে ধীরে,
লয়ে যায় সহস্রেরে আলোকের তীরে।"

আসুন, এই আলোকের তীরে নিজেরা উপস্থিত হইবার জন্য এবং সহস্রকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার জন্য আমরা প্রস্তুত হই। তবেই উৎসব করা সার্থক হইবে। বিধাতা সহায় হউন।

নির্ভরপ্রিয়া ঘোষ।

EQUALITY AND RIGHTS.

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

দ্বিতীয় নালিশ তিনি উচ্চশিক্ষার বিরোধী ছিলেন। তাঁহার গঠিত Victoria Schoolই তাঁহার নমুনা!' কি ভাব লইয়া Victoria School খোলা হইয়াছিল, তাঁহার নারীজাতি সম্বন্ধে কি মত ছিল ও তিনি উচ্চ শিক্ষার বিরোধী ছিলেন কি না, তাহা তাঁহার লণ্ডনে 'ভিক্টোরিয়া ডিস্কসন সোসাইটির' সভাপতিত্বের বক্তৃতা পড়িলে বোঝা যায়—"লোকে বলিয়া থাকে যে, তাঁহার দেশীয় লোকেরা স্ত্রী জাতির সত্ব ও অধিকার সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। তিনি এ কথা সত্য মনে করেন না, তবে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের অবস্থার মধ্যে এমন সকল বিষয় আছে, যাহাতে এরূপ নিন্দা অনেকটা ঠিক। প্রাচীন কালের হিন্দুসমাজ যেরূপ ছিল, আজ আর সেরূপ নাই। এমন এক সময় ছিল, যে সময়ে স্ত্রী ও পুরুষ একত্র মেশামেশী করিতেন, উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিতা হইতেন, এবং নিজের স্বামী নিজে মনোনীত করিতেন। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। সময়ে সময়ে ভারতের নারীগণ এতদূর স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতেন যে, এদেশের সভ্যতাও ততদূর অগ্রসর হইতে পারে না।—বর্ত্তমান ভারতের মধ্যে প্রাচীন ভারতের ভাব দেখা যায় না।—সমুদায় দোষের মূলে বিদ্যালোকের অভাব। যদি ভারতের নারীগণ উপযুক্ত বিদ্যালোক লাভ করেন, তাঁহারা নিজেই এই সকল সদোষ ব্যবহার অপনয়ন করিতে সমর্থ হইবেন। বিধবা হইয়া কৃচ্ছ্র সাধনে জীবনাতিপাত করা, বিদ্যালোক লাভে বঞ্চিত করা, এ সমুদায়ই তাঁহারা ভগবদিচ্ছা মনে করেন, সুতরাং বিদ্যালোকে তাঁহাদিগকে উন্নত করা একান্ত প্রয়োজন। নারীগণের চিত্ত হইতে অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিতে পারিলে কুসংস্কারাদি সহজে উৎপাটিত হইবে, সত্য পবিত্রতা শান্তির প্রবাহ প্রবিষ্ট হইবার জন্য সহস্র দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে।—ভারতের নারীগণের চরিত্র সংস্কৃত করিতে গেলে, তাঁহাদিগের মধ্যে যে সকল উৎকৃষ্ট উপাদান আছে, তৎপ্রতি উপেক্ষা করিলে চলিবে না। ইংলণ্ডের সভ্যতার প্রতি তাঁহার আদর ও সম্ভ্রম আছে, কিন্তু এ

দেশের আচার ব্যবহার ভারতে প্রচলন করিয়া দেশীয়গণকে নীচ করিয়া ফেলা কখন সমুচিত নয়। শিক্ষা অসাম্প্রদায়িক, উদার, খাঁটি এবং কার্য্যোপযোগী হওয়া চাই। সেইরূপ শিক্ষা, যেরূপ শিক্ষাতে তাঁহারা উন্নত মাতা, ভগ্নী, কন্যা ও পত্নী হইতে পারেন।"

উপবাস দ্বারা রোগ চিকিৎসা।

যতই আধুনিক চিকিৎসকগণ শরীরের ক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতেছেন ততই তাঁহারা স্বাভাবিক উপায়ে বিনা ঔষধ প্রয়োগে কঠিন কঠিন ব্যাধি আরোগ্য করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। এই সকল উপায়ের মধ্যে উপবাস একটী প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে।

উপবাস দ্বারা রোগ চিকিৎসা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে উপবাস আমরা কি অর্থে ব্যবহার করিতেছি তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক।

কোন প্রকার খাদ্যদ্রব্য (তরল বা কঠিন) অহোরাত্র পান বা ভক্ষণ না করার নাম একদিন উপবাস। খাদ্যদ্রব্য আমরা পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছি—যথা, আমিষ জাতীয়, স্নেহ-জাতীয়, শালি-জাতীয়, লবণ-জাতীয় ও জল। উপবাস করিতে হইলে আমিষ, স্নেহ, শালি ও লবণ ভোজন নিষিদ্ধ। কেবল আবশ্যক মত জল পান করা যাইতে পারে। অবশ্য জলের সহিত যে সামান্য লবণ দ্রবভাবে বর্ত্তমান থাকে তাহাতে উপবাসের বিশেষ কোন বাধা হয় না। তবে রোগবিশেষে পরিস্রুত জল (Distilled water) ব্যবহার করিলে উত্তম ফল পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদে "লঙ্ঘন" শব্দ উপবাসের স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। লঙ্ঘনের মধ্যে উপবাস ও আরও অন্যান্য প্রকার প্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পাঠকপাঠিকাগণের অবগতির জন্য তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

লঙ্ঘন শব্দার্থ—

যৎকিঞ্চিল্লাঘবকরং দেহে তল্লঙ্ঘনং স্মৃতম্।

যে কোন দ্রব্য বা প্রক্রিয়ার দ্বারা শরীর লঘুতা প্রাপ্ত হয় তাহাকেই লঙ্ঘন কহে।

লঙ্ঘন সংখ্যা—

চতুঃপ্রকারা সংশুদ্ধিঃ পিপাসা মারুতাতপৌ।
পাচনান্যুপবাসশ্চ ব্যায়ামশ্চেতি লঙ্ঘনম্॥

চারি প্রকার সংশোধন (বমন, বিরেচন, আস্থাপন ও শিরোবিরেচন) পিপাসা, বায়ু, আতপ, পাচন, উপবাস ও ব্যায়াম এই সকল লঙ্ঘন পদবাচ্য অর্থাৎ ইহারা শরীরের লঘুতা সম্পাদনকারী।

লঙ্ঘনের ফল—

লঙ্ঘনেন ক্ষয়ং নীতে দোষে সংধুক্ষিতেঽনলে।
বিজ্বরত্বং লঘুত্বঞ্চ ক্ষুচ্চৈবাস্যোপজায়তে॥

উপবাস দ্বারা দোষক্ষয় হইলে এবং অগ্নি প্রদীপ্ত হইলে জ্বরনাশ, শরীর লঘু এবং ক্ষুধা হইয়া থাকে।

অসুস্থ শরীরে উপবাস স্বাভাবিক চিকিৎসা।

মনুষ্য ব্যতীত যখন কোন প্রাণীর রোগ হয়—তখনই তাহাদের আহারে অনিচ্ছা লক্ষণটী প্রথমেই দেখা যায়।

মনুষ্য মধ্যে প্রায়ই প্রকৃতির এই সাধারণ নিয়মটীর বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। যেখানে যতদূর সভ্যতা বিস্তার লাভ করিয়াছে, সেইখানেই রোগের সময় উপবাসের পরিবর্ত্তে নানারূপ আহার্য্যের ভোগ প্রাচুর্য্য দেখা যায়। মনুষ্য ভিন্ন প্রাণীরা একমাত্র উপবাস দ্বারাই রোগ আরোগ্য করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে কোন ঔষধও আবশ্যক হয় না, বা তাহাদের মধ্যে তৈয়ারী কোন প্রকার বলকারক পথ্যও ব্যবহার হয় না। রুগ্ন অবস্থায় তাহারা নিজ হইতেই ভক্ষণ করিতে বিরত হয়। রোগ আরোগ্যের সহিত তাহাদের ভক্ষণস্পৃহা পুনরায় ফিরিয়া আসে।

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে যাহা অন্যান্য প্রাণীদের পক্ষে স্বাভাবিক, মনুষ্যের পক্ষেও তাহাই নিশ্চয়ই স্বাভাবিক হইবে। কিন্তু মনুষ্য সভ্যতার সহিত বহুদিন যাবৎ এই নিয়মের বিরুদ্ধে কার্য্য করায় তাহার প্রকৃতি পরিবর্ত্তন লাভ করিয়াছে।

রোগের অবস্থায় মনুষ্যকে খাইতে দেওয়া প্রকৃতিবিরুদ্ধ কার্য্য। বিবিধ ঔষধ প্রয়োগ যে বিষবৎ কার্য্য করিয়া আরোগ্যকে আরও সুদূরপরাহত করে এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ইউরোপ ও আমেরিকা দেশে অনেকেই উপবাস দ্বারা রোগ দূরীকরণে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। অধুনা উপবাস প্রক্রিয়া রোগ আরোগ্য করিবার একটী প্রকৃষ্ট উপায়রূপে পরিগণিত হইয়াছে এবং এইরূপ উপবাস দ্বারা অধিকাংশ স্থলে সুফল দেখা গিয়াছে।

আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর হইল আমেরিকাতে ডাক্তার হেনরি ট্যানার চল্লিশ দিন উপবাস দিয়াছিলেন। প্রথম দুই সপ্তাহ তিনি জল পর্য্যন্ত পান করেন নাই। ইহাতে তাঁহার শক্তির হ্রাস হয়, কিন্তু তারপর হইতে যখন তিনি জল গ্রহণ করিতে লাগিলেন তখন ক্রমশঃ তাঁহার শরীরে বলবৃদ্ধি হইতে লাগিল। প্রথমতঃ জল গ্রহণ করিয়া তিনি বাজী রাখিয়া একটী লোকের সহিত দৌড়ান; এই লোকটীর ধারণা ছিল যে উপবাস করিলে বলক্ষয় হয়। কিন্তু এইরূপ দৌড়ানর পর তাহার ভ্রম দূর হয়। র‍্যায়াল্টো (Rialto) সহরের ষাট বৎসরের এক বৃদ্ধ (Ambrose Taylor) বাত রোগাক্রান্ত হইয়া উপবাস করিতে আরম্ভ করেন। বাতরোগ তাঁহাকে শয্যাগত করিয়া ফেলে। প্রথম তিন চারি দিন উপবাস করিতে তাঁহার বড়ই ক্ষুধা বোধ হইতে লাগিল এবং পঞ্চম দিবসে তাঁহার প্রায় পক্ষাঘাত হইয়া গেল। ইহাতে তিনি বড়ই ভীত হইলেন, কিন্তু চিকিৎসকগণ তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন যে রোগ দূরীকরণার্থ তাঁহার শরীরের স্নায়ু ও পেশীসমূহ যে কার্য্য করিতেছে তাহারই ফলে এইরূপ হইয়াছে। কিছুদিন পরে আবার একবার পক্ষাঘাতের আক্রমণ হয় এবং তাহার পরে আরও একবার পক্ষাঘাতে তাঁহাকে জখম করিয়া ফেলে; কিন্তু তথাপি তিনি উপবাসে নিরস্ত হইলেন না। আরও কিছুদিন পরে তিনি দেখিলেন যে তাঁহার বাতগ্রস্ত পদটী বেশ সরল হইয়া পড়িয়াছে এবং অনায়াসেই তিনি তাহা

নাড়িতে পারিতেছেন। ২০ দিনের দিন তাঁহার পক্ষাঘাত ও বাতরোগ দুই-ই সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

মানব-দেহ কতকগুলি কোষের সমষ্টি মাত্র। যখনই এই কোষগুলি কার্য্য করে তখনই ইহারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যাইতে থাকে এবং পুরাতন কোষগুলির স্থানে নূতন কোষের উৎপত্তি হয়। বৈজ্ঞানিকের ভাষায় এই সমস্ত ব্যাপারটীকে Metabolism কহে। ক্ষয়প্রাপ্ত কোষগুলিকে যতশীঘ্র সম্ভব শরীর হইতে দূর করিয়া ফেলা আবশ্যক; নচেৎ এইগুলি বিষে পরিণত হয়। এইজন্য আমাদের শরীরের মধ্যে কতকগুলি যন্ত্র আছে যদ্দ্বারা অনাবশ্যক বস্তু শরীর হইতে দূরীকৃত হয়। মল-নাড়ী ও মূত্র-গ্রন্থি দ্বারাই প্রধানতঃ শরীরের ময়লা নিষ্কাসিত হয়। ঘর্ম্মদ্বারাও শরীর মধ্যস্থ বিষ প্রভূত পরিমাণে বাহির হইয়া যায়। প্রশ্বাস বায়ু দ্বারা ফুস্‌ফুসের অভ্যন্তরস্থ অনেক বিষ নির্গত হইয়া যায়। সর্দ্দিরূপে নাসারন্ধ্র দিয়াও অপকারী পদার্থসমূহ বাহির হইয়া যায়।

অধিকন্তু আমরা শরীর বিজ্ঞান আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে ক্ষয়ের জন্য যেমন কার্য্যের প্রয়োজন সেইরূপ উহার পূরণের জন্য বিশ্রামেরও আবশ্যক। যেখানেই কার্য্য হইতেছে সেইখানেই আবার বিশ্রামের প্রয়োজন। সেই জন্যই ভগবানের রাজত্বে ক্লান্তি নিবারণের জন্য নিদ্রার বিধান। কিন্তু কেহ কেহ বলিতে পারেন, এই শরীরেরই ভিতর ত আমরা এই নিয়মের বৈষম্য দেখিতে পাইতেছি। আমরা যত কালই জীবিত থাকি না কেন তত কালই হৃৎপিণ্ড কার্য্য করিতে থাকে। ইহার কার্য্যের ত বিরাম দেখি না। ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, যদিও আমাদের হৃৎপিণ্ড মিনিটে ৭২ বার ধরিয়া সঙ্কোচন ও প্রসারণ কার্য্য সম্পন্ন করিতে থাকে তথাপি প্রত্যেক সঙ্কোচন ও প্রত্যেক প্রসারণের মধ্যে কিছুক্ষণ হৃৎপিণ্ড বিশ্রামলাভ করে।

পূর্ব্বে যে Metabolismএর নিয়ম দেওয়া গেল সেই নিয়মের উপরেই ব্যায়াম ও উপবাস দুইয়েরই ফলাফল নির্ভর করে। যতশীঘ্রই কোষগুলির ক্ষয় হয়, ততশীঘ্রই নূতন নূতন কোষের উৎপত্তি হয়। কিন্তু ব্যায়াম বিষয়েও সাবধানতা ও বিবেচনার সহিত কার্য্য করা উচিত। কারণ কেহ যদি অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতার সহিত ব্যায়াম করে তাহা হইলে উপকারের পরিবর্ত্তে অপকারই হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, ইহাতে শরীরের কোষগুলি এতশীঘ্র ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে যে সেইগুলি শরীর হইতে সম্পূর্ণরূপে বাহির হইয়া যাইবার সময় পায় না। কেহ যদি অত্যন্ত বেগের সহিত দৌড়ায়, তাহা হইলে আমরা দেখি যে কিছুক্ষণ পরেই সে হাঁপাইতে থাকে এবং তাহার মুখমণ্ডল ও সর্ব্বশরীরের আকৃতিও পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। ইহার কারণ এই যে অত্যধিক পরিশ্রমের জন্য তাহার শরীরে যে সমস্ত ক্ষয়প্রাপ্ত পদার্থ একত্রিত হয়, তাহা উপযুক্তরূপে শরীর হইতে বাহির হইয়া যাইতে পারে না। কিন্তু যদি এইরূপ দৌড়ানর পর সেই ব্যক্তি

কিয়ৎকালের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার শরীরের গ্লানি ও শ্রান্তি সমস্তই দূরীভূত হয়; কারণ ঐ বিশ্রাম সময়ে তাহার শরীরস্থ অতিরিক্ত ক্ষয়প্রাপ্ত পদার্থগুলি বাহির হইয়া যায়।

আমাদের ভোজন বিষয়েও উপর্যুক্ত যুক্তি সম্যক্‌রূপে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। আধুনিক সভ্যজগতের পদ্ধতি অনুসারে খাদ্য গ্রহণ করায় আমাদের শরীর মধ্যস্থ পরিপাক যন্ত্রগুলির এরূপ পরিশ্রম হয় যে ইহাদেরও বিশ্রামের আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু যদি ইহাদিগকে উপযুক্ত বিশ্রাম লাভে বঞ্চিত করা হয় তাহা হইলে আমাদের শরীরে উৎকট উৎকট ব্যাধির উৎপত্তি হয়। ব্যাধি হইলেই বুঝা উচিত যে আমাদের শরীরের যন্ত্রগুলির বিশ্রামের প্রয়োজন। এইরূপ ভাবে বিশ্রাম হইলে শরীর মধ্যস্থ বিষগুলি আপনা আপনিই বাহির হইয়া যায় ও দেহও নিরাময় হয়। কিন্তু যদি এই স্বাভাবিক চিকিৎসাপ্রণালী অবলম্বন না করিয়া আমরা অন্যায়রূপে ভেষজদ্রব্য প্রয়োগদ্বারা রোগ দমন করিতে যাই তাহা হইলে যুক্তি বিরুদ্ধ কার্য্যই করিয়া থাকি।

এক্ষণে কি কি রোগী বিশেষতঃ উপবাস দ্বারাই আরোগ্যলাভ করিতে পারে আমরা তাহা বিশদভাবে আলোচনা করিব। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে উপবাসের বিধি ও কতদিন উপবাস করা যুক্তিসঙ্গত, সে সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা বলিয়া লইব। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে দুই তিন দিন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় ৭০।৮০ বা ততোধিক দিবস উপবাস করা যাইতে পারে। কিন্তু কোন্ রোগে কতদিন উপবাস করিতে হইবে সে সম্বন্ধে কোনও নির্দ্দিষ্ট নিয়ম বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে না। রোগীর শরীরের সামর্থ্য ও রোগের অবস্থার উপরে উপবাসের সময় বেশী ও কম হয়। কিন্তু সাধারণ লোকেও যাহাতে চিকিৎসকের সাহায্য ব্যতীত উপবাস করিতে পারে সেই জন্য আমরা বিশেষভাবে আলোচনা করিব।

শরীরের কোন্ কোন্ অবস্থায় উপবাস করা উচিত—যখন আমরা বুঝিতে পারি যে কেবলমাত্র আহার্য্যের ভোগ প্রাচুর্য্য-বশতঃ রোগ হইয়াছে অর্থাৎ শরীরে মেদ বৃদ্ধি হইয়াছে, প্রস্রাবে শর্করা বা এলবুমেন হইয়াছে, যকৃতের ক্রিয়া বিকৃত হইয়াছে, অন্ত্র মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের অস্বাভাবিক পচন জন্য উদরাময় হইয়াছে, অজীর্ণতা জন্য বুকজ্বালা উদ্গার ইত্যাদি উপসর্গ সদাই কষ্ট দিতেছে, প্রস্রাব ঘোলা হইয়াছে বা মূত্র-নালীতে ময়লা জমায় তাহাদের আক্ষেপ জন্য কষ্ট (Renal colic) হইতেছে,—এই সকল অবস্থায় উপবাসের দ্বারা চিকিৎসিত হইলে রোগী অচিরে আরোগ্য লাভ করিতে পারে। এই সকল রোগে অধিক দিন যাবৎ উপবাস আবশ্যক হয়।

কিন্তু যদি রোগী কৃশ ও দুর্ব্বল হয় এবং তাহার অজীর্ণতার সকল লক্ষণই উপস্থিত থাকে, তাহা হইলে কেবল ২।৩ দিন উপবাস করিতে পারিবে এবং উপবাসের দ্বারা তাহার পরিপাক-যন্ত্রাদিকে বিশ্রাম দিতে সক্ষম হইবে। এই বিশ্রামের ফলে পরিপাক-যন্ত্রাদিতে নব বলসঞ্চার

হইবে এবং পুনরায় অল্প পরিমাণে পুষ্টিকর লঘু পথ্য দ্বারা তাহার দেহে অধিক বল সঞ্চয় হইবে এবং রোগীও শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিবে।

যাবতীয় ক্ষয়রোগে উপবাস দ্বারা চিকিৎসা নিষিদ্ধ। তবে কেবলমাত্র পরিপাক যন্ত্রাদিকে বিশ্রাম দিবার জন্য অল্প সময়ের জন্য উপবাস করিতে দেওয়া যাইতে পারে।

উপবাসকালীন শরীরের অবস্থা—সাধারণতঃ মনুষ্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রত্যহ ২।৩।৪ বার পর্য্যন্ত আহার করিয়া থাকে। নিজ নিজ আহারের সময় আসিলেই একটু ক্ষুধা বোধ হয় এবং কিছু খাইবার পরই তাহা নিবৃত্ত হয়। ইহাকে অভ্যাস ক্ষুধা বলা হইয়া থাকে। শরীর রোগাক্রান্ত হইলে এই ক্ষুধা বোধ লোপ পায়, কিন্তু আমরা প্রায়ই অভ্যাসবশতঃ ক্ষুধা না থাকিলেও খাইয়া থাকি। এই প্রকারে আমরা নিজে নিজেই নিজ রসনার পরিতৃপ্তির সহিত রোগ বৃদ্ধি করিয়া থাকি এবং অকাল-বার্দ্ধক্য, জরা ও মৃত্যুকে শীঘ্রই আলিঙ্গন করিতে বাধ্য হই।

উপবাস আরম্ভ করিবার পুর্ব্বে এ বিষয়ে চিত্তে দৃঢ় সঙ্কল্প রাখা সর্ব্বপ্রথমে কর্ত্তব্য। সঙ্কল্প ব্যতীত এই মহাব্রত কদাপি সমাধা হইবে না। সর্ব্বপ্রথমে মনে সঙ্কল্প করিতে হইবে—যে অত্যধিক আহারে আমার শরীরে রোগ প্রবেশ করিয়াছে, তাই অনাহার দ্বারা সেই শরীরকে রোগ হইতে মুক্ত করিতে হইবে। ক্ষুধার সময় উপস্থিত হইলে, সেই সময় উত্তীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত—অন্য কার্য্যে চিত্ত নিবিষ্ট রাখিতে হইবে;—ইহাই প্রথম ও সর্ব্বপ্রধান সঙ্কল্প। পিপাসা বোধ হইলে ঈষদুষ্ণ জল আবশ্যক মত পান করিবে। জল প্রত্যেক ঘণ্টাতেও পান করা যাইতে পারিবে। প্রথমতঃ ২।৩ দিন বিশেষ কষ্ট বোধ হইবে, ক্ষুধা বড়ই কষ্ট দিবে এবং খাইবার ইচ্ছাও বলবতী হইবে। শরীরের মধ্যস্থিত রোগের বিষের অনুপাতে জিহ্বা অপরিস্কৃত হইবে, মুখে দুর্গন্ধ হইবে এবং ক্ষুধাও ক্রমশঃ লোপ পাইবে এবং খাদ্যদ্রব্যে অরুচি আসিবে। পরে উপবাস দ্বারা শরীরস্থ বিষ বহির্গত হইয়া গেলে পর জিহ্বা পরিস্কৃত হইবে, মুখের দুর্গন্ধ দূর হইবে এবং পুনরায় খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ পাইবে। কিন্তু এই ক্ষুধা অতি সামান্য স্বাভাবিক আহার্য্য দ্বারা নিবৃত্ত হইবে ও তাহাতেই রোগী আনন্দ বোধ করিবে। এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলেই উপবাস শেষ করা উচিত।

কেবল যে উপবাস দ্বারা রোগ আরোগ্য হয় তাহা নহে। এই সঙ্গে স্বাভাবিক অন্যান্য বিধিও প্রয়োগ করিতে হয়। রোগী যতদূর সম্ভব মুক্ত বায়ুতে অবস্থান করিবে। যথেষ্ট নিদ্রা যাইবে এবং প্রচুর পরিমাণে সূর্য্যোলোকও ভোগ করিবে।

উপবাসের সময় প্রত্যহ সহ্যমত স্নান করিতে হইবে। শরীর দুর্ব্বল হইলে কেবলমাত্র গাত্রমার্জ্জনী ভিজাইয়া গা মুছিয়া ফেলিবে। ক্রমশঃ ঈষদুষ্ণ জলধারা বেশ করিয়া স্নান করিতে পারিবে ও সহ্য

হইলে ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ফল লাভ করিবে।

প্রচুর পরিমাণে জল খাইলে উপবাসের উপকারিতা পূর্ণমাত্রায় লাভ করা যায়। এই জল দ্বারা শরীরস্থ পেশী ও রক্তের শিরাসমূহও বিধৌত হয় এবং শরীরাভ্যন্তরস্থ ক্লেদসমূহ পরিস্কৃত ও শরীর হইতে নিষ্কাসিত হইয়া যায়।

উপবাসের অবস্থায় কোষ্ঠ স্বভাবতঃই কঠিন হয় এবং ক্রমশঃ বদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু পেট পরিষ্কার রাখা সর্ব্বপ্রথমে আবশ্যক। এইজন্য ঈষদুষ্ণ জলদ্বারা প্রত্যহ অন্ত্র ধৌত করা উচিত।

সময় সময় উপবাসের প্রথম কয়েকদিন পরিপাকযন্ত্রমধ্যে পূর্ব্বকার যে সকল খাদ্য-দ্রব্য থাকে তাহারা অস্বাভাবিকরূপে শীঘ্রই পচিয়া উঠে ও অনেক গ্যাস উৎপন্ন করে। এইজন্য পেটে বেশী কামড়ানি হইতে পারে। ইহার প্রতিকারের জন্য পেটে গরম জলের সেঁক ঈশদুষ্ণ জল দ্বারা অন্ত্রধৌত প্রভৃতি করিবে।

কখন কখন উপবাসকালে রোগীর সামান্যরূপ শরীরের তাপ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এজন্য কোন চিন্তার কারণ নাই। অপর পক্ষে যাহারা দুর্ব্বল ও যাহাদের রক্তাল্পতা আছে তাহাদের ১।২ ডিগ্রি পর্য্যন্ত শরীরের তাপ কম হইয়া যায়।

উপবাসকালে অনেকের শরীর হইতে যে ঘর্ম্ম নির্গত হয় তাহাতে খুব দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন রোগগ্রস্ত ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকারের দুর্গন্ধ হইতে পারে। এই ঘর্ম্ম দ্বারা শরীরস্থ রোগের বিষ সকল বহির্গত হইয়া যায়।

৪।৫ দিন উপবাসের পর অনেকের মুখ-মধ্যস্থিত লালার পরিবর্ত্তন হয়। মুখ শুষ্ক হইয়া যায়, লালা ঘন, চটচটে ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়। পিত্ত বমন হইতেও দেখা যায়। এই সকল উপসর্গ দ্বারা কোন প্রকার ভয় নাই।

উপবাস কালীন বিপদ—সাধারণতঃ উপবাসে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। তবে যদি নাড়ীর গতি দ্রুত হয় বা খুব মৃদু হয়, তাহা হইলে হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে এবং সেই সময়ে উপবাস ভঙ্গ করা উচিত।

যদি মনের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় এবং উপবাস করিতে ভয় বোধ হয় তাহা হইলে উপবাস ভঙ্গ করিবে। অধিক দুর্ব্বলতা বোধ হইলে অর্থাৎ সামান্য চলাফেরা করিতে কষ্ট বোধ হইলে এবং রোগীকে বাধ্য হইয়া সদা সর্ব্বদা শুইয়া থাকিতে হইলে উপবাস ক্ষান্ত করিবে।

যখন শরীরস্থ সূক্ষ্ম অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হয় এবং জীবনীশক্তি কমিতে থাকে তখন উপবাস বন্ধ করা উচিত।

যখন দুই দিন উপবাসের পর প্রত্যহ দুই তিন পাউণ্ড পর্য্যন্ত শরীরের ওজন কমিয়া যায় তখন উপবাস ভঙ্গ করা বিধেয়।

সাধারণতঃ উপবাসকালে মনের অবস্থা অতি সুন্দর থাকে—মন বেশী কার্য্যক্ষম হয় এবং জটিল বুদ্ধির কার্য্য সহজে সমাধা হয়। কিন্তু যদি মনের ভাব বিকৃত হয় এবং মনের তেজ ক্রমশঃ দুর্ব্বল হয় তাহা হইলে উপবাস বন্ধ করিবে।

ক্রমশঃ।

স্বাস্থ্য-সমাচার।

প্রাপ্তগ্রন্থ।

কেশব জননী দেবী সারদা সুন্দরীর আত্মকথা—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল কাস্তগির প্রণীত—ঢাকা—ভারত মহিলাযন্ত্রে মুদ্রিত মূল্য আট আনা মাত্র।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল কাস্তগির ও তাঁহার পত্নী শ্রীমতী সরলাসুন্দরী কাস্তগির আচার্য্য-মাতা দেবী সারদাসুন্দরীর নিকট হইতে তাঁহার জীবনকাহিনী শুনিয়া শুনিয়া তাহা প্রথমে "মহিলা"তে প্রকাশ করিয়াছিলেন; সেই "আত্মকথার" সহিত অপর কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয় যোগ করিয়া এই পুস্তকখানি প্রকাশ করা হইয়াছে। নূতন আকারের পুস্তকখানি উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া আদ্যন্ত পাঠ করিলাম, পাঠে উপকৃত হইলাম। ঠাকুমার জীবনের কথা তাঁহার নিজের মুখ হইতে শুনিয়া রাখা ভাল হইয়াছে। কেশব-জননীর জীবন হইতে কেশব-চরিত্র কিরূপে প্রকাশ হইয়াছে তাহার অনেক আভাস ইহাতে পাওয়া যায়। পুস্তকখানির জন্য যোগেন্দ্রলাল কাস্তগির ও সরলা দেবীকে ধন্যবাদ দান করি এবং ইচ্ছা করি যে আমাদের পাঠিকাগণ এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পাঠ করেন; কিন্তু এইটুকু বলিয়া এ বিষয় শেষ করিতে পারি না।

আমার মনে হয় ঠাকুমার জীবন ইহাতে কিছুই বলা হয় নাই। তিনি আপনাকে যতটুকু জানিতেন তিনি ততটুকু ছিলেন না। তাঁহার জীবনের সারধর্ম্ম অতি গভীর ছিল—পূজা উপাসনার রীতি পদ্ধতি, ধর্ম্মমতের উদারতা বা সংকীর্ণতা এ সকল গণ্ডীর ভিতরে তিনি আবদ্ধ ছিলেন না। তিনি মাতৃপ্রেম সাধন করিতে করিতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, সকলের স্নেহময়ী জননী হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার প্রেম উচ্চতর ভূমিতে আরোহণ করিয়া কল্যাণ বা মঙ্গলরূপ ধারণ করিয়াছিল। তিনি সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতেন যে, "কখনও কাহার বিরুদ্ধে মন্দভাব পোষণ না করি" ইহা মানবীয় দুর্ব্বলতার রেখামাত্র—প্রকৃতপক্ষে কাহারও বিরুদ্ধে মন্দভাব পোষণ করা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত ছিল না। উপাসনা প্রার্থনাতে তিনি যে উজ্জ্বল প্রকাশের রাজ্যে যাইতেন তাহাতে সাকার নিরাকার প্রভেদ থাকিত না। তিনি আধ্যাত্মিক রাজ্যের এমন স্থান লাভ করিয়াছিলেন যে সেখানে শোক বা বিরহ স্থান পাইত না। তাই মনে হয় ঠাকুমার জীবন লেখা হয় নাই—ঠাকুমার ধর্ম্মজীবনের বিকাশ প্রদর্শন করিয়া একখানি জীবনচরিত হওয়া প্রয়োজন।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

ঢাকা মহিলাসমিতির বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি। দেশের সর্ব্বত্র নারীজাতির উন্নতিকল্পে বিবিধ প্রতিষ্ঠান দ্বারা যে সমস্ত দেশের কল্যাণ সাধিত হইবে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মহিলাসমিতির উদ্দেশ্য সাধনার্থ সমিতির অন্তর্গত কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ খোলা হইয়াছে। ১ম, ধর্ম্মসম্বন্ধীয়—যথা—উপাসনা, প্রার্থনা,

পাঠ, আলোচনা ও সঙ্গীত ইত্যাদি। ২য়, সাধারণ শিক্ষাসম্বন্ধীয় যথা—বয়স্থা নারীগণের উপযোগী নানা প্রকার শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা. এবং ৩য়, বালিকাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য বাঙ্গলার ক্লাস। নারী ও পুরুষে এক হইলেই প্রকৃত উন্নতি হয় ইহা স্মরণ করিয়া আমরা রমণীজাতিকে উন্নতিমার্গে আমাদের সহযাত্রী হইতে আহ্বান করি।

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে, মিঃ কে, এস্, জসাওয়াল্লা অবিশ্রান্ত আন্দোলনের পর কলিকাতার মিউনিসিপালিটিকে গোজাতি সংরক্ষণে মনোযোগী করিয়া তুলিয়াছেন। এখন যাহারা অল্পবয়স্কা গাভী হত্যা করিবে তাহাদিগকে প্রত্যেক গাভীর নিমিত্ত মিউনিসিপালিটিকে ১০মুদ্রা করস্বরূপ প্রদান করিতে হইবে। এই আইন প্রবর্ত্তিত করিয়া কলিকাতা মিউনিসিপালিটি কলিকাতা অধিবাসীগণের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিলেন। আমরা আশা করি যে উক্ত আইন সমগ্র ভারতে প্রচলিত হইবে।

দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারিত হইতেছে কিনা এই প্রশ্ন লইয়া আমরা অনেক সময় আন্দোলন করিয়া থাকি। ১৮৯৭ হইতে ১৯০২ সাল পর্য্যন্ত বিদ্যালয় ও ছাত্র সম্বন্ধে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা তেমন সন্তোষজনক ছিল না। তৎপরে ১৯০২—৭ পঞ্চ বর্ষে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১০৭২১ ও ছাত্রের সংখ্যা ৬২১৫৩৯ বৃদ্ধি হয়। ১৯০৭ হইতে ১৯১২ সনের মধ্যে স্কুলের সংখ্যা ৭৭৪৫ ও ছাত্রের সংখ্যা ৮৯১৯৮০ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। দেশী করদ রাজ্যের প্রজাসমূহ বাদ দিলে কেবল ব্রিটিশ ভারতে ৩১ লক্ষ বালক বালিকা অশিক্ষিত থাকিয়া যায়। গণনা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ১৯০০ সাল হইতে এ পর্য্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার ছাত্রসংখ্যা শতকরা ৫২জন হিসাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে। এসব দেখিয়া আমাদের দেশের শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে একেবারে নিরাশ হইবার কারণ দেখিতেছি না।

আজকাল চীন সাম্রাজ্যে রাজধর্ম্ম লইয়া এক মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। চীন কনফিউসিয়াস প্রচলিত ধর্ম্মনীতিকে রাজধর্ম্মরূপে বরণ করিতে অভিলাষ করেন, কিন্তু ইহার সঙ্গে বিপদ আছে। তিব্বত ও মঙ্গোলিয়া চীনের অধীনস্থ দেশ। তদ্দেশবাসীগণ মহাত্মা কনফিউসিয়াসের অনুবর্ত্তী নহে। সুতরাং কনফিউসিয়াসপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মনীতি চীনসাম্রাজ্যে রাজধর্ম্মরূপে সম্মানিত হইলে তিব্বত ও মঙ্গোলিয়া দেশ ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। এই অনর্থ নিবারণের নিমিত্ত চীনের প্রধান প্রধান নেতৃবর্গ রাজনৈতিক সুবিধার নিমিত্ত সকল ধর্ম্মকেই যোগ্য সম্মান দিতে মনস্থ করিয়াছেন। চীনের অধিবাসীগণ বৎসরে দুই বার মহাত্মা কনফিউসাসের পূজার্থ সমবেত হইবেন ইহা সত্য বটে; কিন্তু চীনের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে পৃথিবীর সকল ধর্ম্মেরই আলোচনা হইবে। যে কারণেই হোক চীনে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় সংসাধিত হইবে জানিতে পারিয়া আমরা পরম পরিতোষ লাভ করিলাম। ইহাকেই কি বেগারের পুণ্যে গঙ্গাস্নান বলে না?
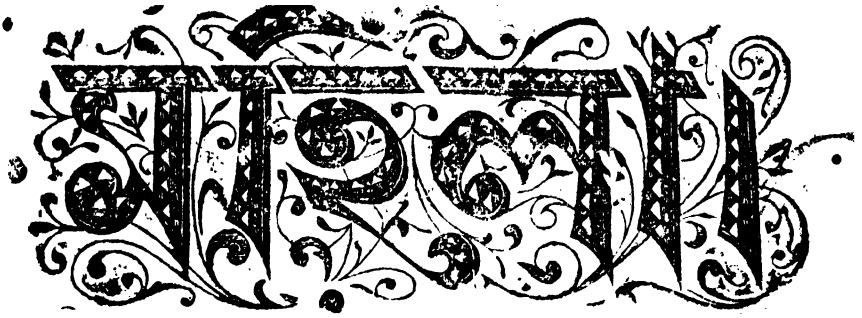
মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ

১৯শ ভাগ] চৈত্র, ১৩২০। এপ্রিল, ১৯১৪। [৯ম সংখ্যা।

প্রার্থনা।

হে পূর্ণব্রহ্ম, তুমি নিত্য জীবন্ত জাগ্রত, তুমি নিত্য ক্রিয়াশীল, পূর্ণ-মঙ্গল। আমরা তোমার জাগ্রতভাব ও ক্রিয়াশীলতার বিষয় যত আলোচনা করি, যত জ্ঞানলাভ করি ততই বুঝিতে পারি তুমি কেমন সর্ব্বত্র প্রেমপূর্ণ হইয়া কার্য্য করিতেছ। জ্ঞান, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত তোমার এই সকল স্বরূপ দর্শন করিয়া কে নীরব, নিষ্ক্রিয় বা উদাসীন থাকিতে পারে! তুমি অনবরত মঙ্গল করিতেছ, এবং যত জড়জীব সৃষ্টি করিয়াছ, সে সকলকেও মঙ্গল সাধনে নিযুক্ত রাখিয়াছ ইহা দেখিয়া আমরা প্রত্যেকে বুঝিতে পারি যে আমরাও তোমার মঙ্গল রাজ্যে মঙ্গল সাধন করিতেই জন্মলাভ করিয়াছি। তোমার কোন পুত্র বা কোন কন্যা যে আপনাকে সামান্য, অযোগ্য বা অকর্ম্মণ্য মনে করিয়া আপনাকে অস্বীকার করিবে তাহার সম্ভাবনা নাই। আপনাকে যদি অকর্ম্মণ্য মনে করি তাহা হইলে কার্য্যত তোমার প্রতি দোষারোপ হয়, একটি নারী বা একটি নরকে তুমি বৃথা সৃষ্টি কর নাই, ইহাতে বিশ্বাস করিলেই আমাদিগকে আত্মসম্মান শিক্ষা করিতে হয়। তাই তোমার চরণে প্রার্থনা করি, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগের বিশ্বাস বাড়াইয়া দেও এবং আশীর্ব্বাদ কর যে আমরা সেই সঙ্গে সঙ্গে যেন আপনাকে মান্য করিতে শিক্ষা করি। তুমি আমাদিগের পিতামাতা পরমেশ্বর নিত্য জাগ্রত ক্রিয়াশীল প্রেমময়, এই সত্যে পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া আমরাও যেন তোমার আদর্শে ও তোমার সাধু সাধ্বী পুত্র কন্যাগণের দৃষ্টান্তে সর্ব্বদা জাগ্রত ক্রিয়াশীল এবং প্রেম-স্বভাব লাভ করিতে পারি এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

আপনাকে জানা।

মানুষের চক্ষু সমস্ত দিন খোলা থাকে,

মানুষের মন অনবরত নূতন নূতন বিষয় জানিতে ব্যস্ত থাকে। যিনি অনেক জানিয়াছেন তিনি আরও অনেক জানিতে ব্যস্ত হন। যত বিষয় সহজে জানা যায় তাহা জানিয়াই যে মানুষ ক্ষান্ত হয় তাহা নয়, বহুকষ্টে যাহার অতি অল্প জানা যায় তাহা জানিতেও মানুষ দিনরাত্র অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতেছে। জল স্থল আকাশ বাতাস প্রভৃতির বিষয় জ্ঞানলাভ করিয়াই মানুষ তৃপ্ত হয় নাই, দূর নক্ষত্রগণের বিষয় জ্ঞানলাভ করিতে কত ব্যস্ত রহিয়াছে। অপর এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা এ সকল বাহিরের বস্তুর জ্ঞানলাভ করাকে অতি সামান্য বিষয় মনে করিয়া থাকেন, বিশ্বের আদি জানিতে ব্যস্ত হন। মহা পণ্ডিত সক্রেটিস বলিলেন "আপনাকে জান"; তখন হইতে মানুষের জানিবার শত সহস্র বিষয়ের মধ্যে নিজেকে জানা একটা প্রধান বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাশ্চাত্য দর্শন শাস্ত্রের পিতা সক্রেটিস কি বিশেষ অর্থে এই কথা বলিয়াছিলেন, তাহা লইয়া অনেক মতভেদ উপস্থিত হয়—এখনও এ বিষয়ে বিভিন্নমত আছে ও চিরদিন থাকিবে; কারণ "আমি" নামে যে বস্তু বা ব্যক্তি আছে তাহা যে ঠিক কি তাহাই সকলে একমত হইয়া স্থির করিতে পারেন না। আমরা দর্শনশাস্ত্রের বিভিন্ন মত লইয়া আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব না, কিন্তু প্রত্যেক লোককেই আপনাকে জানিতে হইবে তাহাই আমাদিগের প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

আমরা সহজভাবে এই কথা বলিতে পারি যে যখন কোন মানুষের বিষয় কোন লোককে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি অমুককে জান? সে লোক যদি বলে "জানি," তাহা হইলে বুঝিতে পারি যে, সে তাহার নাম ধাম বয়স ইত্যাদি জানে এবং হয়ত সে কি ব্যবসায় বা কার্য্য করে, বা কেমন লোক তাহাও জানে। কিন্তু যখন কোন সুপরিচিত লোককে জিজ্ঞাসা করি, "তুমি কি তোমাকে জান?" সে হয়ত কোন উত্তরই দিতে পারিবে না। কারণ সে যে তাহার নিজের নাম ধাম বয়স বা অবস্থার বিষয় জানে তাহা অবশ্য জিজ্ঞাসার বিষয় হইতে পারে না—তাহাকে কোন গূঢ়তত্ত্বের কথা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, যাহার উত্তর দেওয়া তাহার পক্ষে সহজ নয়। যদি পরিচিত লোক এরূপভাবে পরিচয় জিজ্ঞাসা করে তখন অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়, অথবা বলিতে হয় "আমি কে তাহা তো তুমি জান।" প্রকৃতপক্ষে মানুষের সাধারণ পরিচয় জানা অর্থ—তাহার ব্যক্তিত্বের বিষয় জানা—অর্থাৎ সে যে একজন পুরুষ বা নারী, তাহাই জানা। চারিদিকে সহস্র সহস্র লোক রহিয়াছে তাহার মধ্যে একজন পুরুষ বা নারীকে নির্দ্দিষ্টরূপে জানা এক কথা, আর তাহার দ্বারা জনসমাজের কি বিশেষ কার্য্য হইতে পারে বা হইতেছে, তাহা জানা ভিন্ন কথা। সংসার মানুষের নাম ধাম স্থান বা অন্য সকল পরিচয় অধিক চাহে না, চায় কেবল যে সেই বিশেষ ব্যক্তিদ্বারা কি বিশেষ কার্য্য হইতে পারে। যদি মানুষের এই জাতীয় বিশেষত্ব না থাকে, তাহা হইলে তাহাকে বিশেষ স্থান

দিতে কেহ প্রস্তুত হয় না। যদি পাঁচশত লোক উপস্থিত থাকে যাহারা প্রত্যেকে এক মণ বোঝা লইয়া তিন ক্রোশ যাইতে পারে, তাহা হইলে যে মহাজন পণ্যদ্রব্য তিন ক্রোশ দূরে পাঠাইবে সে সেই সকল মানুষকে সমান দৃষ্টিতে দেখিবে। সে বলিবে পাঁচশত ভারবাহী লোককে আমি জানি। কিন্তু ঐ সকলের মধ্যে সূত্রধর বা কর্ম্মকার থাকিলে বা অন্য কোন নিপুণতার কার্য্যে দক্ষব্যক্তি থাকিলে তাহাদিগকেও কেবল ভারবাহী বলিয়া জানা ঠিক জানা হইল না। যদি পাঁচশতের মধ্যে একজন উত্তম গায়ক ও একজন চিত্রকর থাকে তাহা হইলে তাহাদিগকে ভারবাহীর সহিত এক করিয়া জানাও যথেষ্ট হইতে পারে না। এইরূপে বিশেষত্ব অনুসন্ধান ও ব্যক্তিগত কার্য্যকারিতা নির্ণয় করা সর্ব্বদাই প্রয়োজন। এক দেশে লক্ষ লক্ষ লোক আছে, সকলেই সমাজের কোন না কোন কাজে লাগিতেছে, পুরুষ নারী সকলেই আপন আপন উপযুক্ত স্থানে কার্য্য করিতেছে। সাধারণত যে মানুষ যে কার্য্য করিতেছে, আমরা তাহাকে সেই কার্য্যের লোক বলিয়াই জানি ; যে ব্যক্তি কাষ্ঠ বা প্রস্তর বহন করে তাহার ভিতরে যে শ্রেষ্ঠতর কার্য্য করিবার শক্তি নিহিত রহিয়াছে তাহা অনুসন্ধান করিবার সমাজের সময় নাই। এজন্য এরূপ অনেক সময় ঘটে যে চিত্রবিদ্যায় নিপুণ ব্যক্তি ভারবহন করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতে বাধ্য হয় এবং সমাজে ভারবাহী বলিয়াই পরিচিত হয়। মানুষের প্রকৃত পরিচয় না পাইলে যে ব্যক্তি উচ্চ কার্য্য করিতে পারিত তাহাকে নীচ কাজ করিতে হয়, তাহাতে সমাজের ক্ষতি হয়, কারণ উচ্চ কার্য্য করিবার লোক অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়া যায় ; এবং সেই ব্যক্তিরও ক্ষতি হয়, কারণ আপনাকে নীচ জানিয়া নীচ হইয়া গেল—আপনাকে প্রকৃতরূপে না জানাই তাহার মহা ক্ষতি।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে আপনাকে উচ্চ বলিয়া পরিচয় দিবার মহা ব্যস্ততা চলিতেছে। বিশেষত যাঁহারা কোন পদ বা মান প্রার্থী তাঁহারা আপনাকে সাধারণের নিকট শ্রেষ্ঠরূপে প্রমাণিত করিতে একান্ত ব্যস্ত হন। তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াছেন—"আপনাকে জান," এখন সভ্য মানুষ সমাজের অপর সকলকে বিবিধ প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন—"আমাকে উচ্চ বলিয়া জান।" দুঃখের বিষয় এই যে বর্ত্তমান সময়ের সভ্যতা ব্যস্ততাবশতঃ পদ বা মান প্রার্থীকে একথা জিজ্ঞাসা করিতে অবসর পান না যে "তুমি কি তোমাকে জানিয়াছ ?" যাঁহারা অন্যের প্রশংসা পত্র দেখাইয়া আপনাদিগের উচ্চতা প্রমাণ করিতে যত্নবান, তাঁহাদিগকে কিন্তু সর্ব্বপ্রথম আপনাকে জানিতে বলা প্রয়োজন। ফলে অন্য লোকের প্রশংসা পত্রের উপর নির্ভর করিয়া কোন দায়িত্বের পদ গ্রহণ করা অপেক্ষা যদি কোন ব্যক্তির নিজ পরিচয় লাভের বলে তাহার নিজের কথাতে দায়িত্বের কার্য্য দেওয়া যাইত, তাহা হইলে বোধ হয় সমাজে প্রকৃত আত্মপরিচয় ও প্রকৃত যোগ্যতা লাভ অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইত।

আমাদের দেশের মহিলাগণ বিনয়ের অবতার, তাঁহারা পরিবারের দেবী, সংসার রাজ্যের রাণী, কিন্তু লোক-চক্ষুতে তাঁহারা যেন বাড়ীর চাকরাণী। যতপ্রকার পরিশ্রম-সাধ্য ও বিরক্তিকর কার্য্য তাঁহারা করিতেছেন, সেজন্য একটি ধন্যবাদও প্রত্যাশা করেন না। মানব-শিশুর দীর্ঘ শৈশবে তাহাকে লালনপালন করা ও শিক্ষা উন্নতির পথে লইয়া যাইতে মাতার কত প্রেম, কত ধৈর্য্য, কত বুদ্ধি, কত উদ্ভাবনা শক্তি, কত দৃঢ়তা, কত সংযম, প্রকাশ করিতে হয়। যদি তাহা দ্বারা জননীর মূল্য নিরূপণ করা হয় তাহা হইলে প্রত্যেক জননীকে কত উচ্চস্থান, কত মান্য দেওয়া সঙ্গত! কিন্তু জননী আপনাকে জানিয়াও আপনাকে জানেন না—তিনি আপনার শ্রেষ্ঠতা জগতের নিকট প্রমাণ করিতে ব্যস্ত নহেন। গৃহস্থের গৃহে জনক জননী বৃদ্ধ রুগ্ন, অক্ষম অচল, অজ্ঞান হইয়া কত দীর্ঘকাল জীবনধারণ করেন—এই দীর্ঘকালের সেবা শুশ্রূষা ও ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদিগের সহিত ব্যবহার প্রভৃতিতে গৃহিণীর যে চরিত্র প্রকাশ হয়, তিনি যে স্বর্গের দেবী ভাবের পরিচয় দান করেন, তাহা দেখিয়া কেনা বলিবে যে নারী-চরিত্রে অশেষ শক্তি, জ্ঞান প্রেম ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা আত্মত্যাগ প্রভৃতি সকল সাধুভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে। কত সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে বিপথ-গামী স্বামী ভ্রাতা বা পুত্রকে সুপথে আনয়ন করিতে নারী কি অসীম সাহস, ধৈর্য্য, ভালবাসা দৃঢ়তা প্রভৃতি প্রকাশ করেন। দরিদ্র স্বামীর গৃহে সুব্যবস্থা, সৌন্দর্য্য, স্বাস্থ্য, শান্তি রক্ষা করিতে নারী যে অশেষ শক্তি, নিপুণতা, আত্মত্যাগ, প্রেমের বল প্রকাশ করেন তাঁহাকে কি সেস্থানে সামান্য নারী বলিয়া অগ্রাহ্য করা সম্ভব? দিন দিন ঘরে ঘরে, নারী আপনার পরিচয় দিতেছেন, সকল নরনারীই তাহা দেখিতেছেন, কিন্তু নারী নিজে আপনার মূল্য বা শ্রেষ্ঠতা অবগত নহেন এবং জগতের নিকটেও সেইজন্য উচিত মর্য্যাদা বা স্থান লাভ করিতে পারিতেছেন না।

নারী-হৃদয়ে সরলতা, সত্যবাদিতা, ভক্তি, বিনয়, বিশ্বাস, সংযম, নিষ্ঠা প্রভৃতি ধর্ম্ম সাধনের উপাদান প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে এবং সময় ও সাহায্য পাইলেই বিকশিত হইয়া ধর্ম্মকে সত্য ও সুন্দর এবং আনন্দময় করে। নারীজীবনে ধর্ম্ম কত হিতকর ও মনোহর আকার ধারণ করে তাহা সকলেই অবগত আছেন কিন্তু এখানেও নারী আপনার মহত্ত্ব আপনি জানেন না। আপনাকে না জানাতেই তাঁহাতে আত্মসম্মান বোধ হয় না এবং সংসার তাঁহাকে ভারবাহী জীব বা গৃহের চাকরাণীর ন্যায়ই ব্যবহার করে।

আপনাকে জানা একান্ত প্রয়োজন, এই কথা কি প্রত্যেকের জানা একান্ত প্রয়োজন নয়? যাহাকে দর্শনশাস্ত্রে আত্মতত্ত্ব বলে তাহা আলোচনা করিতে বলা হইতেছে না—কারণ যাঁহারা দর্শনশাস্ত্র পাঠ করেন তাঁহারা স্বভাবতই সে বিষয় কিছু কিছু যত্ন করিবেন এবং যাঁহারা সেরূপ জ্ঞানলাভ করেন নাই তাঁহাদিগকে আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে বলাতে লাভ নাই।

আমাদিগের অগ্রকার প্রবন্ধের বিশেষ বিষয় এই যে, যে নারী বা যে পুরুষ সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে যেরূপ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন তাহা সম্পন্ন করিতে থাকুন, কিন্তু তিনি যে শুদ্ধ সেই কার্য্যের জন্যই পৃথিবীতে আসিয়াছেন, সেই কার্য্যই যে তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য তাহা কি তিনি নিশ্চিতরূপে জানিয়াছেন? তাঁহাকে সেইটি জানিতে হইবে। যিনি যে অবস্থার লোক হউন না কেন, সকলকেই সংসারের ভারবহন করিতে হয়। যখন শরীর আছে, দেহে শক্তি আছে, তখন সৃষ্টির নিয়ম এই যে শরীর দ্বারা, অর্থাৎ দেহের বলের ব্যবহার করিয়া সংসারের কতকগুলি কাজ সকলকেই করিতে হয়। তাহা স্বভাবের নিয়মেই হয়. তাই বলিয়া যদি কেহ মনে করেন যে দেহের বল ব্যবহার করাই তাঁহার জীবন, তাহা হইলে সাংঘাতিক ভ্রম হইল।

আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে আপনার ভিতরে যে শ্রেষ্ঠগুণ আছে, যে দৈবীশক্তি আছে, তাহাই জানিতে হইবে। নারী যে অবস্থাতেই সংসারে বাস করুন না কেন তাঁহাকে সংসারের সামান্য কার্য্য ও সামান্য চিন্তাতে জীবনের অনেক সময় অতিবাহিত করিতে হইবে, কিন্তু তিনি যদি আপনাকে জানেন, যদি তাঁহার প্রকৃত মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন তাহা হইলে তিনি কখনও আপনাকে সামান্য লোক মনে করিতে পারিবেন না। পুরুষ হউন নারী হউন, যাঁহার অন্তরে আত্মসম্মান নাই, যিনি আপনাকে সামান্য লোক মনে করেন তিনি বড় দীন—তাঁহার শত প্রকারের গুণ থাকিলেও সে সকল গুণ তাঁহার সহায় হইয়া তাঁহাকে শ্রেষ্ঠতা দান করিতে পারে না।

আজকাল আমাদের দেশে জ্ঞানলাভের স্পৃহা সকলের মনেই জাগিয়া উঠিয়াছে। পুরুষ নারী সকলেই অনেক সত্য জানিতেছেন, কিন্তু আপনাকে জানা কতদূর হইতেছে তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইলেই মনে হয় জ্ঞানলাভ করা হইয়াছে, কিন্তু নিজের প্রকৃত স্বভাব কি, কোন্ কোন্ দৈবীশক্তিতে নিজের বিশেষ অধিকার, কত উচ্চতাতে জীবন স্থাপিত করিতে হইবে, সংসারের বা সমাজের কোন্ বিশেষ অভাব দূর করিতে বা কোন্ বিশেষ সৌভাগ্য বিকশিত করিতে সংসারে আসা হইয়াছে তাহা জানিবার চেষ্টা অতি অল্প লোকেরই যত্ন দেখিতে পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে এ সত্য কে না স্বীকার করিবেন যে, যে ব্যক্তি আপনাকে জানিল না, সে কিছুই জানিল না—যার আপনার বিষয় কোন উচ্চ আদর্শ নাই, যে আপনাকে সংসার স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছে, অবস্থা যেদিকে লইয়া যায় সেইদিকে যাইতেই প্রস্তুত তাহার অবস্থা যে অত্যন্ত বিপদাকীর্ণ তাহা কে অস্বীকার করিবে? উদ্দেশ্যহীন, আদর্শহীন, আত্মসম্মানহীন ব্যক্তির ন্যায় অসহায়, দুর্ব্বল, কৃপাপাত্র আর কে আছে? যদি অন্য সকল জ্ঞানের বিনিময়ে এক বিন্দু আত্মজ্ঞান লাভ হয় তাহাতেও মহা লাভ মনে করিতে হইবে।

নাম ধাম বিদ্যা বুদ্ধি ধন জন দিয়া

মানুষ অন্যের নিকট পরিচিত হয়, কিন্তু আপনার নিকট আপনার পরিচয় এসকল বাহ্য উপায়ে হইতে পারে না। আপনাকে জানিতে হইলে সময় সময় আপনার ভিতর দিয়া যে সকল আশ্চর্য্য শক্তি, বিশ্বাসের বল, ভালবাসিবার অলৌকিক শক্তি প্রকাশ হইয়া পড়ে, পবিত্রতা রক্ষার জন্য অসম্ভব কার্য্য সম্ভব হয়, সময় সময় যে নিঃস্বার্থ শুদ্ধ প্রেম জ্যোতিঃ দেখা যায় তাহা দ্বারা আপনাকে চিনিয়া লইতে হয়।

কোন কোন অত্যাচারী নীলকর জমীদার যেমন আপনার কার্য্য সাধনের জন্য আপনার অধীনস্থ ভদ্র ইতর শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলকেই বলপূর্ব্বক ভারবহন কার্য্যে নিযুক্ত করিত ও অধীনস্থ লোকগুলি নিরুপায় হইয়া সেই সময়ের জন্য ভারবহন করিত এবং কখনও সন্তুষ্টচিত্তে নীচকার্য্য করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিত না; সময় ও শক্তি পাইলেই অত্যাচারীর হস্ত হইতে আপনাকে উদ্ধার করিত। সেইরূপ সমাজ বা সংসার এক অত্যাচারী রাজা সে আপনার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সকল লোককেই ভারবহন করিতে বাধ্য করে; কিন্তু যে সকল নরনারী আপনাদের শ্রেষ্ঠতা জানে, যাহাদের আত্মজ্ঞান হইয়াছে. তাহারা কখনও সংসারের সামান্য কাজকে জীবনের কার্য্য মনে করিতে পারে না। সংসার মানুষকে যেরূপে শ্রেণীবদ্ধ করে তাহার ভিতরেও অনেক ভুল দেখা যায়। ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত, উচ্চশ্রেণী নিম্নশ্রেণী প্রভৃতি বিভাগ সমাজে চিরদিন প্রচলিত আছে, কিন্তু যদি প্রত্যেক নরনারীর প্রকৃত অবস্থা অনুসারে শ্রেণী বিভাগ করা যায়, তাহা হইলে সমাজের বিভাগকে অতি অসার বলিয়া বোধ হয়। যে আপনাকে জানিল না, যে আপনার উচ্চবংশ, মহৎ লোকের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, মহৎ কার্য্যে ও চিন্তাতে স্বাভাবিক অধিকার ধারণ করিতে পারিল না, তাহার পক্ষে জীবনই অর্থশূন্য—সে কেবল অবস্থার অধীন কীটমাত্র—তাহার ধন বা মান, বা বিদ্যা থাকাতে কি ফল হইবে?

আপনাকে জানা একান্ত প্রয়োজন, আত্মজ্ঞান না হইলে আত্মসম্মান উপস্থিত হয় না, আত্মসম্মান লাভ না হইলে পশুত্ব ঘোচে না—এই পর্য্যন্তই মানুষকে বলা যাইতে পারে। প্রকৃতরূপে আপনাকে জানা কি, অথবা ঠিক কি জানিলে আপনাকে জানা হয় সে বিষয় বলা এই প্রবন্ধের অভিপ্রায় নহে। অতএব আমরা এখানেই ইহা শেষ করিব।

জন হ্যালিফ্যাক্স।

"রাস্তার সামনে থেকে সরে যা হতভাগা অকর্ম্মণ্য—" "ভবঘুরে" কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটী (যে একসময় আমাদের দাসী ছিল) থামিয়া গেল।

আমি ও বাবা বৃদ্ধার উপাধি দিতে গিয়া শেষ কথাটা উচ্চারণ না করিয়া হঠাৎ মৌন হওয়ায় একটু আশ্চর্য্য হইলাম। কিন্তু যখন যে ছেলেটীকে এই ভাবে সম্বোধন করা হইয়াছিল সে নীরবে

আমাদের জন্য পথ করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার চোখের ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম কেন বৃদ্ধা শেষ উপাধি না দিয়া থামিয়া গিয়াছিল। ধুলায় ধূসরিত, শত-ছিন্ন কাপড় পরিয়া থাকা সত্ত্বেও তাহাকে অপদার্থ বলিয়া মনে হইতেছিল না।

আমার বাবা আমাকে বৃষ্টি হইতে বাঁচাইবার জন্য আমার গাড়ীটাকে গলীর দেওয়ালের কাছে ঠেলিতে ঠেলিতে বলিলেন, "আহা বাছা তুমি জলে ভিজিও না, এপাশে সরে চল, তোমারও জল লাগবে না, ফ্লেচারেরও জল লাগবে না।" ছেলেটী কৃতজ্ঞতাভরে নিজের কর্ম্মঠ বলীয়ান হাতের জোরে আমার গাড়ীকে দেওয়ালের আরও কাছে ঠেলিয়া দিল। বয়সে সে আমা হইতে ছোট, কিন্তু আমা হইতে তাহার কত বল, হায় কেউ যদি আমায় তাহার মত স্বাস্থ্য দিতেন!

দাসী ঘরের ভিতর হইতে সাড়া দিয়া বলিল, 'আপনি ভিতরে আসিয়া বসুন না।' আমার কিন্তু সেই আড়ালে থাকিয়া বৃষ্টির দৃশ্য দেখিতে বড় ভাল লাগিতেছিল বলিয়া সেখানেই থাকিলাম, আর সেই ছেলেটীকে আরও ভাল করিয়া দেখিবার সাধ আমার ছিল।

ছেলেটী চুপ করিয়া দেওয়াল ঠেসিয়া আমাদের পথ ছাড়িয়াই হউক কিম্বা ক্লান্তি বশতই হউক দাঁড়াইয়াছিল। সে কোন দিকে না দৃষ্টি করিয়া মনোযোগ সহকারে বৃষ্টি পড়া দেখিতেছিল। পঞ্চাশ বৎসর পরে যখন আমি সেই চেহারা স্মরণ করি, মনে হয় বয়সের তুলনায় তাহাকে ভয়ানক গম্ভীর ও মলিনাকার দেখাইতেছিল।

আমি বলিলাম, "বৃষ্টি শীঘ্র থামিয়া যাইবে"। ছেলেটির কানে বোধ হয় কথাগুলি পৌঁছিল না, জানি না কি গভীর চিন্তায় সে নিমগ্ন ছিল।

আমার বাবা তাহাকে আশ্রয় দিবার পর আর তাহার কোন খোঁজ লন নাই। তিনি নিজের ব্যবসায়ের কথাই ভাবিতেছিলেন এবং তাঁহার ধরণ ধারণ দেখিয়া মনে হইতেছিল যে, তিনি নিজের কাজে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি নিজের ঘড়ি বাহির করিয়া সময় দেখিলেন, ঘড়ীর স্বভাবও যেন তার প্রভুর মত ন্যায় বিচারে কঠোর ছিল, কখনও এক মিনিট এধার ওধার হইত না।

"তেইশ মিনিট দেরী হয়ে গেল জলের জন্য। তোমাকে নিরাপদে বাড়ী পৌছাইব কি করিয়া। তুমি কি আমার কার্য্যস্থলে যাইবে?"

আমি মাথা নাড়িয়া অনিচ্ছা প্রকাশ করিলাম। ষোল বৎসরের ছেলে হইয়াও রোগের জন্য দুগ্ধপোষ্য, শিশুর মত আমি অসহায় এবং বাবার কষ্টের কারণ ছিলাম।

"আচ্ছা তাহলে কাহাকেও ডাকি, তোমায় বাড়ী লইয়া যাইবে। ও ঝি, একটা ছেলে ডেকে দিতে পার, ফ্লেচারকে বাড়ী পৌছাইয়া দিবে?"

ঝি অনেক দূরে ছিল, সে শুনিতে পাইল না। কিন্তু আমি দেখিলাম সেই ছেলেটী বাবার কথা শুনিয়া অপ্রতিভভাবে

অগ্রসর হইল। ইহার আগে তাহার শীর্ণতা আমার চোখেই পড়ে নাই।

আমি বাবাকে ডাকিতে যাইতেছিলাম। কিন্তু ডাকিবার আগেই ছেলেটী নিজেকে আত্মাধীন করিয়া সাহসভরে অগ্রসর হইয়া বলিল, "মহাশয় আমি কাজ করিয়া কিছু রোজগার করিতে চাই।" বাবা ছেলেটিকে কাছে ডাকিয়া তাহার নাম ধাম, পিতামাতা জীবিত কিনা ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। বাবার এ রকম প্রশ্নোত্তর করায় আমি একটু অপ্রস্তুত বোধ করিতে লাগিলাম, কিন্তু বাবার ব্যবহার বাহির হইতে সময়ে কঠোর জানিলেও তিনি সর্ব্বদাই সকলের মঙ্গল চেষ্টা করিতেন। তিনি ছেলেটীকে তাহার বয়স, কি কাজ করিতে পারিবে ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, অবশেষে বলিলেন আচ্ছা তুমি আমার ছেলেকে বাড়ী পৌঁছছিয়া দেও এবং এজন্য তুমি পুরস্কার পাইবে, তুমি কি তোমার পাওনা এখনি চাও? তোমায় বিশ্বাস করিতে পারি কি? ছেলেটী এ কথার উত্তর কিছুই দিল না, নীরবে চাহিয়া রহিল ও বলিল যতক্ষণ না আমি আমার কাজ শেষ না করি আমি টাকা চাই না। বাবা আমার হাতে টাকা দিয়া চলিয়া গেলেন।

তখনও বৃষ্টি পড়িতেছিল। জন নিজের জায়গায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া মেয়ারের বাড়ীর দিকে তাকাইয়াছিল; কেবল যখন বৃষ্টির ছাট আসিয়া আমাকে কাঁপাইয়া ছিল, তখন সে আমাকে খুব করিয়া চাদর দিয়া ঢাকিয়া ছিল।

মেয়ারের বাড়ীর জানালা দিয়া অনেক গুলি ছোট ছোট মাথা দেখা যাইতে ছিল ও তাহাদের হাস্য কলরব দূর পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছিল; ছেলে মেয়েরা সকলে খাইতে বসিয়াছিলেন।

এই সময় জানালার কাছে অপেক্ষাকৃত একটী বড় মাথা দেখা গেল। এই মেয়েটীকে আগে আমি দেখিয়াছিলাম সে এখানে অতিথি হইয়া অবস্থান করিতেছিল, মেয়েটী আমাদের দেখিয়া ভিতরে গেল, তাহার পর আসিয়া দরজা খুলিল এবং বেশ গোলযোগ হইতেছে বুঝা গেল।

"আমি বলছি আমি যাব"

"না তুমি কখনও যাবে না উরসুল্লা"

"আমি নিশ্চয়ই যাব"

ছোট মেয়েটী রুটী ও ছুরি লইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে এক টুকরা কাটিয়া লইয়া ছেলেটির ধারে ছুড়িয়া ফেলিয়া বলিল "আহা তোমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে এইটুকু রুটী নেও" বলিতে না বলিতে দাসী দরজা বন্ধ করিয়া দিল এবং মেয়েটীকে ভিতরে টানিয়া লইল।

জন চমকাইয়া দরজার দিকে চাহিল। সে কতদিন গমের রুটী খায় নাই, সে রুটী উঠাইয়া লইল; কিন্তু অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইলেও চঞ্চলতা প্রকাশ পাইল না। সে অনেকক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে খাইতে আরম্ভ করিল।

বৃষ্টি থামিলেই আমরা বাড়ীর দিকে রওয়ানা হইলাম। ছেলেটির ভাষা শুনিতে আমার বড় ইচ্ছা করিতেছিল; বলিলাম "তুমি ভাই যেন ভীম, কাউকে ডরাও না,

তোমার মত যদি লম্বা ও শক্তিশালী হতে পারতাম।"

"আমি কি তাই? তা আমার শক্তি কাজে আসবে, আমাকে খেটে খেতে হবে কিনা" বলিতে বলিতে তাহার প্রশস্ত বক্ষ আরও প্রশস্ত হইয়া উঠিল এবং পা দৃঢ়ভাবে মাটিতে পতিত হইল, যেন সে একলা নির্ভয়ে পৃথিবীর সহিত সংগ্রামে প্রস্তুত হইয়াছে।

আমি বলিলাম "তুমি এতদিন কি কাজ করিতেছিলে?" "যা পাই তাই করি।" "তোমার বাবা কি করিতেন?" "সম্ভ্রান্ত——— ছিলেন।" "তবে বোধ হয় তুমি ব্যবসা করিতে চাও না।" "তা কেন করবো না"। "তোমার মা——" ছেলেটীর মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল, বলিল, "আমার মা স্বর্গগত এবং অচেনা লোকদের মুখে আমি মায়ের নাম শুনিতে চাই না।" ছেলেটী মৃত মাতাকে যে কত সম্মান করে তাহা বোঝা গেল। আমি কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলাম, জন, আমরা কি এখনও অচেনা?

ছেলেটী হাঁসিয়া আমার দিকে চাহিল, সে হাঁসি কি মধুর। বলিলাম "তুমি কি সহরের আশে পাশে ভ্রমণ করিয়াছ?" বলিল "খুব করিয়াছি, কত শস্য কুড়াইয়াছি, আঁটি বাঁধিয়াছি, কেবল গত বারের গরমে আমার জ্বর বিকার হয়েছিল, তখন কোন কাজ করতে পারি নি।"

"তখন তুমি কি করতে?"

"কি আর করবো যতদিন না ভাল হলাম, একটা গোলা ঘরে পড়েছিলাম। এখন ভয় পাবার কোন কারণ নেই, এখন বেশ ভাল আছি।"

শীঘ্রই আমাদের বেশ ভাব হইল। সে শীতকালে যখন কোন বাহিরের কাজ পাওয়া দুরূহ হইবে, তখন কি করিবে জিজ্ঞাসা করিলাম। ছেলেটী চিন্তাযুক্ত হইয়া বলিল, 'কি জানি'; তাহার শীর্ণ মুখ যেন আরও শীর্ণ হইয়া উঠিল, আমার নিজের অসাবধানতার জন্য নিজের উপর ধিক্কার জন্মিল।

সম্মুখে বাড়ী দেখিয়া আমি বলিয়া উঠিলাম, এই যে বাড়ী পৌছেছি। গৃহহীন বালকের মুখের ভাব বদলাইয়া গেল, বিমর্ষভাবে বলিল, "নমস্কার আমি, তবে আসি।"

এই অল্প সময়ে তাহার সঙ্গে এমন ভাবে জড়াইয়া গিয়াছিলাম যে তাহাকে ছাড়িতে হইবে ভাবিতেও আমার কষ্ট হইতে লাগিল। বলিলাম, "এখনি কি যাবে" বলিতে বলিতে অতি কষ্টে গাড়ী হইতে নামিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। "আমার গায়ে অনেক জোর আছে, না না, এই আমি যদি তোমায় কোলে করে নামিয়ে দি তা'হলে বেশ মজা হবে না!" পাছে আমার মনে আঘাত লাগে তাই কি আশ্চর্য্যভাবে কথার ধরণ বদলাইয়া লইল, কিন্তু তাহার গলার স্বর কাঁপিয়া উঠিল, সে যে কত ভালবাসায় পূর্ণ ইহা হইতেই তাহা বুঝা গেল। সে আবার নমস্কার করিয়া বিদায় চাহিল। আমি কাতরস্বরে কি বলিলাম জানি না, কিন্তু আমার কাতরধ্বনি তাহাকে ফিরাইয়া আনিল।

"মহাশয় আমি কি কিছু করতে পারি?" "আমায় মহাশয় বলিও না, আমি তোমার বন্ধুই যে। এখনি যেওনা, ঐ যে বাবা আস্‌ছেন।"

জন সম্মানের সহিত পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইল। "এই যে তুমি আমার ছেলেকে তো বেশ এনেছো, তোমার টাকা পেয়েছো তো?"

আমরা কেহই টাকার কথা ভাবি নাই—বলিতেই বাবা জনের খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন ও পুরস্কারের জন্য পকেট হাঁতড়াইতে আরম্ভ করিলেন। ছেলেটী যাহা পাওয়ানা তাহা লইয়া বাকী টাকা বাবাকে ফিরাইয়া দিল, সে যতটুকু খাটিয়াছে তাহার বেশী চায় না বলিল।

"আমার এখন গল্প করিবার সময় নেই, তবে তুমি একটী অদ্ভুত ছেলে। ভাল কথা তোমার কি ক্ষিদে পেয়েছে?"

এতক্ষণের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, ছেলেটীর চোখ হইতে টস্ টস্ করিয়া জল বাহিয়া পড়িল। "ক্ষিদেতে প্রাণ বাহির হয়ে এসেছে।"

"ওমা! তা'হলে খাবে এস।" "দাঁড়াও—তোমার ভাল বংশে জন্ম তো?" "জেলে টেলে যাওনি তো?" ছেলেটী রাগান্বিত হইয়া বলিয়া উঠিল "আমি আপনার খাবার চাই না, আপনার ছেলে আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করেছিলেন বলেই ছিলাম, এখন আর আমি থাকতে চাই না।"

বাইবেলে এক যায়গায় লেখা আছে "যখন তিনি S...'এর সঙ্গে কথা বন্ধ করলেন, জনথনের হৃদয় ডেবিডের হৃদয়ের সঙ্গে গ্রথিত হয়ে গিয়েছিল এবং জনথন তাহাকে নিজের প্রাণের মত ভালবাসিত।"

আজকে আমার মত অসহায় জনথন তাহার ডেবিডকে খুঁজিয়া পাইয়াছিল, তাহাকে যাইতে না দিয়া ধরিয়া ফেলিলাম। বাবা বলিলেন "আর গোলমাল না করে খাবার ঘরে ঢোক।" আমি আমার ডেবিডের হাত দৃঢ়রূপে ধরিয়া পিতার ঘরে ঢুকিলাম।

উপবাস দ্বারা রোগ চিকিৎসা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

স্থূলতা হ্রাসের জন্য উপবাস।

প্রায় সকলেই জানেন যে, খাদ্যের পরিমাণ বিশেষতঃ স্নেহজাতীয় খাদ্যের পরিমাণ অতিরিক্ত হইলে শরীরের মধ্যে চর্ব্বি জন্মে; এই চর্ব্বি রক্ত-স্রোতের সহিত শরীরে অধিক মাত্রায় প্রবাহিত হওয়ায় তাহা স্নায়ু ও কোষগুলির মধ্যবর্ত্তী স্থানে জমিয়া থাকে এবং ইহা হইতেই মাংসেতে চর্ব্বির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। প্রায় সকলেই অবগত আছেন যে, মানুষ যখন অনাহারে মরিতে থাকে, তখন সে ক্রমে জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া পড়ে এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রায় কঙ্কালসার হইয়া যায়। ইহা হইতে সহজেই এই অনুমান করা যায় যে উপবাসই স্থূলতা হ্রাস করিবার প্রধান ঔষধ। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, খাওয়ার যতই 'ধরাকাট' কর না কেন, যাহার মোটা হইবার 'আড়া', সে মোটা হইবেই—একথা কিন্তু সম্পূর্ণই ভ্রমাত্মক। যিনি যতই

মোটা হউন না কেন উপবাস দ্বারা নিশ্চয়ই তাঁহার স্থূলতা হ্রাস পাইবে। কত দিন উপবাস করিলে শরীরের ওজন কত কম হইবে ইহা সামান্ত পাটীগণিতের সাহায্যেই বাহির করা যাইতে পারে। একদিন উপবাসে এক পাউণ্ড করিয়া যদি শরীরের ওজন কম হইতে থাকে তাহা হইলে কোনও নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পাউণ্ড ওজন হ্রাসের জন্ত কতদিন উপবাস দিতে হইবে তাহা সহজেই বাহির করা যাইতে পারে। কোন কোন অতি স্থূলকায় ব্যক্তির তুই পাউণ্ড বা ততোধিক পরিমাণে শরীরের ওজন একদিন উপবাসে কমিতে থাকে। তাঁহারাও হিসাব করিয়া দেখিতে পারেন যে কতদিনে তাঁহাদের শরীরের ওজন কোন নির্দ্দিষ্ট ওজনের সমান হইবে।

কিন্তু অনেকে এইরূপ হিসাব করিবার পর যখন দেখেন যে তাঁহাদের এত অধিক দিন উপবাস দিতে হইবে, তখন তাঁহারা বড়ই ভয় পাইয়া যান। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে তাঁহারা যে এতদিন উপবাস দিবেন তাহাতে কি তাঁহাদের শরীরের কোন ক্ষতি হইবে না, কি অধিক তুর্ব্বল হইয়া পড়িবেন না? কিন্তু যাঁহারা, উপবাসে যে কি শারীরিক পরিবর্ত্তন হয়, সে বিষয় অবগত আছেন তাঁহাদের আর এরূপ ভয় পাইবার কারণ নাই। যতদিন পর্য্যন্ত হাড়ের উপর মাংস আছে বা হাড়ের উপর চর্ব্বি আছে, বুঝিবে ততদিন পর্য্যন্ত অনাহার বশতঃ মৃত্যু হওয়া অসম্ভব। যে পর্য্যন্ত না শরীর কঙ্কালসার হয়, সে পর্য্যন্ত অনাহারে মৃত্যু হইতে পারে না।

এতদ্ব্যতীত শরীরতত্ত্বের এই একটী অদ্ভুত ব্যাপার যে, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলী শরীরের অন্তান্ত অংশ হইতে রস গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা বৰ্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইতেছে এবং সেই জন্ত যতক্ষণ পর্য্যন্ত শরীরে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলীর পরিপুষ্টিজনক খাদ্য বর্ত্তমান থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আর মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলীর ক্ষয়ের কোনই আশঙ্কা নাই। এমন কি, যে সমস্ত ক্ষেত্রে মানুষ অনাহারে মরিয়াও যায় সে সমস্ত ক্ষেত্রেও মস্তিষ্কের কিছুই নষ্ট হয় না। চর্ব্বির ১০০ ভাগের ৯৭ ভাগ, মাংসপেশীর ১০০ ভাগের ৩০ ভাগ, যকৃতের ১০০ ভাগের ৫৬ ভাগ, প্লীহার ১০০ ভাগের ৬৩ ভাগ, রক্তের ১০০ ভাগের ১৭ ভাগ নষ্ট হয়। কিন্তু স্নায়ুমূলগুলির কিছুই নষ্ট হয় না। অর্থাৎ যেগুলি জীবনী-শক্তির পক্ষে যত বেশী প্রয়োজনীয় সেইগুলি তত কম ক্ষয় হয়। যদি শরীরে কোনও অনাবশ্যক পদার্থ সঞ্চিত থাকে, তাহা হইলে শরীরের কোন জিনিষের বিনাশের পূর্ব্বে এইগুলিই দূরীকৃত ও বিনষ্ট হইবে। রোগের সময় খাদ্যাভাব বশতঃ যে তুর্ব্বলতা হয় তাহা নহে, রোগের বিষের জন্যই তুর্ব্বলতা বোধ হয়। খাদ্যাল্পতার জন্ত শরীর শীর্ণ হয় না; শরীর মধ্যে যে বিষ বর্ত্তমান আছে তাহাই শরীরকে শুষ্ক ও ক্ষীণ করিয়া ফেলে। এই বিষটী বাহির হইয়া গেলেই রোগ সারিয়া যায়।

এই সমুদায় হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে উপবাসই স্থূলতার সহজ ও যুক্তিসঙ্গত চিকিৎসা। উপবাসের প্রথম কয়েক দিন বেশ ক্ষুধা বোধ হইবে, কিন্তু

তারপর ক্ষুধা চলিয়া যাইবে এবং যতদিন উপবাস করিলে পর আবার শরীর স্বাভাবিক হইবে, ঠিক ততদিন পরে ক্ষুধা ফিরিয়া আসিবে, নাড়ী স্বাভাবিক হইবে, শরীরের তাপও স্বাভাবিক হইবে, শরীর হইতে জ্যোতি বাহির হইবে ও মুখের দুর্গন্ধ চলিয়া যাইবে। এই সমস্ত চিহ্নগুলি যখন দেখা যাইবে তখনই বুঝিতে হইবে যে উপবাস ভঙ্গ দিতে হইবে। কিন্তু এরূপ সময়ে যদি উপবাস ভঙ্গ না দেওয়া হয় তাহা হইলে শরীরের ক্ষতি হইবে। এরূপ অবস্থায় যদি খাদ্য গ্রহণ না করা হয় তাহা হইলেই অনাহার বলিতে হইবে। রোগ-মুক্তির জন্য আবশ্যকীয় কয়েক দিন উপবাস করার পর উপবাস করিলেই অনাহার (starvation) করা হইবে। এই দুইয়ের ভিতর পার্থক্য বিশেষভাবে স্মরণ করিয়া রাখা উচিত।

শীর্ণতার জন্য উপবাস।

যদি স্থূলের পরিবর্তে রোগী কৃশ ও শীর্ণ হয় তাহা হইলেও উপবাস করা বিধিসঙ্গত কি না,—এই প্রশ্ন সাধারণতঃই উঠিতে পারে।

সাধারণ চিকিৎসকগণ বলিবেন যে এরূপস্থলে উপবাসের বিধান দেওয়া মারাত্মক ও অনিষ্টকারক। তাঁহারা আরও বলিবেন যে যখন শরীর অপরিপুষ্ট তখন তাহার উপর আবার শরীরের ওজন হ্রাস করান কি যুক্তিসঙ্গত? হাঁ, কোন কোন রোগীর খাদ্যের অপ্রাচুর্য্যবশতঃ শরীর শীর্ণ হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু প্রায় অধিক স্থলেই উপযুক্ত পরিপাকশক্তির অভাবই শীর্ণতার প্রধান কারণ। পরিপাকশক্তি বর্দ্ধিত করিতে হইলে পরিপাকের যন্ত্রগুলিকে বলিষ্ঠ ও রোগশূন্য করা আবশ্যক এবং পরিপাকযন্ত্রগুলিকে বিশ্রাম দিলেই তাহারা স্বভাবতঃ তাহাদের পূর্ব্বেকার শক্তি ও স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করিবে। অপর পক্ষে, অধিক পরিমাণে খাদ্য উদরসাৎ করিলে সেগুলি উপযুক্তরূপে পরিপাক হইবে না এবং উপকারের পরিবর্ত্তে বরং অপকারই হইবে।

রোগী যতই শীর্ণ হউক না, কিছু অল্প সময়ের জন্য তাহাকে উপবাস দিতেই হইবে। এইরূপ উপবাস দিলে পরিপাক যন্ত্রগুলি বিশ্রাম দ্বারা শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। তৎপরে কিছু কিছু দুগ্ধ খাইতে দিবে বা প্রথম ফলমূল খাইতে দিয়া তারপর দুগ্ধ খাইতে দিবে। শেষোক্ত খাদ্য প্রণালীটী পূর্ব্বোক্ত খাদ্যপ্রণালী অপেক্ষা উত্তম। ইহার পর আস্তে আস্তে খাদ্য পরিমিত করিয়া দিতে পারিলেই রোগীর ওজন বৃদ্ধি হইবে ও রোগীর শারীরিক অবস্থা ক্রমশঃ উন্নত হইতে থাকিবে। আমরা বাহুল্যভয়ে এবিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিলাম না।

গর্ভাবস্থায় উপবাস।

গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের আহার সম্বন্ধে আমাদের অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ধারণা আছে। গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগকে কেবলই অধিক আহার করিতে উপদেশ দেওয়া হয়। তাহাদের দুই জনের শরীরের পোষণ করিতে হইবে এই ধারণায় তাহা-

দিগকে অধিক মাত্রায় আহার করিতে বলা হয় এবং তাহারাও সকলের কাছে এইরূপ কথা শুনিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও অতিরিক্ত মাত্রায় ভোজন করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই সমুদায় ধারণা বিশেষ নির্ব্বুদ্ধিতারই পরিচয় দেয়। ধর যে সন্তানটী জন্মিবে তাহার ওজন পাঁচ সের। তাহা হইলে মাসে প্রায় আধ সের বা দিবসে প্রায় এক কাঁচ্চা শিশুটী বাড়িতে থাকে এবং এতটুকু ক্ষতিপূরণের জন্য গর্ভিণীকে দিনে প্রায় আধ সের বা এক সের অতিরিক্ত খাদ্য খাইতে দেওয়া হয়। এইরূপ অস্বাভাবিক ভোজনের ফলে সন্তান প্রসবের সময় গর্ভিণীর অত্যন্ত বেদনা ও যন্ত্রণা বোধ হয় এবং তাহার শরীরে চর্ব্বি-জাতীয় পদার্থের আধিক্যবশতঃ শরীর নরম হইয়া পড়ে; এমন কি সময় সময় গর্ভিণী সন্তান প্রসবের পরই জ্বরাক্রান্ত হয়। কিন্তু যদি তাহার শরীরগ্রন্থিগুলি নরম না হইয়া বেশ শক্ত হয় এবং তাহার পেশীগুলি বেশ বলিষ্ঠ হয় তাহা হইলে গর্ভিণীকে আর গর্ভকালীন বেদনা অধিক অনুভব করিতে হয় না।

সামান্য ও সহ্যমত উপবাস দিলে আসন্নপ্রসবা গর্ভিণীরও উপকার হইয়া থাকে। গর্ভাবস্থায় যদি মাথায় শ্লেষ্মা বোধ হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে শরীরে অনেক অনাবশ্যক পদার্থ সঞ্চিত আছে এবং অনেক অনুপযুক্তভাবে পরিপাকপ্রাপ্ত পদার্থও জমিয়া আছে। এইরূপ স্থলে উপবাস করাই প্রশস্ত উপায়। উপবাস দিলেই শরীর পুনরায় সুস্থ ও লঘু হইবে। ইহাতে কিছু পরিমাণে শরীরের ওজন হ্রাস হইতে পারে বটে, কিন্তু উপবাস দ্বারা যে শরীরের ময়লা নিষ্কাশিত হইয়া যায় এবং শরীর 'ঝরঝরে' হয় তাহা কি কম লাভের কথা? যাহাই হউক, শরীর যাহাতে সুস্থ থাকে, শরীরে যাহাতে স্ফূর্ত্তি থাকে তাহাই আমাদের উদ্দেশ্য, ওজন লইয়া আমাদের বিশেষ কিছু ফল হইবে না। কিন্তু গর্ভাবস্থায় বেশী দিন উপবাস দিলে ক্ষতি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। গর্ভাবস্থায় উপবাসের তত আবশ্যকতা নাই। কিছুদিন কেবল ফলমূল ভক্ষণ করিয়া থাকিলেই গর্ভকালীন যাবতীয় রোগ আরোগ্য হয়। ফলমূল ভক্ষণের এই সুবিধা যে, ফলমূল ভক্ষণ করিলে অন্ত্রগুলি পরিষ্কার থাকে এবং অন্ত্রগুলি পরিষ্কার থাকিলেই প্রায় অৰ্দ্ধেক রোগ সারিয়া যায়। এইরূপ ফল ভক্ষণ করিয়া থাকিবার পর যখন রোগ আরোগ্য হইয়া যায় তখন আবার দুগ্ধাদি পান করিলে দেখা যায় যে প্রসূতির ওজন বৃদ্ধি এবং তাহার শরীরে পুনরায় নব বল ও নবীন স্বাস্থ্যের সমাগম হইতেছে।

বৃদ্ধদিগের উপবাস।

অনেক সত্তর আশী বৎসরের বৃদ্ধদিগকেও উপবাস দ্বারা রোগবিমুক্ত হইতে দেখা গিয়াছে। ডাক্তার ডিউই (Dewey) অনেক বৃদ্ধের কথা লিখিয়াছেন যাহারা উপবাস দ্বারা প্রভূত উপকার লাভ করিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও রোগীর যাট বৎসরের অধিক বয়স হইলে অতি সাবধানে উপবাস দেওয়া কর্ত্তব্য। যাট বৎসর

একাদিক্রমে এক নিয়মমত কার্য্য করায় তাহার অভ্যাসগুলি প্রায় মজ্জাগত হইয়া যায় এবং এরূপ অবস্থায় এত কালের অভ্যাসের ব্যতিক্রম হইলেই কুফল ফলিতে পারে; এমন কি, শরীর একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতে পারে। অল্প সময়ব্যাপী উপবাস করিলে বা কেবল ফলমূলাদি ভক্ষণ করিয়া থাকিলেও বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। ইহার সহিত প্রচুর পরিমাণে জলপান করিলে দীর্ঘকাল উপবাস করার প্রায় সমস্ত ফল পাওয়া যায়।

বৃদ্ধ লোকেরা সাধারণতঃই অতিমাত্রায় ভোজন করেন। স্যার হেনরি টম্‌সন্‌ সাহেবও এই কথা বলিয়া গিয়াছেন, বৃদ্ধদিগের পথ্য সম্বন্ধে ব্যবস্থা দিতে তাঁহার মত দক্ষ লোক ইংলণ্ডে খুব কমই ছিল। তিনি বলেন,—যতই মানুষ বৃদ্ধ হইতে থাকে, ততই তাহার খাদ্যের প্রয়োজন কম হইতে থাকে। ইহার কারণ এই যে, যখন মানুষ বৃদ্ধ দশায় উপনীত হয় তখন ত সে আর বাড়িতে থাকে না, বরং তাহার শরীরের ক্ষয়ই হইতে থাকে। অপর পক্ষে বৃদ্ধাবস্থায় পাকাশয়ের আর তদ্রূপ অগ্নিবল থাকে না; পাকরসগুলিরও পূর্ব্ববৎ শক্তি থাকে না। সেইজন্য বৃদ্ধগণের পরিমিত ও সাদাসিদে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য ও দিবসের মধ্যে বেশী বার করিয়া অল্পে অল্পে ভক্ষণ করাই বিধেয়। ইহার দ্বারা পাকাশয়ের পরিশ্রমেরও লাঘব হয়; এবং ভুক্ত দ্রব্যও শীঘ্র শীঘ্র পাকাশয় ত্যাগ করে।

সেই জন্য যখন কোনও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি পীড়িত হন, তখন তাঁহার অল্প সময়ের জন্য উপবাস করা উচিত। তৎপরে ফলমূল ও দুগ্ধাদি গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এই ফলমূলের রসের সহিত যে লবণ-জাতীয় অংশ থাকে তদ্দ্বারা মাংসগ্রন্থি গুলির মধ্যে যে ধাতব পদার্থ থাকে তাহার অধিকাংশই জান্তব পদার্থে পরিণত হয়। বৃদ্ধ বয়সের একটী প্রধান লক্ষণ এই যে, এই সময়ে শরীরের জান্তব পদার্থগুলি ধাতব পদার্থে পরিণত হইয়া যাইতে থাকে এবং এই জন্যই শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, ফল ভক্ষণ করিলে মানুষের শরীরের জান্তব পদার্থ বৃদ্ধি পায়। সেই জন্য ফল ভক্ষণ দ্বারা বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল পুনরায় নবীন ও সবল হইয়া উঠে।

বালকবালিকাদিগের উপবাস।

সাধারণ লোকের এইরূপ বিশ্বাস যে, বালকবালিকাগণ যত ইচ্ছা তত খাইতে পারে এবং তাহাতেও তাহারা অসুস্থ হয় না। এ কথা কতকটা সত্য। বাস্তবিক যদি বালকবালিকাগণ মুক্ত বায়ুতে ব্যায়াম করে, এবং তাহাদের কোষ্ঠ সাফ থাকে তাহা হইলে তাহারা এত অধিক পরিমাণে ভক্ষণ করিয়াও যে সুস্থ থাকিতে পারে তাহা সত্যই আশ্চর্য্যের বিষয়। কিন্তু সকলেই জানেন যে, বালকবালিকাগণের মধ্যে মৃত্যুসংখ্যা বড় কম নয় এবং বার বৎসর বয়সের পূর্ব্বে প্রতি বৎসরে যে কত সহস্র বালকবালিকার মৃত্যু হইতেছে তাহাই বা কে না জানে? কোন পৈতৃক

ব্যাধি না থাকিলে বার বৎসরের নিম্নবয়স্ক বালকবালিকাগণের খুব স্বাস্থ্যবান্ ও বলিষ্ঠ হওয়াই উচিত। তাহাদের খাদ্যের গুণ ও পরিমাণের দোষ হইতে তাহাদের অনেকের রোগ জন্মিয়া থাকে। তাহা ছাড়া, আমাদের যে ভুল ধারণা আছে যে, ছেলেদের বৃদ্ধির জন্য অধিক পরিমাণে খাদ্যের প্রয়োজন, সেই ধারণা হিসাবে কার্য্য করাতে ছেলে মেয়েদের স্বাস্থ্যহানি হয় এবং এরূপ অতিরিক্ত মাত্রায় ভোজন করাতেই বালকবালিকাগণের জ্বর, হাম, ব্রঙ্কাইটিস, হুপিং কাসি প্রভৃতি পীড়া হয়।

উপযুক্ত সাবধানতার সহিত ছেলেমেয়েদের উপবাসের ব্যবস্থা দিলে তাহাদের প্রায় সমস্ত রোগই আরোগ্য হয়। পরিণত বয়স্ক লোকদিগের যেমন বেশী দিন উপবাস দিলে রোগ আরোগ্য হয়, সেইরূপ ছেলে মেয়েদের অল্প কয়েক দিন উপবাস দিতে দিলেই সমস্ত রোগ আরোগ্য হয়। ইহার কারণ এই যে, বালকবালিকাগণের ক্ষতিপূরণের শক্তি অধিক। উপবাসের সহিত তাহাদের অন্ত্রধৌতি করিলে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়।

শিশুদিগের উপবাস।

শিশুদিগের অধিকাংশ ব্যাধিই আহারের দোষ হইতে হইয়া থাকে। অধিক আহার বা সময়-অসময়ে যখন তখন ক্রন্দন মাত্র আহার দেওয়ার জন্য তাহাদের পাকস্থলীর বিশ্রাম ঘটে না এবং এই জন্য ভুক্তদ্রব্য নিয়মমত পরিপাক পায় না। ইহার ফলে শিশুদিগের দুধ-তোলা, পেটের অসুখ, রিকেট্‌স্, সর্দ্দি, কাসি, ব্রঙ্কাইটিস ইত্যাদি রোগ এবং সহজেই জীবাণু দ্বারা আক্রমণপ্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহারা নানা সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়। এইজন্য শিশুদের পীড়ার কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইবামাত্র তাহাদের আহার বন্ধ করিবে। কেবলমাত্র গরম জল বা পার্ল বার্লি সিদ্ধ করিয়া জল খাইতে দিবে। এই প্রকার ২৪ ঘণ্টা চিকিৎসাতে শিশুদের অধিকাংশ রোগ উপশম হইয়া থাকে। সময় সময় দুই তিন দিন পর্য্যন্তও এইরূপ ব্যবস্থার আবশ্যক হয়।

অন্যান্য রোগে উপবাস।

আমরা কেবল দুই চারিটি রোগের কথা উল্লেখ করিলাম এবং কোন্ রোগীর কিরূপ উপবাস করা আবশ্যক সে সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম; কিন্তু উপবাস দ্বারা এতদ্ব্যতীত আরও অনেক রোগ সারিতে পারে। সকল প্রকার অজীর্ণ রোগ বা পাকাশয়ের রোগ অতি সহজেই কেবলমাত্র উপবাস দ্বারাই আরোগ্য হইতে পারে। নিউমোনিয়া, পুরাতন মাথাধরা, কোষ্ঠবদ্ধতা, বাত ও টাইফয়েড জ্বরও উপবাস দ্বারা আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। কেবল ক্ষয়রোগেই উপবাস দ্বারা ভাল ফল পাইতে দেখা যায় নাই। আর সমস্ত ব্যাধিই উপবাস দ্বারা আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদে রোগীর বল ও রোগবিশেষে লঙ্ঘনের ব্যবস্থা।

লঙ্ঘন দিবার যোগ্য পাত্র।

প্রভূতশ্লেষ্মপিত্তাস্রমলাঃ সংসৃষ্টমারুতাঃ।
বৃহচ্ছরীরা বলিনো লঙ্ঘনীয়া বিশুদ্ধিভিঃ॥

যে সকল ব্যক্তির কফ, পিত্ত, রক্ত ও মল পদার্থ অধিক এবং যাহারা সংসৃষ্টবাত, দীর্ঘদেহ ও বলবান্, তাহারাই বমন, বিরেচন, আস্থাপন ও শিরোবিরেচন এই চারি প্রকার সংশোধনের দ্বারা লঘুকরণ যোগ্য।

যেষাং মধ্যবলা রোগাঃ কফপিত্তসমুদ্ভবাঃ।
ছর্দ্দ্যতীসারহৃদ্রোগবিসূচালসকজ্বরাঃ॥
বিবন্ধগৌরবোদ্গারহৃল্লাসারোচকাদয়ঃ।
পাচনৈস্তান্ ভিষক্ প্রাজ্ঞঃ প্রায়েণাদাবুপাচরেৎ

যে সকল ব্যক্তির বমন, অতিসার, হৃদ্রোগ, বিসূচিকা, অলসক, জ্বর, বিবন্ধ, গৌরব (গাত্রগুরুতা) উদ্গার, হৃল্লাস ও অরোচকাদি রোগ সকল মধ্যবল এবং কফ পিত্ত হইতে উৎপন্ন, প্রাজ্ঞ চিকিৎসক প্রথমে পাচন দ্বারা তাহাদের চিকিৎসা করিবেন।

অতএব যথোদ্দিষ্টা যেষামল্পবলা গদাঃ।
পিপাসানিগ্রহৈস্তেষামুপবাসৈশ্চ তাঞ্জয়েৎ॥

উপর্য্যুক্ত রোগ সকল যদি অল্প বলবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে পিপাসানিগ্রহ ও উপবাস দ্বারা তাহাদের শান্তি করিবে।

রোগাঞ্জয়েন্মধ্যবলান্ ব্যায়ামাতপমারুতৈঃ।
বলিনাং কিং পুনর্যেষাং রোগাণামবরং বলম্॥

বলশালী ব্যক্তিদিগের যদি উপরোক্ত রোগ সকল মধ্যবলবিশিষ্ট হয় তাহা হইলে ব্যায়াম, আতপ ও মারুত দ্বারা চিকিৎসা করিবে, আর যদি উহাদিগের অল্পবল রোগ হয়, তাহা হইলে যে এই ব্যায়ামাদি দ্বারা শান্ত হইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

জ্বরে লঙ্ঘনমেবাদাবুপদিষ্টমৃতে জ্বরাৎ।
ক্ষয়ানিলভয়ক্রোধকামশোকশ্রমোদ্ভবাৎ॥

ক্ষয়জ, বাতিক, ভয়-ক্রোধ-কাম-শোক ও শ্রমজন্য জ্বর ব্যতীত সকল জ্বরে প্রথমেই লঙ্ঘনের উপদেশ আছে।

লঙ্ঘনং স্বেদনং কালো যবাগ্বস্তিক্তকো রসঃ।
পাচনান্যবিপক্বানাং দোষাণাং তরুণজ্বরে॥

উপবাস, স্বেদ, কাল, যবাগূ, তিক্তরস ও পাচন নবজ্বরে অপরিপক্ব দোষ সকল পরিপাক করে, এজন্য নবজ্বরে সর্ব্বপ্রথমেই উপবাস দেওয়ার বিধি।

শোথাধিকারে—

তথামজং লঙ্ঘনং পাচনক্রমৈরিতি॥

অনন্তর আমজ শোথের প্রতিকার করিতে হইলে প্রথম উপবাস, পরে পাচন ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

গ্রহণ্যধিকারে—

শরীরানুগতে যামে রসে লঙ্ঘনমাদিশেৎ॥

আম রস সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইলে প্রথম উপবাস, পরে পাচন ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইত্যাদি

(চরক-সংহিতা)

স্বাস্থ্য-সমাচার।

মেয়েদের গুণাগুণ।

(ফিলিপ গিলবার্ট হ্যামারটনের মত।)

সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় মেয়েরা মানসিক কাজ নিজ হইতে কখনই খুঁজিয়া পান না। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে কাজ করিবার অনেক সুযোগ সত্ত্বেও যতক্ষণ না কোন ক্ষমতাপন্ন পুরুষ দ্বারা উৎসাহিত ও চালিত না হইয়াছেন ততক্ষণ কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। এইরূপ প্রভাবের অভাবে অনেকে মানসিক কার্য্যতৎপরতার অধিকারী হইয়াও সে কার্য্যতৎপরতাকে নিয়মাধীন করিতে কিম্বা জ্ঞান সঞ্চয়ের যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করেন নাই।

উদাহরণ স্বরূপ কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের তিন চারিটী অবিবাহিত ভগ্নীর—যাঁহাদের যথেষ্ট উন্নতি করিবার সময় ও সুযোগ আছে—জীবন দেখুন। সচরাচর দেখিতে পাইবেন যে শিক্ষয়িত্রীর কাছে যেটুকু শিক্ষা পাইয়াছিলেন তাহা হইতে এক পদও অগ্রসর হন নাই। অনেক সময় তাঁদের ছাত্রীজীবনে আজকালকার মত ভাল শিক্ষাপ্রণা ছিল না বলিয়া তাঁহাদিগকে দুঃখ প্রকাশ করিতে দেখা যায় কিন্তু স্কুল কলেজ ছাড়িয়া যেটুকু সময় পাইয়াছিলেন সেটুকুর সদ্ব্যবহার করিলে যে অনেক উন্নতি করিতে পারিতেন এই সহজ কথা কখনও মনে উদয় হয় না। মেয়েদের একটী বাঁধা গদ আছে "বুড়ো ময়না কি ডাকে।"

বিলিয়ার্ড খেলার বল যেমন ধাক্কা না থাইলে যেখানকার সেখানেই থাকে মেয়েদের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ।

এই মানসিক কার্য্যতৎপরতার অভাব তাঁহাদিগের অজ্ঞতার একটী প্রধান কারণ। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আলোচনায় তাঁহাদিগের সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ পায় তাঁহারা গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ থাকেন বাহিরের খবর বড় রাখেন না। বাহির হইতে যতটুকু দেখা যায় তাহাতে তাঁহাদিগের মানসিক চেষ্টার কিছু নূতন বিষয় আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিতে দেখা যায় না। পুরুষ হইতে নারীদিগের রচনা জীবন্ত ও সতেজ হয়। পুরুষদিগের খেয়াল বদলাইতে থাকে পুরাণো খেয়ালের যায়গায় নূতন খেয়াল আসে কিন্তু নারীদিগের পুরাণো খেয়ালই নূতন নূতন ভাবে প্রকাশ পায়।

অনেক নারী ধর্ম্মের জন্য যাহা করিয়া থাকেন অন্যেরা তাহা জীবন পথে চলিতে চলিতে অনেক বিষয় বুঝিতে ও প্রশ্ন করিতে গিয়া সেই সব কাজ করিতে থাকেন। মেয়েরা ছেলেবেলায় যেটুকু বিদ্যা উপার্জ্জন করেন তাহার সাহায্যে সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চান, যখন করিতে পারেন না তখন তাঁহাদিগের বুদ্ধির অগম্য বলিয়া হাল ছাড়িয়া দেন কিম্বা বাহিরের গুজব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া প্রশ্নের মীমাংসা করেন। যখন একটা কথা কিম্বা কোন বিষয় বুঝিতে পারেন না তখন স্বাধীনভাবে কাহারও মতে চালিত না হইয়া নিজে চেষ্টা করিয়া মীমাংসায় উপস্থিত হওয়া মেয়েদের কুষ্ঠিতে সচরাচর দেখা যায় না।

মেয়েদের আর একটী জাতীয়তা আছে, এটী যে কেবল মেয়েদের সম্বন্ধে সত্য তাহা নহে পুরুষদিগেরও এই দোষ দেখা যায় তবে অধিক পরিমাণে মেয়েদের মধ্যেই প্রবল। সে দোষ বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের অভাব। মহিলারা খুব আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য জিনিষ দেখেন ও তাহার উপকারিতা ভোগ করেন কিন্তু কি করিয়া সেগুলি প্রস্তুত হইতেছে ইহা জানিবার যত্ন করেন না, জানিবার জন্য কৌতূহলও হয় না। এই কৌতূহলের অভাবের অনেক উদাহরণ দিতে পারি কিন্তু বাছিয়া একটী আদর্শ উদাহরণ দিতেছি। অনেক দিনের কথা একদিন আমি অনেক শিক্ষিত ইংরাজ মহিলার সহিত একটী ঘরে বসিয়া কথাবার্ত্তা করিতেছিলাম, কথা কহিতে কহিতে নৌকা সম্বন্ধে আলোচনা হইতে লাগিল। একজন মহিলা বলিলেন তিনি পালের কোন বিশেষ উপকারিতা বুঝেন না কেননা পাল বাতাস মুখে নৌকাকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে সাহায্য করে—অন্যান্য মহিলারাও এই মতে সায় দিলেন। ইঁহারা বড় বড় জাহাজের পাল—যে জাহাজের অগ্রে প্রবহমান প্রতিকূল বায়ুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাহা দেখিয়াছেন এবং যে সব জাহাজে বাষ্প দিয়া চালিত হইবার কোন বন্দোবস্ত নাই সে সব জাহাজে যদি পাল না থাকে তাহা হইলে যে জাহাজ ক্রমাগত বাতরক্ষিত পার্শ্বের সম্মুখস্থ উপকূলে উপনীত হইবে তাহা ভাবিতে পারিলেন না। মেয়েরা হয়তো বলিতে পারেন যে ওসব পুরুষদের ব্যবসা তাঁহারা সে সম্বন্ধে কিছুই অবগত নন। কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে ইংরাজ মাত্রেরই কি পুরুষ কি নারীর সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী তৎপরতায় এত বেশী অনুরাগ যে তাঁহাদিগের প্রত্যেকের কাছেই পালের উপকারিতার বিষয় শিক্ষা পাইবার প্রত্যাশা করা যায়। প্রায় সব মহিলারাই জানেন যে বাষ্প গমনাক্ষম বাষ্পীয় যন্ত্রকে চালিত করিয়া লইয়া যায় এবং ইহা জানিয়াই তাঁহারা সন্তুষ্ট, বাষ্প কি করিয়া চাকাকে ঘোরায় ইত্যাদি প্রশ্ন তাঁহাদিগের মনে ওঠে না; তাঁহারা রোজ ঘড়িতে দম দেন কিন্তু কি করিয়া কাঁটা ঘুরিতেছে ইত্যাদি জানিবার ইচ্ছাও প্রকাশ করেন না।

এই কৌতূহলের অভাবের জন্য অনেক কুফল ঘটে। ইহার জন্য মহিলারা সঠিক সত্য সংগ্রহ করিতে পারেন না। তাঁহারা যে শিক্ষা লাভ করেন সেই শিক্ষার সাহায্যে নিজের মানসিক বৃত্তির উচ্চতাকে বিশ্লেষ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করেন না, কিম্বা মানসিক বৃত্তিকে নূতন আবিষ্কারের পথে লইয়া যান না। আর এই অভাবের জন্যই গৃহস্থালী সম্বন্ধে আবিষ্কারও যেমন সেলাই-য়ের কল, মোজার কল, ষ্টোভ ইত্যাদি মেয়েদের দ্বারা আবিষ্কৃত না হইয়া পুরুষ-দিগের দ্বারাই হইয়াছে।

মোটের উপর আমার মত মেয়েরা নিজে হ'তে কিছুই করেন না। আশা করি আমার এই মত প্রকাশে কেহ রাগ করিবেন না।

স্কুলবিহীন গ্রাম ও নগর।

ইংরেজ-শাসিত ভারতে ১৯১১-১২ খ্রীঃ ১৭৬,৪৪৭টি শিক্ষালয় ছিল। তন্মধ্যে ১৬০,৩৩৪টি ছাত্রদের জন্য, ১৬১১৩টি ছাত্রীদের জন্য। এই স্কুলগুলি দ্বারা ৫৮২, ৭২৮টি গ্রাম এবং ১৫৯৪টি সহরের (অর্থাৎ ৫০০০ বা তদূর্দ্ধসংখ্যক অধিবাসিযুক্ত স্থানের) শিক্ষাকার্য্য চলিত। অতএব ছাত্রদের প্রত্যেক স্কুলে ৪টি গ্রামনগরের এবং ছাত্রীদের প্রত্যেক স্কুলে ৩৬টি গ্রাম নগরের শিক্ষাকার্য্য চালাইতে হইত। সোজা ভাষায় ইহার মানে এই যে প্রতি ৪টি গ্রামনগরের মধ্যে ৩টিতে ছাত্রবিদ্যালয় নাই, এবং প্রতি ৩৬টি গ্রামনগরের মধ্যে ৩৫টিতে ছাত্রীবিদ্যালয় নাই। ইহা কেবল একটা গড় মাত্র। বাস্তবিক ইহা দ্বারা যাহা বুঝা যায়, দেশে শিক্ষার অবস্থা তাহা অপেক্ষা খারাপ। কারণ, যদি সৌভাগ্য-শালী গ্রামনগরগুলির প্রত্যেকটিতে কেবল ১টি করিয়া স্কুল থাকিত, তাহা হইলে বলা যাইত যে ঠিক তিন-চতুর্থাংশ স্থানে ছাত্র-বিদ্যালয় নাই, এবং ৩৫-ষট্‌ত্রিংশতম স্থানে ছাত্রীবিদ্যালয় নাই। কিন্তু বাস্তবিক অনেক সহরে এবং কোন কোন গ্রামে একাধিক ইস্কুল আছে। সুতরাং সম্পূর্ণ স্কুলবিহীন স্থানের অনুপাত আরও বেশী।

শার্প সাহেবের পুস্তক হইতে দেখা যায় যে জাপানে সহর ও গ্রামের সংখ্যা ১৪৫৮০ (৪০পৃষ্ঠা), এবং সর্ব্বপ্রকার শিক্ষালয়ের সংখ্যা ৩০,৪২০ (৪৯০পৃষ্ঠা)। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে জাপানে স্কুলবিহীন গ্রাম বা নগর নাই।

ভারতবর্ষের বরোদারাজ্যের ১৯১১-১২র শিক্ষারিপোর্টে দেখা যায় যে উহার ৩০৯৫টি গ্রাম ও নগরের মধ্যে ২১১৯টিতে স্কুল আছে; স্কুলগুলির সমগ্র সংখ্যা ২৯৬১ বাকী ৯৭৬টি গ্রামের মধ্যে ৭০৯টিতে মোটে ২১৪ ঘর বসতি আছে; তাহারাও আবার যাযাবর, স্থায়ী বাসিন্দা নহে; সুতরাং তথায় স্কুল চলিতে পারে না। ৬০টি গ্রামে চাষে অজন্মা হওয়ায় স্কুল বন্ধ করিতে হইয়াছিল; সেগুলিতে আবার স্কুল খোলা হইয়াছে। অবশিষ্ট ১৫৬টি গ্রামে শিক্ষা-বিভাগ, যেখানেই অন্ততঃ ১৫টি ছাত্র ছাত্রী পাইবেন, সেখানেই স্কুল খুলিবার চেষ্টায় আছেন।

স্বদেশপ্রেমিক শিক্ষিত ব্যক্তিদের, তাঁহাদের নিজের নিজের জেলায় কোন্ কোন স্থানে একটিও বালকবিদ্যালয় এবং বালিকাবিদ্যালয় নাই, অবিলম্বে তাহার তালিকা প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়া, বিদ্যালয় খুলিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সব উন্নতির গোড়ায় দৈহিক বল ও স্বাস্থ্যের পরই শিক্ষা। অতএব শিক্ষার অভাব মোচনে সকলে বদ্ধপরিকর হউন। বাঙ্গলা দেশের কয়েকটি জেলার ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের স্কুলের সংখ্যা আমরা গত আগষ্ট মাসে ডিরেক্টর সাহেবের আফিস হইতে আনাই-য়াছিলাম। ঠিক দিয়া স্কুলসমূহের মোট সংখ্যা স্থির করিয়াছি। এসকল জেলার গ্রামনগরের সংখ্যা ও স্কুলের সংখ্যা নীচের তালিকায় দিলাম। গ্রামনগরের সংখ্যা ১৯০১ সালের সেন্সস্ রিপোর্ট অনুসারে দিলাম; এই সংখ্যার বিশেষ হ্রাসবৃদ্ধি হয়

না। তুলনার সুবিধার্থ বরোদার সংখ্যা-গুলিও এখানে জুড়িয়া দিলাম।

জেলা	গ্রামনগরের সংখ্যা	স্কুলের সংখ্যা
মেদিনীপুর	৮৪৭১	৪০৪৫
২৪পরগণা	৫১০৭	১৭৫৯
রংপুর	৫২১৮	১২৫৯
ঢাকা	৭২৬৫	২৩৪৫
মৈমনসিং	৯৭৭৮	২৫৪৭
ফরিদপুর	৫২৮৫	১৫৮৪
বাখরগঞ্জ	৪৬১৭	৩২০১
ত্রিপুরা	৫৩৬৪	২১৬০
বরোদা	৩০৯৫	২৯৬১

এই সব জেলার প্রত্যেকটিরই লোক-সংখ্যা বরোদারাজ্য অপেক্ষা বেশী। জেলা-গুলির মধ্যে বাখরগঞ্জেই বেশীর ভাগ স্থানে স্কুল আছে, কিন্তু সেখানেও প্রায় এক-তৃতীয়াংশ স্থানে স্কুল নাই। বরোদার অবস্থা এ জেলা অপেক্ষাও খুব ভাল। শিক্ষায় বঙ্গদেশ আর সকল প্রদেশ অপেক্ষা অগ্রসর। এ হেন বঙ্গের জেলাগুলির এই অবস্থা। ২৪পরগণা জেলা রাজধানীর নিকটতম। তাহার ৫১০৭টি গ্রামনগরে মোটে ১৭৫৯টি স্কুল আছে, অর্থাৎ দুই-তৃতীয়াংশ স্থানে স্কুল নাই। (প্রবাসী।)

লক্ষ্ণৌ নগরে নববিধান সঙ্ঘ।

নববিধান সংঘের বিবরণ ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকায় সকলে পাঠ করিয়া থাকিবেন। ১০ই এপ্রিল হইতে ১৪ই এপ্রিল পর্য্যন্ত এক মহা আশীর্ব্বাদ সকলের উপর দিয়া বহিয়া গেল, কে কতটুকু সম্ভোগ করিলাম তাহা প্রকাশ করা সম্ভব কি না জানি না; তবুও যাঁরা আসেন নি, আসতে পারলেন না তাঁদের কাছে আমাদের আশীর্ব্বাদের কথা বলতে ইচ্ছা করে।

ছুটী অল্পদিনের এই দূরদেশে কে আর আসতে পারবেন, বড় জোর দশ বারজন হয়তো আসবেন এই রকম ভাব আমাদের অনেকের মনে হয়তো এসেছিল, অনেক রকম প্রশ্ন উঠেছিল, অনেক রকম বাধা এসেছিল, কিন্তু সব সরে গেল। সম্পাদকের চিঠি এবং টেলিগ্রামের পর টেলি-গ্রাম অনেককে টানিয়া আনিল। ভিন্ন ভিন্ন দেশ হতে ভাইরা আসছেন শোনা গিয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যে ঘর দোর ফেলিয়া 'চল ভাই চলি' বলে এতগুলি মহিলা বেরিয়ে পড়বেন তা কে জানিত? ৬৫ জন পুরুষ ও ২৩ জন মহিলা বিদেশ হইতে আসিয়াছিলেন। মহিলারা বেশীর ভাগই হঠাৎ বেরিয়ে পড়েছিলেন, যেমন শোনা তেমনি বেরিয়ে পড়ার মত যেন হয়েছিল। অনেকে বল্লেন যখন শুনলাম সবাই যাচ্ছেন, তখন আর থাকতে পার-লাম না।

সকল যাত্রী ধর্ম্মশালায় নাবিয়াছিলেন। মহারাণী সুনীতি দেবী, মহারাণী সুচারু দেবী ইত্যাদিরা কারল্‌টন্ হোটেলে নামিয়াছিলেন। কদিন ধরিয়া প্রাতঃকালে উপাসনা, দুপুর বেলা কন্‌ফারেন্স, সন্ধ্যার সময় কীর্ত্তন আলোচনা, রাত্রে বারদারী হলে প্রিন্সিপাল ভাসওয়ানির বক্তৃতা আর রাত বারটা একটা পর্য্যন্ত সিন্ধি ভাইদের গান বাজনা নৃত্য যেন একটী স্বর্গের দৃশ্য

ধরেছিল। সকল গোলমাল ত্রুটী ও ক্লান্তির ভিতরেও চারিধারে কেবল হাসি আমোদ ছাড়া কিছু দেখা যাইত না।-

রামায়ণ মহাভারতের কত গল্প শুনেছি, এখন চোক বুজলে সেই সব গল্প চোখে দেখলাম, গল্পের চেয়ে আরও বেশী দেখলাম, আরও বেশী হয়তো দেখবো মনে হয়। কংগ্রেস্ হয় বছরে বছরে ভারতবর্ষীয়দের ভিতর একতা আনিবার জন্য, সেখানে দেখেছি কত লোক কত দেশ থেকে আসেন। এক্‌জিবিশন প্রদর্শনীতে পর্দা ভেঙ্গে যাওয়া দেখেছি, কিন্তু এরকম ভেদাভেদ ঘুচে যাওয়া তো কখনও দেখি নাই। এখানে সকলকে নিজের কথা ভুলে যেতে হয়েছিল। ধনী, নির্ধন, বালক বৃদ্ধ, নারী পুরুষ কিছুরই যেন ভেদাভেদ ছিল না, সকলে নিজেদের শোকের কথা ভুলে গিয়েছিলেন, বিপদের কথা ভুলে গিয়েছিলেন; বালকের নিশ্চিন্ততা যেন ফিরে পেয়েছিলেন, শরীরের দুর্ব্বলতা যেন কোথায় চলে গিয়েছিল। যাবার সময় কেহ বলিলেন, আর ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে না, কেহ বলিলেন, ইচ্ছা করে রোজ রোজ এরকম হয়।

আমাদের বোনদের ভিতর যে কি হয়ে গেল তা আমরা বুঝতে পারছি না। সঙ্কোচ যেন আপনি সরে গিয়েছিল, স্বার্থপরতা যেন ধুয়ে গিয়েছিল, পিঞ্জরের পাখী খোলা বাতাস পেয়ে যেন আর ফিরতে চাইছিল না। দুঃখের বোঝা সহজ ভাবে নেবার জন্য নূতন জীবন নূতন হাঁসির ছবি আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো, ডাক এলো সব বন্ধনের ভিতর থেকেও মুক্ত হও, আনন্দের ফোয়ারা তোলো তাই রান্নাঘরের কাছেও বার বার গান শুনলাম, "আনন্দে গান করো, আনন্দে পান করো, আনন্দে ধ্যান করো, আনন্দে কাজ করো, বিমর্ষ হয়ো না, আলস্য করো না।—।" আমরা কি নিরানন্দে ফিরেছি না সবাই মিলে সংঘের সভাপতির রচিত নূতন গান গাইতে গাইতে সেই গান আমাদের একঘেয়ে কাজের ভেতর ভাল করে গাইব বলে নূতন শক্তি নিয়ে যে যার কাজে ফিরে এসেছি? একটা নূতন রাজ্য দেখে সেই রাজ্য প্রতিজনে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবো বলে নীরবে স্নরবে দীক্ষা নিয়ে ফিরেছি।

ভাইরা কি ভোগ করিলেন তাহা তাঁহারাই জানেন, কিন্তু দেখছি সকলেই বৃদ্ধ হইতে বালক পর্য্যন্ত অতি আদরে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার গেরুয়া রেখেছেন। "আমার গেরুয়া কোথায়?" "আমার মেডালিয়ন কোথায়?" "আমার পেনসিল কোথায়?" "ভাই আমায় একটা সঙ্ঘ স্মরণিকা দেবে?" এই রকম কত কথা শুনছি। হিন্দু ভাই বোনের দেওয়া গেরুয়া বেঁধে আফিসে যাচ্ছেন, সবাই বল্‌ছেন কি দেখলাম! গেরুয়ায় সব গেরুয়া হয়ে গেল। বোনেরা রাণী হয়েও গেরুয়া গায়ে, শাঁক হাতে চন্দনের ফোটা নিয়ে এলেন, সমস্ত পার্থক্য মুছে দিয়ে শঙ্খধ্বনি করে ভাইদের গেরুয়ায় ঢেকে দিলেন, চন্দনের ফোটা পরিয়ে শুভ্র হয়ে যেতে বল্লেন, সবাইকে প্রেমে বেঁধে এক করে ফেল্লেন, আর পালাবার পথ নেই। বোনেরা ভাইদের কাছে

আশীর্ব্বাদ চাইলেন, সবাই মিলে গাইলেন "চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের ও লহরী"—

সংঘতে যে ভগ্নিরা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের লইয়া 'সংঘের ভগ্নিদল' বলিয়া একটি দল হইল, তাঁহারা যে যেখানে থাকুন মিলিত ভাবে কিম্বা নিজ নিজ সামর্থ্যমত সেবা, উপাসনা, সামাজিক মেলা মেশা ও উন্নতির চেষ্টা, পাঠ, আলোচনা, দান, সাহিত্যসেবা ইত্যাদি কাজে সাহায্য করিবেন বলিয়া ব্রত গ্রহণ করিলেন। মহারাণী সুনীতি দেবী এই দলের সভাপতি ও কুমারী সত্যবতী রায় সম্পাদিকা নিযুক্ত হইলেন। কার্য্যপ্রণালী ঠিক করিবার জন্য একটী সবকমিটি গঠিত হইল। মহারাণী সুনীতি দেবী সভাপতি, মহারাণী সুচারু দেবী, শ্রীমতী মণিকা মহলানবীস, সুধাংশু বিকাশিনী মুখোপাধ্যায়, ভক্তিসুধা ঘোষ, প্রীতিলতা ঘোষ, সুমতী মজুমদার, সত্যবতী রায় ইহার সভ্য মনোনীত হন।

কলাই সুঁটীর খিচুড়ী।

ভাল করিয়া রাঁধিতে পারিলে কলাই সুঁটীর খিচুড়ী অত্যন্ত মুখরোচক এবং উপাদেয় সামগ্রী হয়। গৃহস্থের পক্ষে ইহা শুধু একটী সুস্বাদু আদরের দ্রব্য নহে, ইহা অত্যন্ত পুষ্টিকর, বলকারক এবং অজীর্ণনাশক। যে সকল দ্রব্য ব্যবহৃত হয় তাহার কোনও সারাংশ নষ্ট হয় না।

প্রথমতঃ নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সংগ্রহ কর :—

(১) একসের কলাই সুঁটী। ইহা বেশ করিয়া খোসা ছাড়াইয়া দু তিন বার জলে ধুইয়া রাখ।

(২) খাঁড়ি মুসুরী ৫ ছটাক। মসুরীটা একটু ভাল হওয়া আবশ্যক বেশী পুরাতন হইলে সিদ্ধ হইতে বিলম্ব হইবে; বেশ করিয়া ধুইয়া রাখিবে।

(৩) পুরাতন সরু আতপ অথবা সিদ্ধ চাউল ৫ ছটাক।

(৪) লবণ ৫ তোলা।

(৫) ঘৃত এক পোয়া।

(৬) হরিদ্রা বাটা ১ তোলা।

(৭) ধনে বাটা ৪ তোলা।

(৮) জিরামরিচ বাটা ১ তোলা।

(৯) লঙ্কা বাটা আধ তোলা।

(১০) আদা বাটা ১ তোলা।

(১১) তেজপাত ইচ্ছামত।

(১২) ছোট এলাচ আধ তোলা।

(১৩) দারুচিনি ৪ আনা।

(১৪) জল ৩৷৹ সের।

ঘৃত একপোয়া সম চারিভাগে বিভক্ত কর। এক ভাগ জ্বালে চড়াইয়া ৫ মিনিট পরে কলাই সুঁটীগুলি অল্প অল্প ভাজিয়া লও, যখন দেখিবে জল মরিয়া গিয়াছে এবং একটু কাল্‌চে রং হইয়াছে তখন নামাইবে। পরে অন্য ভাগ লইয়া ঐরূপ জ্বালে চড়াইবে এবং চাউলগুলি অল্প ভাজিয়া লইবে, ৫।৭ মিনিট ভাজিলেই চলিবে। তারপর ঘৃতের তৃতীয় অংশ লইয়া খাঁড়ী মসুরীও ঐরূপ ভাজিবে। এই তিনটী জিনিষ পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে রাখিতে হইবে।

এক্ষণে বাকী ঘৃতটা হাঁড়িতে চড়াইয়া

অর্দ্ধেক গরম মসলা দিয়া জ্বাল দাও, ২।৩ মিনিট পরে জল সমস্তটা ঢালিয়া দিয়া যখন ফুটিতে থাকিবে তখন উপরোক্ত সুঁটী, চাউল ও মুসুরি দিবে, এবং ৫ মিনিট পর্য্যন্ত মুখবন্ধ করিয়া জ্বাল দিবে। এখন অন্যান্য মসলাগুলি ক্রমান্বয়ে দিয়া মুখবন্ধ করিয়া দাও এবং খুব সুসিদ্ধ হইয়া জল মরিয়া গেলে বাকী গরমমসলা বেশ করিয়া বাটিয়া জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া খিচুড়ীতে মিশাইয়া নামাইয়া লইলেই উৎকৃষ্ট কলাই সুঁটীর খিচুড়ী প্রস্তুত হইল।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

অবগত হওয়া যাইতেছে যে, ১৮৬৪ সনে জাপানে কেবলমাত্র ১জন প্রটেষ্টাণ্ট খৃষ্টান ছিল; কিন্তু অধুনা জাপানে বালক-বালিকাসমেত ১ লক্ষ খ্রীষ্টান বাস করে। ইহা ছাড়া রোমাণ ক্যাথলিক খ্রীষ্টানের সংখ্যা ৬৬,০০০ এবং গ্রীক চর্চ্চভুক্ত প্রায় ইহার অর্দ্ধেক। ১৮৭৪ সালে জাপান দেশে একজন খৃষ্টান প্রচারকও ছিল না; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে তথায় বহুশত প্রচারক দৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত ৪৩০জন জাপানী মহিলা জাপানে বাইবেল শিক্ষা দিয়া থাকেন।

ইংলণ্ডে বিবিধ রাজনৈতিক সংস্কার লইয়া কত আন্দোলন হয়। কিন্তু সামান্য সামান্য কত বিষয়ে যে সংস্কার প্রয়োজন তাহা অনেকেই ভুলিয়া থাকেন। সম্প্রতি ইংলণ্ডের খ্যাতনামা লেখক জন গল্‌স ওয়ার্দ্দি নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে ইংরেজ সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

১। স্ত্রীলোকদিগের অতিরিক্ত পরিশ্রম।

২। শিশুদিগের অপর্য্যাপ্ত আহার।

৩। নিতান্ত অল্পবয়স্ক বালকদিগের শারীরিক পরিশ্রমে নিয়োগ।

৪। দরিদ্রদের অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস।

৫। নিরাশ্রয়দিগকে (Pauper) পাগলা গারদে প্রেরণ।

৬। বৃদ্ধ অশ্বদিগকে দূরদেশে প্রেরণ।

৭। পক্ষীদিগকে পিঞ্জরে আবদ্ধ রাখা বা তাহাদের প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার।

কাফ্রিজাতির দুর্দ্দশার কথা আমরা অনেক অবগত আছি। মার্কিন দেশে তাহাদের প্রতি কি প্রকার অমানুষিক অত্যাচার করা হয় তাহা আমাদের অবিদিত নহে। কিন্তু এসকল সত্বেও আমেরিকার কাফ্রিজাতির মধ্যে কিরূপ শিক্ষাবিস্তার হইতেছে তাহা শুনিলে পুলকিত হইতে হয়। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে কাফ্রিজাতির মধ্যে শতকরা ৫ জন লিখিতে বা পড়িতে পারিত; কিন্তু অধুনা একশত জন কাফ্রির ভিতর ৬৮ জন লেখাপড়া জানে। গণনা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ৪,০০০,০০০ হইতে ১০,০০০,০০০ পর্য্যন্ত কাফ্রি সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া আমেরিকাবাসী

কাফ্রিজাতির মধ্যে ৭৫০,০০০ কৃষিব্যবসায়ী, ৭০,০০০ চা-ব্যবসায়ী, ২০,০০০ মিস্ত্রী, ২০,০০০ ক্ষৌরকার, ২০,০০০ সেবিকা, ১০,০০০ এঞ্জিনিয়ার, ২১,০০০ শিক্ষক ও বহুসহস্র কাফ্রি অন্যান্য ভদ্র ব্যবসায়ে নিযুক্ত রহিয়াছে। আমেরিকাবাসী কাফ্রিজাতি নিজেদের নিমিত্ত মোটের উপর ১২০,০০০,০০০ পাউণ্ড ধনসঞ্চয় করিয়াছে।

সিংহলবাসীরা স্বায়ত্তশাসন প্রার্থনা করে। কিন্তু "টাইমস্ অব সিলন" পত্রিকা এ ভাবের ঘোরতর বিরোধী। উক্ত পত্রিকা বলেন যে, ইংলণ্ডে একদল রাজনীতিজ্ঞ আছেন যাঁহারা স্বায়ত্ত শাসনের নাম শুনিবামাত্র সবদিক না ভাবিয়া তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া থাকেন। সিংহলের স্বায়ত্তশাসন প্রশ্ন সম্বন্ধে টাইমস্ পত্রিকা এপ্রকার ভয় পোষণ করিয়া থাকেন। স্বায়ত্ত শাসন ভাল কি মন্দ তাহা আমাদের পাঠিকাগণ বিচার করিবেন।

সম্প্রতি বঙ্গের প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি মহাশয় ভারতবাসীর অস্ত্রে অধিকার সম্বন্ধে অনেক সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন অস্ত্রে অধিকার না থাকিলে জাতি কিরূপে ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। আমরা জানি অস্ত্রের অভাবে দেশের লোকের কত অসুবিধা হয়। একটা কুকুর ক্ষেপিলে আমরা ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়ি।

বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যের বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমেরিকার ডাক্তার চার্লস্ ইলিয়ট বলিয়াছেন যে গত শত বৎসরে সভ্যতার উন্নতিতে স্বাস্থ্যের অবনতি সংঘটিত হইয়াছে। নগরবাসীগণের শরীরে জীবনীশক্তি অপেক্ষাকৃত অল্প, সন্তানের সংখ্যা অল্প, স্তন্যদ্বারা প্রতিপালন শক্তি অল্প, উন্মাদ রোগের বৃদ্ধি, বিকলাঙ্গ ও দুষ্কার্য্য প্রবণতার বৃদ্ধি ইত্যাদি দেখা যাইতেছে। সভ্যতা আপনার মৃত্যু আপনি আনয়ন করিতেছে, ইহা মহানগরী সকলের বিকলাঙ্গ, রোগী ও দুষ্কার্য্যে রত লোকদিগের সংখ্যার অত্যধিক বৃদ্ধিতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে। এসকল দোষ দূর করা সহজ ব্যাপার নহে। সমাজ সকল বিষয়ে উন্নতি সাধন না করিতে পারিলে এই অধোগতি ও বিনাশ হইতে রক্ষা পাইতে পারিবে না। সামাজিক জীবনে আমাদিগকে অতি সাবধানে সুনীতি, বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যরক্ষার বিধি সকল পালন করিতে হইবে। যাহাদিগের বয়স অধিক হইয়াছে তাহাদিগের জন্য হয়ত বিশেষ কিছু করিবার নাই, কিন্তু যাহারা অল্পবয়স্ক তাহাদিগকে সকল প্রকার সুব্যবস্থা দ্বারা রক্ষা করিতে হইবে যেন তাহাদিগের শরীর ও মন প্রকৃতিস্থ, সুস্থ ও সবল হইতে পারে। আমাদিগের দেশেও এবিষয় চিন্তা করিবার সময় হইয়াছে। শিশুকাল হইতে নগরে বাস করিয়া বালক বালিকাগণ এক প্রকারের অসহায় দুর্ব্বল জীব হইয়া উঠে—ইহার প্রতীকার না করিলে জাতীয় দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১১শ ভাগ] বৈশাখ, ১৩২১। মে, ১৯১৪। [১০ম সংখ্যা।

প্রার্থনা।

হে আমাদের সৃষ্টি ও পালনকর্ত্তা মঙ্গলময় দেবতা, আমাদের জীবন তোমার অযাচিত দান। এ জীবনের সহিত পিতা-মাতা বন্ধু বান্ধব আকাশ পৃথিবী প্রভৃতি যাহা যাহা পাইয়াছি, সকলই তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে দিয়াছ। তোমার পবিত্র হস্ত দ্বারা রচিত সকল বস্তুই পবিত্র এবং তোমার প্রিয় পুত্র কন্যা সকল নর-নারীই দেবদেবী, আমরা কি কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে ঘৃণা করিতে পারি? আমরা প্রত্যেকে যে তোমার নিকট কিছুই নই, ধূলি অপেক্ষাও হীন, তাহা কি আমরা ভুলিয়া যাইব! তুমি আমাদিগের প্রতি যে এত দয়া করিয়াছ আমাদিগকে যে ধন সামগ্রী অনেক দিয়াছ. আমাদিগকে যে অত্যন্ত হীন অবস্থায় রাখ নাই, ইহাতে আমাদের অহঙ্কার করিবার কিছুই নাই। কিন্তু দেখ, অন্তর্যামী দেবতা, আমরা তোমার ধনে ধনী হইয়া তোমার প্রদত্ত সামগ্রী ও তোমার প্রেরিত মানুষকে ঘৃণা করি। আমরা একজন মানুষকে পবিত্র বলি আর একজনকে অপবিত্র বলিয়া ঘৃণা করি। কতকগুলি বস্তুকে অকারণ অপবিত্র বলি। আমাদের এ মহা মোহ আর কে দূর করিতে পারে? আমরা এখন তোমার চরণে বিনীত ও ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা করি যে, আমরা যেন তোমার কোন দানকে অবজ্ঞা না করি; যেন সকল বস্তু ও ব্যক্তিকে তোমার প্রেরিত বলিয়া মান্য করি। তোমার ইঙ্গিতে আমাদিগের উপযোগী সকল বস্তু আমরা যেমন গ্রহণ করিব তজ্জন্য যেন একান্ত বিনীত হইয়া তোমাকে ধন্যবাদ দান করিব এবং যাহা আমাদিগের গ্রহণের জন্য নহে, তাহা দূরে রক্ষা করিব। তুমি দয়া করিয়া আমাদের আত্মার অবিনীত ভাব দূর করিয়া দাও এবং তোমার রাজ্যে যেন বিনীত হইয়া বাস করি ও সর্ব্বদা তোমার গৌরব

গান করি এই শিক্ষা দাও। এই প্রার্থনা করিয়া বার বার তোমার পাদপদ্মে প্রণাম করি।

শুচি ও অশুচি।

অপরিষ্কার, বিরক্তিকর বা দুর্গন্ধময় বস্তু ব্যবহার করিতে অনিচ্ছা মানুষের অত্যন্ত স্বাভাবিক। মানুষ স্বভাবতঃ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সুখকর ও সুগন্ধ সামগ্রী ভাল বাসে। মানুষের প্রকৃতির অভ্যন্তরে এই ভাবটি নিহিত রহিয়াছে। মানুষ যতই কেন হীন অবস্থায় পড়ুক না, তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র স্বাভাবিকতা থাকিলেই তাহাকে পরিষ্কার থাকিতে হয়, বিশ্রী দুর্গন্ধ বস্তু বা বিকট শব্দাদি হইতে দূরে পলায়ন করিতে হয়। অপর দিকে যখনই কেহ কোন বিশেষ কার্য্য করে, শারীরিক মানসিক বা আধ্যাত্মিক মঙ্গলোদ্দেশ্যে কোন ব্যবস্থা করে, তাহার সঙ্গে পরিষ্কার হইবার নিয়ম রাখা হয়। এই জন্য সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানের পূর্ব্বে স্নানাদি দ্বারা পরিষ্কৃত হওয়ার ব্যবস্থা দেখা যায়। আমাদের সকল প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত এই ভাবটি এক বিশেষ ভাবে প্রকাশ হইয়া থাকে।

শুচি ও অশুচি এই দুইটি শব্দ আমাদের দেশে যেমন ভাবে ব্যবহার হইয়া থাকে, অন্য দেশে ঠিক এরূপ ব্যবহার আছে কি না জানি না, কিন্তু মনে হয় যদি প্রাচীন সমাজের দৈনিক জীবনের ধর্ম্মসাধন বা বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াকর্ম্মের মধ্য হইতে বস্তু, ব্যক্তি ও স্থানের "শুচি" "অশুচি" ভাবটি তুলিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ধর্ম্মসাধনের নিষ্ঠা ও উৎসাহ অধিক অবশিষ্ট থাকে না। পরিষ্কার, সুন্দর, সুগন্ধ ও সুখকর শব্দ সকল গ্রহণ করা ও তদ্বিপরীত সকল প্রকার মলিন, অসুন্দর, বিরক্তিকর বস্তু ত্যাগ করা যে স্বাভাবিক নিয়ম আমাদের দেশে তাহা বিশেষ আকার ধারণ করিয়াছে। কোন গুণে কোন্ বস্তু বা স্থান বা ব্যক্তি কোন্ বিশেষ দেবকার্য্যে বা পবিত্র অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা আর এখন দেখিবার নিয়ম নাই। যে কার্য্যের জন্য যাহা শুচি বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিয়াছে বিনা বিচারে তাহা সেই ভাবে গ্রহণ হইয়া থাকে। এরূপ দেখা যায় যে, প্রাচীন কালে যে সকল সামান্য বস্তু দেবার্চ্চনা ইত্যাদিতে ব্যবহার হইত তাহাই শুচি বলিয়া গৃহীত হইতেছে, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তুও সেরূপ ভাবে গৃহীত হয় নাই। যাহা পূর্ব্বকালে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাই শুচি ও এখন যাহা দেখা যাইতেছে তাহা যেন অশুচি।

প্রাচীন মিশরদেশে শুচি অশুচির বিচার ছিল দেখা যায়। ইহুদি জাতি আজ পর্য্যন্ত অনেক সামগ্রীকে অশুচি জ্ঞান করিয়া থাকে, কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষে এই ভাবটি যত জীবন্ত সবল ও সূক্ষ্ম, মনে হয়, আর কোথাও এরূপ নাই। দক্ষিণ ভারতে এরূপ বিচারের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি আছে, ভারতবর্ষেও অন্য কোন স্থানে সেরূপ নাই। কিন্তু আমাদের বঙ্গদেশে কোন

কোন বিষয়ে শুচি অশুচি জ্ঞানের বাড়াবাড়ি অতি অদ্ভুত। অন্য দেশের লোককে সেরূপ শুচি অশুচির কথা বুঝাইয়া দেওয়াও কঠিন মনে হয়। আমাদিগের শরীরের পরিত্যক্ত দূষিত পদার্থগুলি স্বভাবতই আমাদিগের ঘৃণার বস্তু. কিন্তু সে বিষয়েও অতিরিক্ত ঘৃণা প্রকাশ করা মনের দুর্ব্বলতাই প্রকাশ করে। আবার জাতি বর্ণ বা বংশ ইত্যাদির ভিন্নতা অনেক সময়ে মানুষকেও যেন ঘৃণার বস্তু করিয়া তুলে। অমুক ব্যক্তি অমুক বংশের লোক অতএব অস্পৃশ্য—এরূপ নির্দ্ধারণ যেন হইয়াই আছে। বিচার না করিয়া অশুচি জ্ঞান করা সকল জ্ঞানবিজ্ঞান বিরুদ্ধ, সকল উচ্চ ধর্ম্মসাধকের ভাববিরুদ্ধ। অথচ আমাদিগের দেশে আজও এইরূপ অশুচি জ্ঞান স্থান পাইতেছে। নীচকুলে যাহার জন্ম তাহার আর শু'চ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই ইহাই আমাদের প্রাচীন ধর্ম্মের চিরন্তন মীমাংসা। বর্ত্তমান সময়ে প্রাচীন সমাজে বিভিন্ন বিভাগে সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে. সময়ে সকল বিভাগই সংস্কৃত হইবে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু এই শুচি অশুচি বিষয়ে মানুষের মনে জ্ঞানালোক ও প্রেমালোক প্রবেশ করা অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

বর্ত্তমান যুগ বিজ্ঞানপ্রধান। এখন বেদ বেদান্তের বাক্য অপেক্ষা বিজ্ঞানের বাক্যের মূল্য অত্যন্ত অধিক। বিজ্ঞান চারিদিকে অদৃশ্য জীবাণুপুঞ্জ জ্ঞানচক্ষুতে দর্শন করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে চারিদিকের এই সকল কীটাণু আমাদিগের পরম শত্রু—সুস্থভাবে জীবন ধারণ করিতে হইলে বিজ্ঞানের সাহায্য ও পরামর্শে. এই সকল শত্রু বিনাশ করিতে হইবে—তাহা না পারিলে তাহারা আমাদগের স্বাস্থ্য নষ্ট করিবে ও সময়ে পীড়াও অকাল মৃত্যু উপস্থিত করিবে। এত দিন আমাদের দেশের নরনারী যেমন প্রাচীন কালের প্রথার অনুবর্ত্তন করিয়া বিনা বিচারে কতকগুলি বস্তু ও ব্যক্তিকে অশুচি বলিয়া ত্যাগ করিয়াছেন বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষিত লোকেরা সেইরূপ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া বিনা বিচারে অর্থাৎ অন্ধ ভাবের শ্রদ্ধার সহিত তাহাদিগের উপদেশ পালন করিতেছেন এবং প্রাচীন কালের কুসংস্কারের পরিবর্ত্তে নূতন যুগের নূতন কুসংস্কারে পতিত হইতেছেন। এ শ্রেণীর লোক শিক্ষিত হইয়াও শুচি অশুচি বিচার করিবার সময় অযথা বাড়াবাড়ি করিতেছেন। এই নূতন প্রকারের শুচি অশুচি বিচারের পরিণাম কি হইবে এবং তাহার সংশোধন কে করিবে তাহা আমরা বলিতে পারি না।

আমাদিগের মহিলাগণের মধ্যে অপর এক শ্রেণীর শুচি অশুচি জ্ঞান আছে। তাহাকে সাধারণত আমরা "শুচি বায়ু" নাম দিয়া থাকি। চিকিৎসাশাস্ত্রের রোগনির্ণয় প্রকরণের মধ্যে শুচিবায়ু নামক রোগ পাওয়া যায় না তাহা আমরা জানি, কিন্তু মনে হয় ইহাকে এক প্রকারের উন্মাদ রোগ বলিলে অসঙ্গত হয় না। মনোবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন অনেক মানুষ আংশিক ভাবে নির্ব্বোধ—

কোন কোন লোক আংশিক ভাবে উন্মাদ-গ্রস্ত—সেই নিয়মে বলা যাইতে পারে যে, আমাদিগের মহিলাগণের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা অন্য সকল বিষয়ে বুদ্ধিমতি, সমদর্শনশীলা, কেবল কোন কোন বস্তু বা ব্যক্তি বা স্থানকে অত্যন্ত অপবিত্র বা অশুচি বলিয়া সন্দেহ হওয়া তাঁহাদের রোগ বিশেষ। যখন সেইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয় তখন আর তাঁহাদের স্বাভাবিক বিচার বা সহজ জ্ঞান কোন কাজে আসে না—তাঁহারা সন্দেহ করিয়া না করিতে পারেন এমন কাজ প্রায় নাই। মহিলাগণের এরূপ শুদ্ধতানিষ্ঠা বা রোগ কেবল তাঁহাদিগকে ক্লেশ দেয় তাহা নয়, তাঁহাদের পারিপার্শিক অনেক নর নারীর প্রতি অত্যাচার করে। শুচিবায়ু কত অশান্তি, অপচয়, মনোবেদনা ও অসুবিধা উপস্থিত করে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যাঁহারা সৌভাগ্য ক্রমে এই ক্লেশ দায়ক রোগাক্রান্তের সহিত ব্যবহার করেন নাই তাঁহারা ইহার, অপকারিতা বুঝিতে পারিবেন না—কিন্তু যাঁহারা শুচিবায়ু গ্রস্ত লোকের সহিত কিছু কাল ব্যবহার করিয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই বলিবেন যে, চিকিৎসকগণ ইহাকে রোগ বলিয়া নির্ণয় না করিলেও ইহা একটী যন্ত্রণা দায়ক রোগবিশেষ।

জলপান করা মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক কার্য্য সকলেই জানেন, কিন্তু যখন অত্যধিক পিপাসা হইয়া মানুষকে ক্রমাগত জলপান করিতে ব্যাকুল করে তখন চিকিৎসক বলিবেন ইহা একটী কঠিন রোগ, ইহার আশু চিকিৎসা প্রয়োজন; ঠিক সেইরূপ পরিষ্কৃত সুন্দর কার্য্যোপযোগী অর্থাৎ শুচি বস্তু গ্রহণ করা ও অপরিষ্কৃত কুৎসিৎ অনুপযোগী অর্থাৎ অশুচি বস্তু ত্যাগ আমাদিগের পক্ষে স্বাভাবিক কার্য্য, কিন্তু যখন ক্রমাগত সকল পরিষ্কৃত সুন্দর ও কার্য্যোপযোগী বস্তুকে অশুচি বলিয়া ত্যাগ করা হয় যখন কোন বস্তুকেই শুচি মনে হয়না যখন চারিদিকে যাহা কিছু দেখা যায় তাহাই যেন অশুচি বলিয়া সন্দেহ হয় তখন অবশ্য সহজ বুদ্ধির বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ বলিবেন যে এব্যক্তির চিত্তের বিকার ঘটিয়াছে, ইহার শুচিবায়ু রোগ উপস্থিত হইয়াছে। উন্মাদ-গ্রস্তকে অন্য লোকে পাগল বলে কিন্তু সে নিজে নিজেকে সুস্থ মনে করে, এরোগ সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিয়া থাকে। যাঁহারা শুচিবায়ুগ্রস্ত হন তাঁহারা আপনাদিগকে অপর সাধারণ অপেক্ষা অধিক পবিত্র মনে করেন, তাহাও যদি না করেন তবে আপনাদিগকে নিরোগ, প্রকৃতিস্থ মনে করেন তাহার কোন সন্দেহ নাই।

আমরা দেখিতে পাই যে আমরা স্বভাবের নিয়মে অশুচি ত্যাগ করি ও শুচি বস্তু গ্রহণ করি এবং যতদূর সম্ভব আমাদিগের শরীর অন্ন বস্ত্র গৃহ, সামগ্রীও অপর সকল বস্তুকে পরিষ্কৃত ও সুন্দর এবং শুদ্ধ রক্ষা করিতে যত্নবান থাকি। এই সহজ বিধি অবশ্য অতি আদিকাল হইতে জন সমাজে কার্য্য করিতেছে এবং বিশেষ২ ব্যক্তির প্রতি বা সাধারণভাবে প্রাচীনগণের প্রতি শ্রদ্ধা করিয়া তাঁহারা যে সকলকে শুচি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন আমরা সে

সকলকে শুচি বলি এবং যেসকলকে অশুচি বলিয়া ত্যাগ করিয়াছেন আমরাও তাহাই করি। এই জন্য এক দেশের আচার অনুসারে যে সামগ্রী পবিত্র অপর দেশের আচার অনুসারে তাহা অপবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময় বিবিধ দেশেরও সমাজের লোক সমবেত হইয়া বাস করিতে বাধ্য হইতেছেন, সেই সঙ্গে শুচি ও অশুচি বিষয়ক সংস্কার নানা অবস্থায় নূতন নূতন ভাবে গঠিত হইতেছে। এখন বংশগত বা দেশাচারগত শুচি অশুচি জ্ঞানকে আর ধরিয়া রাখিলে চলিবে না। যাঁহারা একত্র বাস করেন তাঁহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি যাহাকে শুচি বলিয়া গ্রহণ করিবেন অন্যে তাহাকে অশুচি জ্ঞান করিলে একত্রে বাস করাই কঠিন হইয়া উঠে। এজন্য পুর্ব্বে যে সকল বস্তুকে যে ভাবে দর্শন করা হইত তাহাকে পুনর্ব্বার বিবেচনা করিয়া শুচি বা অশুচি স্থির করিতে হইবে। আমরা জানি মহিলাগণ শুচি অশুচি বিচার করিবার সময় অন্যের মত জানিবার জন্য অপেক্ষা করেন না। আপনার শিক্ষা বা রুচি, বা কল্পনা অনুসারে অনেক বস্তুকে অশুচি বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া বসেন কিন্তু এখন যে সময় উপস্থিত হইয়াছে এখন আর সেরূপ আপনার ভাবে ডুবিয়া থাকিলে চলিবে না। যেমন প্রতিবেশীর সহিত সম্পর্ক না রাখিয়া গ্রাম বা নগরে বাস করা অসম্ভব তেমনই বিবিধ বিষয়ে অন্যের মতের প্রতি অবমাননা করিয়া সমাজে চলা অসম্ভব।

আমরা সকলেই দেখিতে পাইতেছি যে, শরীরের স্বাস্থ্যরক্ষা, রোগ উপশম, মনের স্ফূর্ত্তি, কার্য্যের সফলতা, নীতির পবিত্রতা, সৌন্দর্য্য ও পরিচ্ছন্নতা, জ্ঞানের তৃপ্তি, সুখশান্তি ও পুণ্যের বৃদ্ধি এবং আনন্দলাভের বিবিধ উপকরণকে শুচিরূপে গ্রহণ করিতে হইবে এবং তদ্বিপরীত বস্তু সকলকে ত্যাজ্য বলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টির সকল বস্তুই সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্ট—কোন বস্তুই অপবিত্র হইতে পারে না—তবে আমরা যে সকল বস্তু গ্রহণ করা উপাদেয় মনে করি তাহারা আমাদিগের নিকট শুচি বা গ্রহণীয়, যাহা অনুপযোগী মনে করি তাহা হেয়। পৃথিবীর বস্তু সকলই সমান, কেবল আমাদিগের সম্পর্কে কোনটা কিরূপ তাহাই আমাদিগের দেখিবার বিষয়, সেইরূপ মানুষ সম্পর্কেও জানিতে হইবে যাহা যাহা উপযোগী, সুন্দর, সুখপ্রদ তাহা যেসকল মানুষে পাওয়া যায় তাহারা আমাদিগের গ্রহণীয় ও তদ্বিপরীত ত্যাজ্য। কিন্তু সকল মানুষই ভগবানের সন্তান, তাহারা ভগবানের বিধি বিধান অনুসারে উন্নতি ও শ্রেষ্ঠতার পথে যাইবে।

আমাদিগের জ্ঞান অতি অল্প, বস্তুর পরিচয় অতি অপূর্ণ—ইহা দিন দিন বৃদ্ধি লাভ করিবে ইহাই সৃষ্টির ব্যবস্থা। এজন্য কোন বস্তু বিষয়ে একটা সংস্কার ধরিয়া রাখা—উপযুক্ত প্রমাণ পাইলেও তাহা পরিবর্ত্তিত না করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বিজ্ঞানের আলোক অনুসারে চলা আমাদিগের একমাত্র পথ কিন্তু দুঃখের বিষয় যে বিজ্ঞানও অপূর্ণ, আজ যাহাকে উপাদেয়

বলিয়া গ্রহণ করিতে বলিতেছেন কল্যই ঠিক সেই বস্তুকে হেয় বলিয়া দূর করিয়া দিতে বলিতেছেন। এসকল বিষয় আলোচনা করিয়া আমরা বলিতে পারি যে, যে কোন সামগ্রী হউক তাহাকে চিরদিনের জন্য অশুচি বলিয়া ত্যজ্য মনে করা সঙ্গত নয়। যাঁহারা অশুচি ত্যাগ করিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত তাঁহারা বৃথা মনের অশান্তি উপস্থিত করেন, বৃথা অনেক সময় সামগ্রী নষ্ট করেন—কার্য্যত তাঁহাদিগকেও শুচি অশুচি সকল বস্তুই ব্যবহার করিতে হয়—কারণ অশুচি ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেই ত্যাগ করা যায় না। ইহা কে না জানে যে আমাদিগের শরীরের দূষিত পদার্থগুলিই অত্যন্ত অশুচি, শরীরই সকল প্রকারের জঞ্জাল মলিনতা অশুচির মূল, অথচ সেই শরীর লইয়া সকলকে ঘর করিতে হয়। যাঁহারা বৃথা সংস্কারের দ্বারা চালিত হইতে প্রস্তুত নহেন, যাঁহারা আপনারা বিচার করিয়া সকল প্রকার দূষিত বস্তু ত্যাগ করেন তাঁহাদিগের পক্ষে শুচি ও অশুচি স্থির করা কঠিন হয় না—কিন্তু যাঁহারা অন্যের মুখাপেক্ষা করিয়া বা সংস্কারের অধীন হইয়া শুচিকেও অশুচি মনে করেন অথবা অশুচিকে শুচি বলিয়া গ্রহণ করেন তাঁহাদিগের সঙ্গে যুক্তি বিচারের আলোচনা করা বৃথা। কিন্তু তাঁহারা একটু চিন্তা করিলেই দেখিতে পাইবেন যে তাঁহাদের মনেই অশুচি রহিয়াছে এবং শরীর অন্য সকলের শরীরের ন্যায় ক্রমাগত অশুচি উৎপাদন করিতেছে মনকে শুদ্ধ করিয়া শরীরকে শুদ্ধ রাখিতে যত্ন করিলে তাঁহারাও অপর দশ জনের ন্যায় উন্নতিশীল অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন।

জন হ্যালিফ্যাক্স।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আমি ও আমার বাবা একটী বড় সজ্জিত কামরায় রাত্রির খাওয়া শেষ করিলাম। জন রান্নাঘরে খাইল। যতক্ষণ না বাবা বাহিরে গেলেন ততক্ষণ জনকে আমি সাহস করিয়া ভিতরে আনিতে পারিলাম না। বাবা বাহিরে যাইবামাত্র জনকে ডাকিয়া আনিলাম। বাড়ীতে জেল (ঝি, যে আমাকে মার মৃত্যুর পর হইতে মানুষ করিয়াছিল) ছাড়া অন্য কোন মেয়ে ছিল না। জেলের শান্তমূর্ত্তি খুব কমই দেখা যাইত। খুব সম্ভবতঃ সে রান্নাঘরে চাকর বাকরদের সঙ্গে রাগারাগি করিয়াছিল, তাহার পরেই জনকে আমার সঙ্গে দেখিয়া তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। "ভিখারী ছোঁড়াটার তো খাওয়া হয়েছে এবার বাড়ী যাক্ না সারাদিন কেবল ওর সঙ্গে ঘুরে বেড়ালে তোমার চল্‌বে না।"

জেলের কথা শুনিয়া আমি একটু অপ্রস্তুত হইলাম ভাবিলাম জন হয়তো তাহার কথা শুনিতে পায় নি কিন্তু যাহা ভয় করিয়াছিলাম তাহাই হইল। জন সব শুনিতে পাইয়াছিল সে শান্তভাবে হাসিতে হাসিতে বলিল "মহাশয় আমি জীবনে কখনও ভিক্ষা করি নাই, ভগবান্ আমাকে হাত পা দিয়াছেন আশা করি

তাহা খাটাইয়া আমি স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারিব।" তাহার পর আমার কাছে আসিয়া আমার স্বাস্থ্যের কথা, এবং যাইবার আগে আমার জন্য কিছু করিতে পারে কি না, জিজ্ঞাসা করিল।

আমার এই সঙ্গীহীন জীবনে তাহাকে ছাড়িতে চাহিতেছিলাম না। ব্যাকুলস্বরে তাহাকে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। জন একঘণ্টা থাকিতে স্বীকৃত হইয়া আমার পাশে বসিয়া তার জীবনের কষ্ট দুঃখের আশ্চর্য্য ঘটনা সকল বলিতে আরম্ভ করিল। আমি যে দিনরাত বইয়ের ভিতর ডুবিয়া থাকি সে তাহা জানিত না সেজন্য আমি লিখিতে এবং পড়িতে জানি কিনা জিজ্ঞাসা করিল; তাহার পর একখানি সুন্দর ক্ষুদ্র বাইবেল বাহির করিয়া দেখাইল।

বইয়ের প্রথম পাতেই বাপের নাম, তার মা বাবার বিয়ের দিন, জনের জন্মদিন, বাপের মৃত্যুদিন, লেখা ছিল।

"জন আমি কি লিখিব?" জন দোয়াত কলম আনিয়া বলিল "আমার মায়ের স্বর্গারোহণ অমুক তারিখে অমুক সনে হয়েছে লিখে দিন।" "আর কিছু না?" "না।"

সে অতি যত্নে লেখাটা শুখাইয়া বই বন্ধ করিয়া তুলিয়া রাখিল। তাহার বংশের এইটুকু মাত্র কথা বই আর কিছুই আমরা জানিলাম না।

জেল ব্যস্ত হইয়া ক্রমাগত বাহির ভিতর করিতেছিল। আমি কখনও হাসিতাম না কিন্তু জনকে সঙ্গীরূপে পাইয়া আমার মন আনন্দে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, এবং বিমর্ষভাব যেন কোথায় পলায়ন করিয়াছিল।

জেলের কিন্তু ইহা সহ্য হইল না। সে বলিল "তোমার আজ বাহিরে বেড়াইতে যাওয়া উচিৎ।"

"আমি বেড়াইয়াছি আর বাহিরে যাইবার কোন প্রয়োজন নাই।"

"তোমার কিন্তু অত হাসি শরীরের পক্ষে ভাল নয়, আর ও ছেলেটী এখন নিজের কাজে গেলেই পারে তো!"

"জেল বক্‌বক্ করো না চুপ কর।"

জন গম্ভীর হইয়া বলিল "জেল ঠিকই বলিতেছে আমি এবার আসি, খুব আমোদ করিলাম, সেজন্য ধন্যবাদ।"

"যাবে! বাবা ফিরে না আসা পর্য্যন্ত থাক, ভাই আমার মত হতভাগ্যের জন্য এইটুকু দয়া কর্‌বে না? তোমার তো কোন কাজ নেই তবে কেন তাড়াতাড়ি করিতেছ?"

"কাজ খুঁজে নিতে হবে. যা পাব সেই কাজই করবো। অনেক সময় আমায় ক্ষুধায় থাকৃতে হয়েছে কিন্তু কখনও ভিক্ষা করি নাই আর কাপড়—অবশ্য আমার মা বেঁচে থাকলে আমার এই মলিন শতছিন্ন কাপড় দেখলে কষ্ট পেতেন কেন না তিনি আমায় সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখতেন। এখন তো কেউ দুঃখ করবার নেই কিছু আসে যায় না।"

আমি বাবাকে জনের কাজের জন্য বলিব মনস্থ করিয়া সঙ্গে করিয়া বাগানে

যাইবার জন্য উঠিলাম কেননা জেলের গলা পাইতেছিলাম তার বকুনী শুনিবার ইচ্ছা আমার ছিল না। জন আমায় লাঠি ধরাইয়া দিল।

আমি শুষ্ক হাসি হাসিয়া লজ্জা ঢাকিতে চেষ্টা করিয়া বলিলাম "তোমার এ রকম লাঠি দরকার হয় না?"

"আশা করি তোমারও বেশীদিন দরকার হবে না।"

"হয়তো নাও হতে পারে। শীঘ্র মারা যেতে পারি।"

জন আর কিছু বলিল না কিন্তু কিছুক্ষণ হাঁটিয়াই আমাকে ক্লান্ত হইতে দেখিয়া বলিল আমি তোমাকে পিঠে করে নিয়ে যেতে পারি, ভারী ভারী বস্তা নিয়ে যাওয়া আমার খুব অভ্যাস আছে। আমি হাসিয়া বস্তার স্থান অধিকার করিতে প্রস্তুত হইলাম। জন আমাকে একটী ছোট ছেলের মত অনায়াসে বহিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। একটী বাগানে পৌঁছিয়া আমি ধীরে ধীরে নামিয়া ঘাসের উপর বসিলাম।

জনের বাগানটী বড় ভাল লাগিয়াছিল। আমি যে জন্মাবধি সে বাগান দেখিতেছি তাহা বলিলাম পরে তাহার ইতিহাস বলিতে আরম্ভ করিলাম। সাম্‌নের উচ্চ ঝোপ্‌টী দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যদি তাহাকে উহা পার হইয়া যাইতে বলা হয় তাহা হইলে সে কি করে, লাফান তো অসম্ভব।

"লাফাইতে চেষ্টাও করিতাম না ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ওধারে যাইতাম।" "থাক্ থাক্ তোমার আর গায়ের বলের পরীক্ষা করিতে হইবে না।" বাবা এই সময় আসিয়া পড়িলেন, তিনি আমাদের কথা শুনিয়াছিলেন এবং জনকে বলিলেন এই রকম করিয়া বুঝি তুমি সমস্ত বিপদের উপর জয়লাভ কর? তোমার নাম কি হে ভায়া?

আমি তাহার নাম বলিলাম। বাবা বলিলেন "ভাল কথা জন তুমি না একটা কাজ খুঁজিতেছিলে? আচ্ছা তুমি কি কাজ করিতে পার?

ব্যাকুলভাবে জন বলিল "আপনি যা দিবেন।"

"যা হয়" ইহার কিছুই মানে নাই, এতদিন তুমি কি কাজ করিয়াছ সত্যি করিয়া বলতো?"

জন শান্তভাবে শ্রদ্ধার সহিত বলিল "আমাকে একটু ভাবিতে দিন তাহার পর বলিতেছি।

—সমস্ত বসন্তকাল একটী কৃষকের সাহায্য করিয়াছি. তাহার পর কতকগুলি ভেড়া লইয়া পাহাড়ে গিয়াছিলাম, পরে জুন মাসে ঘাস তৈরী করিতে আরম্ভ করিয়াই জ্বরে পড়িলাম, তাই বলিয়া ভয় পাইবেন না দুমাস যাবৎ ভালই আছি—না হলে কি আর আপনার কাছে আসি।"

"থাক্ থাক্ আর বলিতে হইবে না অনেক হইয়াছে।"

"ধন্যবাদ মহাশয়! আমাকে কি কাজ দিতে পারবেন?"

"দেখ আমায় মহাশয় বলে সম্বোধন করো'না, আমার নাম ধরে ডেকো। আচ্ছা ফিলিয়স আমাদের কারখানা থেকে

একটা ছোঁড়া পালিয়েছে তার যায়গায় জনকে নিলে কেমন হয় ?"

"কার কথা বলিতেছেন ?"

"বিলের কথা।" আমার মুখ শুকাইয়া গেল। চুরুট মুখে, ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরিয়া ঠেলা গাড়ী করিয়া বাড়ী বাড়ী গিয়া বিলের চামড়া জড় করিয়া আনিবার ছবি আমার চোখের উপর ভাসিতে লাগিল।

"বাবা !" আমার ভাষায় বাবা অনিচ্ছা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন কাজ করিবে তাতে আবার অত বিচার কি, যে কাজ করিতে গিয়া উঁচু নীচু পদের কথা ভাবে সে কখনও উন্নতি করিতে পারে না, পদের কথা ভাবিতে গেলে খাওয়া বন্ধ করিতে হয়।

"জন গম্ভীরভাবে বলিল আমি যে কাজই হোক না কেন করিতে রাজী আছি।"

বাবা ছেলেটীর সঙ্গে খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিয়া বেতন ঠিক করিয়া চলিয়া গেলেন। বেতন খুব কমই হইল কেননা তখনকার মত ছিল যে মুটে মজুরদের বেশী পয়সা হওয়া ভাল নয়; বাবা উদার প্রকৃতির লোক হইলেও এ ধারণাটা তাঁহার মন হইতে সরিয়া যায় নাই। বাবা চলিয়া যাইবার পর আমি ধীরে ধীরে জনের কাছে গিয়া মনের আনন্দ প্রকাশ করিলাম।

জনও জয়ধ্বনি করিতে করিতে ছোট ছেলের মত টুপী ছুড়িয়া লাফাইয়া উঠিল আমিও কম্পিত গলায় তাহার সঙ্গে যোগ দিলাম।

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রথম সাক্ষাতের পর অনেক দিন গত হইয়াছে জনের সঙ্গে আর দেখা হয় নাই। মাঝে মাঝে আমি খুব পীড়িত হইয়াছি রোগশয্যায় শুইয়া শুইয়া সেই হাসিমুখখানি আমার কতবার মনে পড়িয়াছে। ডাকিলেও জেল উপরে লইয়া আসিবে না জানিয়া আমি কোন দিনও জনকে ডাকি নাই। এক এক সময় মনে হইত জনকে একবার দেখিতে পাইলে বুঝি নূতন প্রাণ পাই।

অবশেষে আমি সারিয়া উঠিলাম। একদিন জেল বাজারে গিয়াছে সে সময় আমি নীচে নামিয়া আসিলাম, পাখীর ডাক শুনিবার জন্ত জানালা খুলিয়া দিলাম, কিন্তু সমস্ত সময় প্রাণ ধুক্‌ধুক্ করিতেছিল যে কখন না জানি জেলের সুমিষ্ট মধুর স্বর কর্ণকুহরকে তৃপ্ত করে। তারপর আমি ভাবিতে লাগিলাম লোকেরা বুড়ো হইলে এমন খিট্‌খিটে মেজাজের কেন হইয়া যায়।

পাখীর গান বন্ধ হইয়া গেল। আমি রাস্তার ধারে চাহিয়া রহিলাম। প্রথমে একটী কৃষককে সস্ত্রীক গাড়ী করিয়া যাইতে দেখিলাম তাহার পেছনেই আর একটা গাড়ী আসিতেছিল সেই গাড়ীটী প্রথম গাড়ীর কাছে আসিলে, কৃষকপত্নী ছি! ছি! বলিয়া নাকে রুমাল দিলেন আমার তো দেখিয়া হাসি পাইল, অল্পক্ষণের মধ্যেই শেষের গাড়ীখানা আগের গাড়ীকে পিছাইয়া ফেলিল, সেই গাড়ীর চালক টুপী তুলিয়া সহাস্যবদনে অভিবাদন করিল।

আমি মুহূর্ত্ত মধ্যে চিনিয়া ফেলিলাম চালক আমাদের জন।

"জন জন—ভাই জন হ্যালিফাক্স" জন বোধ হয় শুনিতে পাইল না কিন্তু যেই আমাদের বাড়ীর সামনে গাড়ী আসিল জন একবার উপরের দিকে চাহিয়া সহাস্য-বদনে ঘাড় নাড়িয়া অভিবাদন করিয়া আবার নিজের কাজে মনোনিবেশ করিল।

"জন দাঁড়াও ভাই তোমার সঙ্গে কথা বলিতে চাই, নেমে এসো গাড়ী ওখানেই থাক্।" এ সময় জেলের বকুনীর ভয়ও চলিয়া গিয়াছিল। জন গাড়ীখানি একটী বড় গাছের নীচে ছাওয়াতে দাঁড় করাইয়া একটি ছোট ছেলেকে ঘোড়া দেখিবার ভার দিয়া এক লাফে আমার কাছে আসিয়া পৌঁছিল।

"আমি ভেবেছিলাম তোমার অসুখ সারে নি। এই ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থেকো না ভিতরে যাও।" "তুমি যদি এস তাহলে যাই।"

"বড় ভাইয়ের মত কোমরে হাত দিয়া জন আমাকে ভিতরে লইয়া গেল।

"তুমি ভাল হইয়া গিয়াছ বলিয়া আমার এত আনন্দ হইতেছে" বলিয়াই জন নীরব হইল বেশী কথা না বলিলেও তাহার দৃষ্টিতে তাহার মনের ভাব প্রকাশ পাইতেছিল।

"জন তুমি কেমন ছিলে। তোমার কাজ কি রকম লাগছে?" "বেশ! এ কাজ না পেলে এতদিন না খেতে পেয়ে মারা যেতাম।"

আমি জনের বলিষ্ঠ হাত নিজের হাতের ভিতর টানিয়া লইয়া গল্প করিতে আরম্ভ করিলাম এমন সময় জেলের গলা শুনিয়া বেচারা জনকে তাহার গালাগালের মুখ হইতে বাঁচাইবার জন্য বলিলাম "যাও এবারে গাড়ীতে ওঠ গিয়ে, আমি তোমার গাড়ী হাঁকান দেখিতে চাই, নমস্কার, আজ বিকালে তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিব।" তারপর জেল আসা স্বত্ত্বেও আমি যতক্ষণ না গাড়ীটী দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল ততক্ষণ তাকাইয়া রহিলাম।

কতক্ষণ পরে বাবা আসিলেন, বলি-লেন, "আজ একটু ভাল আছ? শুনলাম উরসুল্লা বলে একটী মেয়ে টানাটানি করতে করতে হঠাৎ ছুরীতে হাত কেটে ফেলেছে, তুমি যেন এরকম করো না।"

উরসুল্লা যে জনকে রুটী দিতে গিয়া বাধা প্রাপ্ত হয়ে হাত কেটেছে তা বেশ বুঝতে পারলাম, কিন্তু একথা শুনিলে জনের কষ্ট হবে জানিয়া চাপিয়া গেলাম।

"বাবা আজ বিকালে আমি আপনার সঙ্গে কার্য্যালয়ে যাইব।" জেল গৃহকোণ হইতে শুনিতে পাইয়া ফোঁস করিয়া বলিল, "ফিনিয়সের শরীর একটুও—"

"তুমি থাম। ফিনিয়স, তুমি কি যেতে পারবে মনে করিতেছ?"

"হাঁ, নিয়ে গেলেই যাব"।

বাবা ও আমি একসঙ্গে বাহির হই-লাম, রাস্তার উপর পার্শ্বের লোকেরা আমাদের নমস্কার করিতে লাগিল। সেই জনের সঙ্গে বাড়ী আসার পর আর আমি সহরের ভিতর আসি নাই। রাস্তার ভাল দৃশ্য চোখে পড়িল না, কিন্তু রাস্তার ময়লায়

স্তূপাকার, চরকার ঘর ঘর শব্দ, স্ত্রীলোক-দিগের চেঁচামেচী, ছেলেদের ঝগড়া ইত্যাদি চোখে পড়িল। জন কি ইহাদের সঙ্গে বাস করে?

খানিক পরেই পিতার কার্য্যালয়ে প্রবেশ করিলাম। জন বসিয়া কতকগুলি স্ত্রীলোককে কাজ দেখাইতেছিল। আমি গিয়া তাহাকে ডাকিলাম, সে আমাকে সঙ্গে করিয়া খানিকটা ঘুরিয়া আসিয়া নদীর কিনারায় বসিবার যায়গা করিয়া দিল।

আমরা দুজনে একজায়গায় বসিয়া গল্প করিতে আরম্ভ করিলাম, জনের সেখানে সুবিধা হচ্ছে কিনা জানিতে চাহিলাম। জন বলিল, তার সেখানে থাকিতে খুব ভাল লাগে, কেবল বৃষ্টির দিনে একটু খারাপ মনে হয়।

তারপর জন আমার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল, আমার অসুখ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিল। আমি তাহাকে একটু বেশী চিন্তিত দেখিয়া বলিলাম, জন, কিছু ভেবো না, আমি এখন বেশ সুখী, আমার একটি জিনিষের অভাব ছিল, সেটি বন্ধু, তা আমি এখন পেয়েছি। জন সেই ধরণের লোক ছিল, যাঁদের চিনিতে খুব দেরী লাগে, কিন্তু যত মেশা যায় ততই বিশ্বাস বাড়ে, আর একবার বিশ্বাস স্থাপন করিলে সে বিশ্বাস চিরদিনের জন্য রহিয়া যায়।

জন পড়িতে পারে না বলিয়া দুঃখ করিল; বলিল সমস্ত সময় আমি কি হইতে চাই ও কি হইব এই প্রশ্নই মাথায় ঘোরে।

"জন, মনে কর তুমি যদি বাবার পদের অধিকারী হও, তাহালে কি তুমি চামড়ার ব্যবসাদার হতে রাজী হও?"

"তা কেন হব না, আমিতো তাতে মানহানি মনে করি না।"

"আমারতো মনে হয়, তুমি যে কাজ চেষ্টা করবে সেই কাজই ভাল করে করতে পারবে।"

"আপাততঃ তো আমি তোমার বাবার কুলী, ভবিষ্যতে কি হবো সে পরের কথা।"

"জন, তুমি কোথায় থাও, তোমার ঘর দেখাবে না?"

থাই—রাস্তায় যেতে যেতে ফল পেড়ে থাই, আর রাতে যখন সব মজুররা চলে যায়, এই চামড়ার গাদার উপর বসে থাই, ঘুমুইও ওখানে।"

আমার তো মাথায় বজ্রাঘাত হইল। জন বুঝিতে পারিয়া কাছে টানিয়া নিয়া বলিল, "আমার আয়ে কুলোয় না, একবার কম খরচে বাসা খুঁজেছিলাম কিন্তু সে সব বাসা ভদ্রলোক থাকিবার যোগ্য নহে, তার চেয়ে একলা আকাশের তলে শোওয়া ভাল।"

"জন শীতকালে কি করবে?"

"কি আর করবো ঐ থামের ভিতর কোন রকমে জায়গা করে নেব, চড়াইরা যেমন থাকে।" হায়, জন সত্যি সত্যি পাখীদের মত নিঃসম্বল ছিল!

আমি তাহাকে সেলির কাছে থাকিবার কথা বলিলাম। তার একটী ছেলে বিদেশে ও একটী ঘরে আছে। অনেক কষ্টে দুঃখে পড়ে তার স্বভাব কিছু খিটখিটে হয়ে

গিয়েছে, তা না হলে সে মোটের ওপর বেশ ভাল লোক।

আমি জনকে সম্মত দেখিয়া সঙ্গে করিয়া সেলির বাড়ী চলিলাম। সেলি সকল শুনিয়া খুব আনন্দের সহিত জনকে রাখিতে চাহিল। বলিল "বিল" চলে গিয়ে বাড়ীটা খালি হয়ে গিয়েছে, ছেলেটী থাকিলে বিলের কথা তবু অনেক ভুলিয়া থাকিতে পারি, আহা! তোমার বন্ধু অনেকটা আমার ছেলের মত দেখতে। তিনি বিলের ঘরে থাকবেন, আর যাতে কোন কষ্ট না হয় সে বিষয় খুব চেষ্টা করবো।" বৃদ্ধার আয় বৃদ্ধি হইল বলিয়া খুব আনন্দিত হইয়াছে বুঝিতে পারিলাম। জন নিজের ঘর দেখিয়া বলিল,"বা! এখানে তো আমি রাজার হালে থাকিব।"

ছোট্ট ঘর—বৃষ্টি পড়িলে ঘর দোর জলে ভাসিয়া যাইত, বেশী রোদ হইলে মনে হইত আগুনের ভিতর কেহ ফেলিয়া দিয়াছে। যখন বরফ পড়িত, জানালা পর্য্যন্ত বরফে ঢাকিয়া যাইত, তবুও এই ঘরটিতে আমরা কত সুখী ছিলাম অনেক বৎসর পরেও এখানকার কাটান দিনগুলো ছবির মত মনে হইত।

(ক্রমশঃ)

—

মাতৃত্ব।

একটী সাধারণ প্রবাদ আছে যে "সুস্থ মায়েরই সুস্থ ছেলে হয়।" এ সুস্থতা যে কেবল শারিরীক সুস্থতা তাহা নহে। মায়ের শরীর ভাল হওয়া না হওয়ার সঙ্গে যেমন শিশুর শরীর ভাল হওয়া না হওয়া নির্ভর করে, সেইরূপ শিশুর মানসিক ও নৈতিক অবস্থাও মাতার মানসিক ও নৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। শিশুর জন্মের পূর্ব্বে মায়ের মানসিক অবস্থার ছাপ শিশুর মনের উপর পড়ে।

সাধারণতঃ মায়েরা মনে করেন যে মার কর্ত্তব্য ছেলেদের ভুল ঠিক করিয়া দেওয়া, কোন্ পথে চল্‌তে হবে না হবে বলিয়া দেওয়া, কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ শিক্ষা দেওয়া। ইহা করিলেই যথেষ্ট হইল।

কিন্তু মার প্রধান কর্ত্তব্য নিজেকে প্রথমে শাসন করা। তাঁর নিজের জীবন ও চিন্তাশক্তিকে এমন করিয়া চালিত করিতে হইবে যে তিনি যেমন শিশু প্রার্থনা করেন ঠিক সেই রকম যেন নিজে হইতে চেষ্টা করেন, শিশুর জন্মগ্রহণের আগে এবং শিশুর জন্মের পরেও।

বড় বড় কথা ও উপদেশে শিশুর খুব কমই লাভ হয়। জীবনই নিঃশব্দে জীবন গড়ে। শিশুর উপর মার প্রভাব মার কথার উপর নির্ভর করে না, মায়ের জীবনের উপর নির্ভর করে। শিশু যেমন মার প্রত্যেক কাজ গভীর মনোযোগের সহিত খুটিনাটি করিয়া দেখে, এ রকম বোধ হয় বড় বড় বিচারকেরা দেখিতে পারেন না। সে মায়ের সুখ, দুঃখ, শান্তি অশান্তির সঙ্গে এমন ভাবে জড়িত যে খুব নিকটস্থ বন্ধু কিম্বা আত্মীয় কেহই সে রকম ভাবে জড়িত নন।

আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার দোষ

গুণ অজানিত অজ্ঞাতভাবে আমাদিগের আত্মস্থ হইয়া যায়। এই সত্যকে জনসাধারণ বংশের দোষ বলিয়া থাকেন।

কোথায় ?

স্বপ্নময় কোন্ রাজ্য বসতি তোমার
কল্পনায় পাবনাকি দেখা ?
মহান্ ভুবন ভরা অসীম আকাশ
অপরূপ কি আলেখ্য আঁকা ?
অনন্ত গগন পট নোয়াইয়া শির
বসুধার বেলাভূমি চুমে,
তারপর পারে কিগো সিংহাসন তব
কোন দূর পরাহত ভূমে।
শুনিয়াছি পুরাকালে ঋষি মহাযোগী
তপস্যায় লভিতেন তোমা
হৃদয় নিভৃত পটে সিংহাসন তব
রচিতেন অতি মনোরমা।
প্রকৃতির কোল ছাড়ি তুমিও কি তবে
মানবের মানস-মন্দিরে
রাখ ও চরণ যুগ, বহু শতাব্দীর
বহু ধ্যান তপস্যার বরে ?
অগম্য নহে কি দেব বাসস্থান তব
কোথা, কোন্ স্বপ্নলোকে থাক ?
কোন্ ইন্দ্র-জাল-মন্ত্রে মানবের চিত
তোমা পানে ভুলাইয়া রাখ !!

শ্রীইন্দুপ্রভা দেবী।

ভক্তিমার্গ।

(প্রিন্সিপাল ভাসওয়ানীর লক্ষ্ণৌ নববিধান সঙ্ঘে, বারদরীতে, বক্তৃতার আংশিক অনুবাদ।)

শ্বেতকেতু বলিয়া একটী বালক ছিল; তাহাকে তাহার পিতা ব্রহ্মের অনুসন্ধানে পাঠাইলেন। যখন বালকটী গৃহ ত্যাগ করিল তখন তাহার বয়স বার বৎসর ছিল, বার বৎসর পরে চব্বিশ বৎসর বয়সে ছেলেটী আবার গৃহে প্রত্যাগমন করিল। দুঃখের বিষয় এই কয়বৎসরের শিক্ষা কেবল তাহার আত্মগরিমা বৃদ্ধি করিয়াছিল—তাই তাহার পিতা তাহাকে বলিলেন "বাছা শ্বেতকেতু তোমার 'শিক্ষার' জন্য তোমার অহঙ্কার হইয়াছে কিন্তু যে প্রেমে অশব্দ বস্তু শ্রবণ করা যায়, অদৃশ্য রাজ্য দৃশ্যমান হয় এবং অবোধ্য বস্তু সহজ বোধ্য হয় সেই প্রেমের কি অনুসন্ধান করিয়াছিলে ?

যে 'শিক্ষা' দ্বারা অশব্দ বস্তু শ্রবণ করা যায়, অদৃশ্য রাজ্য দৃশ্যমান হয় এবং অবোধ্য বস্তু সহজ বোধ্য হয় সেই শিক্ষাকে ব্রহ্মজ্ঞান বলে। জ্ঞান ও বিদ্যার প্রভেদ লক্ষ্য কর। বিদ্যা ও পাণ্ডিত্য একই জিনিষ, অনেকে হয়তো বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছেন কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহাদিগের জ্ঞানলাভ হয় নাই। জ্ঞান আন্তরিক দীপ্তি, অনেকের জ্ঞানলাভ হইয়াছে কিন্তু বিদ্যালাভ হয় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস জ্ঞানী ছিলেন; তিনি বাহিরের বিদ্যা উপার্জ্জন করেন নাই কিন্তু আত্মতত্ত্বের বিদ্যা হারাবলি অভ্যস্ত করিয়াছিলেন; তিনি মুক্তপুরুষ ছিলেন তাঁর হৃদয়—সেই অরূপের আলোকে আলোকিত হইয়াছিল।

জ্ঞানলাভ অনেক প্রকারে হয়—শঙ্করের বুঝিবার আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা; বুদ্ধদেবের অন্যের কষ্ট যাতনার চিন্তা;

কাহারও কাহারও সৌন্দর্য্যকে শিল্পে প্রকাশ করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা; কাহারও কোন সঙ্গীত; কাহারও ভিতরের বাণী; জ্ঞানলাভের উপায় স্বরূপ হইয়াছিল। অনেক রকমে সেই চিন্ময় মানবাত্মাকে স্পর্শ করেন এবং সেই স্পর্শই অন্বেষণকারীকে তাহার জীবন পথে—যে পথ এই পৃথিবীর জীবনে আরম্ভ হইয়া সেই অনন্ত জীবনে মিশ্রিত হইয়াছে—চালাইয়া লইয়া যায়।

পথ একই, তবে দেখিবার মঞ্চ অনেক; কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি এই সকল ভিন্ন ভিন্ন পথ নয় কিন্তু একই পথের ভিতর এই সকল মঞ্চ স্থাপিত; কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি পরস্পর পরস্পরের সহিত জড়িত; সেইজন্য ভক্তি যে অনুরক্তি অর্থাৎ যে রক্তি (প্রেম) ভগবানের কাছে জ্ঞান (অনু) লাভের পর উদয় হয়। নববিধানের আলোকে আজ আপনাদিগকে ভক্তির কথা কিছু বলিব।

ভক্তির মূলমন্ত্র ভগবানের 'আনন্দ' স্বরূপ দর্শন করা, প্রেম হইতে যে আনন্দ আসে সেই আনন্দ। কপিলা এক যায়গায় ভগবানকে 'সুন্দর' ও 'পদ্মলোচন' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 'আনন্দের' ডাক জীবের নিকট আসিতেছে সেই ডাকের সাড়াই ভক্তি। তাই আনন্দ, প্রেম ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠার আহ্বান ও চেষ্টা জগতময়। এই কারণেই উপাসনার সময় আমরা ভগবানকে মা বলিয়া ডাকি।

"ত্যাগ ও আনন্দ" এই দুইয়ের অপূর্ব্ব মিশ্রণই ভক্তি। ত্যাগ বলিতে বাহিরের কর্ম্ম ও কর্ত্তব্যের ত্যাগ নহে; পরিবার, সমাজ, জাতি, দেশ, জগৎ সমস্তের প্রতি আমাদিগের পবিত্র কর্ত্তব্য আছে, সকল ছাড়িয়া অগ্রাহ্য করিয়া সন্ন্যাসী হওয়াতে স্রষ্টার সৃষ্টির অবমাননা করা হয়; ভগবান্ না নিজের স্বরূপে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন? ত্যাগ বলিতে আভ্যন্তরিক ত্যাগ বুঝায়।

ভক্তের প্রেম তাহাকে বাহিরের সকল সম্বন্ধ ও কর্ত্তব্য ত্যাগ করায় না কিন্তু ইহা সকলের সঙ্গে যোগকে আরও দৃঢ় করিয়া দেয়, উদাসীন না করিয়া আনন্দে পূর্ণ করে। ভালবাসার জিনিষ হারাইলে যে যাতনা হয় ভক্ত ভগবানকে হারাইলে সেই যাতনা অনুভব করেন। ভক্ত প্রহ্লাদের কেবল এক প্রার্থনা ছিল "আমি যেন তোমায় কখন না ভুলি।" সেই প্রেমস্বরূপে ডুবিয়া ভক্ত সকল কোলাহলের ভিতর তাঁহার আশ্চর্য্য প্রেমে পূর্ণ হইতে থাকেন। সেই ভালবাসা শ্রীচৈতন্যের ছিল সেইজন্য যখন জগাই মাধাই তাঁহাকে মারিলেন ও গাল দিলেন তখন তিনি আশীর্ব্বাদ ছাড়া আর কিছুই উচ্চারণ করিলেন না, আর এক সময় তিনি প্রার্থনা করিলেন "আমি পৃথিবীর ধন মান বিদ্যা কিছুই চাহি না কেবল তোমার প্রতি যাহাতে আমার ভক্তি বৃদ্ধি হয় তাহাই কর।" সেই ভালবাসা শ্রীনানকের ছিল তাই তিনি গাহিয়াছিলেন "পদ্ম যেমন জল চায়, মাছ যেমন জল চায়, চাতক যেমন বৃষ্টি চায়, ভগবানকে সেই রকম ভালবাস।" সেই ভালবাসার আস্বাদন মিরাবাই পেয়েছিলেন তাই স্বামী কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইতে

হইতে বলিয়াছিলেন “ভগবান্ এখানেও বর্ত্তমান তুমি তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইতেছ না?” সেই প্রেমে পাগলিনী হইয়া রাবেয়া অবিবাহিত রহিলেন। সেই প্রেমের আস্বাদন সুরদাস, তুলসীদাস, হরিদাস, গোপাল, কবীর, দাছু, তুকারাম, নন্দদাস সকলেই কিছু কিছু পেয়েছিলেন। আর সেই ভালবাসায় পূর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজাইলেন যে বাঁশীর পবিত্র ডাকে গোপী ও গোপীনীগণ গৃহত্যাগ করিয়া তাঁহার সাথী হইলেন।

আজ ভারতবর্ষে সেই ভালবাসার প্রয়োজন হইয়াছে। যেখানে দয়াধর্ম্মের, ভালবাসার বার্ত্তা বার বার প্রচার হইয়াছে সেই ভারত আজ প্রেমহীন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের দ্বন্দ্বস্থল হইয়াছে, ধর্ম্মের দোহাই দিয়া আমরা ভিন্ন ধর্ম্মের লোকরা কেবল বিবাদ করি ভুলিয়া যাই যে, প্রত্যেক ধর্ম্ম সেই বিরাট মূর্ত্তির আংশিক প্রকাশ মাত্র—পরস্পর পরস্পরের সহিত আদান প্রদান করিতে করিতেই কেবল আমরা পূর্ণের দিকে নিজেদের টানিয়া লইয়া যাইতে পারি। এত কোলাহল সত্ত্বেও তাঁহার প্রেম আমাদিগের জন্য রহিয়াছে; তিনি আমাদের ডাকিতেছেন; তাঁহাকে আমাদিগের ভিতর প্রতিষ্ঠিত করিতে বলিতেছেন; তাঁহার ভিতর দিয়া যাইলে আমরা প্রত্যেকে যে কত সুন্দর তাহাই দেখিতে ও বুঝিতে বলিতেছেন। আর কত দিন, ভাই আর কত দিন। তুমি নিজের হৃদয়কে সম্মান করিও; অসীম তাঁর সৌন্দর্য্য তোমার ভিতর ঢেলে দিবার জন্য তোমায় খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন, আমায় তোমায় সকলকে নিজ নিজ জীবনটুকু ঢেলে দিয়ে সেই বিশ্ব প্রাণকে এই বিশ্বের সমষ্টি স্বরূপ দেখিয়া লইতে বলিতেছেন। আত্ম সমর্পণকারী ভালবাসা সাধন করিতে করিতে সেই ডাক শুনিতে শুনিতে অগ্রসর হইতে হইবে। একটী সুন্দর গানের ভাব এইঃ— তাঁর বাঁশী বাজিতেছে আমাকে যেতেই হবে। সহজ হোক শক্ত হোক যেতেই হবে; কাঁটাপূর্ণ জঙ্গলের ভিতর দিয়া যেতে হলেও যেতেই হবে, কারণ বাঁশী যে বাজছে। হাঁ আমাদের ভগবান নাছোড়বন্দা; তাঁর বাঁশী বাজছে আমাকে তোমাকে সকলকেই ছুটতে হবে; মোহন বাঁশী সেই প্রেমের কথা কত বার বলেছে, বলছে, বলবে; তাঁর হাত এড়ায় কাহার সাধ্য? তাঁর বাঁশী বাজছে যেতেই হবে; কতবার ঠেলে দিতে চেষ্টা করেছি; তাঁকে দেখবো না বলে পরদার উপর কত পরদা ফেলেছি, লাভ ক্ষতির কত ভাবনা ভেবেছি; তবুও সে ভালবাসা ছাড়বে না সৌন্দর্য্য দেখাবেই সুন্দর করে নেবেই। আমাদের হৃদয়ের দুয়ারে ভিখারী হইয়া তিনি দণ্ডায়মান; বাজছে বাঁশী এখনও বাজছে। সকলের মৃদু মন্দ বাতাসের সঙ্গে নাচিতে নাচিতে; সন্ধ্যাবেলার সেই অপূর্ব্ব কারিকরের তারা ছায়া অন্ধকারের মিশ্রনে অদ্ভুত ছবির ভিতর হইতে যখন আত্মা একাকী নীরবে ভক্তিভরে চরণে মাথা নত করে তখন তাঁর বাঁশীর সুর আসিতে থাকে। তাঁর বাঁশী ডাকছে; আমরা

কি যাব না? সহজ হোক; শক্ত হোক; কিছু ভয় নাই; বাঁশী ডাকছে; আমরাও যাব আমরাও জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাব; যতক্ষণ সেই বংশীধারীর সহিত চাক্ষুষ দেখা না হয় আমরাও চলতে থাকবো আমরাও খুঁজতে থাকবো। তারপর—তারপর কি হবে? তারপর আমরা আমাদের সমস্ত—যা কিছু আছে সব—নিজ হৃদয়ের চাবি তাঁর হাতে সঁপে দেব তিনি তখন আমাদের নিজ হাতে আশীর্ব্বাদ করবেন আমাদের অন্ধকার হৃদয় আলোক পূর্ণ করে দেবেন নিজেই আনন্দের গান আমাদের কাছে গাইবেন—যে আনন্দ পাতায় পাতায়, ফুলে ফুলে, তরঙ্গে তরঙ্গে ভেসে যাচ্ছে—যে আনন্দ আমাদের অমৃতধামের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

কাঁচা খাদ্যের সহিত পুষ্টিকারিতার সম্বন্ধ।

প্রেসিডেন্সি কলেজের শারীরবিধান তত্ত্বের (Physiology) অধ্যাপক শ্রীনিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্, এ, বি, এস্, সি, লিখিত—

প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ দার্শনিক Schopenhaur সপেনহাওর শারীরবিধান সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "The summit of the whole of natural science and its obscurest region" শারীরবিধান বিদ্যা যাবতীয় প্রকৃতি বিজ্ঞানের শীর্ষদেশে অবস্থিত এবং উহার অন্ধতম প্রদেশ। সে আজ শতাধিক বর্ষের কথা। ইহার মধ্যে শারীরবিধান বিদ্যার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে কিন্তু তথাপি উহার অন্ধতম প্রদেশের পরিমাণও প্রচুর। আমি আজ সেইরূপ একটী প্রদেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব।

শারীরবিধান বিদ্যা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা যাঁহারা করেন, তাঁহারাই জানেন যে আমাদের খাদ্যে ত্রিবিধ রাসায়নিক পদার্থ আছে। যথা প্রটীন—ডিম্বের শ্বেতাংশ সদৃশ পদার্থ, তৈলময় পদার্থ এবং চিনি ও শ্বেতসার সদৃশ পদার্থ। এই সকল পদার্থ পর্য্যাপ্তরূপে পাইলেই লোকে জীবন ধারণ করিতে পারে, অন্য কোন পদার্থের প্রয়োজন নাই এইরূপ একটা ধারণা কিছুকাল আগে বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পরে জানা গেল যে ঐ সকল পদার্থ ব্যতীত বিবিধ লবণ পদার্থও জীবের জীবন ধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক।

উদ্ভিদবিৎগণ বহুকাল পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন যে মাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম প্রভৃতি কতিপয় মূল পদার্থ উদ্ভিদ দেহে অতি সামান্য পরিমাণে অবস্থান করে। যদি তাহারা ঐ সমস্ত পদার্থ না পায় তবে বাড়িতে পারে না। বিবিধ পরীক্ষার দ্বারা তাঁহারা নির্ণয় করেন যে উদ্ভিদ জীবনের পক্ষে ঐ সকল পদার্থও অত্যাবশ্যক।

পরে ইহাও প্রমাণিত হইল যে, কতিপয় লবণ পদার্থ জীবদেহের পুষ্টির জন্য অল্পমাত্রায় আবশ্যক। ঐ সকল দ্রব্যের অভাব হইলে প্রচুর ঘৃত, চিনি, শ্বেতসার এবং বিশুদ্ধ প্রটীন খাদ্য খাইয়াও জীবন

ধারণ করা সম্ভব নহে। একটী বেঙের হৃৎপিণ্ড দেহ হইতে পৃথক্ হইয়া কয়েক মিনিট বাঁচিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু উহাকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণযুক্ত সোডিয়াম ক্লোরাইড, পোটাসিয়ম ক্লোরাইড এবং ক্যালসিয়ম ফস্ফেটযুক্ত জলে রাখিলে উহা কয়েক ঘণ্টা অনায়াসে বাঁচিয়া থাকে। কিন্তু ঐ সকল জিনিসের পরিমাণ যদি একটু বেশী হয় তাহা হইলেও হৃৎপিণ্ডটী অবিলম্বেই পঞ্চত্ব পাইবে।

উক্ত ঘটনাগুলি হইতে ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে, আমাদের শরীর রক্ষার্থ আমরা যে সকল খাদ্য প্রচুর পরিমাণে খাই, তাহারাও যেমন প্রয়োজনীয়, আমরা যে সকল খাদ্য স্বল্পমাত্রায় ব্যবহার করি তাহা াও সেইরূপ প্রয়োজনীয়।

বহুকাল হইতে কাঁচা খাদ্যের কোন এক অদ্ভুত গুণের কথা চিকিৎসক সমাজে প্রচলিত আছে। বালকদিগকে সিদ্ধ করা দুধ খাওয়াইলে তাহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ও তাহাদের পরিপাকশক্তি কমিয়া যায়। ইহা অনেক ইংরাজচিকিৎসক পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। ঐ সকল বালককে যদি পরে কাঁচা দুগ্ধ বা কাঁচা ফল খাইতে দেওয়া হয় তবে তাহারা সত্বর আরোগ্য লাভ করে।

অনেক জাহাজে লোকদিগকে বহুকাল সিদ্ধ (sterilised) খাদ্য খাইয়া জীবন ধারণ করিতে হয়। এ কারণ তাহাদের Scurvy, বেরিবেরি প্রভৃতি ব্যাধি জন্মে। পরে তাহারা যদি টাট্‌কা খাদ্য ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে, তবে সত্বর আরোগ্য লাভ করে।

পুষ্টি সম্বন্ধীয় ব্যতিক্রম হইয়া যে সকল ব্যাধি জন্মে তাহারা যে বিবিধ ফল ব্যবহারে সারে, তাহা অনেক দিন হইতে জানা আছে। যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় অম্লরসাত্মক ফলসমূহ উপকারী। সাধারণ লোকের মধ্যে জানা আছে যে, কাঁচা নারিকেল বা কলা খাইলে অম্লরোগের উপশম হয়। বিলাতে একবিধ চিকিৎসা প্রণালী আছে তাহাতে পীড়িত ব্যক্তিকে আঙ্গুর খাওয়াইয়া রোগ আরোগ্য করা হয়।

কিন্তু সম্প্রতি হফকিন্স নামক জনৈক বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষায় ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, আমাদের সুস্থাবস্থাতেও বিশেষতঃ বৃদ্ধিশীল বালক ও শিশুদিগের জন্য প্রাত্যহিক খাদ্যের একটা অল্প পরিমাণ অংশ অসিদ্ধ অর্থাৎ সদ্য হওয়া আবশ্যক। হফকিন্স সাহেব দুই দল সমান আকার প্রকারের ইন্দুর শাবক লইয়া পরীক্ষা করেন। দুই দলকে একই রকম অবস্থায় রাখা হইয়াছিল এবং তাহাদিগকে একই রকম বিশুদ্ধ প্রটীন, কার্ব্বোহাইড্রেট, তৈলময় খাদ্য ও লবণ দেওয়া হইয়াছিল। কেবল একদলের ইন্দুর শাবকদিগকে অতি সামান্য মাত্রায় (সমস্ত খাদ্যের শতকরা চতুর্থ ভাগ মাত্র) কাঁচা দুগ্ধ দেওয়া হইয়াছিল।

কিছুকাল ঐ দুই দল ইন্দুরকে ঐভাবে রাখার পর তাহাদের পুষ্টিসম্বন্ধীয় বিচিত্র পার্থক্য দেখা গেল। যে সকল ইন্দুর শাবককে স্বল্পমাত্রায় কাঁচা দুগ্ধ দেওয়া হইতেছিল তাহারা অন্য দল অপেক্ষা

অপেক্ষাকৃত অল্প আহার করিয়াও বেশ হৃষ্টপুষ্ট হইয়া বাড়িতে লাগিল। এবং অন্যদল অপেক্ষাকৃত অধিক আহার করিয়াও শীর্ণ হইতে লাগিল, পরে তাহাদের আহার কমিতে লাগিল ও তাহারা মরিতে লাগিল। উহাদের যে কয়েকটীকে কিছু কিছু কাঁচা দুগ্ধ দেওয়া আরম্ভ হইল তাহারা সত্বর আরোগ্য লাভ করিল। হফকিন্স দেখাইয়াছেন যে কাঁচা দুগ্ধের মাত্রা এত কম ছিল যে, তদ্দ্বারা ইন্দুর শাবকগণের ওজন বৃদ্ধি কোনক্রমেও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে না। তিনি বলেন, ঐ কাঁচা দুগ্ধে এমন একটী পদার্থ আছে (যাহার বিষয় আমরা এখন কিছু জানি না) যাহা ইন্দুর শাবকগুলির খাদ্য পরিপাক করিবার পক্ষে এবং পরিপক্ব খাদ্যকে শরীরের অংশ রূপে পরিণত করিবার পক্ষে সবিশেষ সাহায্য করিয়াছে।

এই অজ্ঞাত পদার্থটীর সম্বন্ধে নানারূপ কল্পনা আছে।

উহা যে প্রটীন জাতীয় পদার্থ নহে তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে। দুগ্ধের প্র ন অংশকে লঘুতাপ সহযোগে বাদ দিলে যে পদার্থ পাওয়া যায় তাহার গুণও কাঁচা দুগ্ধেরই অনুরূপ। অনেকেই অনুমান করেন উহা তৈলসদৃশ Lipoid নামক পদার্থ। উহা তাপ সহযোগে ক্রমশঃ উপিয়া যায়। ওভারটুন নামক পণ্ডিত বলেন যে, আমাদের শরীরের কোষগুলি উক্ত তৈলময় পদার্থের সূক্ষ্ম ত্বক দ্বারা আবৃত। ঐ ত্বকের দ্বারা কোন তরল পদার্থের কোষগুলির ভিতর হইতে বাহিরের কিম্বা বাহির হইতে ভিতরের দিকের গতি নিয়মিত হইয়া থাকে। শরীর মধ্যে উহার অভাব হইলে অপরিচিত পদার্থের সহসা ভিতরে প্রবেশ বা পরিচিত পদার্থের সহসা বহির্গমন হেতু কোষগুলি বিকল হওয়ায় ব্যাধির উৎপত্তি হয়। এই মতানুসারে কোন কোনও অজীর্ণ দোষ যে কয়লার উনানে রাঁধা দ্রব্য খাওয়া পরিত্যাগ করিয়া পোরের ভাত ব্যবহার করিলে ভাল হয় তাহা সহজে বুঝাইয়া দেয়। কয়লার উনানে তাপ অধিক বলিয়া জল অত্যধিক বেগে উপিয়া যায়। উহার সহিত ঐ তৈলময় পদার্থও উপিয়া যায়।

কেহ কেহ বলেন প্রত্যেক জীবিত কোষের মধ্যে অল্পাধিক পরিমাণে তাহার স্বকার্য্য নির্ব্বাহোপযোগী পাচক পদার্থ (Autolytic enzyme) থাকে। ঐসকল পদার্থের কিয়দংশ কাঁচা খাদ্যে থাকে বলিয়া উহারা উদরস্থ হইয়া পরিপাক কার্য্যের সহায়তা করে।

কোন কোন কাঁচা খাদ্যের সহিত কিছু কিছু প্রয়োজনীয় ব্যাকটি্রয়া মিশ্রিত থাকে, উহারাই অন্ত্রমধ্যে গিয়া দূষিত পচন ক্রিয়া নিবারণ করিয়া শরীর রক্ষার সাহায্য করে। মেচনিকফ (Metchinikoff) এই বিশ্বাসে অন্য সকল খাদ্য উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া (sterilisation) ভক্ষণ করিয়া পরে কিছু দধি বা দধি ব্যাকটি্রয়া ভক্ষণ করিতে পরামর্শ দেন।

ঐ সকল মতগুলির কোন একটী বা সকল গুলিই অল্পাধিক পরিমাণে সত্য হইতে পারে।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, কাঁচা খাদ্য এক নূতন মূর্ত্তিতে আমাদের সমক্ষে উপনীত হইয়াছে। ভাত, জল, রুটী প্রভৃতি যেমন আমাদের প্রাত্যহিক আবশ্যকীয় খাদ্য, অল্প পরিমাণ কাঁচা দ্রব্যও তদ্রূপ হওয়া উচিত। বিশেষতঃ অল্পবয়স্কদিগের পক্ষে ইহা সবিশেষ প্রয়োজন। পরিণত বয়স্ক ব্যক্তিগণ বহুকাল sterilised খাদ্য খাইয়া জীবিত থাকিতে পারে কিন্তু বালকে নহে। এই কারণেই বোধ হয়, বালকগণের কাঁচা ফলের প্রতি একটা দুর্দ্দমনীয় আসক্তি আছে।

প্রাত্যহিক খাদ্যের সহিত নিয়মিতভাবে ফল খাওয়া বাঙ্গালী সাধারণের মধ্যে চলিত নাই। আমি অনেক বাঙ্গালীকে বহুদিন ধরিয়া sterilised খাদ্য খাইয়া থাকিতে দেখিয়াছি। বিশেষতঃ বাঙ্গালী শিশুগণ মাতৃদুগ্ধ ছাড়িবার পর অনেক দিন ধরিয়া প্রকৃতপক্ষে sterilised খাবার খাইয়া জীবনধারণ করিতে বাধ্য হয়। আমার বিশ্বাস উহাই শিশুদিগের অকাল মৃত্যুর একটী প্রধান কারণ। শিশুদিগের জন্য কাঁচা দুগ্ধের ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া যায় না। কারণ তাহাতে হিতে বিপরীতই ঘটিবে। নিজের তত্ত্বাবধানের সুস্থ গাভীর দুগ্ধ না হইলে অজানা দুগ্ধে অনেক বিপদ; উহার সাহায্যে যক্ষ্মা, কলেরা প্রভৃতি রোগ সংক্রামিত হইতে পারে। ফলও বালকদিগকে বেশী খাইতে দেওয়া উচিত নহে। কারণ ফলসমূহ নানাবিধ রোগের বীজাণু দূষিত হইতে পারে। এবং যা তা ফল খাইতে দিলে এরূপ রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা বাড়িবে। তদ্ব্যতীত ফলের মধ্যের কোন কোনও পদার্থ শরীরের অপকারকও হইতে পারে। এজন্য শিশুদিগের ফল সংগ্রহে অধিকতর সতর্কতা প্রয়োজন। আমার বিবেচনায় কচি শাঁসযুক্ত ডাবই শিশুদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী কারণ ইহাতে ব্যাক্‌টি্রয়ার উপদ্রবের আশঙ্কা নাই। ডাবের পর অক্ষত আম ও লেবু।

উপসংহার।

এই প্রবন্ধে নিম্নলিখিত কার্য্যকর উপদেশ দুইটীর উপকারিতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

(১) বাঙ্গালী শিশুগণের মধ্যে যাহারা মাতৃদুগ্ধ ছাড়িয়াছে এবং যাহাদিগকে শুধু সিদ্ধকরা (sterilised) খাদ্য (দুধভাত) খাইয়া জীবনধারণ করিতে হয়, তাহাদিগকে যদি পূর্ব্বোক্ত দৈনিক খাদ্য ব্যতীত কিঞ্চিৎ পরিমাণ ফল (যেমন নেবু, বা এক বা আধ ছটাক আমের রস) দেওয়া হয়, তবে তাহাদের সাধারণ খাদ্য পরিপাকের ও পুষ্টির বিশেষ সহায়তা করিবে। অভাব পক্ষে অন্য কোন অক্ষত ফল অতি অল্পমাত্রায় প্রত্যহ দেওয়া যাইতে পারে। এক বা আধ চামচে দধি একটু জলসহ মাড়িয়া ঘোল করিয়া দেওয়াও যাইতে পারে।

(২) বয়স্ক বাঙ্গালীদিগের মধ্যে যাহারা শুধু পাক করা খাদ্য খাইয়া থাকেন তাহারা যদি প্রত্যহ এক ছটাক বা দুই ছটাক ফল বা দধি প্রত্যহ ভক্ষণ করিতে থাকেন তবে তাঁহাদিগেরও পুষ্টির বিশেষ সহায়তা হইবে। (স্বাস্থ্যসমাচার)

কুচবেহার সুনীতি কলেজের বাৎসরিক বিবরণ।

১৯১৩-১৪।

বিগত ২৯শে এপ্রেল অপরাহ্ণ ৪ টার সময় স্থানীয় ল্যান্সডাউনহলে সুনীতি কলেজের ছাত্রীদিগের পারিতোষিক দান কার্য্য বিশেষ উৎসাহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। মহারাণী শ্রীসুনীতি দেবী খুব উৎসাহের সহিত ছাত্রীদিগকে পারিতোষিক দান করিয়াছেন। সভাস্থলে কুচবিহারের নূতন মহারাজা এবং নূতন মহারাণী উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত কুচবিহার ষ্টেটের সুযোগ্য সুপারিণ্টেডেণ্ট মিঃ কলিন, জজ মিঃ এন্ এন্ সেন, এবং ষ্টেটের আরও কতকগুলি উচ্চকর্ম্মচারী এবং স্থানীয় কতকগুলি ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। বিগত Anglo Vernacular Upper Primary এবং Lower Primary পরীক্ষায় উত্তীর্ণা ছাত্রীগণের মধ্যে যে তিনটী ছাত্রী খুব উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে মহারাণী মহাশয়া তাহাদিগকে স্বর্ণালঙ্কার প্রদান করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে স্কুলের সম্পাদক কর্ত্তৃক যে রিপোর্ট পঠিত হইয়াছে তাহার প্রতিলিপি এবং বালিকাগণ কর্ত্তৃক আবৃত্ত কবিতা এবং তাহাদিগের গীত সঙ্গীতাদি নিম্নে কিছু কিছু প্রকাশিত হইল। মহারাণী সুনীতি দেবীকে ও নব রাজদম্পতীকে প্রদত্ত অভিনন্দন আমরা স্থানাভাবে প্রকাশ করিতে সক্ষম হইলাম না।

শিক্ষা প্রণালী।—বিগত পাঁচ বৎসর হইতে সুনীতি কলেজে নূতন প্রণালী অনুসারে শিক্ষা দান চলিয়া আসিতেছে। বালিকাদিগের উপযোগী ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষা এবং শিল্প শিক্ষা দানই এ প্রণালীর উদ্দেশ্য।

পরীক্ষার ফল।—বিগত ১৯১৩ সালের পরীক্ষায় নিম্নলিখিত বালিকাগণ Anglo Vernacular Upper Primary Standard পরীক্ষায় প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণা হইয়াছে :—

(পারদর্শিতানুসারে)

প্রথম বিভাগ।

কুমারী পঙ্কজিনী চক্রবর্ত্তী, শ্রীমতী স্নেহলতা দত্ত।

উক্ত সালের Anglo Vernacular Lower Primary Standard পরীক্ষায় নিম্নলিখিত বালিকাগণ প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণা হইয়াছে :—

(পারদর্শিতানুসারে)

প্রথম বিভাগ।

কুমারী লীলাবতী রায়, কুমারী প্রতিভাবতী সেন, কুমারী মালতীলতা চট্টোপাধ্যায়, কুমারী ষোড়শীকুমারী ভৌমিক, কুমারী অচলনন্দিনী চক্রবর্ত্তী, কুমারী ঈশানীবালা মুখোপাধ্যায়, কুমারী প্রতিভা কুমারী রায়, কুমারী নিভাননী সরকার, কুমারী নগেন্দ্রবালা গুহ, কুমারী আমিনা খাতুন, কুমারী যোগমায়া দাস গুহ, কুমারী হেমপ্রভা বাগচি, কুমারী সৌদামিনী সরকার।

দ্বিতীয় বিভাগ।

কুমারী স্নেহলতা রায়, কুমারী বিভাবতী লাহিড়ী।

উপরোক্ত বালিকাগণের মধ্যে যে বালিকা Anglo Vernacular Lower Primary Standard পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে, স্কুলের প্রচলিত নিয়মানুসারে তাহাকে মাসিক দুই টাকা হিসাবে বৃত্তি দেওয়া হইবে। যে হিন্দু বালিকাটী অষ্টম স্থান অধিকার করিয়াছে সেটি কুচবেহারের আদিম অধিবাসী ও যেটি ত্রয়োদশ স্থান অধিকার করিয়াছে সেটি এদেশীয় মুসলমান বালিকা। পরীক্ষার ফল কুচবিহার গেজেটে ও অন্যান্য সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

ছাত্রী সংখ্যা।—১৯১৪ সালের মার্চ্চ মাসের ছাত্রী সংখ্যা ১৯৭ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ১২ জন অধিক। গড় উপস্থিতি ১৭৫ অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৫ জন অধিক। এই সকল ছাত্রীদের মধ্যে ৯ জন মুসলমান অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৪ জন কম। ৫ জন ব্রাহ্ম অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ১ জন অধিক। ১ জন খৃষ্টান অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসরের সমান। ২৩ জন রাজগণ ও কোচবিহারের আদিম অধিবাসী অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ১৪ জন কম। এই ২৩ জনের মধ্যে ৮জন বালিকা রাজগণ পরিবারভুক্ত। ইহা অত্যন্ত আশাজনক যে স্থানীয় রাজগণ পরিবারে স্ত্রী শিক্ষার সমাদর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

মহিলা বিভাগ।—এই শ্রেণীর কার্য্য বিগত জুলাই মাস হইতে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মহিলাগণ সাংসারিক কার্য্যের অসুবিধা ও ক্রমাগত স্থান পরিবর্ত্তন নিবন্ধন নিয়মিত স্কুলে উপস্থিত হইতে না পারায় ও শিল্প শিক্ষয়িত্রী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করায় এ বিভাগের কার্য্য আশাজনকরূপে চলিতে পারিল না। রাজগণ মহিলাদিগকে শিল্প শিক্ষা বিধানই এই বিভাগের উদ্দেশ্য। অবস্থার প্রতি-কূলতাবশতঃ তাহাদের মধ্যে অনেকেই স্কুলে আসিতে অসমর্থ হইতেছিলেন, সুতরাং বর্ত্তমানে ইহার কার্য্য বন্ধ আছে। অল্প-বয়স্কা বালিকাদিগের ক্রমান্বয়ে ৫।৬ বৎসর শিল্প শিক্ষা বিধানের বিশেষ উপযোগীতা ও ফল অনুভূত হওয়ায় সমগ্র বালিকাদিগকে প্রতিদিন শিল্প শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

স্কুল পরিদর্শন।—বিগত ১৯এ আগষ্ট তারিখে মাননীয় ষ্টেট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ কলিন স্কুল পরিদর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দ ও স্কুলের পরিদর্শন পুস্তকে উৎসাহজনক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

সঙ্গীত।

এসেছ তুমি এসেছ
কমলার বেশে সাজি।
নন্দন হ'তে এনেছ ভরি
তোমার কনক সাজি।
একি এ সহসা মুহু মুহু মুহু
গাহে কোয়েলা কুহু কুহু কুহু
নাচে সরসী
মুঞ্জরে তরুরাজি।

এলোকেশে ভাসে মেঘমালা
অঞ্চলে হাসে চঞ্চলা
স্বপন রঞ্জিত স্বরগ সঙ্গীত
নূপুরে উঠে বাজি বাজি
কেনরে নয়ন করে ছল ছল
সারা পরাণ সুখে টলমল
একি উৎসব
মোদের আজি।

(আমরা) তৃপ্ত হৃদয়ে কর্ম্ম করিয়া
জীবন যাপিব ভাই।
কর্ম্মের মাঝে শান্তি বিরাজে
অন্য কিছুতে নাই।
(যদি) দুঃখী হইয়ে রই
দরিদ্র বেদনা সই
(আমরা) ক্ষুণ্ণ হব না কথাটি কব না
মাথায় ধরিব ভাই
(যদি) শরীরের কষ্ট হয়
(আমরা) তাহাতে করি না ভয়
(আমরা) কর্ম্ম সাধনে অন্তর মনে
বিমল আনন্দ পাই।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

স্যার সালারজঙ্ এর পুত্রবধু নেপালের রাণী তারা দেবী একজন সর্ব্বজনপ্রিয় মহিষী। বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে কলিকাতা মহানগরীতে তাঁহার ন্যায় ব্যক্তি অতি অল্পই আগমন করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃতভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন এবং সঙ্গীতবিদ্যাতেও তাঁর সবিশেষ খ্যাতি আছে। উচ্চ শিক্ষা ও সভ্যতার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিলেও রাণী তারা দেবী সূর্য্যালোক-আলোকিত ভারতের রমনীয় পরিচ্ছদের একান্ত পক্ষপাতী। কলিকাতা অবস্থিতি কালে তিনি গবর্ণরপত্নী ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ইংরাজ মহিলার সহিত সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। নানা বিষয়ে সৌভাগ্যবতী হইলেও তিনি দুঃখের হাত হইতে একেবারে পরিত্রাণ লাভ করেন নাই। ১৮৮৫ সালে নেপাল দরবারে প্রভুত্ব লইয়া যে ষড়যন্ত্র উপস্থিত হয় তাহাতে তাঁহার স্বামী নিহত হন। কিন্তু এই শোক রাণী তারাদেবী ধীরভাবে সহ্য করিয়া আসিতেছেন। অধুনা তিনি ভারতের ঐতিহাসিক স্থান সমূহ দর্শন করিয়া বিলাত গমন করিতে ইচ্ছা করেন। তিনি তাঁহার স্বামীর ও শ্বশ্রু মহাশয়ের একখানি জীবন চরিত লিখিবেন স্থির করিয়াছেন।

এখনও মাঝে মাঝে ভিন্ন২ স্থানে ২।১টি সতী দাহের বিবরণ সংবাদ পত্রে পাঠ করা যায়। সহমরণ প্রথা যে অজ্ঞতাপ্রসূত ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। স্বামীর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিতে যাইয়া ঈশ্বরদত্ত জীবনের উপর হস্তক্ষেপ করা মহাপাপ। স্বামীর সম্মানার্থে বিধবারা সমাজের বিবিধ সদনুষ্ঠানে নিজেকে লিপ্ত করিলে সমাজের প্রভূত কল্যাণ হয় এবং তাঁহারাও কৃতার্থ হইয়া যান। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে ভগবানদত্ত জীবনকে সমূলে নির্ম্মূল করিলে সমাজের যে কি ইষ্ট সাধিত হয় তাহা আমরা বলিতে পারি না। আশা

করি দেশের পুরুষ ও নারী সকলেই সহমরণ প্রথার পাপ ও অনিষ্টকারিতা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিবেন।

মহামতি সার হেনরি কটন (Sir Henry Cotton) বেত্রাঘাতের বিরুদ্ধে বহুদিন হইতে আন্দোলন করিয়া আসিতেছেন। বেত্রাঘাত বা অন্য কোনও প্রকার দৈহিক শাস্তি সভ্যজগত হইতে বিদূরিত হইলেই মঙ্গল। দৈহিক শাস্তিবিধান বর্ব্বরতার ধ্বংশাবশেষমাত্র। যে দিন সভ্য জগত হইতে প্রাণ দণ্ড বা অন্য কোন ও প্রকার শারীরিক শাস্তিবিধান একেবারে তিরোহিত হইবে সেদিন মানবজাতির বিশেষ আনন্দের দিন তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। মানব দেহ দেব মন্দির। এ মন্দিরের উপর অত্যাচার ঈশ্বরের নিকট পাপ বলিয়া পরিগণিত হয়। দোষীকে সঙ্গত উপায়ে সুপথে লইয়া যাওয়াই রাজার ধর্ম্ম।' তাহার শরীরের উপর জবরদস্তি করিলে তাহার চরিত্রের কোন সংশোধন হয় কিনা তদ্বিষয়ে গভীর সন্দেহ আছে।

তাই সেদিন একখানি ইংরাজি পত্রিকায় যখন পড়িলাম যে মহামতি কটনের আন্দোলনের ফলে বেত্রাঘাতের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে তখন বিশেষ আনন্দ পাইলাম। সার কটন বলেন যে ১৮৭৮ সালে ৭৫,২২৩ ব্যক্তিকে বেত্রাঘাত করা হয়। ১৮৯৫ সালে ৬০০৮, ১৯০৯ সালে ১২,৫৫৯, ১৯১০ সালে ৯,৮৭৬ এবং ১৯১২ সালে ৯, ৫০০ ব্যক্তি বেত্রাঘাত দণ্ডে দণ্ডিত হয়।

সম্প্রতি সার রপার লেথিব্রিজ (Sir Roper Lethbridge) এসিয়াটিক রিভিউ পত্রিকায় ত্রিবঙ্কুর রাজ্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন যে ত্রিবঙ্কুর রাজ্যে ব্যবসার মালমসলা যথেষ্ট আছে, কিন্তু বিদেশী বাণিজ্যের আক্রমণে তথায় দেশীয় শিল্প সমূহ তেমন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না। কিন্তু ত্রিবঙ্কুরের মহারাজা দেশীয় শিল্প যাহাতে সসমৃদ্ধি লাভ করে তজ্জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। ত্রিবঙ্কুরে ব্যবসায়ীগণকে সরকার হইতে সার যোগান হয় এবং দেশালাই প্রস্তুতের জন্য কাঠ সকল তাহাদিগকে বিনা মূল্যে বিতরিত হইয়া থাকে। ভারতে প্রতি বৎসর ৮৭৫৮২৬০ টাকার দেশালাই বিদেশ হইতে আমদানী হয়; কিন্তু ভারতবাসীরা এখনও পর্য্যন্ত এই বিদেশী বাণিজ্যের আক্রমণ হইতে ত্রাণ লাভ করিতে সমর্থ হইতেছেন না।

প্রাতঃস্মরণীয়া কুমারী শ্রীমতী ফ্লোরেন্স নাইটিনগেলের নাম জগদ্বিখ্যাত। পরসেবায় তিনি স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার এই সেবাব্রত বারিধিপরিবেষ্টিত ইংলণ্ডের ক্ষুদ্র সীমা রেখার ভিতর আবদ্ধ ছিল না। এই রমণী হৃদয়ের প্রেম দেশের ব্যবধান দূর করিয়া আমাদের এই ভারতবর্ষেও ধাবিত

হইয়াছিল। ভারতের মুখ না দেখিয়াও তিনি যে এই দেশকে এত ভাল বাসিতে পারিয়াছিলেন ইহা ভাবিলে বাস্তবিকই বিস্মিত হইতে হয়।

ভারতবর্ষের অবস্থা আলোচনা করিয়া এই মহাপ্রাণা নারী একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি এই পুস্তক খানি মুদ্রিত করিবার অবসর পান নাই। অধুনা সেই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি হইতে স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়া সার ওয়েডারবার্ণ (Sir Wedderburn) বিলাতের একখানি প্রসিদ্ধ পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতেছেন। আমরা নিম্নে তাহার কিয়দংশের মর্ম্ম প্রদান করিলাম।

নাইটিনগেল বলেন যে ভারতবর্ষে জলের উপযুক্ত ব্যবহার না হইলে কখনও ভারতবাসীর দৈন্য দূর হইবেনা। নাইটিনগেলের মতে ভারতবর্ষে যথেষ্ট খাল খনন করা (irrigation) প্রয়োজন। তিনি বলেন যে ভারতের দুর্ভিক্ষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে যথা, ১৮৬৬ সালে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে দশলক্ষ লোক প্রাণত্যাগ করে; ১৮৬৮ সালে রাজ পুতানার দুর্ভিক্ষে পনর লক্ষ, ১৮৭৮ ও ১৮৯৭ সালে তদপেক্ষা অধিক এবং ১৯০০ সালে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোক অনাহারে জীবলীলা সাঙ্গ করে। নাইটিনগেলের মত এই যে জলকষ্ট নিবারণের উপযুক্ত আয়োজন হইলে ভারতের অন্নাভাব বিদূরিত হইবে।

কুমারী নাইটিনগেল বলিতেছেন যে যেদেশে বর্ষাপ্রধান ইংলণ্ড ভূমি অপেক্ষা বৎসরে ১০ হইতে ৩০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বৃষ্টি পতিত হইয়া থাকে সে দেশে যে দুর্ভিক্ষ হয় ইহা একটি বিস্ময়কর ব্যাপার। ভারতে এক রাত্রে ৫ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হইয়াছে দেখা যায়, এবং কখন কখন ইহার মাত্রা ১২ ইঞ্চি পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া থাকে। বছরের মধ্যে সেপ্টেম্বর মাস হইতে অকটোবরের শেষ পর্য্যন্ত শস্যের পক্ষে সঙ্গীন্ সময়—সেপটেম্বরের মাঝামাঝি বৃষ্টি বন্ধ হইলে শস্য সকল মরিয়া যায়। উড়িষ্যায় সম্বৎসর ৬০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বৃষ্টি পড়িয়া থাকে। ১৮৬৫ সালে যেবার উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় সেবার সমস্ত বছরে কটকসহরে প্রায় ৬০ ইঞ্চি বর্ষণ হইয়াছিল; কিন্তু ১৪ই সেপটেম্বরমাসে বর্ষণ বন্ধ হওয়ায় সমস্ত শস্য ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়। খাল খনন প্রণালী দ্বারা এই বিপদের হাত হইতে ত্রাণলাভ করা যায় এবং যতদিন না গভরমেণ্ট দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য প্রাণগত চেষ্টা করিবেন ততদিন গভরমেণ্ট সেবিষয়ে অত্যন্ত অপরাধী। কুমারীর পুস্তকের খালখনন প্রণালীবিষয়ক (irrigation) অধ্যায়ের শিরোভাগে এই উক্তিটি দৃষ্ট হয় (The fate of India, in ragara to food, is wholly in the hands of its rulers,) অর্থাৎ খাদ্য-সংস্থান বিষয়ে ভারতের ভাগ্য সম্পূর্ণরূপে তাহার শাসনকর্ত্তাদের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। আমরা বারান্তরে এই মহিলার ভারতবিষয়ক চিন্তা ও সহৃদয়তাপূর্ণ উক্তি সকল উদ্ধৃত করিবার আশা পোষণ করি।

—

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৯শ ভাগ]   জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়, ১৩২১।   [১১শ ও ১২শ সংখ্যা।

প্রার্থনা।

হে প্রেমময়, তুমি ভালবাসার অনন্ত আধার। তুমি প্রেমে অনাদি অনন্ত ও অদ্বিতীয়—তোমার প্রেমের রহস্য কেহ বুঝিতে পারে না। কেবল বিশ্বাসী ভক্তগণ তোমার প্রেমে মত্ত হইয়া আত্মহারা হইয়া তোমাকে দয়াময়, স্নেহময় বলিয়া জগতে প্রচার করেন।* নরনারী তোমার সন্তান, তোমার ছায়ায় বা আদর্শে গঠিত একথা তাঁহারাই বলিয়া থাকেন—আমরা বিশ্বাস করিয়া আপনাদিগের উচ্চবংশ, দেবত্বলাভের সম্ভাবনা জানিয়া আশান্বিত ও কৃতার্থ হই। কিন্তু দেখ, আমরা তোমার কন্যা ও পুত্র আপনাদিগকে বলি, অথচ আমরা তোমার চরিত্রের কোন সুগন্ধ আমাদিগের চরিত্রে দেখিতে পাই না। তুমি শিবস্বরূপ, তোমার ভালবাসা বা মঙ্গল স্বভাব সমস্ত জীবজন্তু কীট পতঙ্গ নরনারীর প্রতি নিত্য প্রেম করিতেছে, কিন্তু আমরা ভালবাসিতে যাইয়া কেবলই সংকীর্ণ হইয়া পড়ি। তুমি এক জনকে ভালবাস যদি দেখিতে পাই, তাহাতে বিশ্বাস করি যে তুমি সকলকেই ভালবাস; অপরদিকে নরনারী একজনকে ভালবাসে নিশ্চয় জানিলে একরূপ নিশ্চয় বুঝিতে পারি যে অন্যকে তেমন ভালবাসে না। তুমি ভালবাসিয়া উদার, আর আমরা ভালবাসিয়া সংকীর্ণ হই—এরূপ হইলে আমরা তোমার পুত্র কন্যা বলিয়া পরিচয় দিতে পারি না। যে সকল নরনারী তোমাকে ভালবাসিয়াছেন তাঁহারা তোমারই মত উদার প্রেম পাইয়াছেন, তাহাতেই দেখিতেছি যদি আমরা তোমার সন্তান হইয়া শুদ্ধ ও সুখী হইতে চাই, তাহা হইলে আমাদিগকে তোমার প্রেমের স্বভাব লাভ করিতে হইবে। তাই তোমার চরণে প্রার্থনা করি, যেমন এক এক বিন্দু পার্থিব প্রেম দিয়া আমাদিগকে সংকীর্ণ মানুষ করিয়াছ, তেমনই তোমার উদার প্রেম একবিন্দু দান করিয়া তোমার সন্তা-

নত্ব দান কর। এই প্রার্থনা করিয়া বার বার তব পাদপদ্মে প্রণাম করি।

উদার প্রেম।

যে সকল পণ্ডিত পৃথিবীতে জীবনের ঊর্দ্ধগতি বা অভিব্যক্তির বিষয় গবেষণা করেন, তাঁহাদের মধ্যে অতি প্রধান এক শ্রেণী আত্মরক্ষার ভাব বা স্বার্থপরতাকেই জীবনের সফলতা ও উন্নতির সোপান বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে যাহারা শক্তিতে, চতুরতাতে ও স্বার্থপরতাতে শ্রেষ্ঠ তাহারাই সময়ে ও প্রয়োজন অনুসারে উন্নততর অবস্থা লাভ করে। পক্ষান্তরে অপর কতকগুলি সেই উচ্চশ্রেণীর চিন্তা-শীল ব্যক্তি দেখাইয়া দেন যে স্বার্থপরতার ভিতরে নিঃশব্দে পরার্থপরতা অর্থাৎ প্রেম প্রবেশ করিয়া সৃষ্টির উন্নতি ও শ্রী সাধন করে। হিংস্র জন্তুগণও অপত্য স্নেহের বশ হইয়া আপনাকে ভুলিয়া অন্যের প্রতি প্রেম করে। ব্যাঘ্রী আপন সন্তানকে সত্যই প্রাণ দিয়া ভালবাসে একথা সকলেই জানেন। আত্মরক্ষাবৃত্তিকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল বৃত্তি অবশ্য বলিতে হয়, কিন্তু প্রেমও অত্যন্ত বলশালী বৃত্তি তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

অভিব্যক্তির শ্রেণীবিভাগ অনুসারে বিচার করিলে দেখা যায় যে জীবন জড়-জগতে প্রবেশ করিয়া প্রথম জড়ীয় ভাবের জীবনস্রোত প্রবাহিত করে। অর্থাৎ বৃক্ষ লতা, নীচ জীব সকলের মধ্যে ক্রমে প্রাণশক্তির বিকাশ হইয়াছে—তাহার ভিতরে আত্মরক্ষার প্রয়োজন আছে, কিন্তু তাহাদের ভিতরে জ্ঞান যথেষ্ট প্রকাশ হয় নাই বলিয়া আত্মরক্ষা বিষয়েও জড়ভাব রহিয়া যায়। তাহার উপর শ্রেণীর জীবের ভিতরে চেতনা বা জ্ঞান কতকটা প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু তাহা কেবল স্বার্থপর ভাবে আত্মরক্ষা করিতেই ব্যয়িত হয়। অধিকাংশ মৎস্য, সর্প, ব্যাঘ্র প্রভৃতি জীবের এইরূপ স্বার্থপর জ্ঞান বা কেবল আত্মরক্ষার বৃত্তি দেখা যায়। তদপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর জীবেতে স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা উভয় বৃত্তিই দেখা যায়। এইরূপ উচ্চ হইতে উচ্চতর জীব সকলের ভিতরে ও সর্ব্বোপরি মনুষ্যের ব্যবহারে দেখা যায় স্বার্থপরতার অপেক্ষা পরার্থপরতার শক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে। সর্ব্বশেষে মনুষ্যগণের উচ্চ নীতি ও ধর্ম্ম এবং চরিত্রের অভিব্যক্তি হইলে স্বার্থপরতা সম্পূর্ণ পরাস্ত হয় ও নিঃস্বার্থ প্রেম মনের উপর রাজত্ব করে।

সৃষ্টির শিরোভূষণ নরজাতির ভিতরেও সৃষ্টির সকল অবস্থার ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ভ্রূণতত্ত্ববিৎপণ্ডিতগণ বলেন যে, মনুষ্য-ভ্রূণ প্রথম সঞ্চারের সময় হইতে পূর্ণাবয়ব মানব শিশুর আকার ধারণ পর্য্যন্ত সৃষ্টির সকল প্রকার জন্তুর ভ্রূণের সাদৃশ্য লাভ করিয়া থাকে। অর্থাৎ মনুষ্য-ভ্রূণ এক অবস্থায় মৎস্য-ভ্রূণ হইতে অভিন্ন মনে হয়—এক সময় চতুষ্পদের ভ্রূণের আকার ধারণ করে, এক সময়ে বানর প্রভৃতির আকার ধারণ করে—সর্ব্বশেষে মানুষের আকার ধারণ করে—এবং ক্রমে জাতি বংশ পরিবার প্রভৃতির সাদৃশ্য লাভ

করে। ঠিক সেইভাবে মানুষের মনকে যদি উচ্চ দেবসন্তানের ভ্রূণরূপে দেখা যায়, তাহা হইলে বলিতে হয় মানুষের মন আপনার ক্রমোন্নতির নিয়মে জড়ভাব, জড়জাতীয় স্বার্থপরতা, চতুর স্বার্থপরতা, নিঃস্বার্থভাব-মিশ্রিত স্বার্থপরতা, পরার্থ-পরতা বা পূর্ণ পরার্থপরতা ও সর্ব্বশেষে শুদ্ধ পরার্থপরতা লাভ করে। আমরা চারিদিকে যে সকল লোককে দেখিতে পাই, যাহা-দিগের সহিত বাস করি সকলেই এই ক্রমোন্নতির কোন না কোন অবস্থায় অবস্থিত আছেন।

এক ভাবে বলা যাইতে পারে যে সভ্যতাতে, নীতিতে ও ধর্ম্মে উন্নতি লাভ করিবার অর্থ এই পরার্থপরতার উন্নতি লাভ করা। আমরা জ্ঞান সভ্যতা লাভ করিয়া কতকগুলি বিষয়ে উপর উপর জ্ঞান লাভ করিয়াছি, স্বভাবের বস্তু সকলের ব্যবহার কতকটা জানিতে পারিয়াছি—তাহা সভ্যতার এক বাহিরের দিক—কিন্তু ভিতরের দিক দিয়া দেখিলে বলিতে হয় যে সভ্যতা, নীতি ও ধর্ম্ম আমাদিগকে অপর মানুষের সহিত উত্তম ব্যবহার করিতে শিক্ষা দিয়াছে। যাঁহারা বর্ত্তমান সময়ের নানাবিধ জ্ঞান ধন সুখ সম্পদ লাভ করিয়াও অন্তরে স্বার্থপর রহিয়াছেন, অন্যকে ভালবাসিতে শিক্ষা করেন নাই তাঁহারা প্রকৃত উন্নতি বা সভ্যতা লাভ করেন নাই। একথা সত্য যে বর্ত্তমান সময়ের মহা স্বার্থপর ব্যক্তিও কতকগুলি নরনারীকে আপনার স্বার্থের অন্তর্গত করিয়া লইয়া স্বার্থপর হইয়াছেন। অর্থাৎ আপনার স্ত্রী পুত্র কন্যা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় প্রভৃতি কতকগুলি মানুষকে আপনার মনে করিয়া নিঃস্বার্থ প্রেম করেন এবং অপর সকল মানুষকে পর স্থির করিয়া তাহাদিগের সহিত সহানুভূতি করেন না, তাহাদিগের মঙ্গল চিন্তা, মঙ্গল কার্য্য করেন না, ইহাই বর্ত্তমান সভ্যতার প্রধান লক্ষণ; তাঁহাদিগকে লোকে স্বার্থপর বা অপ্রেমিক বলিয়া থাকে, কিন্তু মূল সত্য কথা এই যে তাঁহাদের প্রেম আছে, তাঁহারা প্রেমে অত্যন্ত অগ্রসর। কেবল একমাত্র অভাব এই যে তাঁহাদের প্রেম সংকীর্ণ—তাঁহারা অল্প কয়েকজন লোককে প্রেম করেন।

আমরা সকলেই দেখিতে পাই আমা-দিগের মাতা ভগ্নী প্রভৃতি আত্মীয়গণ আমাদিগকে অত্যন্ত ভালবাসেন। কেনা জানে শিশু রুগ্ন দুঃখী সকলেই নারীগণের ভালবাসা ও সাহায্য অধিক পাইয়া থাকে। প্রাণ দিয়া ভালবাসা, সেবা করা ইহাই যেন নারীজীবনের কার্য্য। সাধারণ সকলেই বলে নারী প্রেমের অবতার। পুরুষ যে কোমলতা বা প্রেমস্বভাব বহু চেষ্টা করিয়াও তেমন লাভ করিতে পারে না, নারী তাহা স্বভাবের গুণেই লাভ করেন। এদিকে সমাজ বিজ্ঞানের সার-শিক্ষা এই যে নরনারী সকলের মনে জ্ঞান ও প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলেই সমাজের দুঃখের দিন অবসান হইবে। পক্ষান্তরে ব্যক্তিগত-ধন-মান-প্রভুত্ব-স্পৃহা বা দাম্ভিক স্বার্থপরতা যতরূপ দুঃখের কারণ। যদি মানবমনে সামাজিক সম্বন্ধের জ্ঞান জন্মে,

যদি তাহাতে ভালবাসা উপস্থিত হয়, তবেই যত অবিচার অত্যাচার অজ্ঞানতা হীনতা চলিয়া যাইবে। ইহাতে মনে হইতে পারে যে যখন নারীগণের হৃদয়ে স্বাভাবিকভাবে এত প্রেম রহিয়াছে তখন সামাজিক সুখ সৌভাগ্যের দিন অত্যন্ত নিকট।

একথা কেনা স্বীকার করিবে যে মাতা ক্রোড়স্থ নিজ সন্তানকে যেরূপ ভাল বাসেন তাহাই স্বর্গের নিঃস্বার্থ প্রেমের দৃষ্টান্ত। অথবা ভগিনী ভ্রাতাকে যে ভালবাসা দান করেন তাহা একান্ত পবিত্র ও হিতকর। পৃথিবীতে স্বর্গের প্রেমের দৃষ্টান্ত দেখা যায় না তাহা নহে। ফলে বিশ্বের মহাশিল্পী সকল বস্তুর সৌন্দর্য্য সাধনার ব্যবস্থা যেমন করিয়াছেন, মানব মনের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য সাধনার জন্যও তেমনই ব্যবস্থা করিয়াছেন। নিঃস্বার্থ ভালবাসা সকলেই দেখিয়াছে এবং ভাল বাসিলেই যে ভাল হওয়া যায় সেবিষয়ে জ্ঞানও রহিয়াছে; কিন্তু পৃথিবী স্বর্গ হইতে বহুদূরে পড়িয়া আছে এবং নারী প্রেমস্বভাব হইয়াও অধিক নিকট যাইতে পারেন না। ইহার কারণ এই যে মাতা বা ভগ্নী বা স্ত্রীর ভালবাসা ব্যক্তিতে আবদ্ধ। মাতা আপনার শিশুটিকে ভাল বাসিলেন, কিন্তু অন্যলোকের শিশুকে ভাল বাসিতে-পারিলেন না। ভালবাসা কি তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিয়াছেন, কিন্তু ভালবাসা অন্যকে দেওয়া কি তাহা তিনি জানেন না। এখন দেখিতে হইবে যে সমাজবিজ্ঞানবিদ্‌গণ সমাজের সকল অঙ্গে যে গভীর প্রেম বা সহানুভূতির প্রয়োজন অনুভব করেন, তাহা পৃথিবীতে নাই তাহা নয়, প্রতি পরিবারে তাহা আছে, প্রত্যেক জনক জননীর অন্তরে তাহা পাওয়া যায়। ধর্ম্ম এই ভালবাসাকে —ইহার স্বর্গীয় আদর্শকে স্বর্গরাজ্য বলেন, সমাজবিজ্ঞান সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি দ্বারা সেইরূপ একটা অবস্থা আনিতে যত্ন করিতেছেন। নীতিশিক্ষক মনে করেন, সকলে সুনীতি-পরায়ণ হইলে স্বভাবতঃ সকলেই প্রেমিক হইবে। ফলবাদিগণ মনে করেন যে, ভালবাসিলে অর্থাৎ স্বাভাবিক সংকীর্ণ প্রেমকে উদার করিলে এত মহা উপকার হয় ইহা চিন্তা করিয়া অবশ্যই সকলে এই প্রেম সাধনা করিবে।

যেমন বনভূমিতে ক্ষুদ্র কাঠ গোলাপ স্বাভাবিক ভাবে জন্মিয়া থাকে, স্বভাবজ্ঞ উদ্যানপালক বহু যত্ন চেষ্টা করিয়া বহুদিন পরে কাঠ গোলাপের বংশ হইতে পলনিরন প্রভৃতি বৃহৎ ও সুন্দর গোলাপ জন্মাইয়া থাকে, ঠিক সেইরূপে মানব-হৃদয়ে বিধাতার সাধারণ ব্যবস্থাতে অতি সুন্দর কিন্তু ক্ষুদ্র সামান্য অপত্যস্নেহ ভ্রাতৃবাৎসল্য প্রভৃতি প্রস্ফুটিত হইতেছে। তাহাতে প্রেম আদিম আকারে জীবিত থাকে, বংশরক্ষার সাহায্য করে, কিন্তু ভগবানের অহেতুক অনাদি অনন্ত প্রেমকে লাভ করিতে পারে না। কে না বলিবে যে উদার প্রেমের অত্যন্ত প্রয়োজন? কে না বলিবে যে প্রেমপ্রসারণ অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে হইতে পারে? কিন্তু কার্য্যত স্বাভাবিক প্রেমই পৃথিবীতে রাজ্য করিতেছে—বিশ্বস্রষ্টার প্রেম পৃথিবীতে আসিবার এখনও সময় হয় নাই। কিন্তু আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে উদার প্রেমের দিকে এখন

পৃথিবীর দৃষ্টি পড়িয়াছে এবং হয়ত অতি অল্পদিনের মধ্যে উদার প্রেম লাভ করিবার যথাবিধি চেষ্টা সকলেই করিতে আরম্ভ করিবেন। যিনি যে সত্যদর্শন করিয়া বা যে আদর্শ অবলম্বনে অন্যকে ভাল বাসিতে পারেন, শুদ্ধ প্রেমদান করিতে পারেন, তিনিই সমাজের উপকার করিবেন।

নারীজাতি প্রেম-প্রধান—তাঁহাদের নিঃস্বার্থ প্রেমে মানুষ অসহায় শিশুকালে লালিত পালিত হয়। তাঁহাদের সহিষ্ণু প্রেমে পরিবারে শান্তি কুশল বিরাজ করে, কিন্তু তাঁহাদের প্রেম সঙ্কীর্ণ বলিয়া পৃথিবীতে নানা রূপ দুঃখ পাপ অশান্তি উপস্থিত হয়। যদি জননী, ভগিনী ও কন্যাগণ যেমন আপনার পুত্র কন্যা, ভাই ভগ্নী, পিতা মাতাকে গভীর ভালবাসা দান করিয়া পরিবারকে স্বর্গেরসৌন্দর্য্য ও শান্তি দান করেন, যদি তাঁহারা প্রেমকে উদার করিয়া সকল নরনারীর যথাযোগ্য কন্যা, ভগিনী ও মাতা হইয়া প্রেম দান করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের শুদ্ধ প্রেম উদার ও প্রশস্ত হইয়া সমাজকে পবিত্র, সুন্দর ও সুখালয় করিতে পারে।

পূর্ব্ব ও পশ্চিম।

জনৈক লেখক বলিতেছেন—"ভারতের একটা নিজস্ব সভ্যতা ও সাধনা ছিল এবং আছে। জাতীয় জীবনের বিবর্ত্তনে তাহাকে রক্ষা করিতে না পারিলে উন্নতির পরিবর্ত্তে আমাদের অশেষ দুর্গতি হইবে। আধুনিক সকল সংস্কার প্রয়াসের পশ্চাতে এই সাঙ্ঘাতিক আত্মবিস্মৃতি আছে।

"ইউরোপীয় সভ্যতার মূলমন্ত্র রাইট্‌স্ বা স্বত্ব বা অধিকার—কতকগুলি দাবি-দাওয়া যাহা প্রয়োজনমত অপরের উপর জারি করিতে পারা যায়। এজন্য রাইট্‌স্ এর গতি বিচ্ছিন্নতার দিকে, একতার দিকে নয়। অধিকার আপনাকে অপরের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত করিতেই চায়। অপরের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া, হারাইয়া, তার সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম হইয়া যে পূর্ণতর সার্থকতা লাভ করা যায়—রাইট্‌স্ সে উচ্চতত্ত্বের সন্ধান রাখে না। অধিকারের নিয়মাধীন সমাজের প্রকৃতিই 'চাচা আপন বাঁচা'। প্রতিযোগিতাই এ সমাজের বিবর্ত্তনের মূল সূত্র। এ ক্ষেত্রে সমরসজ্জাই সমাজের স্বাভাবিক ও নিত্যকার অবস্থা। সুতরাং এরূপ সমাজের রাজশক্তিকে আত্মরক্ষণে অক্ষম ব্যক্তিগণকে এই সাঙ্ঘাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে রক্ষা করিবার উপযুক্ত শিক্ষা দীক্ষা দিয়া সেই সমাজের উপযুক্ত করিয়া দিতে হয়, নতুবা সমাজরক্ষা হয় না। যে সমাজে ব্যক্তিগত স্বত্ব স্বাধীনতার এই অদ্ভুত আদর্শ এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সেখানে সহজ পারিবারিক স্নেহমমতা এবং অকৃত্রিম সামাজিক সৌহার্দ্দই দুর্ব্বলকে প্রবলের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। রাজশক্তিকে হস্তক্ষেপ করিতে হয় না।

"মানুষের প্রকৃতি সর্ব্বত্রই একপ্রকার। কিন্তু কোথাও সমাজবিধান এরূপ যে, তাহাতে মানুষের স্বাভাবিক পশুত্বকে সহু

চিত করিয়া দেবত্বকেই প্রসারিত করিবার চেষ্টা করে। আর কোথাও বা সমাজ-বিধান এরূপ যে, তাহাতে দেবত্বকেই চাপিয়া রাখে ও পশুত্বকেই বাড়াইয়া তোলে।

"ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে ব্যক্তিগত স্বত্ব স্বার্থের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিবন্ধন সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন ক্রমেই শিথিল হইয়া যাইতেছে। পিতা মাতা ভ্রাতা পুত্র কলত্রাদি আত্মীয়স্বজন, সহজে যাহাদের প্রতি মন অসীম স্নেহভরে ধাবিত হয়, তারাই আবার যখন অকারণ অপরের হস্তে ক্লেশের বা নির্য্যাতনের কারণ হইয়া উঠে, তখন সেই স্নেহটুকু কখনই তেমন ভাবে বাঁচাইয়া রাখা যায় না। এই জন্য যেখানেই রাজশক্তি বা রাষ্ট্রশক্তি, আপনার অটল আদালত ও পুলিস পাহারা লইয়া স্বামী স্ত্রী বা পিতা পুত্রের বা অন্য কোন স্নেহের বা প্রেমের সম্বন্ধের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়া যে সম্বন্ধের স্বত্বাস্বত্ব এবং অধিকার অনধিকার নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হয়, সেখানেই এসকল সম্বন্ধ আর টিকিয়া থাকিতে পারে না। মানুষের সহজ স্নেহমমতার প্রেরণায় পরিবারে ও সমাজে অক্ষমদের রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষা দীক্ষার যে সকল ব্যবস্থা আপনা হইতে গড়িয়া উঠে তাহাই সর্ব্বোত্তম। সাধু ইচ্ছাতেও বাহির হইতে জোর করিয়া কিছু চাপাইয়া দিলে কোন ব্যক্তি বা সমাজের কখনও মঙ্গল করিতে পারা যায় না। মানুষের ভিতরের ভাব ও প্রবৃত্তি হইতে যে সকল পারিবারিক, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় বিধি ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে, তার মধ্যে এমন একটা শক্তি, সজীবতা ও আনন্দ থাকে যে জোর করিয়া রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যে সে সকল ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিলে কখনও তাহা থাকিতে পারে না। সন্তানবাৎসল্যপ্রণোদিত হইয়া পিতামাতা সর্ব্বত্রই জীবন পণ করিয়া স্বীয় সন্তানকে উপযুক্তরূপে পালন করিয়া ও শিক্ষা দীক্ষা দিয়া জীবনসংগ্রামের উপযোগী করিয়া দেন। ইহাই সহজ ও স্বাভাবিক নিয়ম। মাতা ভগ্নীর স্নেহ-রস ও পরিবারের স্নিগ্ধচ্ছায়া হইতে সরাইয়া বোর্ডিং বা বিহারে রাখিয়া যতই উৎকৃষ্ট-প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হউক না কেন, তাহাতে কেহ কেহ অসাধারণ উন্নতি লাভ করিতে পারিলেও, সমাজের স্বাভাবিক মনুষ্যত্বটা ক্রমাগতই দুর্ব্বল ও ক্ষয়োন্মুখ হইয়া উঠে, সাধনার অভাবে লোকের স্বাভাবিক সন্তানবাৎসল্য হ্রাস হইতে থাকে, পারিবারিক সম্বন্ধের শক্তি ও শ্রী নষ্ট হইয়া যায় এবং সমাজ হীনবল ও শিথিলগ্রন্থি হইয়া পড়ে।"

অন্যের প্রতি যখন আমরা বিচারে প্রবৃত্ত হই তখন একটা সহজ কথা ভুলিয়া যাই। উচিত অনুচিত, ন্যায় অন্যায়, সঙ্গত অসঙ্গত সম্বন্ধীয় জ্ঞান আমাদের নিজ নিজ হৃদয়ের প্রেম, সামাজিক রীতি নীতি, বংশ, শিক্ষা, দীক্ষা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। ব্যক্তিবিশেষের কাজ যখন অন্যায় বলিয়া মনে হয় তখন তাঁহাদের বিচার না করিয়া যদি বুঝিতে চেষ্টা করি, আপনাকে সেই অবস্থায় স্থাপন করি, তাহা হইলে অনেক সময় যাহা অন্যায় বলিয়া

মনে হইয়াছিল তাহা সেই ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে যে খুব প্রয়োজন ছিল তাহা প্রতীয়মান হয় না কি? পশ্চিমে নারীজাতির অবস্থা ও ভারতের নারীজাতির অবস্থা এক নহে। আমাদের যে কাজ সহজে হওয়া সম্ভব তাহা তাঁহাদের পক্ষে বোধ হয় অসম্ভব।

ভারতে পূর্ব্ব পশ্চিমের মিলন হওয়াতে একটা নূতন ভাব আসিয়াছে। এখন জোর করিয়া 'সীতা হও সাবিত্রী হও' কথা শুনিতে সীতা সাবিত্রীরা প্রস্তুত কিনা তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। সীতার কথা বলিতে গেলে প্রথমেই কি জনক ঋষির কথা বলিতে হয় না? তিনি যখন সীতাকে সীতার মার কোলে দিলেন তখন বলিলেন 'এই নাও ভগবানের দান।' আবার অন্যদিক দিয়ে দেখতে গেলে দেখি, ওয়াশিংটনের মা 'আমি আমার ছেলেকে দেশের কাজে উৎসর্গ কর্‌লাম' প্রাণখুলে বলতে পেরেছিলেন; তাতেই ওয়াশিংটন ওয়াশিংটন হতে পেরেছিলেন। যদি আমাদের নিকট হতে পূর্ব্ব পশ্চিমের মিলন চাওয়া হয় আমাদের প্রথমে পূর্ব্ব পশ্চিমের মিলন দিতে হবে না কি? অন্য ধার দিয়ে আবার আমরা যদি পশ্চিমের অনুকরণ করিতে উৎসুক হইয়া থাকি, যদি ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থের মত ভাই চাই, যদি কবি ব্রাউনিংএর মত স্বামী চাই, যদি ওয়াশিংটনের মত ছেলে চাই, তাহা হইলে কি ডোরার মত বোন, মিসেস্ ব্রাউনিং এর মত স্ত্রী, ওয়াশিংটনের মার মত মা হতে হবে না? যদি আমাদের কাছ হতে প্রাণ, কাজ, স্বাধীনতা, আনন্দ, ভালবাসা চাওয়া হয়, তাহা হ'লে এসব দিতে হবে নাকি? আবার আমরা যদি এসব চাই ও পাই, তাহা হ'লে আমাদের কি করতে হবে তাহা প্রত্যেক কে ভাবতে হবে নাকি?

নব জীবন।

মাঘ মাস; কন্‌কনে শীত। আজ ভোর হইতে অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে এবং উত্তরে বাতাস একটু প্রবলবেগে বহিয়া শীতের প্রকোপকে বাড়াইয়া তুলিয়াছে। একটী ছোট গৃহে একটী রমণী রোগশয্যায় শায়িত—পার্শ্বে তাঁহার দশ বৎসরের বালিকা বসিয়া আবশ্যকমত তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছে।

মেয়েটীর নাম বীণা—তাহার পিতা নবকান্ত ঘোষ যে গ্রামে বাস করেন, সেখানে অনেক ভদ্র লোকের বাস। নবকান্তের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে, এককালে তাঁহাদের অবস্থা খুব ভাল ছিল, কিন্তু নবকান্তের বুদ্ধির দোষে আর্থিক অবস্থায় ভাঁটার টান পড়িয়াছে। বিশ বৎসর পূর্ব্বে মহা সমারোহে বৈশাখের শুভলগ্নে নবকান্তের পিতা যখন নববধূ শৈবলিনীকে বরণ করিয়া গৃহে তুলিলেন—পাড়ার সকলে তখন একবাক্যে বলিয়াছিলেন, আহা, "বৌ নয়ত, যেন স্বয়ং মা লক্ষ্মী ঘর আলো কর্ত্তে এলেন।" বিচিত্র অবস্থা ও নানা ঘটনার মধ্য দিয়া বিশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে—সুখের ও দুঃখের

বিচিত্র কাহিনী এই ক্ষুদ্র পরিবারটীর উপর দিয়াও চলিয়া গিয়াছে।

আঠারো বৎসর যখন তাঁর বয়স তখন —নবকান্তের বিবাহ হয়। বিবাহের কিছু কাল পরে হঠাৎ কলেরায় তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর হইতেই নবকান্তের স্বাভাব বিগড়াইতে সুরু হয়—অবস্থা স্বচ্ছল, মাথার উপর কেহ নাই, অনেক বন্ধু জুটিল। বন্ধু বান্ধবের শুভদৃষ্টিতে বিষয় সম্পত্তিতে টান পড়িল—এবং অবশিষ্ট যাহা কিছু আজও আছে, তাহা তাঁহার স্ত্রীর চেষ্টার ফল। নবকান্ত যাহাই হউন না কেন, তিনি নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক নহেন, তাঁহার হৃদয় খুবই কোমল এবং এই কোমলতাই তাঁহার পতনের কারণ। নিজের জন্য যে তিনি দুঃখিত নহেন, এমন নয়—তাঁহার আচরণ যে তাঁর স্ত্রীকে খুব পীড়া দিত, তাহাও তিনি বুঝিতেন। সবই বুঝিতেন, সবই জানিতেন—পতনের পথে যাওয়াটা যত সহজ, সেটা হইতে উঠা যে তার চেয়ে অনেক কঠিন, তাই তিনি আর উঠিতে পারিতেছিলেন না। ঘরের ভিতরে আসিলে, তিনি ঘর ও বাহিরের প্রভেদটা বেশ বুঝিতে পারিতেন—বিশেষতঃ বীণা যখন আরও ছোট ছিল এবং হাসিতে হাসিতে যখন সে তাঁর কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িত, তখন তার সেই চঞ্চল বেষ্টনের মধ্যে এমন একটা স্নিগ্ধ কোমল ও পবিত্র ভালবাসা ফুটিয়া উঠিত, যেটা বেদনার মত তাঁর রুদ্ধ বুকে বাজিয়া উঠিত। ঘরের বাহিরে যখন তিনি তাঁহার অভ্যস্ত জীবনের মধ্যে গিয়া পড়িতেন, তাঁহার মনুষ্যত্ব যে কোন্ অতল গর্ভে ডুবিয়া যাইত, তাহার ঠিকানা থাকিত না।

বীণার গায়ের রঙ শ্যাম বর্ণ, চোক দুটী ভাসা ভাসা, তার উপরে কালো কালো টানা ভুরু, মুখে বেশ একটী ঢল ঢল ভাব; বড় বড় থোবা থোবা কোঁকড়া চুল যখন তার মুখে পিঠে পড়িত, বাস্তবিক তখন তাকে বড় সুন্দর দেখাত—এমন একটা কোমল শ্রী তার মধ্যে ছিল যেটা নজরে পড়িবামাত্রই আকর্ষণ করে। বীণাকে যে দেখিত সে ভাল বাসিত।

বীণার মায়ের মনে কিন্তু শান্তি ছিলনা —কি একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় তিনি শিহরিয়া উঠিতেন। তাঁহার মনের কষ্ট যতদূর পারিতেন তিনি কন্যার সমক্ষে গোপন রাখিবার চেষ্টা করিতেন। বীণা তাঁর এ ভাবটা কতকটা বুঝিত, সেই জন্যই বোধ হয় তাহার বয়সের চেয়ে তার মুখে একটা গম্ভীর ভাব সর্ব্বদা দেখা যাইত। সে মাকে বুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া মায়ের বুকে কি ব্যথা আছে সেটা জানিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু সেটাত সে কোন মতে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিত না —তাই তার ক্ষুদ্র হৃদয়ে জননীর ম্লান মুখ দেখিলে বড়ই আঘাত লাগিত, সে লুকাইয়া লুকাইয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কেন যে কাঁদিত তাহার অর্থ সে কোন দিনই বুঝিতে পারে নাই। এইরূপ অবস্থায় সে অনেক দিন ঘুমাইয়া পড়িত—ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া সে স্বপ্নে প্রায়ই দেখিত যে, আকাশ থেকে রথের মতন একটা কি নামিয়া

আসে, তার চারিদিকে কি একটা উজ্জ্বল আলোক সে আলোতে তার চোখে কেমন ধাঁধা লাগিয়া যাইত। রথ ঠিক তাদের ঘরের সাম্‌নে এসে দাঁড়ায় আর তার ভিতর থেকে লোক নামিয়া আসে, আর তার মাকে সেই রথের উপর তুলিয়া লইয়া তারা আবার আকাশ পথে চলিয়া যায়। যখন লোকেরা তার মাকে রথের উপর চড়ায় তখন সে স্বপ্নে যেন তাদের কাঁদিয়া বলে—"ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি, আমার মাকে তোমরা নিয়ে যেওনা। মাকে যদি নিয়ে যাও তো আমাকে আমার মার সঙ্গেই নিয়ে যাও।" ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে তার বুকটা কেমন ধড়াস্ করে উঠে—কিসের যেন একটা ভয়ে তাকে আড়ষ্ট করিয়া ফেলে।

বীণার মা শৈবলিনীর মনে সুখ নাই—অনেক দিন হইতেই তাঁর স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়াছে. তবে এতদিন যে তিনি সংসার চালাইয়া আসিয়াছেন, সেটা শুধু জোর করিয়া এবং কতকট বীণার ভয়ে—কেননা বীণার ম্লান মুখ দেখিলে তাঁর সমস্ত বেদনা একটা বোঝার মতন হইয়া বুকের শির ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িত। তবে এবারে যখন তিনি শয্যাশায়ী হলেন, তখন তিনি জানিতেন যে এ যাত্রা আর তিনি রক্ষা পাইবেন না। মরিবার তিনি ভয় করিতেন না। তবে তাঁহার আদরের ও স্নেহের বীণার কি হইবে, এই ভাবনাটা তাঁহাকে উতলা করিত, তাঁহার অবর্ত্তমানে এই অসহায়া মাতৃহীনা বালিকা নির্ম্মম সংসারে কাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইবে। এই সব ভাবনা তাঁহার মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিত, এবং মনের যাতনা অস্ফুট আর্ত্তনাদের মধ্যে কোন মুহূর্ত্তের অসাবধানতায় যদি বাহির হইয়া পড়িত, তখনই তিনি দেখিতেন যে দশমবর্ষীয়া বালিকা সতর্ক প্রহরীর ন্যায় শিয়রে বসিয়া বসিয়া নির্বিষ্টমনে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে এবং সেইজন্য যখন সে তাঁহার এই চির অব্যক্ত যন্ত্রণার কারণ জানিতে চাহিত, তখন বাস্তবিক তাঁহার মাতৃহৃদয় এবং নারীমহিমার মধ্যে এমন একটা বিদ্রোহ বাধিত যাহার মীমাংসা তিনি এই চিরসহিষ্ণু সেবাপরায়ণা ক্ষুদ্র বালিকাকে কোনমতেই বুঝাইতে পারিতেন না। তাই তাহাকে বুকের মাঝে টানিয়া লইয়া শুধু চুম্বনের দ্বারা মাতার আশীর্ব্বাদ অঙ্কিত করিতেন। এই অবস্থায় উভয়ের চোখের পাতা কি একটা ভাবের মহিমায় ভিজিয়া যাইত।

বীণা ভাবিত অমন সকলেরইত অসুখ করিয়া থাকে, মার অসুখ করিয়াছে সারিয়া যাইবে। সে কোনমতেই বুঝিতে পারিত না যে এবারে তার মায়ের ডাক পড়িয়াছে, তাই সে মায়ের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিত "মা, তুমি কবে সারিয়া উঠিবে?" সরলা বালিকার এই প্রশ্নে তাহার স্নেহময়ী জননীর ওষ্ঠে চকিতের মতন হাসি মিলাইয়া যাইত। সংসার-অনভিজ্ঞা বালিকা সে হাসির রহস্য ভেদ করিতে পারিত না। পৃথিবীকে অন্ধকারে ডুবাইবার পূর্ব্বে সূর্য্যদেবও ঠিক এইরূপ ম্লান হাসেন—সে হাসিও অর্থপূর্ণ।

সন্ধ্যার সময় গ্রামের বিজ্ঞ কবিরাজ রোগীকে দেখিতে আসিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া তিনি খুব ভাল করিয়া দেখিলেন। জ্বর এবং কাশীর প্রকোপ কোন ঔষধেই কমিতেছিল না—রোগী সম্বন্ধে ক্রমে তিনি হতাশ হইয়া পড়িতেছিলেন। আয়ু ফুরাইলে ঔষধ কি করিবে? আজ রোগীর অবস্থা দেখিয়া তিনি ভীত হইলেন। যতদূর সাধ্য ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া আজ রাত্রে বীণা যেন একটু বিশেষ সাবধানে থাকে, এ কথাটা তিনি বীণাকে বলিয়া গেলেন। বিজ্ঞ কবিরাজের এই সতর্ক বাণীর মধ্যে অমঙ্গলের এমন একটা ছায়া আছে, যেটার কথা ভাবিবামাত্র বীণার অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিল। সহসা তাহার রুদ্ধ অভিমান এবং রোষ তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়া তাহাকে বিচলিত করিল। জননীর এই সঙ্কটাবস্থায়, তাহার পিতা কোথায়? আজ দুই দিন ধরিয়া তাঁহার কোন উদ্দেশ নাই—সে লোকের দ্বারা অনেক খোঁজ করিয়াছে, কিন্তু তিনি গ্রাম ছাড়িয়া কোথায় গিয়াছেন কেহ জানে না। সে অনেকক্ষণ ধরিয়া শুধু কাঁদিল, কতবার মনে মনে ডাকিল "বাবা গো, তুমি কোথায়, একবার এস।" কই, তাহার এই আকুল আহ্বানেও তার বাবা আসিলেন না। সে ধীরে ধীরে মায়ের কাছে গিয়া আবার বসিল। ক্ষীণদীপালোকে রক্তহীন পাণ্ডুর মুখশ্রী তাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য এখনও সম্পূর্ণভাবে হারায় নাই—সে আত্মহারা হইয়া মাকে দেখিতে লাগিল।

রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে এই ক্ষুদ্র পরিবারে অন্ধকারের ছায়া গাঢ়তর হইল। ক্ষুদ্র বালিকা সারা রাত্রি জাগিয়া মায়ের সেবা করিতে লাগিল। শেষ রাত্রিতে রোগ বৃদ্ধি পাইল। শৈবলিনী বলিলেন—'মা, বীণা, আমার বুকটা কেমন করছে, শরীর কেমন হিম হয়ে আসছে। কই, উনি এখনও এ'লেন না। মা, আমি চল্লুম—ভগবানের হাতে তোমাকে রেখে চল্লুম। আমার সময় ফুরিয়েছে। ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন।" ঠিক এই সময়ে একটা ঝটকা বাতাসে, ঘরের প্রদীপ নিভিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির আর একটা ফুৎকারে বীণার জননীর জীবন-প্রদীপও নিভিয়া গেল। মাটিতে পড়িয়া আছড়াইয়া আছড়াইয়া বীণা কাঁদিতে লাগিল। আজ হইতে সে মাতৃহীনা বালিকা।

ভোর হইতে আর দেরী নাই—আকাশের মেঘ অনেক কাটিয়া গিয়াছে। এমন সময়ে নবকান্ত ঘরে ঢুকিয়া ডাকিলেন —বীণা। বীণা উত্তর দিল না. উত্তর না পাওয়াতে তিনি আবার ডাকিলেন বীণা— উচ্ছ্বসিত শোকে বীণা এবার কাঁদিয়া উঠিল। বাড়ীর সামনে দিয়া একটা নিশাচর পাখী কর্কশস্বরে ঠিক এই সময়ে ডাকিয়া গেল।

নবকান্ত সব দেখিলেন—সব বুঝিলেন। চোখের সম্মুখে সংসারের সমস্ত দৃশ্য মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার কাছে ঝাপ্‌সা হইয়া উঠিল। যিনি লক্ষ্মীর ন্যায় তাঁহার ক্ষুদ্র পরিবারকে শুভ-চেষ্টা ও কল্যাণ-কামনার দ্বারা পূর্ণ

করিয়াছিলেন, আজ তাঁহারই উপেক্ষা এবং অনাদরে জীর্ণ হইয়া তিনি সকল যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তীব্র অনুতাপে তাহার চোখ ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল। বিশ বৎসরের সমস্ত কাহিনী আজ তাঁহার মনে পড়িল, এই নিদারুণ শোকের মধ্যে ও আপনার হীনতার কথা স্মরণ করিয়া তিনি বালিকা কন্যার নিকট অপরাধীর ন্যায় দাঁড়াইলেন। যিনি তাঁহার সমস্ত ত্রুটী ও অপরাধ ক্ষমা করিবেন, তিনিত আজ নবকান্তের আয়ত্তের বাহিরে। বীণা কি তাঁহাকে ক্ষমা করিবে? এইরূপ নিস্তব্ধভাবে তাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বীণা "বাবা গো" বলিয়া ছুটিয়া আসিল। শোকাকুলা কন্যাকে পিতা বুকে টানিয়া লইলেন, আজি এই শোকাশ্রুর মধ্যে দূরত্ব চলিয়া গেল, এবং যে অভিনব প্রয়াগের সৃষ্টি হইল তাহাতে নবকান্তের পাপ ধুইয়া গেল।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর নবকান্ত আর কাহারও সঙ্গে মিশিতেন না। তাঁহাদের ভালবাসার নিদর্শন বীণাকে নবকান্ত আর কখনও চোখের আড়াল করিতেন না। জীবনে শৈবলিনী যাহা পারেন নাই, মরণের দ্বারা তাহা তিনি পূর্ণ করিলেন। শৈবলিনীর মৃত্যুতে সকলে বুঝিতে পারিল যে নবকান্তের নবজীবন লাভ হইয়াছে।

শিক্ষা ও নারী প্রকৃতি।

নারী কিংবা নর সকলেই শিক্ষার জন্য ধরাধামে আনীত হইতেছে। জন্মের পর হইতেই নর-সন্তান শিক্ষারম্ভ করে। জন্ম মাত্র মানব শিশুর জীবনে যেমন ক্ষুধা তৃষ্ণার সঞ্চার হয়, তেমন জানিবার জন্য স্পৃহাও সঞ্চারিত হইয়া থাকে। এই স্বাভাবিক স্পৃহার প্রাবল্যহেতু শিশুরা যেমন আহার পান, তেমন জ্ঞানাহরণ করিয়া বর্দ্ধিত হইতেছে। পিতা মাতা ও প্রতিবেশিগণ, আচার আচরণ ও দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা নানা বিষয়ে শিশুদিগকে জ্ঞানদান করিয়া থাকেন। বালকের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি অতি ব্যগ্রভাবে চারি দিকস্থ লোকদিগের কার্য্যকলাপ এবং কথা বার্ত্তার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে। বয়স্কদিগের ব্যবহারের কোন কিছুই বালক বালিকাদের পক্ষে ব্যর্থ হয় না। এজন্য বালিকা কিম্বা বালক আপন আপন পরিবার এবং প্রতিবেশিগণের অনুরূপ চরিত্র, ভাব ও কার্য্যশক্তি লাভ করিতেছে। বালকদিগের নিকট কেহ আত্মগোপন করিয়া অথবা ভিতরে এক প্রকার হইয়া বাহিরে অন্য প্রকার অবস্থা প্রদর্শন করিতে পারে না। যে ভিতরে যেরূপ তাহার সেই ছবি বালক বালিকার চরিত্র-দর্পণে অবিকল মুদ্রিত হইতেছে। এসকল লক্ষণ দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হয়, শিক্ষা করা নর-সন্তানের জীবন-ব্রত। এজন্য বালিকা ও বালকদিগকে সুসঙ্গ ও সুশিক্ষা দেওয়া অত্যাবশ্যক।

সুশিক্ষা দ্বারা কি লাভ? আজও অনেকের এরূপ সিদ্ধান্ত, সুশিক্ষা দ্বারা অভাব বিমোচনের উপায়প্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু একথা সত্য কথা নহে। শিক্ষা

দ্বারা অভাব বিমোচিত হয় না, বরং অভাববোধের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সুখে আহার পানাদি লাভ করাই যাহারা মনুষ্য জীবনের চরমোদ্দেশ্য বলিয়া বোঝে, তাহারা শিক্ষার দ্বারা কি লাভ তাহা পরিগ্রহ করিতে অক্ষম থাকে এবং চির দিন থাকিবে। আহার করিলে কি ক্ষুধা চিরদিনের জন্য নির্ব্বাপিত হইয়া যায়? কখনও নহে। আহার গ্রহণ দ্বারা আহারগ্রহণস্পৃহা বিবর্দ্ধিত হয়। তেমনি শিক্ষা লাভ দ্বারা শিক্ষার স্পৃহা প্রবলরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। জ্ঞান-স্পৃহা-বৃদ্ধি ও জ্ঞানের প্রসারই উৎকৃষ্ট শিক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তনের মুখ্য উদ্দেশ্য। মনুষ্যকে সহজে অন্নবস্ত্র আহরণের উপায় অবলম্বনে সক্ষম করা যাহারা শিক্ষার উদ্দেশ্য মনে করে, তাহাদের সেটি মহাভ্রম। এদেশে নারীজাতিকে বর্ত্তমান সময়ে বিবিধ বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়েও বঙ্গীয় যুবতীগণ শিক্ষা লাভ করিতেছেন। একি তাঁহাদের জীবন পোষণের উপায় নির্দ্ধারণার্থ? কখনই নহে।

একটি নিরক্ষর অসভ্য পাহাড়ী লোক একজন বাঙ্গালী শিক্ষিত লোককে যাহা বলিয়া তাহাদের জাতিমধ্যে বিদ্যালয় স্থাপনের অনাবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়াছিল, তাহা এস্থলে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমাদের মহিলাগণ তাহা হইতে একটু বিশেষ শিক্ষা লাভ করিবেন এই আশায় আমরা সে বিষয়টি নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

আসাম প্রদেশের নানা স্থানে মিরি নামক অসভ্য জাতির বাস। আসামস্থ স্কুলসবইন্‌স্পেক্টারগণ মিরি জাতির মধ্যে পাঠশালা স্থাপনের চেষ্টা পুনঃ পুনঃ করিয়া বিফল-প্রযত্ন হইয়া থাকেন। ইহার পরে যখন সে অঞ্চলে এক জন নূতন স্কুলসবইন্‌স্পেক্টার কার্য্য ভার গ্রহণ করেন, তখন ডিপুটি ইন্‌স্পেক্টার তাঁহাকে এই পরামর্শ দিলেন যে মিরিদের মধ্য হইতে একটি বুদ্ধিমান যুবাকে সহরে আনিয়া শিক্ষা দিয়া শিক্ষক রূপে তাহাদের অঞ্চলে প্রেরণ করিলে স্থায়িরূপে পাঠশালা স্থাপনের আশা করা যায়। উপদেশপ্রাপ্ত সবইন্‌স্পেক্টার মিরিদের পল্লীতে গিয়া একটি বুদ্ধিমান যুবকের সহিত আলাপ পরিচয় করিলেন। তাহাকে বৃত্তি দিয়া শিক্ষালাভার্থ নগরে নিবার প্রস্তাব তাহার নিকট উপস্থিত করিলেন। এপ্রস্তাব শ্রবণে মিরিযুবা কিছু কাল নীরবে থাকিয়া সব্‌ইন্‌স্পেক্টারকে বলিল:—

তুই কি আমাদের তোর মত বাবু বানাতে চাস্! লেখাপড়া শিখে বাবু হয়ে তোর কি ভাল হয়েছে তা কি তুই বুঝিস্? আমার তা হয়ে কি হবে? দেখ আমার সম্মুখে ব্রহ্মপুত্র নদ আছে, আমি যখন খুসী মাছ ধরে খাই, বাজারে বেচে পয়সা পাই। পাছের দিকে জমি আছে; ধান বুনি, শরিষা বুনি, তা হইতে ভাত পাই, টাকা পাই। ঘরে গরু ও শুয়র আছে, তার মাংস খাই, আমার ঘরে আমার মা বাপ স্ত্রী আছে। সকল সময়ে তাদের সঙ্গে থাকিতে পাই। একত্র থেকে সুখে আছি। তোর কি অবস্থা? তোর

স্ত্রী কোথায়, বাপ মা কোথায়? তারা কেমন আছে, এখন তাকি তুই জান্তে পারিস্, তুই ত পয়সা পয়সা করে ঘুর্তে এসেছিস্। তোর মত পড়ে শুনে আমার ত ঐদশা হবে, এমন পড়া আমি চাই না। সবইন্স্পেক্টর একেবারে নির্ব্বাক হইলেন। তিনি একথার কোন জবাব দিতে পারিলেন না। সহরে আসিয়া তিনি একথা পরামর্শদাতা ডিপুটি ইন্স্পেক্টারকে বলিলেন। তিনিও ঐ মিরির তর্কপূর্ণ জবাবে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; মিরির জবাবটি ক্রমে আসামের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর সাহেবের কর্ণগোচর হইল। তিনি শুনিয়া বলিলেন, মিরি ক্ষুদ্র একটি দার্শনিক বটে। যাহোক মিরির এ অবস্থাতে শিক্ষাদ্বারা যে কিছুই লাভ হইবে না সে বিষয় মিরি বিলক্ষণ বুঝিয়াছিল, এবং তাহার সিদ্ধান্ত সবইন্স্পেক্টর বাবুকে বুঝাইয়া দিয়াছিল।

আমাদের দেশে এখনও এমন অনেক লোক আছে যাহারা নারীজাতির বিদ্যালয়ের জ্ঞানলাভ-চেষ্টা নিরর্থক মনে করে। কারণ জ্ঞান-লাভ হইলেও নারী স্বামী পুত্র লাভ করিয়া পাক শাক ঘর কন্নাই করিবে, যাহা অশিক্ষিত অসংখ্য রমণীও সংসাধন করিতেছে। যদি গৃহকার্য্যের জন্যই রমণীর জীবন তবে বিদ্যালয়ে শিক্ষার প্রয়োজন কি? কিন্তু শিক্ষা শিক্ষারই জন্য প্রয়োজন। জ্ঞান মনুষ্য-জীবনের নিত্য গ্রহণীয় মানসিক আহার্য্য পদার্থ। ইহাদ্বারা শারীরিক অভাব বিমোচন না হইলেও মনের জন্য এবং আত্মার জন্য ইহা প্রত্যেক নারী বা নরের নিত্য আহরণীয়। জ্ঞানের অভাবে অস্মদ্দেশীয় নারীজাতি দ্বারা ভারতবর্ষের গৃহস্থদিগের গৃহকর্ম্ম নির্ব্বাহ হইত না, সে জন্য কি নারীসমাজে জ্ঞানবিস্তারের এত প্রচেষ্টা হইতেছে? কখনই নহে। জ্ঞানের অভাবে ভারতের মহিলাবর্গ মনুষ্যোচিত অবস্থা হইতে অধঃপতিত হইয়াছিলেন, তাহাদের স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিত্ব দুই মহামূল্য অধিকার বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল; ইহা কি সামান্য ক্ষোভ এবং ক্ষতিজনক।

ঈশ্বরের অসীম জ্ঞানরাজ্য মনুষ্যেরই জন্য। আহার পান ও সন্তানপালন মাত্র নারী বা নরের সমগ্র কর্ত্তব্য নহে। জ্ঞান রাজ্যের দ্বারোন্মোচন পূর্ব্বক সেই রাজ্যে অনন্ত কাল ভ্রমণ করিতে হইবে; এই দ্বারোন্মোচনের জন্য মনুষ্য পৃথিবীতে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে। নারীগণ যদি গৃহকর্ম্ম মাত্র জীবনের উদ্দেশ্য মনে করেন, তবে ঐ অসভ্য মিরির বুদ্ধি ও সিদ্ধান্তকে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি ও চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিলেন। বাস্তবিক এসিদ্ধান্ত ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত মাত্র। জ্ঞান ভিন্ন নারীগণ জীবনের উদ্দেশ্য লাভে অসমর্থ থাকেন। অতএব জ্ঞানের জন্যই জ্ঞানশিক্ষা এবং আলোচনা কার্য্য যাহাতে রমণীসমাজেও পরিগৃহীত হয় তাহাই কর্ত্তব্য।

স্ত্রীশিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।

এক জীবনে বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার চারিযুগ

দেখিলাম। এখন আমার বয়স ৬৩ বৎসর। প্রথম বয়সে, যতদূর মনে পড়ে, বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার অমানিশা বা অন্ধকার-যুগ দেখিয়াছিলাম। তখন মেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষা একটা ভয়ানক নিন্দার কথা ছিল। এমন কি মেয়েরা লেখাপড়া শিখিলে বিধবা হয় এ প্রকার সংস্কারও অনেকের ছিল। যে দেশে একদিন গার্গী মৈত্রেয়ী প্রমুখা নারীগণ উপনিষদাদির আলোচনা করিয়া ভারতে ব্রহ্মজ্যোতি বিকীর্ণ করিয়াছিলেন, খনা ও লীলাবতী জ্যোতিষ ও গণিতের আলোক ছড়াইয়াছিলেন, সেই দেশে এমন সংস্কার কেমন করিয়া দৃঢ়মূল হইয়াছিল তাহা ভাবিলেও আশ্চর্য্য হইতে হয়।

ক্রমে দেখিলাম ভদ্রপরিবারের ২।১টি মেয়ে অতি গোপনে স্বামী বা পরিবারস্থ কোন আত্মীয় বালকের নিকট কিছু কিছু অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁদের সেই শুভ উদ্যম কোন প্রকারে প্রকাশ হইলে লাঞ্ছনা গঞ্জনার শেষ থাকিত না। এইটি স্ত্রীশিক্ষার অরুণ যুগ। সূর্য্যোদয়ের আগে সূর্য্যের সারথি অরুণদেব নিশার নিবিড় অন্ধকারের ভিতরে লুকাইয়া যেন সঙ্কুচিত ও সশঙ্কিত ভাবে উঁকি মারিতে লাগিল।

ক্রমে পূর্ব্বগগনপ্রান্ত আরক্তিম হইয়া উঠিল। বেথুন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি বিদেশী স্বদেশী মহাত্মাগণ স্ত্রীশিক্ষার অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। মহানগরী হইতে ক্রমে স্ত্রীশিক্ষার জয়পতাকা লইয়া যজ্ঞাশ্ব চারিদিকে ছুটিল। অনেক যুদ্ধ বাধিল, অনেক বাধা পড়িল, কিন্তু সত্যের জয় হইতে লাগিল। বিদ্যোৎসাহী গবর্ণমেণ্ট, খ্রীষ্টান ধর্ম্মযাজকগণ ও দেশীয় শিক্ষিত যুবকগণ ক্রমে এই মহাযজ্ঞের সৈন্য হইলেন। সূর্য্য যখন দেখা দিলেন, কার সাধ্য অন্ধকারকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে? উষা-যুগ আরম্ভ হইল। নিতান্ত রক্ষণশীল সমাজের ভিতরেও স্ত্রীশিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল, দূরতম দরিদ্র পল্লীতেও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে চলিল। ক্রমে এমন সময় আসিল, যখন, পূর্ব্বে যে পরিবারে স্ত্রীশিক্ষায় বৈধব্যের আশঙ্কা ছিল, সেখানেও বিবাহের সময় কন্যার শিক্ষা বিষয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। এই সময় স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে, লেখক মাত্রেই লেখনী চালাইতে আরম্ভ করিলেন। আমি কখন লেখক ছিলাম না, কিন্তু মনে আছে ছেলেবেলা যখন স্কুলের নিম্নশ্রেণীতে পড়ি, সহপাঠীদের সঙ্গে প্রায় স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা বিষয়ে রচনা লেখা হইত। তাৎকালীন সাহিত্য-জগতে, যিনি লিখিবার কোন বিষয় খুঁজিয়া পাইতেন না, তিনিও এই বিষয়ে কিছু না কিছু লিখিতেন। দেশীয়দের মধ্যে এ বিষয়ে দেশীয় খ্রীষ্টান ও ব্রাহ্মসমাজ বিশেষভাবে অগ্রগামী হইয়াছিলেন।

ক্রমে এমন সময় আসিল যখন স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বা উপকারিতা বিষয়ে আর লেখা বা বক্তৃতার প্রয়োজন থাকিল না। সেটা একরকম সর্ব্ববাদি-সম্মতরূপে গৃহীত হইয়া গেল। অনেক মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পাইতে

লাগিলেন। এইটি মধ্যাহ্নযুগের আরম্ভ। পাঠশালা হইতে মধ্যম শ্রেণীর বিদ্যালয়, উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় ও কলেজ পর্য্যন্ত স্থাপিত হইল। শিক্ষয়িত্রী, ধাত্রী ও লেডী ডাক্তার পর্য্যন্ত হইতে লাগিলেন।

এই সময় স্ত্রীশিক্ষার সমর্থক সভা, বক্তৃতা ও প্রবন্ধের প্রবাহ মন্দগতি হইয়া আসিল বটে, কিন্তু আর একটা আন্দোলনের পথ খুলিয়া গেল। শিক্ষা প্রয়োজন, কিন্তু শিক্ষাপ্রণালী লইয়া আন্দোলন আরম্ভ হইল। পুরুষোপযোগিনী শিক্ষা নারীদিগের পক্ষেও উপযোগিনী কিনা এই লইয়া মতভেদ উপস্থিত হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্ত্তিত প্রণালী নারীদিগের উপযোগী কি না এই প্রশ্ন উঠিল। জ্ঞানকরী শিক্ষার নামে যিনি যত কেন বলুন না, আমাদের দরিদ্র দেশে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য অর্থ। মধ্যবিত্ত গৃহস্থগৃহে পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুত্র বিদ্যাশিক্ষা করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবে এই আশাও ভূমিষ্ঠ হয়। কন্যাদিগের সম্বন্ধে অবশ্য সে অবস্থা এখনও উপস্থিত হয় নাই, কালে কি হইবে জানি না। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন পুত্রকন্যার একজাতীয় শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। নারীজীবনের উৎকর্ষসাধন ও নারীজীবনের কর্ত্তব্যপালনোপযোগী শিক্ষাই মহিলাদিগকে দিতে হইবে। যে শিক্ষা-প্রভাবে নারী নারীই থাকিবে ও এক আধারে কন্যার কর্ত্তব্য, ভগ্নীর কর্ত্তব্য, স্ত্রীর কর্ত্তব্য ও সর্ব্বোপরি মাতৃকর্ত্তব্য শিক্ষা করিয়া গৃহে গৃহে প্রেমরূপিণী সেবাদেবীর দিব্যমূর্ত্তি স্থাপিত করিবে ইহাই সংক্ষেপতঃ কেশবচন্দ্রের স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ ছিল। কিন্তু সে আদর্শ আজও কার্য্যে পরিণত হইতে পারিল না।

বর্ত্তমান মধ্যাহ্নযুগে বৎসর বৎসর স্থানীয় গেজেটে বালিকা ও মহিলাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া চারিদিকে খুবই জয়ধ্বনি উঠিতেছে। শিক্ষাবিভাগের রাজপুরুষগণ সুদীর্ঘ রিপোর্টে স্বস্ব কৃতকার্য্যতার ও লিপিকুশলতার পরিচয় দিতেছেন এবং বাহ্যদর্শীর চক্ষে অসভ্য বঙ্গদেশ শীঘ্রই পাশ্চাত্য সভ্যতার উচ্চতম শিখর স্পর্শ করিবে এই মহাচিত্র প্রতিবিম্বিত হইতেছে। কিন্তু মধ্যাহ্নের পরেই অস্তের আয়োজন আরম্ভ হয়, বর্ত্তমান বিষয়েও সেরূপ কোন আশঙ্কা আছে কি না সেটা আমাদের একবার ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

নারীজাতির উচ্চ শিক্ষার আমি সম্পূর্ণ পক্ষপাতী, কিন্তু যে প্রণালীতে এখন উচ্চ শিক্ষা চলিতেছে তাহাতে জাতীয় সভ্যতা পাশ্চাত্য সভ্যতার উচ্চতম শিখর স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই বা অত্যুত্থানশীলা বেতসলতিকার মত ঢলিয়া পড়িয়া যায় এই আশঙ্কা। বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষাপ্রণালী সম্পূর্ণ বৈদেশিক। বিদেশীয় কোন বিষয় গ্রহণ করিতে হইলে তাহা দেশীয় অবস্থার সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া না লইতে পারিলে ঘোর অনিষ্টের আশঙ্কা। বিদেশীয় জীবজন্তু বা উদ্ভিদ্ এদেশে আনীত হইলে তাহা যদি সম্পূর্ণরূপে এদেশের জল বায়ু আলোক ইত্যাদির উপযোগী হইতে পারে, তবেই বাঁচিবে নচেৎ নিশ্চয় মরিবে। এই উপযোগিতা সংঘটনের জন্য নানাপ্রকার কৃত্রিম

উপায় অবলম্বন করা হয়, ইহা প্রায় সকলেই বিদিত আছেন। নারীপ্রকৃতি প্রেমপ্রধান। পারিবারিক বন্ধনের জন্য স্ত্রী-প্রকৃতি বিধাতার একটি বিশেষ সৃষ্টি। কন্যা, ভগ্নী, স্ত্রী ও মাতা নারীজীবনে এই চারিটি অবস্থা। যে দেশে একান্নবর্ত্তী পরিবারপ্রথা প্রচলিত, সে দেশের পক্ষে এই চারিটি অবস্থা আরও বিশেষরূপে প্রয়োজনীয়। এদেশে একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা থাকা উচিত কি না সেটি স্বতন্ত্র প্রশ্ন, তাহার মীমাংসার জন্য এ প্রবন্ধ নয়। তবে একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, নারীজাতির বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী একান্নবর্ত্তী পরিবারপ্রথার উপযোগী নয়। যে দেশে পুত্র ও কন্যা বিবাহিত হইলেই পক্ষিশাবকের মত অন্য গাছে গিয়া বাসা বাঁধে, সে দেশে কেবল স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিলেই নারীজীবনের সার্থকতা সম্পন্ন হয়। এদেশের নারীধর্ম্ম বড়ই মিশ্রভাবাপন্ন (complex)। পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল উভয় কুলের কুক্কুর বিড়ালটির প্রতি পর্য্যন্ত যথাযথরূপে কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে। এই কর্ত্তব্য কেবল নীতিমূলক হইলে চলিবে না, প্রেমমূলক হওয়া চাই। নীতিমূলক কর্ত্তব্য পালন নীরস ও কর্কশ, প্রেমমূলক কর্ত্তব্য পালনে রস আছে, মিষ্টতা আছে, সুতরাং কর্ত্তব্যের মূলে স্নেহ ভক্তি ভালবাসা না থাকিলে সংসারে সুখ থাকে না, আরাম থাকে না।

অধিকাংশ স্থলে উচ্চ শিক্ষা দিতে হইলে বালিকাকে পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ছাত্রীনিবাসে রাখিতে হয়। ছাত্রীনিবাসের স্নেহশূন্য কর্কশ বিধির ভিতরে থাকিয়া স্বতই বালিকা হৃদয়শূন্য একটি কলের পুত্তলিকা হইয়া পড়ে। নারী-জাতি স্বভাবত প্রেমপ্রবণ হইলেও উপযুক্ত কর্ষণ অভাবে নারীজাতিসুলভ কোমলতা পুষ্ট হইতে পারে না। কোন প্রবৃত্তিই উপযুক্ত কর্ষণ ভিন্ন পুষ্ট হইতে পারে না। এ অবস্থায় সরলতা কোমলতা ও স্নেহ ভক্তি প্রেম প্রভৃতি নারীজাতির নিজস্ব স্ত্রীধনগুলির পরিবর্ত্তে, বিদেশীয় সাহিত্য ইতিহাস ও উপাখ্যানের সাহায্যে কতকগুলি বিদেশীয় পারিবারিক ভাব লইয়া কোন শিক্ষিতা মহিলা যদি একটি একান্নবর্ত্তী পরিবারের কর্ত্রীরূপে প্রতিষ্ঠিতা হন, তবে সেই পরিবারে কি ভয়ানক বিপ্লব উপস্থিত হইবে। এই প্রকারে নারীত্ব-বিনাশকেও নারীহত্যা বলা যায়। হিন্দু-শাস্ত্রে নারীহত্যা মহাপাপ।

আর একটি কথা আরও গুরুতর। ছাত্রীনিবাসটি সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য প্রথা। সে দেশ সাধারণতঃ খৃষ্টবাদীর দেশ, সে দেশের রাজা প্রজা সাধারণতঃ সকলেই খ্রীষ্টবাদী, সুতরাং সে দেশে ধর্ম্মসম্বন্ধে রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা প্রয়োজন না হওয়াতে সমুদয় ছাত্র বা ছাত্রীনিবাসে ধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এদেশে সচরাচর সে ব্যবস্থার সুবিধা নাই। এই বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত দেশে বাধ্য হইয়া ধর্ম্মসম্বন্ধে নিরপেক্ষ শিক্ষা-নীতি অনুসরণ করিতে হয়। সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়েতেই ধর্ম্মবিশ্বাস সচরাচর স্ত্রীজাতির মধ্যে প্রবল। নারীজাতিই পরিবারে ধর্ম্ম-রক্ষায় প্রধান সহায়। যে গৃহে প্রাচীনা

গৃহিণী বর্ত্তমান আছেন, সেই গৃহই এ কথার প্রমাণ। অধুনাতন নিরীশ্বর বিদ্যালয় সংযুক্ত নিরীশ্বর ছাত্রীনিবাসে নিরীশ্বর শিক্ষা ও সংসর্গের প্রভাবে ভাবী গৃহিণীগণ ধর্ম্ম বিশ্বাস হারাইবেন ইহা অবশ্যম্ভাবী। এই প্রকারে ধর্ম্ম ও প্রেম হারাইয়া আসিয়া তাঁহারা যে সংসার পাতিয়া বসিলেন, সে সংসারের ভাবী অবস্থা ভাবিতেও ভয় হয়। আবার সেই প্রকারের সংসারের সমষ্টিতে সে জাতি, তাহার দুর্দ্দশা একবার ভাবুন।

এস্থলে নব্য সভ্যতাভিমানী কেহ কেহ বলিতে পারেন যে স্নেহ-মমতা-প্রেম-প্রণোদিত সেবাপরায়ণতা ও ধর্ম্ম ভাব, এ সমস্তই হৃদয়ের একটা ভাবমাত্র। বাহুল্যের ভয়ে তাঁহাদিগকে একটি মাত্র প্রশ্ন করি। এই জড়বাদ-প্রধান নব্য সভ্যতায়তো দয়া ধর্ম্ম প্রভৃতি ভাব বলিয়া উপেক্ষিত হয়, কিন্তু বিধাতার এই বিশাল জীব-জগৎ-সৃষ্টিতত্ত্বের মূলে কি এই হৃদয়ের কোমল ভাবগুলির কোন প্রয়োজনীয়তাই নাই? পিতৃমাতৃস্নেহ ভিন্ন কোন্ জীব জগতে তিষ্ঠিতে পারিত? ইতর প্রাণীর ভিতরে যে স্বর্গের রত্ন আসিয়া, সাধকের জন্য যে আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত দিবানিশি দেখাইতেছে, সেই অমূল্য রত্নই কি পাত্রভেদে নানা নামে নানা ভাবে মানব-পরিবারের প্রসারণ, পালন ও রক্ষণ সাধন করিতেছে না? কোন্ মাতা বিচার করিয়া সন্তানকে স্তন্য দান করেন? কোন্ ভ্রাতা বিচারে মীমাংসা করিয়া নিরাশ্রয়া ভগ্নীকে আশ্রয় দান করেন? কোন্ স্ত্রীর পতিসেবা বিচার সাপেক্ষ? এক কথায় বলিতে হইলে, কোন্ পরিবার বা সমাজ বিচারের বা জ্ঞানের বা কেবলমাত্র স্বার্থের ভূমিতে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে?

তথাপি পাশ্চাত্য সভ্যতার জড়োন্মত্ততার ভয়ে সেবা, কর্ত্তব্য, প্রেম, ধর্ম্ম, এসব কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। কিন্তু স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের দোহাইতো তাঁদের মানিতেই হইবে। সেখানেতো আর ভাব বলিয়া উপেক্ষা করা খাটিবে না। আচ্ছা, তবে দেখা যাউক বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষা প্রথা সম্বন্ধে বিজ্ঞান কি বলে?!

এবার অধ্যাত্মবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান ভুলিয়া গিয়া জড়বিজ্ঞান বিশেষতঃ শারীর বিজ্ঞানের আলোকে এদেশের স্ত্রীশিক্ষা নীতি আলোচনা করা যাউক। আমাদের মতে আধ্যাত্মিক, মানসিক, নৈতিক ও শারীরিক উন্নতির সমন্বয় সাধন শিক্ষার ও মানব-জীবনের উচ্চতম লক্ষ্য। ইহার মধ্যে প্রথম তিনটি ছাড়িয়া দিলে বাকী থাকে শারীরিক উন্নতি। বর্ত্তমান জড়বাদের মতে শরীরের স্বাস্থ্য ও শক্তি পার্থিব সকল প্রকার উন্নতির মূল। শরীর ভাল না থাকিলে অন্য প্রকারের উন্নতি সত্বেও সমাজের কোন উপকার সাধন করা দূরে থাকুক, বরং সমাজের গলগ্রহ হইতে হয়। দুর্ব্বল রুগ্ন ব্যক্তি গৃহের জঞ্জাল, সমাজের জঞ্জাল। শুধু জঞ্জাল নহে, সমাজের অনিষ্টকারী। এই প্রকার পিতা মাতার সন্তানগণ বংশাবলীক্রমে পরিবারের ও সমাজের দারিদ্র্য ও অশান্তি বৃদ্ধি করে। এইজন্য অনেক দেশে চিররুগ্নের বিবাহ

নিষেধ। এমন কি অনেক প্রাচীন সভ্য-দেশেও বলিষ্ঠ পুরুষ ও সুন্দরী কন্যা ভিন্ন বিবাহ হইতে পারিত না।

আমাদের দেশে প্রাচীনকালে নারী-জাতির মধ্যে, মধ্যে মধ্যে বিদুষী নারীর উল্লেখ থাকিলেও, স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, যুদ্ধ প্রভৃতি Technical Educationএর কি প্রকার প্রণালীবদ্ধ ব্যবস্থা ছিল তাহা আমরা অবগত নহি, এবং তাহা আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্যও নহে। সাধারণ শিক্ষা সম্বন্ধে যতদূর জানি তাতে মনে হয় তাৎকালিক শিক্ষায় শারীরিক উন্নতির কোন ব্যাঘাত ঘটিত না। এ প্রকার শিক্ষা এখন সচরাচর প্রায় ঋষিদিগের আশ্রমে ব্রহ্মচর্য্যের অবস্থায় সম্পন্ন হইত। পুরাণাদিতে যতটুকু দেখা যায় তাতে বুঝা যায় ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় বালকদিগকে গুরুগৃহে থাকিয়া শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভৃত্যের ন্যায় গুরুর সমুদয় গৃহকার্য্যে সাহায্য করিতে হইত। তাতে জ্ঞানাদি শিক্ষার সঙ্গে যেমন আধ্যাত্মিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতি হইত, তেমনি শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা শারীরিক উন্নতিও সাধিত হইত। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী সেরূপ নহে, হইতেও পারে না। কিন্তু বালকদিগের তবুও শারীরিক উন্নতির পথ কথঞ্চিৎ পরিষ্কার আছে। তাহারা স্বাধীন-ভাবে মুক্তবায়ুতে বেড়াইতে পায়, নানা প্রকার ক্রীড়াদিতে মন ও দেহের উন্নতির অবসর পায়। বালিকাদিগের সে সুযোগ কোথায়? পল্লীগ্রামের পথে বা নদীতীরে বেড়াইতে বেড়াইতে যে সকল গৃহকার্য্য-তৎপরা কৃষক বালিকা ও যুবতী দৃষ্টিগোচর হয়, তাদের সুস্থ সবল দেহ ও সরল স্বাভাবিক হাসিমাখা মুখ কি বিদুষীদিগের মধ্যে সহসা দৃষ্টিগোচর হয়?

নগরে ও মধ্যবিত্ত ভদ্রগৃহে বালিকা ও যুবতীগণ স্বহস্তে রন্ধনাদি যাবতীয় গৃহ-কার্য্যে ও সেবায় যথেষ্ট পরিশ্রমের সুযোগ প্রাপ্ত হন। যে পাশ্চাত্য প্রণালীতে এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হইয়াছে সে সকল সভ্যস্থানে স্ত্রীজাতির অবরোধ প্রথা নাই। সেদেশের মহিলাগণ অবাধে মুক্ত-বায়ুতে ভ্রমণ, ব্যায়াম, অশ্বারোহণ, সন্তরণ প্রভৃতি নানা প্রকারের শারীরিক পরিশ্রমের সঙ্গে মনের প্রফুল্লতা সাধনের সুযোগ পান। যে প্রথা যতই মঙ্গলজনক হউক না কেন, তাহা দেশের অন্যান্য প্রথার উপযোগী করিয়া গ্রহণ না করিলে তাহা সম্পূর্ণ মঙ্গলপ্রদ হইতে পারে না। এক-দেশদর্শিতা কখন সুফলপ্রদ হয় না। এদেশের অবরোধ প্রথার সঙ্গে সামঞ্জস্য করিয়া না লওয়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রণালীগত স্ত্রীশিক্ষা আমাদের বংশাবলী-ক্রমে অমঙ্গল সংঘটন করিতেছে। বিদ্যা-লয়ের ও নিজ নিজ সুখ্যাতি লোলুপ শিক্ষকদিগের শাসনাধীনে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লোলুপা মহিলাগণ, নারী-জাতির অবশ্য জ্ঞাতব্য ও কর্ত্তব্য সকল শিক্ষা অগ্রাহ্য করিয়া, মনের ও হৃদয়ের বৃত্তিগুলিকে পদদলিত করিয়া ও শারীরিক উন্নতি সাধনের সুযোগে বঞ্চিত হইয়া আশৈশব অসূর্য্যম্পশ্য গৃহকোণে রুদ্ধ-

বায়ুতে বসিয়া কেবলই আত্মনাশের ও বংশনাশের যে আয়োজন করিতেছেন সে বিষয় আমাদের সকলেরই একবার ভাবিয়া দেখা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। শিক্ষিতা মহিলাদের যদি একটা স্বাস্থ্যানুযায়ী গণনা করা যায়, অশিক্ষিতা ভগ্নীদের তুলনায় তাঁদের অবস্থা ইতিমধ্যেই কি ভয়ানক হইয়াছে বুঝিতে পারা যাইবে। এই সকল মহিলা প্রায় সমাজের উচ্চশ্রেণীর। ইঁহাদেরই বংশাবলী সমাজের ও দেশের মুখোজ্জ্বল করিবেন। বংশাবলীক্রমে যাঁহারা বলবীর্য্যে স্বাস্থ্যাদিতে পরম্পরাক্রমে হীন হইতে হীনতর অবস্থার দিকে সবেগে ধাবিতা সেই জীর্ণাশীর্ণা চিররুগ্না জননীর ক্রোড়ে হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ দীর্ঘায়ু বালক বালিকা আশা করিতে হইলে সমস্ত শারীর বিজ্ঞানকে ভস্মীভূত করিতে হয়। জীবনের হ্রস্বতা, দেহের খর্ব্বতা, ক্ষীণতা ও দুর্ব্বলতা এবং স্বাস্থ্যের হীনতা যে দ্রুতবেগে আমাদিগকে পৃথিবীর ইতিহাস হইতে মুছিয়া ফেলিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমরা স্ত্রীশিক্ষার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী, কিন্তু বর্ত্তমানে যে প্রকারে ঐ শিক্ষা চলিতেছে সেই প্রণালীটী সম্বন্ধে সকলেরই চিন্তা করা প্রয়োজন। এক সময় যেমন স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা লইয়া মহা আন্দোলন চলিয়াছিল, এখন আবার স্ত্রীশিক্ষার প্রণালী লইয়া সেই প্রকার বা ততোধিক আন্দোলনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। যাঁহারা দেশের জন্য সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত, সেই সকল মহাত্মারা ও শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ শীঘ্র একটা মধ্যবর্ত্তী পথ আবিষ্কার না করিলে শীঘ্রই দেশের সর্ব্বনাশ হইবে।

পেটের দায়ে বালকদিগকে নিরীশ্বর শিক্ষা দিয়া যদিচ ভারতের মহাগৌরবের ও চির আদরের ধন ধর্ম্মরত্নকে তাড়াইয়া দেওয়া হইতেছে, তাহাতেও দেশের তত ক্ষতি হইত না, যদি প্রতি গৃহে ধর্ম্মপ্রাণা বিশ্বাস ভক্তি ভূষিতা গৃহলক্ষ্মী দৃঢ়ভাবে কর্ণ ধরিয়া বসিয়া থাকিতেন। কিন্তু চিরকাল সকল দেশে যাঁহারা প্রেম-ভক্তি-বিশ্বাসে পুরুষদিগকে পরাস্ত করিয়া ধর্ম্মের হাল ধরিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা যদি আজ নিরীশ্বর শিক্ষার দোষে নাস্তিক হইয়া বসেন, তবে আর দেশের আশা ভরসা কোথায়? ফলতঃ দেশে ধর্ম্মনীতি, একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা ও অবরোধ প্রথা রক্ষা করিতে হইলে স্ত্রীশিক্ষাপ্রণালী তদুপযোগী করিয়া লইতেই হইবে, নচেৎ অবরোধ প্রথা, একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা, ধর্ম্ম ও নীতিকে দেশ হইতে বিদায় দিতেই হইবে। ফলতঃ আমাদিগকে দুদিক রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। স্ত্রীশিক্ষাও ছাড়িতে পারি না, অন্য দিকে ধর্ম্মনীতিও ছাড়িতে পারি না, সহসা একান্নবর্ত্তী পরিবার বা অবরোধ প্রথাও এককালীন ছাড়িতে পারি না। এ অবস্থায় উভয় দিকের একটা সামঞ্জস্য সাধন ভিন্ন আমাদের নিস্তার নাই।

অতএব দেশের বিদ্বন্মণ্ডলী সমাজনেতৃ ও সংস্কারকগণ, স্বদেশ-প্রেমিকগণ ও শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ দয়া করিয়া

এদিকে একবার দৃষ্টিপাত করুন, জাগিয়া উঠুন এবং এই বিষম সমস্যার সময় একটা মধ্যপথ আবিষ্কার করিয়া দেশে পারিবারিক শান্তি স্থাপন করুন, ঘরে ঘরে ধর্ম্ম-বিশ্বাস প্রেম-ভক্তি পরায়ণা স্ত্রী ও জননী দিয়া বর্ত্তমান ও ভাবী বংশের চরিত্র গঠনের পথ প্রশস্ত করুন ও দেহে স্বাস্থ্য ও শক্তি দিয়া, বর্ত্তমানে সুখ স্বচ্ছন্দতা ও ভবিষ্যতে সুস্থ বলিষ্ঠ বংশ রচনার উপায় বিধান করুন।

শ্রীবিপিনমোহন সেহানবিশ।

জন হ্যালিফ্যাক্স।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

চতুর্থ অধ্যায়।

সেবারে খুব শীঘ্রই শীত পড়িল। সমস্ত শীতকাল আমি ঘরে বন্ধ রহিলাম। ডাক্তার ও জেল ছাড়া কাহার মুখ দেখিতে পাইতাম না। একদিন সাহস করিয়া জনের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য ডাক্তারের কাছে অনুমতি চাহিলাম।

"সে ছোকরার সঙ্গে দেখা করে কি হবে। সে তোমার সাথী হবার উপযুক্ত নয়। ওকে অত মাথায় চড়িয়ো না, তাহালেই ও নষ্ট হয়ে যাবে।"

পাছে আবার প্রতিবাদ করিলে জনের ক্ষতি হয়, সেজন্য আমি আর কিছু বলিতাম না; কেবল মাঝে মাঝে তাহাকে ছাপা অক্ষর বড় বড় করিয়া লিখিয়া কিম্বা দুএক খানা বই পাঠাইয়া দিতাম।

দেখিতে দেখিতে বসন্তকাল আসিয়া পড়িল। আমি জনের স্বভাব জানিতাম; সে আমায় খুব ভালবাসিলেও বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে যে আমার কাছে কোন মতেই আসিবে না, ইহা একেবারে নিশ্চিত।

একদিন বরফ পড়িয়া পরিষ্কার হইয়া যাবার পর জেলের বাধা এবং বাবার উৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়া ধীরে ধীরে বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। জেলকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে সেলির বাড়ীর খবর কিছু জানে কিনা। সে বিরক্ত হইয়া বলিল, "তার খুব কষ্টের দিনই যাইতেছে। একেতো নিজের অনেক গুলি ছেলে মেয়ে, তারপর যে ছোঁড়াটা তার কাছে আছে সে যা দেয় তার দ্বিগুণ খায়।"

জেল যে জনের বিরুদ্ধে বলিয়া একটু গায়ের জ্বালা মিটাইল তা বেশ বুঝিতে পারিলাম, কিছু আর বলিলাম না। জনের আয় বৃদ্ধির সঙ্গে যে সে সেলিকে বেশী দিতে আরম্ভ করিয়াছে তা আমি বেশ ভাল করিয়া জানিতাম।

হঠাৎ একটী লোককে আসিতে দেখিয়া জেল কাটা তরকারী কোঁচড়ে লইয়া উঠিয়া দাড়াইল, "ওমা কি হবে গো, ভদ্রলোকটার সামনে গে যে এই বেশে ধরা পড়লাম" বলিতে বলিতে শাক সবজী গুলি ছাড়াইতে ছাড়াইতে ছুটিল।

আমি তো আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। জেল যখন দেখিল সে ভুল করিয়া জনকে ভদ্রলোক বলিয়া ফেলিয়াছে, তখন সে তেলে বেগুনে জলিয়া উঠিল। "তোমার আবার এখানে কি দরকার? যা বলবার তা শীঘ্র শীঘ্র সেরে চলে যাও। কিনিয়সের সঙ্গে বেশী মেশা ওর বাবা পচ্ছন্দ করেন না।"

"কিনিয়সের বাবাই তার ছেলের সঙ্গে বেড়াতে যাবার জন্য আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।" জেল কোন উত্তর দিল না, কিন্তু রাগেতে বাকী সবজিগুলি ছড়াইতে ছড়াইতে চলিল। জন সেগুলি উঠাইয়া দিতে গেল, কিন্তু ধন্যবাদের বদলে জেল বিরক্ত হইয়া তাহার হাত ঠেলিয়া দিল।

তার পর দুজনে গল্প আরম্ভ করিলাম। জন আর এখন চামড়া জড় করিয়া বেড়ায় না, সে নিজে হইতে অল্প অল্প লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছে শুনিয়া তাহাকে টাকা তুলিবার ভার দিয়াছেন। সমস্ত শীত কালটা সে রাস্তায় চলিতে চলিতে যেটুকু সময় পাইত সেটুকু এবং রবিবারটুকু পড়িয়া কাটাইত ; সে রবিবারে পড়া অন্যায় মনে করিত না। এই অল্প সময়ে সে আমার দেওয়া চারিখানি বই শেষ করিয়াছে। জনের উন্নতি দেখিয়া খুব আহ্লাদ হইল এবং আমি খুব অল্প জানিলেও যাহা জানি সেটুকু দিতে পারিলে খুব আনন্দিত হইব বলিলাম।

"বলি ভাই ডেবিড আমরা যে পাহাড়ের কাছে এসে পৌঁছেছি, আমি তো আর ওপরে উঠতে পারবো না।"

"পারবে না আবার কি, আমি নীচে থেকে তোমায় ঠেলে দেব।" সত্যি সত্যি খানিক পরেই আমার মত দুর্ব্বল লোক পাহাড়ের উপর গিয়া দাঁড়াইল। সেখান হইতে সাবারণ নদী বড় সুন্দর দেখাইতেছিল, দৃশ্যতে কিছু অসাধারণত্ব ছিল না, কিন্তু বাস্তবিকই সুন্দর দৃশ্য, ধীর শান্ত ভাবে শক্তি ও গম্ভীরতার চিহ্ন দেখাইয়া নীরবে একটী সুন্দর জীবনের মত—যাহা যেথানে পড়ে সকলকে সুখী করে শুষ্ক জমিকে সরস করিয়া বহিয়া যাইতেছিল।

হঠাৎ নদীতে একটী অদ্ভুত দৃশ্য দেখিলাম। মাঝ স্রোত হইতে দেওয়ালের মত ৩।৪ ফুট জল উঠিয়া ভয়ানক তোড়ে আসিতে লাগিল। সে ঢেউটী এত বড় যে কোন নৌকার সামনে পড়িলে নৌকা একেবারে ডুবিয়া যায়। এই কথা মনে হইতে না হইতেই দেখিলাম সেই স্রোতের মুখে একটী নৌকা, তাহাতে দুটী মাত্র লোক, তাহারা প্রাণপণে স্রোতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে। "ও জন! ওরা আর বাঁচবে না, নিশ্চয়ই জলে ডুবিয়া যাইবে।"

এই কথা মুখে বাহির হইতে না হইতে দেখি, জন জলে লাফাইয়া পড়িয়াছে। লোক দুটী কিনারায় আসিতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু পারিতেছে না। জন চেঁচাইয়া বলিল "পালের দড়ি ফেলে দেও, আমি তোমাদের টানিয়া আনিব।" জন হাঁটু জলে নামিয়া গেল এবং প্রাণপণ শক্তিতে টানিয়া লোক দুটীকে বাঁচাইল ; কিন্তু নৌকা রক্ষা করিতে পারিল না, কেননা সেই সময় ঢেউয়ের ধাক্কা নৌকাতে লাগায় দড়ি ছিঁড়িয়া গেল এবং নৌকার ছেঁড়া পাল একবার উঠিয়া কোথায় একেবারে অদৃশ্য হইল।

নৌকার আরোহী দুটী নৌকার জন্য একটু দুঃখ প্রকাশ করিয়া জনের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে আমাদের প্রাণ বাঁচাইল? তার পর একজন নাক সিটকাইয়া বলিল, ওহে ওকে চেন না, ও

যে চামড়ার কারখানায় কাজ করে. ওকে পরিশ্রমের জন্য কিছু দিলেই চলিবে। "এই নাও" বলিয়া একটী গিনি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল, তাহা মাটীতেই পড়িয়া রহিল। তাহাদের মধ্যে রুগ্ন বৃদ্ধটী বলিলেন. যাই হোক তুমি আমাদের অনেক উপকার করিয়াছ, তজ্জন্য এই যৎসামান্য দিতেছি, গ্রহণ করিলে সুখী হইব।

জন বিনীত ভাবে নমস্কার করিয়া বলিল, ক্ষমা করিবেন, আমি ইহার জন্য পুরস্কার চাহি না। ভদ্র লোকটী একটু আশ্চর্য্য হইলেন। পরে বলিলেন "বালক, ভবিষ্যতে যদি তোমার কোন সাহায্য দরকার হয়, হেনরী মার্জ্জকে খুঁজিও। নমস্কার।"

দুজনে চলিয়া যাবার পর আমি মাটিতে জনকে তাহার নাম ধূলার উপর লাঠির ডগা দিয়া লিখিতে শিখাইলাম। পরে দুজনে বাড়ী ফিরিবারজন্য উঠিলাম। নদীর পাশ দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম যে সে ঢেউ প্রকাণ্ড হইতে প্রকাণ্ড হইয়াছে। কিনারায় যে গাছ ছিল তাহা মাঝ জলে অর্দ্ধ ডুবু ভাবে দেখা যাইতেছে। বাবার কারখানার জন্য একটু ভাবনা হইল। জন কারখানায় ফিরিল, আমি বাড়ী ফিরিলাম।

আসিয়া দেখি বাবা চিন্তিত ভাবে ধূম পান করিতেছেন। বাবাকে পথে যাহা দেখিয়াছিলাম সব বলিলাম। হঠাৎ দরজায় শব্দ হইল। বাবা আমার দরজা বন্ধ করিয়া ফটক খুলিয়া দিলেন। খানিক পরে আমার ঘরে পায়ের শব্দ হইল।

জনের গলা পাইলাম। "ক্রিনিয়স কারখানায় জল ঢুকিতেছে, আমি তোমার বাবাকে লইতে আসিয়াছি, তুমি ভয় পাইও না, বাহিরে যাইও না, আমি তোমার বাবাকে রক্ষা করিব।"

এই বলিয়া উভয়ে বাহির হইয়া গেলেন এবং সমস্ত রাত ফিরিলেন না।

ভোর বেলা বাবাকে নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলাম। আমাকে উদ্বিগ্ন দেখিয়া বলিলেন, "কিছু ভেবো না, কাল তোমার বাবা বড় লোক ছিলেন, আজ একবারে গরীব।" বাবা কি রকম টাকা ভালবাসিতেন বুঝিলাম, তাঁর যে খুব লাগিয়াছে তাহাও বুঝিলাম।

"তাতে আর দুঃখ কি? যা কিছু রয়ে গিয়েছে সেজন্য আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।"

"এই ছেলেটী না থাকিলেই আমার সব যাইত। জন, বাহিরে কেন? ভিতরে এসে আগুনের পাশে বস।"

তার পর বাবা জেলকে খাবার আনিতে বলিলেন, সে একজনার খাবার আনিল। "দুজন লোক, একজনার আনিলে যে?"

"ও রান্না ঘরে গিয়ে খাক্ না"

"আমি যা বলছি তাই কর, আর এক জনার খাবার এই খানে নিয়ে এস।"

অগত্যা জেল সেখানেই জনের খাবার আনিয়া দিল। বাবা ও জনকে একত্র খাইতে দেখিয়া আমার খুব আহ্লাদ হইল।

হঠাৎ বাবা সন্দিগ্ধ ভাবে বলিয়া উঠিলেন "জন, তুমি অত রাত্রে জাগিয়া কি

করিতেছিলে ? সত্যি কথা বলিবে, তাহা হইলে আমি কিছু বলিব না"।

"আমি জাগিতে চাহিতেছিলাম, কিন্তু আমার আলো না থাকায় চৌকিদারের আলোর কাছে আমি বসিয়াছিলাম"।

'অত রাতে সেখানে কি করিতেছিলে।'

"আমি তো কোন অন্যায় করি নাই। আমি এত বড় হইয়াছি তবুও লিখিতে পারি না ইহা হইতে আর লজ্জার বিষয় কি আছে। দিনের বেলা সময় পাই না, রাতে লিখিলে কাজের ক্ষতি হবে না বলে জাগিয়া লিখিতেছিলাম।"

"আচ্ছা এবার তুমি কাজে যাও। দেখ তুমি আমার অনেক উপকার করিয়াছ, সেজন্য পুরস্কার গ্রহণ কর।"

"আপনার যে কাজে আসিয়াছি এবং তাহাতে আপনি সুখী, ইহাই আমার পুরস্কার ; আমি অন্য কিছু চাহি না।"

"কিনিয়স, তুমি কি তোমার বন্ধু জনের জন্য কিছু চিন্তা কর ?"

"বাবা জনকে রবিবারে আমার কাছে আসতে দেবেন। সে কি আর নিজের সঙ্গীদের ছাড়িয়া তোমার কাছে আসিতে চাহিবে ?"

"বাবা তুমি জনকে চেন না, সে কোন ছেলের সঙ্গে ঘোরে না, আমাকে ছাড়া কাউকে জানে না।"

সেই অবধি জন প্রতি রবিবার আমার কাছে আসিতে আরম্ভ করিল।

পঞ্চম অধ্যায়।

দেখিতে দেখিতে গ্রীষ্মের পর গ্রীষ্ম ও শীতের পর শীত চলিয়া গেল। আমি বহির্জগতের অবস্থা কিছুই অবগত ছিলাম না এবং অবগত হইবার আকাঙ্ক্ষাও আমার বিশেষ ছিল না। বাবা, আমি ও জন সকলেই নিজ নিজ ভাবে জীবনযাপন করিয়া যাইতেছিলাম। বাবা ঘড়ীর কাঁটার মত অটল ভাবে দিনের পর দিন কাজ করিয়া যাইতেছিলেন, জনের দিনগুলি কাজের ব্যস্ততার ভিতর এবং আমার দিনগুলি নীরবে বৃথা কাটিয়া যাইতেছিল।

এইরূপে দিন যাইতে যাইতে একদিন হঠাৎ সকালে জাগিয়া মনে পড়িল আমার বয়স কুড়ি বৎসর হইয়াছে এবং জনও যুবক হইয়া উঠিয়াছে। জন অনেকদিন হইতেই বেশ বড় হইয়াছিল, কিন্তু সে এত সাদাসিদে ছিল যে আমার কাছে সে সেই ছোট্ট ছেলের মতই ছিল। আজ হঠাৎ জন্মদিনে নিজের বয়স বৃদ্ধির সহিত তাহার বৃদ্ধিও বিশেষ করিয়া চোখে পড়িল।

বাগানের ভিতর গাছের ছাওয়াতে বসিয়া উভয়ে গল্প করিতেছিলাম।

"কি আশ্চর্য্য জন, সত্যি সত্যি আমার বয়স কুড়ি বৎসর হইল ?"

"ইহাতে আর নূতনত্ব কি আছে ?"

আমি নীরবে বসিয়া সামনের নদীর গতি নিরীক্ষণ করিতেছিলাম, আমার জীবনের গতি ঠিক যেন নদীর মত ধীরে ধীরে একঘেয়ে ভাবে চলিয়াছিল, তার আর যেন বিশ্রাম নাই। জন আমাকে জিজ্ঞাসা করিল "কি ভাবিতেছ ?"

"নিজের কথা, কুড়ি বৎসর বয়স হলো, কিন্তু কি অদ্ভুত জন্তুই তৈরী হয়েছি।"

জন লোকের দুঃখ খুব বুঝিতে পারিত এবং তাহা কি করিয়া হাল্‌কা করিয়া দিতে হয় তাহাও জানিত। কেউ কেউ আছেন যাঁহারা ভালবাসার জন্য সকল সহ্য করেন, ক্ষমা করেন এবং ঠাট্টার ছলে ভুল শুধরাইয়া দেন; জন সেই প্রকৃতির ছেলে ছিল।

"ওহে ভায়া, জন্মদিনের দিন আত্ম-পরীক্ষা করা ভাল। এস তোমার ভিতর ও বাহিরের রূপের ব্যাখ্যা করি।"

"যাও যাও আর ফাজলামি করতে হবে না।"

"আরে শোন তবে! আমাদের বীর-পুরুষটী ছোট্ট রোগা তালপাতার সেপাই। মুখটি লম্বা ফ্যাকাসে হলুদবর্ণ। চোক দুটী বড় বড় যেন গিলতে আসছে। চুলগুলি লম্বা লম্বা, ঘোর কাল, যে কোন মেয়ে দেখবে সেই ভুলে যাবে।"

জেন ও সেলি ছাড়া কোন মহিলার সংস্রবে আমি কখনও আসি নাই, তবুও সেক্সপিয়ার পড়া পর্য্যন্ত দু একবার স্ত্রী-জাতির মহত্ত্বের কথা কল্পনা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা কল্পনাতেই শেষ হইল। কেননা শীঘ্রই বুঝিতে পারিলাম আমার মত অপারগ শক্তিহীন লোক কখনও কোন স্ত্রীলোকের কাছে সম্মান বা ভালবাসা পাইতে পারে না, এবং আমার মত রোগীর বিবাহ করিয়া সেই রোগ বংশানুক্রমে চিরস্থায়ী করা অন্যায় হইবে। সেই অবধি বিবাহ করিব না ইহাই স্থির করিলাম। ভগবানের আশীর্ব্বাদে আজ পর্য্যন্ত নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিয়াছি। আমি বন্ধুর ভালবাসা পাইয়াছিলাম—সুখের যায়গায় কর্ত্তব্য পাইয়াছিলাম এবং ইহাই আমার মঙ্গল জানিয়া সন্তুষ্ট ছিলাম।

এই প্রশ্ন উঠিবার পর আমার মন স্থির করিতে আমাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল এবং সে বিষয় জনকে আমি জানিতে দি নাই। তাহার পর কয়েক বৎসর গত হইয়াছে, আমার মন স্থির হইয়াছে, সেইজন্য জনের ঠাট্টা আমার গায়ে লাগিল না; আমি হাসিতে হাসিতে 'বোকা ছেলে!' বলিয়া নিজের চুল সরাইয়া দিলাম এবং তাহার পর তাহার দিকে তাকাইতে তাকাইতে হঠাৎ মনে হইল যে সে আর বালক নয়। দুঃখের ভাবে বলিলাম "ভাই ডেবিড, তুমি একটী যুবক হয়ে দাঁড়িয়েছ।"

সে হাসিতে হাসিতে বলিল, "বয়সের অপেক্ষা যে আমাকে বড় দেখায়, তাহাতে আমি অত্যন্ত সুখী। কার্য্যক্ষেত্রে এই চেহারা অনেক সাহায্য করে. একটী ছোট্ট ছেলে দেখলে সহজে লোক বিশ্বাস করে না। কিন্তু তোমার বাবা আমাকে বিশ্বাস করেন।"

"তিনি এখন তুমি অত চেষ্টা করিয়া লেখাপড়া শিখিয়াছিলে বলিয়া তোমার উপর খুব খুসী এবং শীঘ্রই তোমার কাজের উন্নতি করিয়া দিবেন বলিতে-ছিলেন। জন, আমার হৃদ্‌গত ইচ্ছা যে তুমি বর্ত্তমান কার্য্য অপেক্ষা কোন ভাল কাজ কর। জন আমার একটা ইচ্ছা আছে"—

সে ইচ্ছা প্রকাশ করিবার আগেই

জেল ধক্‌ধক্‌ করিতে করিতে উপস্থিত হইল। "নয় আরোগ্য লাভ করবে, নয় মারা যাবে—এবেন ফ্লেচার নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গিয়েছেন, যেন কচি ছেলের বাড়া, ডাক্তার মহাশয়ের সোজা এই কথা ফ্লেচারকে বলা উচিত" ইত্যাদি ইত্যাদি। জেলের ভাষা ও ব্যবহার দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম ঘটনা কি। বাবা ডাক্তার জেম্‌সকে ডাকিয়া একবার আমি ভাল হইতে পারি কিনা শেষ পরীক্ষা করাইবেন। জানিতাম বাবার চেষ্টা বৃথা। আমি গেলাম, আমার শরীর পরীক্ষার বিবরণ আর বলিয়া দরকার নাই, বাবার আশা একেবারে চিরদিনের জন্য চলিয়া গেল। আমরা তিন জনে নীরবে বাবার ঘরে মিলিলাম, অসুখের বিষয় একেবারেই উচ্চবাচ্য হইল না, সকলে অন্য কথাবার্তা করিতে লাগিলাম। ডাক্তার চলিয়া গেলেন। বাবা নীরবে ধূমপান করিতে করিতে এক দৃষ্টে জনকে দেখিতে লাগিলেন। বাবা কি তাঁর ভবিষ্যৎ আশা জনের উপর স্থাপন করিতেছেন? যদি তাই হয়, তাহা হইলে কি সুখের বিষয়।

একদিন রবিবারে আমাদিগের অভ্যাস মত আমরা বাগানে তারকাপূর্ণ আকাশের নীচে বসিয়া গল্প করিতেছিলাম।

"ফিনিয়স্‌, শীঘ্রই আমাদের এই আরামপ্রদ জীবন ছাড়িয়া পৃথিবীতে বাহির হইয়া সংগ্রাম করিতে হইবে। সময় সময় প্রশ্ন ওঠে যে, সেজন্য কি আমরা প্রস্তুত হইয়াছি?"

"আমার মনে হয় তুমি হয়েছ।"

"কি জানি। আনন্দের খাতিরে যে কখন অন্যায় করিব না, এ বিষয় যে খুব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছি. তাহা তো মনে হয় না। এখনও মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে যে সকাল ৮টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত অন্ধকার আফিসঘরে হিজিবিজি কাটার চেয়ে পৃথিবীতে বেরিয়ে পড়ে খুব বড় বড় কাজ করি, আর এখানে কখনও ফিরে না আসি।"

"কখনও না।"

"না না, আমি কি আর সত্যি যাচ্ছি। সকলেরই তো খেয়াল আছে, এটা আমার একটা খেয়াল মাত্র, যাক্‌ সে সব কথা কিছু ভেবো না।"

এবার জন উঠিল, তাহাকে একটু বিমর্ষ দেখাইতেছিল। দুজনে ভিতরে গেলাম, খাওয়া দাওয়ার পর সাড়ে নয়টার সময় জন বাবাকে নমস্কার করিয়া বাড়ী যাইবার জন্য উঠিল। বাবা তাহাকে পরদিন বিশ্রাম করিতে বলিলেন। এবং তিনি জনের সব হিসাব পত্র পরীক্ষা করিয়া ভাল কাজ হইয়াছে বুঝিলে তাহার কোন উন্নতি করিতে পারেন কিনা, সে বিষয় চেষ্টা দেখিবেন বলিয়া আশা দিলেন।

জনের পরদিন ছুটী জানিয়া দুজনে একটা মাঠে গিয়া দিন কাটাইব স্থির করিলাম। কথা মত আমরা মাঠে উপস্থিত হইলাম। সমস্ত দিন আমরা কুঁড়ের মত মাঠে শুইয়া কাটালাম। বিকালে আহার করিয়া আর কোথাও যাইব ভাবিতেছি, এমন সময় দেখি দুটী অদ্ভুত পোষাক পরা লোক আসিতেছে।

তাঁদের মধ্যে বেঁটে লোকটী জনের দিকে অগ্রসর হইয়া কোণ্টহাম সহর কোথায় জিজ্ঞাসা করিল, পরে খাবার বাহির করিয়া খাইতে বসিল। আমাদের জন্য খানিকটা খাবার দিল, আমি ভাল খাবার নয় বলিয়া খাইলাম না। জন আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া খাইতে আরম্ভ করিয়া দিল; বলিল "কি জানি, সময়ে লোকের এই খাবারই জোটে না।" তাহার পর কতক্ষণ গল্প করিয়া লোক দুইটী বিদায় লইল।

আমরাও বেড়াইতে বেড়াইতে খানিক দূর অগ্রসর হইয়া হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, চার্লস (সেই বেঁটে লোকটী) একটী ঘাসের ঠেলাগাড়ীর উপর দাঁড়াইয়া হাত পা নাড়িয়া খুব বক্তৃতা দিতেছে, কতকগুলি গরীব অশিক্ষিত লোক হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া তার হাত পা নাড়া ও মুখনাড়া দেখিতেছে। অনেকক্ষণ বলিবার পর অবশেষে লোকটী থামিল এবং কোন ভাল কাজ করিবার জন্য সকলের কাছে সামান্য চাঁদা সংগ্রহ আবশ্যক বলিয়া নিবেদন করিল। দরিদ্র ব্যক্তিরা ও স্ত্রীলোকেরা কেহ এক পয়সা, কেহ দু পয়সা, কেহ এক আনা চাঁদা দিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। চার্লস "তোমাদের মঙ্গল হউক বলিয়া" আঁশীর্বাদ করিতে লাগিল।

সকলে চলিয়া যাইবার পর চার্লসের সাথী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। চার্লস্ ঠেলা গাড়ী হইতে নামিয়া ঘাম মুছিতে মুছিতে বলিল "আর আমি জীবনে এরকম কাজ করবো না; কি করি পেটের দায়ে পড়িয়া সকলি করিতে হয়। কুড়ি মাইল হাঁটিয়া কিছু আহারের যোগাড় না করিয়া আরও দশ মাইল হাঁটা একেবারে অসম্ভব।"

জনের চার্লস্‌কে অত্যন্ত ভাল লাগিয়াছিল; সে বলিল "তুমি একজন অভিনেতা নাকি?"

"হাঁ, আজ রাত্রে আমাকে ম্যাকবেথের অভিনয় করতে হবে, আপনারা দুজনে নিশ্চয় আসবেন।" জন বলিল "গেলে মন্দ কি, বিশেষ কি অন্যায় হবে? তোমার বাবা তো অনেক রাত্রে ফিরিবেন। একবার যদি অভিনয় দেখি তাহা হইলে তিনি কিছু মনে করবেন না; রোজ রোজ তো আর দেখিতে যাইব না। ফিরিবার সময় যদি তোমার ক্লান্তি লাগে আমি কাঁধে করে নিয়ে আসবো।" চার্লস্ আহ্লাদে লাফাইয়া উঠিল এবং আমাকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিল। আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম, কিন্তু দেখিলাম জন অনেকক্ষণ ধরিয়া একটীও কথা বলিল না।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ঠিকা গাড়ী একটী সরাইয়ের নিকট গিয়া দাঁড়াইল। জন আমাকে একটী কামরায় কাউচে শুয়াইয়া নিজে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চারিধার তদারক করিতে লাগিল। সে আর এখন বালক নহে, তাহার চাহনীতে একটু একটু চঞ্চলতা প্রকাশ পাইতেছিল; কিন্তু হাবভাব খুব প্রশান্ত ছিল।

জন ঘুরিয়া আসিয়া বলিল "তোমাকে

যদি চারিধারে বেড়িয়ে আনতে পারতাম, তাহ'লে কি আনন্দ হতো ; কিন্তু তোমার বিশ্রাম দরকার। বাড়ীটা খুব ভাল নয়, ইহাদের উচিত একটা ভাল বাড়ী প্রস্তুত করা। ফিনিয়স্, তুমি কি অভিনেত্রী মিসেস সিডনস্‌কে দেখিতে যাইবে? কুড়ি বৎসর আগে তিনি এসে যোগ দিয়েছেন, কিন্তু এত বয়স হইয়াছে তবুও বেশ দেখিতে। তোমার বাবা কি তাহাকে দেখিয়াছেন?"

"বাবা! বাবা কখনও থিয়েটার দেখিতে যান না।"

কি!

"অত ভয় পাইও না। তিনি নিজে যান না বলে যে আমাকে আটকাইয়া রাখিবেন তাহা মনে হয় না।"

জনের মুখ শুকাইয়া গেল। "আমি যাহা করিয়াছি ইহার জন্য শাস্তি ভোগ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু আমার জন্য— ফিনিয়স," বলিতে বলিতে হঠাৎ বলিল "জন, তুমি কি বাড়ী যেতে চাও? আমি তোমাকে নিয়ে যাব।"

আমি তাহাকে ভাল করিয়া বুঝাইলাম যে আমরা খেলা দেখিতে আসিয়া কিছুই অন্যায় কাজ করি নাই। জন শেষে থাকিতে সম্মত হইল।

খেলা আরম্ভ হইল, সে দৃশ্য আমি কখনও জীবনে ভুলিব না। শ্রীমতী সিডনকে জীবন্ত লেডি ম্যাকবেথ মনে হইতেছিল। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর গত হইয়াছে, এখনও তাঁহার গলার স্বর কানে বাজিতেছে।

খেলা শেষ হইল আমরা আর অপেক্ষা না করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। রাস্তায় আসিয়া পড়িবার পর জন মস্ত বড় নিশ্বাস টানিয়া যেন হাঁপ ছাড়িল। তাহার মুখ নীল হইয়া গিয়াছিল।

আমি ডাকিলাম "জন!"

জন ফিরিয়া তাহার হাত আমার কাঁধের উপর রাখিল। "তুমি কি বল্লে? শীত করছে নাকি? এখন খেলা দেখা তো হলো, বাড়ী যেতে হবে। কটা বেজেছে দেখতো?" ঘড়ীতে ঢং করিয়া এগারটা বাজিল। আমাদের মুখ শুকাইয়া গেল। কি করিয়া আমরা বাড়ী পৌছিব?

"জন. কি হবে ভাই?"

"কিছু ভয় নেই. আমার কাছে যা আছে, তাই দিয়া গাড়ীভাড়া করিয়া বাড়ী পৌছিব।" জন পকেট হাতড়াইল, কিন্তু টাকা কোথায়? ভিড়েতে কে তাহার পকেটে যাহা ছিল, সমস্ত বাহির করিয়া লইয়াছে।

"কেহ কি আমাদের কিছু ধার দেবে না?'

"জীবনে কখনও হাত পাতি নাই; এখন লোকে কি বল্‌বে। আচ্ছা দাঁড়াও, আমি চেষ্টা করছি।"

খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া হাসিয়া বলিল "আমি ভেবেছিলাম আমি একজন মস্ত বড় লোক, কিন্তু কই তা তো দেখছি না; কেউ ধার দেয় না আমায়।"

দুজনে পরামর্শ করিলাম, তারপর জন দৃঢ়স্বরে বলিল "আর সময় নেই, প্রত্যেক মুহূর্ত আমাদের পক্ষে মূল্যবান্। তোমাকে

বাবা বোধ হয় আমাদের জন্য কত ভাবিতেছেন ; চল আমরা হাঁটিতে আরম্ভ করি।”

জন গল্প করিতে করিতে চলিল। খানিক দূর যাইতে না যাইতে আমি চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। চোখ খুলিয়া যখন আবার চাহিলাম. দেখি জন আমার মাথায় জল ঢালিতেছে।

“ভয় পেয়েছ ভাই ? ভয় কি ? এখনি ভাল হয়ে যাবে।”

“ভাই ফিনিয়স্, আমি ভাবলাম, আমি বুঝি তোমায় মেরে ফেল্লাম।”

সে আর কিছু বলিল না। কিন্তু সেই প্রথম জনের চোখ থেকে কয়েক বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে দেখিলাম।

প্রভাত হইয়া আসিয়াছিল। আমি উঠিতে চেষ্টা করিলাম, জন বাধা দিয়া বলিল “আমি তোমায় বহন করিয়া লইয়া যাইব।”

বলিলাম “অসম্ভব।”

“কি অসম্ভব? অর্দ্ধ মাইল লইয়া আসিয়াছি, আর বাকিটুকু পারিব না ? জেনথন কি শেষে তার ডেবিডের মৃত্যুর কারণ হইবে ?”

জানি না কোন বলে বলীয়ান হইয়া জন প্রায় সমস্ত পথ আমাকে বহিয়া লইয়া চলিল। বাড়ী পৌঁছিতে বেশ বেলা হইয়াছিল, জন আমাকে বাড়ীর দরজায় পৌঁছাইয়া বিদায় চাহিল।

আমি বলিলাম “তুমি আসিবে না ? তুমি কি এ অবস্থায় আমাকে একলা ফেলিতে চাও।”

“না।”

উভয়ে বাড়ীর দিকে চাহিলাম। সমস্ত দরজা জানলা বন্ধ ছিল। দরজায় আঘাত করিয়া উভয়ে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। খানিকক্ষণ পরে ফিনিয়সের বাবা আসিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। একটীও কথা বলিলেন না, কিন্তু তাঁহার চেহারা দেখিয়া বোঝা যাইতেছিল যে তিনি সমস্ত রাত্রি জাগিয়াছিলেন এবং আমরা যে কোথায় ছিলাম, তাহাও অবগত আছেন। আমাদিগকে লজ্জা দিবার জন্য খিড়কী তুলিয়া দিলেন।

“ফিনিয়স্ তুমি কোথায় গিয়াছিলে ?”

জন সাহস করিয়া বলিল “কোণ্টহামে থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিলাম। আমার দোষেই হইয়াছে। আমি উহাকে লইয়া গিয়াছিলাম।”

“কেন তুমি উহাকে লইয়া গিয়াছিলে ?”

“কেন ? মহাশয় আপনি কি কখনও যুবাপুরুষ ছিলেন না ? আমি তো বল্ছি যে আমার দোষ হয়েছে। এখন আমার মনে হচ্ছে অন্যায় করেছি—কিন্তু তখন প্রলোভন সামলাইতে পারি নাই। আমার কাজ করতে করতে সময় সময় প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে, কিছু আমোদ আহ্লাদ করতেও ইচ্ছা হয়।”

“করতে পাবে।” এমন গম্ভীরস্বরে ইহা উচ্চারিত হইল যে, জন নীরব হইয়া রহিল। “জন হালিফাক্স, এই বিষয়ে যোগাড় কতদিন হইতে করিয়াছিলে ?”

“একদিন কি এক ঘণ্টাও আগে করি

নাই। হঠাৎ খেয়াল হইল” আমার বাবা বিদ্রূপের হাসি হাসিলেন। “মহাশয়, আমি কি কখনও আপনাকে একটী মিথ্যা কথা বলিয়াছি? যদি আমাকে বিশ্বাস না করেন, ফিনিয়স্‌কে জিজ্ঞাসা করুন। না, না ফিনিয়স্‌কে কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন না।” বলিতে বলিতে জন দৌড়াইয়া যেখানে ফিনিয়স্ শুইয়া পড়িয়াছিল সেখানে গেল। “ভাই, ফিনিয়স্! তোমার সঙ্গে কি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছি!” আমার কথা বলিবার শক্তি ছিল না, আমি হাসিতে চেষ্টা করিলাম; বাবা আসিয়া জনকে ঠেলিয়া দিলেন।

“আমি নিজের ছেলের তত্ত্বাবধান করিতে সক্ষম। তুমি আর তাহাকে অনিষ্টের পথে লইয়া যাইবে না। তোমাকে বিশ্বাস করাই আমার ভুল হইয়াছিল।”

যদি তিনি জনকে বকিতেন, গাল দিতেন, তাহা হইলেও বোধ হয় জনের এত আঘাত লাগিত না। কিন্তু এরকম ভাবে অবিশ্বাস প্রকাশ করায় তাহার হাড়ে হাড়ে বিদ্ধ করিল। জন কেবল তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিল।

“আমি আবার বলছি তোমাকে বিশ্বাস করাই ভুল হইয়াছে। তোমাকে মনের মত পেয়েছি ভেবেছিলাম। তোমাকে ক্রমশঃ উচ্চপদ দিয়া শেষে আমার অংশীদার করিব ভেবেছিলাম। কিন্তু”

“জন আস্তে আস্তে বলিল, আমি অন্যায় করিয়াছি। আমি চলিয়া যাইতেছি। অন্য যায়গায় কি কাজ করিতে বলেন?”

এবেন ফ্লেচার থতমত খাইয়া বলিলেন “না আপাততঃ তো না।”

জন আনন্দে আমাকে জড়াইয়া ধরিল; এবং নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে বলিল।

বাবা গম্ভীরভাবে বলিলেন, “জন, আমি তোমাকে কোন পাপ করিয়াছ বলিয়া দোষ দিচ্ছি না; কিন্তু একটু প্রলোভন সামলাইতে পারিলে না, সঙ্গে আর এক জনকে টানিয়া লইয়া গেলে, তোমার মনের একটুও বল নাই। আজ হইতে তুমি আমার কার্য্য করিবে, কিন্তু আমার ছেলের সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক রহিল না।”

জন খানিকক্ষণ প্রস্তরমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর বলিল “ফিনিয়স্, তোমার বাবা যাহা বলিতেছেন তাহা একধার দিয়া ধরিতে গেলে ঠিক। আমাকে যাইতে দাও, হয়তো অনেক দিন পরে আবার দেখা হইবে। যদি না হয়—নমস্কার ভুলো না।”

“নমস্কার। যদি বেঁচে থাকি, তাহা হইলে আবার বন্ধুভাবে মিলিব।” জন তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছে। দুবৎসর কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু জনের সঙ্গে আর আমার সাক্ষাৎ হয় নাই।

জনশিক্ষার আয়োজন।

আমাদের দেশের প্রায় শতকরা আশী জন লোক চাষা। তার উপর কত লোক আছে যারা মুটে, মজুর, মুচীর কাজ করে জীবিকা উপার্জ্জন করে। আমরা ভদ্র লোক বলে এক এক সময় মনে অত্মপ্রসাদ অনুভব করি, কিন্তু সেই সময় আমরা ভুলে

যাই, আমরাই দেশের সব নই। আমরা ছাড়া হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক আছে, যাদের আমরা অনেক সময় ইতর, ছোট লোক বলে অবজ্ঞা করি—তারাই, বলিতে হইলে, এক দিকে দেশের মেরুদণ্ড স্বরূপ। "তাঁতি কর্ম্মকার" "মুটে মজুর মূচী," "চাষা গোয়ালা" না থাকলে আমরা এক মূহূর্ত্তও জীবন ধারণ করতে পারি না। একথা আমরা এক এক সময় ভুলে যাই; সেই জন্য এক এক সময় এই সকল শ্রমজীবীদের সমাজে যে স্থান আছে সে কথা ভুলে যাই, তাদেরে অস্বীকার করি, তাদেরে আমাদের অধীন রাখতে চেষ্টা করি।

আমাদের দেশে এই সব শ্রমজীবীদের মিলিত করবার, এদের শিক্ষা দেবার এক সময় চেষ্টা হয়েছিল। সে আজ বেশী দিনের কথা নহে। আচার্য্য কেশবচন্দ্র যখন জীবনের সকল বিভাগের কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য প্রত্যেক বিভাগের কার্য্যের মধ্যে নূতন শৃঙ্খলা আনয়ন করিতে চেষ্টা করছিলেন, সেই সময় তাঁর চেষ্টায় আমাদের দেশে শ্রমজীবীদের জন্য বিদ্যালয়ে শ্রমজীবীদের জন্য কীর্ত্তন প্রভৃতি ব্যবস্থা হয়েছিল। আর তিনি যে সুলভ সমাচার প্রকাশ করেছিলেন, সেই সুলভ সমাচারও দেশের অনেক অর্দ্ধ শিক্ষিত ও নিরক্ষর লোকের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করেছিল। সেই সময়েই কেশবচন্দ্রের পুণ্য প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন ও শ্রমজীবীদের মধ্যে শিক্ষা, নীতি ও ধর্ম্মের বিস্তার যাহাতে হইতে পারে, তাহার জন্য বিবিধ প্রকারে চেষ্টা করেন।

অনেক দিন পর আবার বর্ত্তমান যুগের যুবকদিগের মধ্যে সেই শ্রমজীবীদের মধ্যে শিক্ষা, নীতি ও ধর্ম্ম বিস্তারের জন্য বিবিধ কেন্দ্র স্থাপন করিবার আয়োজন দেশের মধ্যে দেখা গিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে শ্রমজীবি-শিক্ষা-সঙ্ঘ এই বিষয়ে যে যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহার বিবরণ সম্প্রতি তাঁহাদের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে বাহির হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা ও তন্নিকটস্থ সহর ও গ্রামে উৎসাহী যুবকদের চেষ্টায় কয়েকটী নৈশবিদ্যালয় খোলা হয়, এই নৈশ বিদ্যালয় গুলির কার্য্য বেশ চলিতেছে। শ্রমজীবি-শিক্ষা-সঙ্ঘের সহিত প্রায় ২০ টী বিদ্যালয় এক যোগে কার্য্য করিতেছে। এই বিদ্যা-লয়গুলির ছাত্রসংখ্যা একসহস্রের অধিক। ইহার কর্ম্মি-সংখ্যা প্রায় ১৫০ শত যুবক। ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ কলেজের ছাত্র উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতেছেন, এই সকল যুবক কর্ম্মীদের উৎসাহ দেখিয়া নিরাশ প্রাণেও অনেক সময় আশার সঞ্চার হয়। তাঁহারা যে কে বল ছাত্রদের লেখা পড়া শেখান বা বই মুখস্থ করান তাহা নয়, তাঁহারা শ্রমজীবী ছাত্রদের বন্ধু হইয়া যান; তাহাদের সঙ্গে কথা বার্ত্তা, তাহাদের রোগের সময় চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যবস্থা, তাহাদের সহিত একসঙ্গে বেড়ান ও খেলা প্রভৃতি কার্য্যে তাঁহারা অল্প বিস্তর সকলেই পটু। এই যুবকদলের সম্মিলিত চেষ্টা এক দিকে সামান্য হইলেও আমাদের যুবক

বন্ধুদের চেষ্টা ও যত্ন অনেকাংশে ফলবতী হইয়াছে। যুবক কর্ম্মীরা প্রায়ই তাঁহাদের ছাত্রদল লইয়া নানা দর্শনযোগ্য স্থানে গমন করেন, কখন কখন তাঁহারা সহরের কর্ম্ম কোলাহলের বাহিরে পল্লীগ্রামে ছাত্রদের লইয়া গিয়া তাহাদিগকে সহর ও পল্লীর প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দেন। কখন বা ছায়াচিত্র (ম্যাজিক লণ্ঠন) যোগে আমাদের দেশের ইতিহাস, ভূগোলের ছবি দেখাইয়া বা গল্পের ছবি দেখাইয়া ছাত্রদের চিত্তকে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করেন। ছাত্রদের সহিত একসঙ্গে স্তোত্র পাঠ বা গান করিয়া কত সময় নিজেদের দৃষ্টান্ত দ্বারা ছাত্রদের সৎশিক্ষা দেন। এইরূপে উৎসাহী যুবকবৃন্দ ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পর শ্রমজীবীদের মধ্যে শিক্ষা, নীতি ও ধর্ম্মের বিস্তারের যে শুভ চেষ্টা হইয়াছিল,সেই শুভচেষ্টাকে পরিণতির দিকে লইয়া যাইবার জন্য অদম্য উৎসাহে কার্য্য ক্ষেত্রে নামিয়াছেন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা, তাঁহাদের শুভচেষ্টা ফলবতী হউক। শ্রমজীবি-বিদ্যালয়ের কার্য্য পরিদর্শন করিয়া কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই ইচ্ছা যে শীঘ্র কার্য্যে পরিণত হইবে, সে বিষয়ে আমাদের আশা আছে। রবীন্দ্র বাবু লিখিয়াছিলেন ;—

"শ্রমজীবী বালকদের জন্য এই যে নৈশ বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে, ইহা পরিদর্শন করিয়া আমি বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। ইহার কার্য্যপ্রণালী এবং প্রতিষ্ঠাতৃগণের উৎসাহ দেখিয়া আমার স্পষ্ট মনে হইল এই ক্ষুদ্রায়তন বীজ কালক্রমে মহৎ সফলতা লাভ করিবে। সমাজের নিম্নশ্রেণীবর্ত্তী দরিদ্র বালকদের শিক্ষার জন্য যে কয়টী যুবক আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাদের দৃষ্টান্ত পল্লীতে পল্লীতে শুভচেষ্টা ব্যাপ্ত করিয়া দিক্ এই আমি প্রর্থনা করি।"

যাঁহারা এই বিদ্যালয় গুলির কার্য্য-প্রণালী বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা ৮০।৩ হ্যারিসন রোডে সম্পাদকের নিকট কার্য্য বিবরণী ও জন শিক্ষার পাঠ্য প্রণালী পাইবেন।

তন্ময়।

(আমি) তোমার ভাবেতে রহিব মগন
দিবস নিশি,
তোমার মাঝারে রহিব সতত
তোমাতে মিশি।

যবে পাখী গাবে গান উষার আলোয়,
সুরভি মাখিয়া বহিবে মলয়,
সরসী সলিলে শ্বেত কুবলয়
কিরণে ভাসি,
উঠিবে হাসি ;

যবে শিশির সিক্ত মুকুলের কোলে
নাচিবে ভ্রমরী গুঞ্জন রোলে,
গাহিবে কোকিলা পঞ্চম বোলে
মঞ্জু সাজে
কুঞ্জ মাঝে ;

যবে নিবিড় নীরব সন্ধ্যা গগনে,
বিশ্ব জনের আঁধার ভবনে,
উজলি উলসি চন্দ্র সদনে
হাসিবে তারা
মুকুতা পারা ;

যবে শাখী পরে শাখী ফুটাইবে ফুল,
ঝরিয়া পড়িবে গন্ধে বকুল,
আঁধারের শেষে বিহগীর কুল
উঠিবে জাগি
বিদায় মাগি ;
ওগো তখন আমার মোহের বন্ধ
যাইবে ছুটিয়া। সকল দ্বন্দ্ব
ঘুচিবে। কেবল মম সানন্দ
নয়ন দু'।
উঠিবে ফুটী।
আমি হিয়ার মাঝারে যতনে তোমারে
রাখিব পুষি,
তোমার করেতে সকলি সঁপিয়া
হইব খুসী॥
ইন্দুপ্রভা দেবী।

প্রবাসে রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর ও এণ্ড্রুস সহেব।

আমাদের শ্রদ্ধেয় কবি ও বিদেশী শ্রদ্ধেয় বন্ধু ঘুরতে ঘুরতে শেষে এই খোট্টাদের দেশে উপস্থিত। বঙ্গীয় যুবক-সমিতি তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সমবেত হওয়ায় কবি তাঁহাদিগের কাছে সাহিত্য সম্বন্ধে, এবং বাঙ্গালীদিগের ভাল মন্দ দুইধার লইয়া কিছু বলিলেন। যাহা বলিলেন, সে বিষয়ে চিন্তা করিলে হয়তো আমাদের সকলেরই উপকার হইতে পারে ভাবিয়া শোনা কথা গুলির ভাবটা যতটুকু মনে আছে, তত টুকুই লিখিতে চেষ্টা করা যাক্।

কবি বলিলেন, দেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, জ্ঞান, ধর্ম্মের, সাহিত্যের, বিস্তার প্রথম বাঙ্গলা দেশ ও মগধ হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। সময়ে পশ্চিম হইতে আরম্ভ হইয়া পূর্ব্বে গিয়াছে বটে, কিন্তু পূর্ব্ব তাহাকে আরও উন্নত করিয়া ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিয়াছেন। পূর্ব্ব দেশই এক সময় তাঁহার জ্ঞান ধর্ম্ম তিব্বত, চীন, জাপানকে দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এখনও আমাদের দেশে এমন বড় বড় পণ্ডিত আছেন যে বিদেশী পণ্ডিতেরা তাঁহাদের নিকট কিছুই জানেন না ; তথাপি আমাদের দেশের সাহিত্যের উন্নতি এত ধীরগামী কেন? বক্তা নিজের আমেরিকার অভিজ্ঞতার কথা বলিলেন। সেখানকার সংস্কৃত ও তামিল ভাষার অধ্যাপকেরা আমাদের দেশের সাধারণ পণ্ডিত অপেক্ষা জ্ঞানে বেশী উন্নত নহেন, বরং কমই জানেন ; কিন্তু তাঁহারা শিশুকাল হইতে জ্ঞান দিবার একটা বৈজ্ঞানিক প্রণালী শিক্ষা করিয়াছেন, সে জন্য যেটুকু জানেন তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে এক এক জন এমন পণ্ডিত আছেন যে, বলিতে হয় যে, তাঁহারা জ্ঞান ও বিদ্যার ভিতর ডুবে এবং মজে রয়েছেন ; কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক প্রণালী না জানার দরুণ তাঁহারা কিছুই করিতে পারিতেছেন না। এখনও ভাষাতত্ত্ব শিখিতে গেলে আমাদের ইংরাজ লেখকদিগের শরণাগত হইতে হয়, অবশ্য ইহার জন্য আমরা তাঁহাদিগের নিটক খুব কৃতজ্ঞ, কিন্তু তাই বলিয়া কি আমরা

চিরকাল আঁচল ধরা হইয়া থাকিব? দেশে দেশে ক্লাব আছে সেখানে সকলে সাহিত্য আলোচনা করিয়া থাকেন; কিন্তু সেটা খুব মস্ত জিনিস নয়। আমরা কি ইহা অপেক্ষা আর কিছু করিতে পারি না? এখন বাঙ্গালীরা দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছেন। যাঁরা যেখানে আছেন, সেই খানেই সমবেত ভাবে সেখানকার ভাষার সঙ্গে ও বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গে কোথায় সামঞ্জস্য ও কোথায় অসামঞ্জস্য ইহা আলোচনা করেন, কিম্বা সকলেই নিজে নিজে যেটুকু জানিতে পারেন, সেটুকু সংগ্রহ করিয়া একটা বিশেষ স্থলে দিতে থাকেন, মেয়েদের গ্রাম্য কথা সব সংগ্রহ করিতে থাকেন, তাহা হইলে সেই সকলের সাহায্যে ভবিষ্যতে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা কত ইতিহাসতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব হয়তো আবিষ্কার করিতে পারিবেন। এই যে দেশ বিদেশে সাহিত্য সম্মিলন হয় সকলেরই এই এক উদ্দেশ্য।

যেখানে এরূপ সম্মিলন নাই তাঁহারা নিজেদের সংগ্রহ সাহিত্য পারিষদ মাসিক পত্রিকায় পাঠাইতে পারেন। প্রতিজন নিজের সংগ্রহ নিজের কাছে রাখিলে হয়তো বিশেষ কিছুই লাভ না হইতে পারে কিন্তু সকলের সমবেত চেষ্টাতে সব সংগ্রহ গুলি এক স্থলে সংগৃহীত হইলে তাহা হইতে অনেক লাভ হইতে পারে।

"ইহা বলা হইয়াছে যে বাঙ্গালীর অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আগে লোকেরা যেমন বাঙ্গালীকে সম্মান করিত এখন সে রকম ভাবে করে না। ইহাতে উভয় পক্ষের দোষ হইতে পারে। একের অহঙ্কার ও অন্যের প্রতিযোগিতা। বাঙ্গালীদের মনে এই অহঙ্কারের ভাব আসিয়াছে আমরা বড়, আমাদের মতন ধর্ম্মে জ্ঞানে কেহ সমতুল্য নহে। তাঁহারা নিজেদের বড় একটা কিছু মনে করিয়া অন্য জাতির সঙ্গে সে রকম মন খুলিয়া মিশিতে পারেন না। শ্রেষ্ঠতার একটা দায়িত্ব আছে সেটা কি আমাদের ভুলে যেতে হবে? না যে যে দেশেই থাকি যে জাতির ভিতর থাকি তাদের সঙ্গে নিজেদের এক মনে করে তাদের প্রতিও প্রেম দিয়ে জয় করতে হবে? মনে রাখতে কি হইবে না যে ভারত বাণিজ্য, শিল্পর কিম্বা বাহুবল দ্বারা তিব্বত, চীন, জাপানে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নাই কিন্তু প্রীতি দিয়া সকলকে জয় করিয়াছিলেন। আমাদের ভিতর যদি সেই বিশেষ সদ্‌গুণ থাকে তাহা হইলে অহঙ্কার করিবার কিছু নাই কিন্তু তাহা বাড়াইয়া দান করিবার দায়িত্ব প্রতিজনের রহিয়াছে। আমাদের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়া যদি অন্যেরা আমাদের অপেক্ষা বেশী উন্নত হন তাহাতে হিংসা করিবার কিছু নাই বরং ইহা খুব সুখের ও গৌরবের বিষয় হওয়া উচিত। কেবল প্রীতি ও প্রেমই আবার আমাদের ভিতর একতা আনিয়া দিবে ও আমাদিগকে শক্তিশালী করিবে।

শ্রদ্ধেয় Andrews সাহেব এক জন Christian প্রচারক ইনি ভারতবর্ষীয়দের সাহায্য করিবার জন্য Africa তে গিয়াছিলেন, এখন বোলপুরে স্কুলের

শিক্ষক হইয়া যাইতেছেন Andrews সাহেব বলিলেন যে তিনি এগার বৎসর পূর্ব্বে যখন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন তখন বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে তাঁহার অনেক কুসংস্কার ছিল এবং সেগুলি Anglo India দের সঙ্গে মিশিয়া আরও বাড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু ১৯০৩ সালে যখন তিনি প্রথম কলিকাতায় আসিলেন তখন বাঙ্গালীদের মানসিক শক্তি দেখিয়া তাঁহার অনেক কুসংস্কার কমিয়া যায় কিন্তু তবু এই গুণে তিনি বাঙ্গালীদের উপর শ্রদ্ধাবান ও আকৃষ্ট হন নাই। তিনি দিল্লিতে কাজ করিতেন, সেখানে সাধারণ গরীব কেরাণীদের সঙ্গে মিশিয়া দেখিলেন তাহাদিগের মধ্যে যে একটা একতার ভাব আছে, নিজের মাতৃভাষার উপর টান আছে সেরূপ প্রায় কাহারও নাই। Africa তে তিনি গিয়াছিলেন, সেখানে বাঙ্গালী নাই কিন্তু গুজরাটী ও তামিলদের ভিতরও এই বিশেষত্ব দেখিলেন। সেখানে আর একটী খুব ভাল জিনিষ দেখিলেন তাহা এই যে, এক মাতৃভাষায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্ম্মের লোকের ভিতর একটা খুব একতা আছে। প্রথমে আমাদের মাতৃভাষার উপর দাঁড়াতে হবে তারপর ক্রমে ক্রমে গণ্ডী ভেঙ্গে ভেঙ্গে কেবলই উন্নতির দিকে চলতে হবে। বাঙ্গালীরা নিজের মাতৃভাষাকে এত ভালবাসেন দেখিয়া তাঁর সত্যই তাঁহাদিগের উপর ভক্তি হয়। আর তাঁর শেষ কথা এই যে, তিনি মনে করেন ভারতের নারী অমূল্য রত্ন। আফ্রিকাতে যদি মিসেস বগি না থাকিতেন তাহা হইলে এই যুদ্ধ করা হয়তো অসম্ভব হইত।

আহার ও স্বাস্থ্য।

শ্রীযুক্ত ছগনলাল পরমানন্দ দাস নানাবতী কৃত "আহার এবং স্বাস্থ্য" সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই পুস্তিকা বম্বের শ্রীজীবে দয়া জ্ঞানপ্রসারক ফণ্ড হইতে প্রচারিত হইয়াছে। উদ্দেশ্য নিরামিষ আহারের শ্রেষ্ঠত্ব এবং উপকারিতা প্রদর্শন করা।—লোকে নিরামিষ আহার ধরিলে গোজাতির বিনাশ রহিত হইবে। ভারতের লোকের জীবন গোজাতির উপর নির্ভর করে; নিরামিষ আহারে শরীর সুস্থ সবল থাকে এবং চিন্তাশক্তি বুদ্ধিশক্তি ও আধ্যাত্মিকতা যেরূপ বৃদ্ধি পায় মাছ মাংস আহারে তত পায় না। আহার্য্য বস্তুর একটী তালিকা দ্বারায় প্রদর্শন করিয়াছেন যে শাকশবজী এবং দুগ্ধ ঘি দই প্রভৃতিতে অধিক পরিমাণ পুষ্টিকর পদার্থ আছে। শাকশবজী নিরোগ আহার। অপর পক্ষে মাংস ইত্যাদি আহারে অনেক প্রকার দুরারোগ্য রোগের উৎপত্তি হয়—যথা এপেণ্টিসাইটিস, ক্ষয়কাশ, কেন্সার। মাংসাহার অধিক প্রচলনেই এপেণ্টিসাইটিস্ রোগের আবির্ভাব এদেশে হইয়াছে। পূর্ব্বে এ রোগের নাম কেহ জানিত না। ডাক্তার পাইন্স বলেন রক্ত বিষাক্ত হইয়াই রোগ জন্মে। পাকস্থলী এবং আন্ত্রিক রোগে নিরামিষ আহার বড় উপকারজনক। বিশেষতঃ যকৃৎ, মূত্রাশয় এবং অন্যান্য

ব্রক যন্ত্রের পীড়ার অবস্থায় নিরামিষ হোর উপকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ডাক্তার পাইন্স বলেন গর্ভবতী স্ত্রীলোকেরা নিরামিষ আহারী হইলে প্রসব সময় কষ্ট পান না। ডাক্তার পৌষ্টে বলেন নিরামিষ আহারে অস্ত্র চিকিৎসার সময় বিশেষ উপকার, এমন কি কোন কোন স্থানে অস্ত্র চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা চলিয়া যায়। বহুতর প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় ডাক্তারদের এরূপ মত দাঁড়াইতেছে যে নিরামিষ আহার প্রশস্ত এবং আমিষ ভক্ষণে অনেক রোগের নিদান। স্থানাভাববশতঃ এস্থলে সমস্ত ডাক্তারদের মত বিশেষভাবে প্রদান করা গেল না। তবে সর্ব্বসাধারণে যদি বোম্বের "শ্রীজীবে দয়া জ্ঞানপ্রসারক ফণ্ড" প্রচারিত এই পুস্তিকাখানি এবং অন্যান্য গ্রন্থ আনাইয়া পাঠ করেন তবে আহার এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিয়া পরিবারের মধ্যে স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে সক্ষম হইবেন। গোধনের মত ধন ভারতে আর নাই। নিম্নে ইহার প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শিত হইল।

১। এই গরু হইতে দুধ, ঘি, দই পাই। গো দুগ্ধ খাইয়াই ভারতের লোক বাঁচিয়া আছে।

২। হালচাষ করা।

৩। গভীর কূপের জল উত্তোলন করিয়া কৃষিক্ষেত্রে সিঞ্চন করা।

৪। গোবর দ্বারা ঘর দুয়ার বিশুদ্ধ রাখা অর্থাৎ গৃহের মধ্যে দূষিত পদার্থের বিষাক্ততা গোবর লেপে নষ্ট হয় এবং গৃহে সেঁত সেঁতের অবস্থাও কমাইয়া দেয় এবং ঘুঁটে জালান হয়।

৫। গোযান দ্বারায় যাতায়াতের সুবিধা।

৬। ঘানিগাছে গরু জুড়ে দিয়ে তেল বাহির করা।

৭। ফসলের সময় ধানের মাড়াই কার্য্যে লাগান।

৮। ক্ষেত্র হইতে গৃহে ধান আনা।

৯। ষ্টেশনে, ডক প্রভৃতি স্থান হইতে মাল বাড়ীতে কিম্বা দোকানে লইয়া আইসা।

১০। গোবরে ক্ষেতের উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করে।

১১। রাস্তায় জলসিঞ্চনের গাড়ী টানা। এত প্রকারে গরু আমাদের প্রয়োজন। সেস্থলে গোজাতির যত্ন, রক্ষণাবেক্ষণ আমাদের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। এই গরুকে যদি প্রতিদিন হত্যা করিয়া ইহার মাংসাহার করা হয়, তবে গরুর সংখ্যা কমিয়া যাইয়া দেশের ভয়ানক দুর্গতি হইবে। এই কলিকাতা নগরে শুনিতে পাই প্রতিদিন প্রায় পাঁচশত গরু জবাই হয়। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য নগরেও গোমাংস বিক্রয় হইতেছে। ইংরেজ রাজত্বের পূর্ব্বে কখনও এরূপ গোমাংসের বিক্রয়ের প্রথা এ ভারতে ছিল না। এই ব্যবসায় প্রচলন হইয়া গোবংশ ধ্বংশ হইতেছে এবং সেই হেতু খাটি দুধ ঘি দুস্প্রাপ্য হইয়াছে। পরীক্ষা দ্বারায় দেখা গিয়াছে ২২ জনের দুধের মধ্যে খাটি দুধ মাত্র একটীতে পাওয়া যায়। তারপর "ঘি" নানা জন্তুর চর্ব্বিতে প্রস্তুত—খাটি ঘি অতি বিরল। এমতাবস্থায় দেশের লোকের খুব চিন্তাকুল হওয়া উচিত। হিন্দু

মুসলমান উভয় জাতিরই জীবন গোজাতির উপর নির্ভর করে। যদি নিরামিষ আহারের প্রয়োজনীয়তা হিন্দু মুসলমান বুঝিতে পারেন এবং নিরামিষ আহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আপন আপন স্বাস্থ্যবর্দ্ধন করেন তবে গোমাংসের ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা এত থাকিবে না—সুতরাং গোজাতি রক্ষা পাইবে এবং দেশে সুখাদ্য প্রচুর পরিমাণ লাভ হইবে। দেশের স্বাস্থ্য উন্নত হইবে এবং লোকের শরীর মন সবল, প্রফুল্লতা লাভ করিবে। যাহাতে মুসলমানেরাও আপন হিত বুঝেন তাহা দেখা উচিত। সাধে কি হিন্দুরা গরুকে দেবতা বলিয়া পূজা করেন। হিন্দুরও উচিত নহে যে, বৃদ্ধ হইলে কিম্বা গরু রাখার অসুবিধা হইলে তাহা কখনও মুসলমানের নিকট বিক্রয় করিয়া প্রকারান্তরে গোবংশের ধ্বংশের মাত্রা বৃদ্ধি করেন। পরিশেষে আমরা আশা করি দেশের হিন্দু মুসলমান এই গোবংশ রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

সমায়িকপ্রসঙ্গ।

মুসলমানগণ সর্ব্বত্র নারী জাতির অবরোধ প্রথার পক্ষপাতি। তুরস্ক সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাপশালী মুলসমান রাজ্য—ইউরোপীয় তুরস্কের রাজধানী কনষ্টাণ্টিনোপলে এখনও স্ত্রীলোকগণ পরদায় আবদ্ধ। কিন্তু সময়ের স্রোত সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইতেছে। তুরস্কের রাজধানীতেও অবরোধ প্রথা ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। সম্প্রতি কনষ্টাণ্টিনোপলে দরিদ্র দিগকে সাহায্য করিবার জন্য এক বাজার হইয়াছিল। শুনা যায় যে ঐ বাজারে তুরস্ক দেশের সম্মানিত পরিবারের মহিলাগণ বুরখা বা আবরণ ব্যহার করেন নাই। ইহা সে দেশের পক্ষে একটি সমাজিক মহা বিপ্লব। সেনাপতি ইজ্জেত পাশা এই অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে সংবাদ পত্রে মহা আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন, চারিদিকে এবিষয়ে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। তুরস্ক দেশের রাজা ও ধনীগণের প্রত্যেকের বহুস্ত্রী থাকাতে যে সমাজের ও দেশের মহা অনিষ্ট হইয়াছে তাহা সকলেই এখন দেখিতে পাইতেছেন। প্রকৃতপক্ষে নারীগণকে জনানাতে আবদ্ধ করিয়া রাখাতে তাঁহারা আপনাদিগের অধিকার লাভ করিতে পরেন না, নারীগণকে গরদায় আবদ্ধ করার প্রথা উঠিয়া গেলে সেই সঙ্গে সঙ্গে বহুবিবাহ প্রথাও অবশ্য উঠিয়া যাইবে। ভারতবর্ষের মুসলমানগণ মধ্যেও অবরোধ প্রথা উঠাইয়া দিবার উদ্যোগ দেখা যাইতেছে। অত্যল্প সম্মানিত কয়েকটি মুসলমান আপনাদের পরিবারের মহিলগণকে সভা সমিতিতে লইয়া আসিতেছেন। আমরা আশা করি মুসলমানগণ পরদা প্রথা তুলিয়া দিতে আরম্ভ করিলে অতি শীঘ্রই এই কুপ্রথা রহিত করিয়া ফেলিবেন। দুঃখের বিষয় যে হিন্দুগণ বহুদিন হইতে এই বিষয়ে সংস্কার আরম্ভ করিয়াও অধিক অগ্রসর হইতে পারেন নাই। অবরোধ প্রথা যে সকল প্রকার অত্যন্ত অপকারী

ও সকল প্রকার উন্নতির অত্যন্ত ব্যাঘাত-কারী তাহা এখন সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন ও স্বীকার করিতেছেন। এখন নারীকে অবরুদ্ধ করিয়া রক্ষা করা অত্যন্ত লজ্জাকর অপরাধ জানিয়াই অবিলম্বে এই প্রথা ত্যাগ করা উচিত।

ভিক্টোরিয়া মহিলা বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা উন্নত হইয়াছে সরকারী মাসিক সাহায্য ৬৩০৲ টাকা পাওয়া যাইতেছে এবং ছাত্রী বেতন হইতে পাঁচ শত উঠিতেছে, কুচবিহারের মহরাজ ও রাজমাতা, ময়ূরভঞ্জের মহারাণী, ডাক্তার আর এল, দত্ত ও অন্যান্য বিদ্যোৎসাহী মহাশয় ও মহিলাগণ অর্থ সাহায্য করিতেছেন ছাত্রী সংখ্যাও দুই শতের অধিক হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরের প্রবেশিকা পরীক্ষাতে দুইটি বালিকা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার একজন প্রথম বিভাগে ও এক জন দ্বিতীয় বিভাগে উর্ত্তীর্ণ হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া সকলেই হয়ত মনে করিবেন যে ইহার উদ্যোক্তা ও পৃষ্ঠ পোষকগণ ইহার অবস্থা দর্শন করিয়া আনন্দিত হইতেছেন। কিন্তু সে কথা ঠিক সত্য নহে। কলিকাতাতে নারী শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় অনেক আছে এবং অচিরে আরও অনেক হইবে। পুরুষ দিগের জন্য নির্দ্ধারিত আদর্শ অনুসারে যে সকল বিষয় শিক্ষাদানের বিধি বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ করিতেছেন বালক ও বালিকা বিদ্যালয় উভয়েতেই তাহা পঠিত হইতেছে। অল্পদিন হইল বালিকাদিগের প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে কিঞ্চিৎ পৃথক শিক্ষা প্রণালী গ্রহণ করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু কর্য্যত প্রায় পূর্ব্বের ন্যায় চলিতেছে। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র নারী-শিক্ষার স্বাভাবিক ও উপযোগী ব্যবস্থার কথা উথাপন করিয়াছিলেন। তাহা তখন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করেন নাই কিন্তু তিনি নিজে সে আদর্শ অনুসারে শিক্ষাদানের সূত্রপাত করিয়াছিলেন এবং ভিক্টেরিয়া কলেজ ও পরে ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিশন সে আদর্শ অনুসারে নারীশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত।

অতি দুঃখের সহিত স্বীকার করিতেছি যে আমরা আজপর্য্যন্ত আমাদের আদর্শ অনুসারে কার্য্য করিতে সক্ষম হই নাই। কার্য্যত আমরা এই বিদ্যালয়েও স্বদেশী ভাব ও বালিকা শিক্ষার বিশেষত্ব ত্যাগ করিয়া ইংরাজ বালিকাগণের স্কুলের রীতিনীতি ও পুরুষ-দিগের শিক্ষার আদর্শ অনুসারে শিক্ষা দেওয়া হইয়া আসিয়াছে। আমাদের দেশের পিতা মাতা বা অভিভাবকগণ এক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকেই উচ্চশিক্ষা জ্ঞান করিতেছেন। এজন্য এ বিদ্যালয়ের বিশেষ আদর্শ কার্য্যে পরিণত হয় নাই। কিন্তু সম্প্রতি আমাদের উদার গবর্ণমেণ্ট ও নূতন শিক্ষাশাস্ত্র তত্ত্ববিৎ কর্তৃপক্ষ আমাদিগের প্রস্তাবিত শিক্ষাপ্রণালী গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

সকলে শুনিয়া সুখী হইবেন যে, ভিক্টোরিয়া বিদ্যালয় আপনার আদর্শ

অনুসারে কার্য্য করিতে পুনরায় কৃত-সংকল্প হইয়াছেন। এখন বালিকাগণের পিতা মাতার ও সাধারণের সাহায্য পাইলে শীঘ্রই এই বিদ্যালয় শিক্ষার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত কতক পরিমাণে দেখাইতে পারিবেন আশাকরা যায়।

গ্রীষ্ম অবকাশের পর বিদ্যালয় গত ২৩শে জুন ভিক্টোরিয়া বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে এবং ৪ঠা জুলাই হইতে মহিলা-দিগের জন্য বক্তৃতা আরম্ভ হইয়াছে। ডাঃ সতীশ চন্দ্র সেন গার্হস্থ্য স্বাস্থ্য বিষয়ে পাঁচটি বক্তৃতা দান করিবেন। প্রতি শনিবার অপরাহ্ন ৪টায় সময় বক্তৃতা হইবে। ইহার পর অধ্যাপক ডাঃ দেবেন্দ্র নাথ মল্লিক শব্দ ও সঙ্গীতবিজ্ঞান বিষয়ে বক্তৃতাবলী প্রদান করিবেন। মহিলাগণ এই সকল মূল্যবান বক্তৃতা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিলে ২০ নং বীডনষ্ট্রীট ভবনে লেডী সুপারিইন্‌টেণ্ডেন্টকে লিখিবেন।

"নীরব সাধনা"। আমাদের প্রিয় প্রাচীন বন্ধু শ্রীযুক্ত ললিতা মোহন রায় মহাশয়ের কন্যা ও প্রীতিভাজন সুরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়ের পত্নী স্বর্গগতা সুবোধ বালা দেবীর লিখিত কতকগুলি কবিতা তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনীর সহিত "নীরব সাধনা" নামে প্রকাশিত হইয়াছে। কবিতা গুলি অতি সুন্দর রূপে মনের ভয়, দুঃখ, আশা বিশ্বাস প্রভৃতির উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে। আমরা ইহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আস্বাদন করিয়া তৃপ্ত হইয়াছি। কেহ এই সুন্দর পুস্তক খানি পাইতে ইচ্ছা করিলে শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ রায়ের নিকট ৮২ নং হেরিসন রোড ভবনে পত্র লিখিলে বিনা মূল্যে পাইবেন। আমাদিগের পাঠিকাগণকে ইহার একটি কবিতা উপহার দান করিতেছি।

কে আমি।

এ বিশ্ব সংসারে প্রভো
কোন্ ক্ষুদ্র কণা আমি
যার তরে ব্যস্ত হয়ে
আছি এত দিন যামি ?
আমার আমার ক'রে
সব তাতে ব্যস্ত হই
আমি তো ধূলির কণা
বিনা আর কিছু নই।
তুচ্ছ তৃণ কণাটুকু
তাও গো আমার বলে
প্রাণভরে পারিনা ক
পর করে দিতে তুলে।
একটী তুচ্ছ কথায়
কেন বুক ভেঙ্গে যায়
সহানুভূতিতে পুনঃ
কেন বা আনন্দ পায় ?
সুখ সুখ করে মরি
না পেলে হৃদয়ে কেন
এত দুঃখ এত ক্ষোভ
আসি উপজয় হেন ?
তোমারি হাতের এক
ক্ষুদ্র পুত্তলিকা আমি,
তোমারি বিধান তরে
পাঠায়েছ বিশ্বস্বামী।
সে বিধি হইলে পূর্ণ
জল বিম্ব প্রায় হয়ে

অনন্ত কাল সাগরে
যাব আমি মিশাইয়ে।
কয়দিন তরে আর
মোর জগতেতে আসা
কেন এত দুঃখ খেদ
কেন অশ্রু কেন হাসা ?
এত অহঙ্কার করি
এ দেহ তো হবে ছাই
ভাবিয়া এ তত্ত্ব হায়
অবাক হইয়া যাই।
তাই গো তোমারে দেব
করিতেছি এ মিনতি
আমিত্ব বিনাশ হয়ে
মিশে যাক্ তোমা প্রতি।

আত্ম নিবেদন।

বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষা বিস্তার, মুদ্রাযন্ত্র, ডাক প্রভৃতির উন্নতির সহিত সাময়িক পত্রিকার উন্নতি দর্শন করিয়া সকলেই সুখী হইতেছেন এবং অনেকে অর্থ ব্যয় করিয়া সাময়িক পত্রিকা গ্রহণ করিতেছেন। কোন কোন সাময়িক পত্রিকা উচ্চ আদর্শে পরিচালিত হইতেছে না ইহা দুঃখের বিষয় কিন্তু অধিকাংশ পত্রিকাই সাধারণের জ্ঞান বৃদ্ধির ও মানসিক বিকাশের সাহায্য করিতেছে, তাহার সন্দেহ নাই। মহিলাগণের জন্য কয়েকখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে বটে কিন্তু মনে হয় এ দিকে আরও অধিক দৃষ্টি পড়ার প্রয়োজন। নারীজাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে পরিচালিত মাসিক পত্রিকার সংখ্যা শীঘ্রই বৃদ্ধি পাইবে আমরা আশা করি।

সাময়িক পত্রিকা ক্ষেত্রে যে উন্নতির স্রোত এখন প্রবাহিত হইতেছে তাহাতে যে ত্যজ্য বা অব্যবহার্য্য অনেক সামগ্রী আছে তাহা অবশ্য সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন—মাসিক পত্রিকাগুলিকে কলেবরে বৃহৎ করিতে যে উৎকণ্ঠা দেখা যাইতেছে তাহা স্বাভাবিক সুস্থতার লক্ষণ কি না সন্দেহ। পুস্তিকাখানি ওজনে অধিক হইলেই যে অধিক মূল্যবান্ হইবে একথা কে বলিবে। এমন দেখা যায় যে শত বা ততোধিক পৃষ্ঠার একখানি মাসিক পত্রিকাতে সুপাঠ্য একটি বা দুইটি প্রবন্ধ প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর হয়। পাঠক পাঠিকাগণ যদি পুস্তকের ভারিত্বকেই শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণরূপে গ্রহণ করেন তবে দেশের সুদিন বহুদূরে রহিয়াছে বলিতে হইবে।

গত কয়েক বৎসরে আমাদের দেশে চিত্রাঙ্কন বিষয়ে অনেক উন্নতি হইয়াছে। চিত্রবিদ্যা মানব-মনের গভীর সৌন্দর্য্যস্পৃহা তৃপ্ত করে। কিন্তু সৌন্দর্য্যের আদর্শ সঙ্গে সঙ্গে উন্নত না হইলে চিত্র কেবল চঞ্চল চক্ষের তৃপ্তিসাধন করিয়া আপনি হীন হইয়া পড়ে। যদি অন্তরের অন্তরে সম্ভাবনারূপে অবস্থিত সৌন্দর্য্য, কোমলতা, প্রেম পুণ্য, মহত্ব, প্রভৃতি স্বর্গীয় ভাব সকল অন্তরে ক্রমে প্রকাশিত না হয় এবং তাহাকে পদ্যে পদ্যে সঙ্গীতে মূর্ত্তিতেও চিত্রে প্রকাশ করিতে একান্ত যত্ন না হয় তাহা হইলে চিত্র জাতীয় শিক্ষা ও উন্নতি বিষয়ে হিতকর হইতে পারে না। চিত্রবিদ্যা

উন্নত হউক সুখের বিষয় কিন্তু যদি সেই সঙ্গে স্বাভাবিক দৃশ্য ও মানবচরিত্রের ভিতরকার উচ্চতর সৌন্দর্য্য প্রকাশ হইয়া চিত্রকরকে পরিচালিত না করে তাহা হইলে চিত্রকর দিশাহারা হইয়া পড়িবে।

আমরা 'মহিলা' পরিচালনা সম্বন্ধে উচ্চ আশা ও আদর্শ পোষণ করি; আমাদিগের পাঠক পাঠিকাগণকে সে কথা বিনীত ভাবে জানাইতেছি। তাহার কারণ এই যে, আমরা অন্য সকল সাময়িক পত্রিকা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ নহি, অথচ ঠিক অন্য কোন পত্রিকার সহিত এক আদর্শ লইয়া চলি না। অন্য সকল মাসিক পত্রিকার উন্নতি দর্শনে আমরা আনন্দিত এবং আমরাও তাঁহাদিগের অনুসরণ করিতে ইচ্ছুক কিন্তু দেখিতে পাই আমরা যে ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত সে ক্ষেত্রে কোন পত্রিকা আমাদিগের আদর্শ হইতে পারে না এবং আমরা সমাজের সেবাকার্য্যে যে ক্ষুদ্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতেছি তাহার স্থান অন্যে ঠিক পূর্ণ করিতে পারে না। একথা সত্য যে আমাদের দেশে বিবিধ ক্ষেত্রে নবালোক উপস্থিত হইয়া নব জাগরণ সংঘটন করিয়াছে। রাজনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানাবিধ বিভাগে নব জাগরণ উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু আমরা যে মহাসমন্বয়ের আলোক পাইয়াছি তাহা অন্য সকল বিষয়কে উপযুক্ত সম্মানের সহিত গ্রহণ করিয়া সর্ব্বোপরি স্বর্গের আদর্শকে গ্রহণ করিতে উৎকণ্ঠিত করিয়াছে। বিবিধ শাস্ত্র, বিভিন্ন কলাবিদ্যা, অতীত ও বর্ত্তমানের সকল শিক্ষণীয় ও প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচনা করিতে আমরা সকলের সহিত মিলিত হইব, সকল শিক্ষকের নিকট শিক্ষা করিব কিন্তু আমরা সেখানেই কার্য্য শেষ করিতে পারি না। আমাদের মঙ্গলময় পরমেশ্বর তাঁহার পুত্র কন্যার জন্য যে উচ্চজীবন, সুখী পরিবার, আনন্দলোক লইয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন তাহা লাভ করিতে সকলকে আশান্বিত, উত্তেজিত, ও উৎকণ্ঠিত করিতে আমরা বদ্ধপরিকর, এজন্য মহিলা পাঠিকা ও পাঠকগণের দয়া সহানুভূতি ও সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া নূতন ভাবে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে।

এতদিন "মহিলা" ২৪ পৃষ্ঠাতে সমাপ্ত হইত, নূতন বৎসর হইতে ৩২ পৃষ্ঠার ন্যূন হইবে না, সময় সময় চল্লিশ পৃষ্ঠাও হইবে। যে সকল মহিলা ও মহাশয়গণ এতদিন ইহাতে লিখিতেন এখন তাঁহারা ব্যতীত আরও অনেকগুলি মহোদয় ও মহিলা লিখিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। বারান্তরে "মহিলা"র লেখক ও লেখিকাগণের নাম প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

ক্ষুদ্র "মহিলা"র প্রতি অনেকের ভালবাসা ও কৃপাদৃষ্টি আছে আমরা জানি। এখন আশা করি যে তাঁহারা আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া মহিলার গ্রাহিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিবেন। যদি বর্ত্তমানের প্রতিজন গ্রাহিকা আর একজন গ্রাহিকা করিয়া দেন এবং যদি সকলেই ইহার বার্ষিক মূল্যটি অগ্রিম দান করেন তাহা হইলেই আমরা এই ক্ষীণহস্তে মহৎ উদ্দেশ্যের কিছু মৌলিক কার্য্য করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি। সকল সদনুষ্ঠানের যিনি আদি সহায় ও বল, সকল পাঠক পাঠিকার অন্তরে যিনি শুভ ভাব ও উচ্চ আদর্শ প্রদান করিতেছেন তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করিয়া আমরা নব-বর্ষের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি, তিনি সহায় হউন।